শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

৭ম ভাগ

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

প্রাপ্তিস্থান

১। আনন্দময়ী আশ্রম, ২।৯৪ ভদৈনী, বেনারস।

২। আনন্দময়ী মন্দির,
৪।৪, একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

৩। শ্রীযুক্ত অমলেন্দু সেন,
কুইন্সওয়ে, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, নিউ দিল্লী।

৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য,
'রুবীলজ', রিসলদারবাগ, লক্ষ্ণৌ।

৫। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়,
"দেবালয়", ২৮ ডি, এ, ভি কলেজ রোড, দেরাদুন।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

সপ্তম ভাগ

[অগ্রহায়ণ—চৈত্র, ১৩৪৫]

ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
২।৯৪ ভদৈনী, বেনারস

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

সপ্তম ভাগ

বিস্তারিত বিষয়-সূচী

বিষয় অনুসারে সজ্জিত ও বর্ণানুক্রমিক

মায়ের শরীরে সাধনার বিভিন্ন অবস্থা—

বিষয়		পত্রাঙ্ক
একাত্ম ভাব	...	১০
ক্রিয়া		১২৯, ১৩৭, ৩৩১, ৩৩৮
খণ্ড শূণ্য ভাব	...	১৪
গতাগতির ক্রিয়া	...	৩৪
গ্রন্থি খোলার কথা	...	১০৪
ত্রাটক	...	২,৭, ৬৩
দীক্ষা	...	৫৪
পূর্ব্বকথা	...	৭৩
পূজাদির খিবরণ	...	১৩
যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশে প্রায়শ্চিত্ত	...	৫৪
সাধনার কথা	...	৮
স্থির শান্ত ভাব	...	৩৩১
সাধক ও মার সাধনাবস্থা	...	১৩৮

সূক্ষ্মজগতে মা—

অশরীরীদের সহিত মার কথা	...	৭০
আমার রোগমূর্ত্তি দর্শন	...	৩৭৭
একটি মূর্ত্তি দর্শন	...	৪৬

বিষয়		পত্রাঙ্ক
কথাবার্ত্তা	...	১৬৫
কাঠিয়াবাড়ের এক মহিলার মাকে দর্শন	....	৬৬
কীর্ত্তনোৎসব	...	৩০৫
কথোপকথন	...	২৬০
খারাপ আত্মার দর্শন	...	৩৬৭
গঙ্গোত্রী-যাত্রী সাধু	...	৩২৯
ঘরে শিশুর গায়ের গন্ধ	...	১৭০
তিনটি মূর্ত্তি দর্শন	....	১৬৬
তিনটি সাধু	...	৩২৪
দেরাদুনের সাধু	...	৩৩২
বৃদ্ধ সাধু	....	৬১
মার স্থানান্তর গমন	...	৫১
মাকে গোপাল রূপে দর্শন	...	১৫৯
মৃতদেহ দর্শন	...	৩১৮
মনসাদেবী	...	৩২০
মার কম্বল	...	৫১
যতীশদার রুগ্নমূর্ত্তি	...	৩৩৩
যোগানন্দজীর শিষ্যার মাকে দর্শন	...	৪৭
শিশুদের মার নিকট আগমন	...	৩২৪
শিশু-সাধুদের কথা	...	৩২৮
শ্রীরাধা	...	৩৬২

বিষয় পত্রাঙ্ক

স্থক্ষ্মে দর্শনাদি স্বপ্ন কিনা ... ৩০৯
হনুমানজী ... ৩৩২

মার মুখে পূর্ব্বকথা—

ছিন্নমস্তারূপ-দর্শন ... ২৫২
ভাইজীর স্ত্রীর কথা ... ১১১
ভোলানাথের দীক্ষা ... ৩৩০
ভোলানাথের ভাবের রূপান্তর ... ২০৭
ভোলানাথের দেহত্যাগ ... ২০৯
মার পূর্ব্বের ভাবাবস্থার কথা ... ২০৫
মার দিদিশ্বাশুড়ীর সহমরণের কথা ... ২১৪
বাজ্বিতপুরে মার আত্মপরিচয় দানের ইতিহাস ৩২
স্বর্পরূপী আত্মানন্দের কথা ... ৩২১

মায়ের সম্বন্ধে নানাকথা—

অসুস্থতা —, শরীরের ... ২৬৩, ৩৫৩
অসুখ কি (মায়ের) ... ৩৫৫
আকর্ষণী শক্তি ৩১৭
ইচ্ছা অনিচ্ছা ... ১৮১
উপহাস করা সম্বন্ধে মার কথা ... ১৫১
কীর্ত্তন ৯৮, ১৩১, ২৭১, ৩৯২
কীর্ত্তনে ভাবাবেশ ১৫৫, ১৬১, ৩৫৯
খেয়াল, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ... ১২৯

বিষয় পত্রাঙ্ক

গান

স্বরচিত ... ২৮৭

ছন্দ ... ১৩২

বিভিন্ন শব্দাদি ... ২৭১

গীতা আবৃত্তি ... ১৩

ঝিমুনি আসে কি ... ১৮৫

ভূবনেশ্বরী মূর্ত্তীতে দর্শন ... ৩৩০

মার প্রকৃত সেবা কি ... ২১৫

মৌনভাবের আবেশ ... ২৬০

যথাযোগ্য ব্যবহার ... ১০৬

যে যাহা বলে মা তাহাই ... ২৫৮

সকলের প্রতি সমভাব ... ১৩৩, ২০৬

সকলের নিঃসঙ্কোচ ভাব ... ১৩৫

মার মুখনিঃসৃত উপদেশাদি—

অখণ্ড শান্তির চেষ্টা ... ১০৯

অধিকারী ভেদে কথা ১৬৯

অপাত্রে কৃপা ... ১৪৮

অভ্যাসযোগ ... ১৯৩

"আপন করিয়া নাও" ... ২৭৯

আশ্রমের কার্য্যশৃঙ্খলা সম্বন্ধে ... ১২৩

আশ্রমের ব্যবস্থা কে করিবে ... ১৪১

বিষয়		পত্রাঙ্ক
উপনিষদ কি	....	৩৩৮
একের মধ্যে অনন্তত্ব	...	২০
একটি ছেলের বিবাহের সম্বন্ধে	...	১২৯
"এক আমিই"	...	২৮২
কাজ করিলেই কৃপালাভের আশা	...	১০৯
কাজ পূর্ণভাবে করা উচিৎ	...	১১৩
কর্ম্ম ও সঙ্গের ফল	...	২৫২
কুলগুরু	...	৩৩৪
কীর্ত্তনের পূর্ব্বের ধ্বনি সম্বন্ধে	...	৩৪৮
গতাগতি জগৎ	...	১
গুরু কে	...	২৩১
গুরু প্রয়োজন	...	২৬২
গুরু ও দীক্ষার তাৎপর্য্য	...	২৯৪
চাকুরীর জন্য দরখাস্ত কর	...	২২৮
চেষ্টা করা চাই	...	৩১৬
জীব কে	...	২৫১
জপের মালা	...	২৭২
জগতের সম্বন্ধই কষ্টদায়ক	...	৩৭০
জনৈক ব্রহ্মচারীকে উপদেশ	...	৩০৭
জনৈকা মেমসাহেবকে গুরুবিষয়ে	...	৩৯১
ধ্যানে স্থিতি	...	১৫০
নিষ্কাম কর্ম্ম	...	৩১৭

বিষয়		পত্রাঙ্ক
নির্ভরতা	...	৩৩৭
প্রাণবায়ু স্থির করিবার উপায়	...	১৮
প্রাণবায়ুর সহিত নামের যোগ	...	২৪৫
প্রণাম	...	২৭
পূর্ণ বলিলেও সব বলা হয় না	...	১৪৭
পথের সন্ধান	...	৩৩৬
প্রকৃত প্রেম কি	...	৩৬৯
পুরুষকার ও দৈব	...	১৪১
বাহির ও ভিতর পরিষ্কার করা	...	১২৪
ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীর রক্ষার্থে ক্রিয়াদি করা সম্বন্ধে	...	১৬৯
বীজমন্ত্র	...	২৩৭
বাড়ীকে ধর্ম্মশালা বানাও	...	৩০৫
বই ও গুরুর নিকট মন্ত্র লওয়ায় পার্থক্য	....	৩৪৪
"বাড়ী পরিষ্কার রাখা"	...	৩৬৮
ভালবাসা কি	...	১৯
ভক্তদের প্রতি আশ্বাসবাণী	...	২২৫
ভোজন কি	...	২৫৮
মেয়েদের প্রতি উপদেশ	...	১১০
মনস্থিরের চেষ্টায় নানা চিন্তা আসার কারণ	...	১২৭
মনস্থিরের উপায়	...	৩৩৬
মোড় ঘোরানই—গোলমাল	...	১৬২
"মা-টি" ছাড়া কিছুই নাই	...	১৬৭

বিষয়		পত্রাঙ্ক
মার ধর সম্বন্ধে	...	৩৬১
"যথাসাধ্য কাজ করিয়া যাও"	...	১২৫
যোগাযোগ ত শ্বাস প্রশ্বাসেই আছে	...	১৪৯
রাজার ছেলে বটে—সাবালক হলেই রাজ্যপদ	...	৩৮৯
শিশুদের প্রতি উপদেশ	...	৩১
"শুধু ঔষধ খাইলেই হয় না"	...	১৫১
শূণ্যের চিন্তা	...	১৮৩
শ্বাসের সহিত নাম	...	২৫৬
শিব ও শক্তি	...	২৯২
স্বাভাবিক প্রকাশ গতি	...	১৫
সাধকের সাম্প্রদায়িকতা হয় কেন	....	১৭
সাধুভাবকে শ্রদ্ধা করিতে হয়	...	২৬
সন্তানের শিক্ষা বিষয়ে মাতাপিতার কর্ত্তব্য	...	১০৮
সংসারত্যাগ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান	...	১২৬
সাধনার দ্বারা বাসনার বীজ নষ্ট হয়	...	১২৮
সাধনাবস্থায় সাধকের শরীর	...	১৪৩
সংযম ব্রত	...	১৬২, ২২৯
সঙ্গ কাহাকে বলে	...	২২১, ২৬৬
"সবাই ত এক"	...	২৭৮
"সবই ভোগ"	...	৩১১
সবল খাদ্য অর্থাৎ সাধন	...	৩৩৪
সমাধি	...	৩৩৪

বিষয়		পত্রাঙ্ক
সাকার ও নিরাকার উপাসনা	...	৩৩৮
সব একেই আশ্রম	...	৩৯৪

মায়ের লীলা-কথা—

অপরিচিতার সহিত মার পরিচিতার ন্যায় ব্যবহার		১০০
"এ কি রকম সাধু?"	...	৩২৪
কলিকাতার ভক্তসঙ্গে লীলা	...	২২০
খেওড়ার পূর্ব্ব পরিচিতাদের সহিত কৌতুক	...	২৩৬
চট্টগ্রামে আমসত্ব চুরি	...	২৪৬
জনৈকা স্ত্রীলোকের চিরপরিচিতার ন্যায় ব্যবহার	...	৪
দেবুর জন্য মার চিন্তা	...	৩৫
দুটি বৃদ্ধার সহিত কৌতুক	...	২১২
কলাহারী মায়ের প্রতি করুণা	...	৪৯
ফলহারী মার সহিত দুষ্টামী	...	১০৩
বাল্যকালের গল্প (মার)	...	৫৮
বীরেনের অভিমান	...	১৫১
ভাইজীর সহিত থাকাকালীন দেরাদুনের একটি ঘটনা		৯৬
মার দুষ্টামী	...	১৪০
মার নিজেকে লইয়া কৌতুক	...	২৮৭
"মিশ্রি মুখে রাখিও"	...	৩৪৭
সুকেতের নাগা সন্ন্যাসির সহিত আলাপ	...	২৮০

মায়ের লীলা-সহচর সম্বন্ধে

আত্মীয় স্বজনের আনন্দ ... ২৪৮
কবিরাজের মার শরীরে অবস্থা দর্শনে বিস্ময় ... ৩৪৯
কুমারী মেয়েদের মার নিকট আরতির নৃত্য ... ৩২৬
কৃষ্ণানন্দ-ব্রহ্মচারী ... ১৯২
কৃষ্ণা মা ... ২৫৯
দিদিমার সন্ন্যাস ... ১৭৪
নারায়ন স্বামী ... ৯৯
নবদ্বীপের মাঝি ... ১৩৪
পাহাড়ী স্ত্রীলোকদের মাকে লইয়া আনন্দ ... ৩১৫
পূর্ব্ব পরিচিতা ...
 বৈজনাথে ... ৩০৪
 সুলতানপুরে ... ২৪৩
মিসেস্ অম্বাপ্রসাদের স্বপ্ন ... ৩১২
মিসেস্ দীক্ষিতের অনুযোগ ... ৩১১
মহারতনের মুখে বিস্ময়কর ঘটনা ... ৩৮২
যমুনাবাই ... ১০০
রেলকর্ম্মচারী ... ৩৪১
শিশুদের সহিত মার বন্ধুত্ব ... ১৮৭, ২৮৫
সেবার ভাবাবেশ, মার স্পর্শে ... ১৭৯
হারান বাবুর প্রার্থনা ... ৩৮২

বিষয় পত্রাঙ্ক

নানা কথা—

কীর্ত্তন
জন্মস্থানে ... ২৪০
ঝুলনপূর্ণিমায় কীর্ত্তনোৎসব ... ২৪১
ঢাকাকায় নামযজ্ঞ ... ২৩৩
দিল্লীতে দোলপূর্ণিমায় ... ৩৮১
বিরলা মন্দিরে ... ১৫৪
সিমলায় নামযজ্ঞ ... ২৩৩
মার ফুলদোল দেখা ... ১৫৯
মাকে পূজা করা ...
জন্মদিনে ... ১৮৪,
জন্মতিথিতে ... ১৮৭
দিল্লীতে বাসন্তী পূজার সময় ... ১৫৩
স্মৃতি
কয়েকটী অলৌকিক ঘটনা ... ২৮৮
গণের অত্যাচার ... ২৯২
তারামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ... ৩০৮
বস্ত্রালঙ্কার বিতরণ ... ৩০০
বিদায় গ্রহণ ... ৩০১
সিংহের গল্প ... ২৭৬

মায়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত—

অমৃতসর ... ৩০৯

বিষয়		পত্রাঙ্ক
আলমোড়া	...	৩১৪
আগ্রা	...	৩০
আজীমগঞ্জ	...	২৩১
উত্তরকাশী	...	১৮৪
এলাহাবাদ	....	২৮
কাশী		১৪৩, ২৫৭, ৩৩৩, ৩৩৯
কন্খল	...	১৭৩
কলিকাতা		২১৯, ২৫২, ২৫৭, ৩৪২
কুমিল্লা	...	২৪৪
খেওড়া	...	২৩৫
চান্দোদ	...	৩৮, ১০৬
চট্টগ্রাম	...	২৪৬
জামসেদপুর	...	২৫৪
ডাকুর	...	১১৫
ঢাকা	...	২৩৩, ২৫০
দেওঘর	...	১২০
দিল্লী	...	১৫৮; ৩৮০ ৩৯৬
দেরাদুন		১৬৪, ৩৭৮, ৩৯৬
নবদ্বীপ		১১৮, ৩৪২
নলহাটি		২২৫
বৈদ্যনাথ		১
বিন্ধ্যাচল		২৫, ১২৩, ৩২৮, ৩৩৫, ৩৭৮

বিষয়		পত্রাঙ্ক
বরোদা		৩২, ১০৭
ব্যাস	...	৩৮
বৃন্দাবন		১৫৭, ৩৮৫
বৃন্দাবন গমনের কারণ		৩৮৮
বহরমপুর	...	২২৬
বৈজনাথ	...	৩০৩
বেরিলী	...	৩১১, ৩২০
ব্যাণ্ডেল	...	৩৪০
মথুরা	...	১১৭
মুন্সীগঞ্জ	...	২৩৪
রায়পুর	...	২১৮
শ্রীরামপুর	...	২২৪
সিমলা	...	২১৯, ২৬৪
সুলতানপুর	...	২৪৩
সেলিন	...	২৬৪, ২৬৭
সুকেত	...	২৭৩

শ্রীশ্রীমা

আনন্দময়ী আশ্রম

১। কিষণপুর, দেরাদুন
২। রায়পুর, ”
৩। ভোঙ্গা, ”
৪। উত্তরকাশী, টীহরি, গাড়ওয়াল
৫। পাতালদেবী, আলমোড়া
৬। অষ্টভূজা পর্ব্বত, বিন্ধ্যাচল
৭। ভদৈনী, (বি ২।৯৪) কাশী
৮। ভীমপুরা, নর্ম্মদাতীর, চান্দোদ, গুজরাট
৯। বালীগঞ্জ, ৪।৪ একডালিয়া রোড, কলিকাতা
১০। স্বর্গদ্বার, সমুদ্রতীর, পুরী
১১। রমনা, ঢাকা
১২। সিদ্ধেশ্বরী, ”
১৩। খেওড়া, ত্রিপুরা

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী

সদ্‌বানী, (মাতৃবানী সংগ্রহ)—৺ভাইজী	১৲
ঐ (গুজরাটি অনুবাদ) শ্রীকান্তিভাই ব্যাস	১৲
ঐ (ইংরাজী অনুবাদ) শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	১৲
মাতৃদর্শন, (২য় সংস্করণ) সংক্ষিপ্ত জীবনী—৺ভাইজী	২৲
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী— (ধারাবাহিক বিস্তারিত জীবন কথা) গুরুপ্রিয়া ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম. ৬ষ্ঠ, ও ৭ম ভাগ, প্রতিখানা—	২৲
ঐ ১ম ভাগের হিন্দি অনুবাদ, ডাঃ পান্নালাল	২৲
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত ১ম ও ২য়, প্রতিখানা	১৲
মা আনন্দময়ীর আগমনে—শ্রীঅরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	॥৵
মা আনন্দময়ীর বানী—অভয়—	॥০
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলাকথা, ১ম—অভয়	১॥০
মা আনন্দময়ীর কথা—অভয়	॥০
Ma Anandamoyee—by devotees	৩॥০
মা—(মায়ের ৬খানি চুহবর্ণ চিত্র সম্বলিত বংলা এ্যলবাম্)	১॥০
MA— (ঐ ইংরাজী)	১॥০

ইহা ছাড়া নানা অবস্থার ও বিভিন্ন সময়ের তোলা, নানারকম সাইজের মায়ের ছবি, প্রতিখানা— ২৷৷, ১৲, ৷৷০ ও৷০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীকুসুমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

২।৯৪ ভদৈনী, বেনারস

প্রকাশকের কথা

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের যে ধারাবাহিক ইতিহাস এই বইগুলিতে প্রকাশিত হইতেছিল, নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে তাহা এতদিন বন্ধ ছিল। এই ভাগে অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র, ১৩৪৫ সনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হইল। ইহাতে মায়ের অমূল্য উপদেশ অজস্র আছে ও তাহার ভাষা যথাসাধ্য অপরিবর্ত্তিত রাখা হইয়াছে

ভ্রমবশতঃ, এই ভাগের মূদ্রণ কার্য্য অসংশোধিত পাণ্ডুলিপিখানি হইতেই আরম্ভ হওয়ায় প্রথম দিকে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি আছে। প্রচ্ছদ-পট, বাঁধাই ইত্যাদি যথাসাধ্য সুন্দর করিতে প্রয়াস পাইয়াছি—ভক্তদের ভাল লাগিলেই ইহা সার্থক।

ডাঃ পান্নালাল এই পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিয়া ভক্তদের সকলের পরম উপকার করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি, বোধি প্রেসের সহযোগীতা ও সহানুভূতি না পাইলে পূজার পূর্ব্বে পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হইত না।

মহালয়া—১৩৫৫,
আনন্দময়ী আশ্রম
বেনারস

বিনীত—
প্রকাশক

সূচীপত্র

বৈদ্যনাথ ধাম—মার সাধনার কথা	...	১
চান্দোদ ও ব্যাসে মা	...	৩৭
দিল্লীতে ৺বাসন্তী পূজায় মাতৃপূজা	...	১৫০
বৃন্দাবনে—'ফুলদোল' দেখার জন্য গোবিন্দজীর অনুরোধ	...	১৫৭
হৃষিকেশে দিদিমার সন্ন্যাস গ্রহণ—মুক্তানন্দ গিরি	...	১৭৩
উত্তর কাশীর পথে	...	১৮২
দুর্গম গঙ্গোত্রীর পথে	...	১৮৮
জন্মস্থানে মা—খেওড়া	...	২৩৪
সুলতানপুর—মাতুলালয়	...	২৪৩
কুমিল্লা, চট্টগ্রাম	...	২৪৫
বিদ্যাকূট	...	২৪৭
সুকেত	...	২৭৩
বৈদ্যনাথ—তারানন্দ স্বামী	...	৩০৩
বেরিলীতে—মার আকর্ষণী	...	৩২০
মায়ের অসুস্থতা—কলিকাতা, আগড়পাড়া	...	৩৪২
বৃন্দাবনে মা	...	৩৮৫
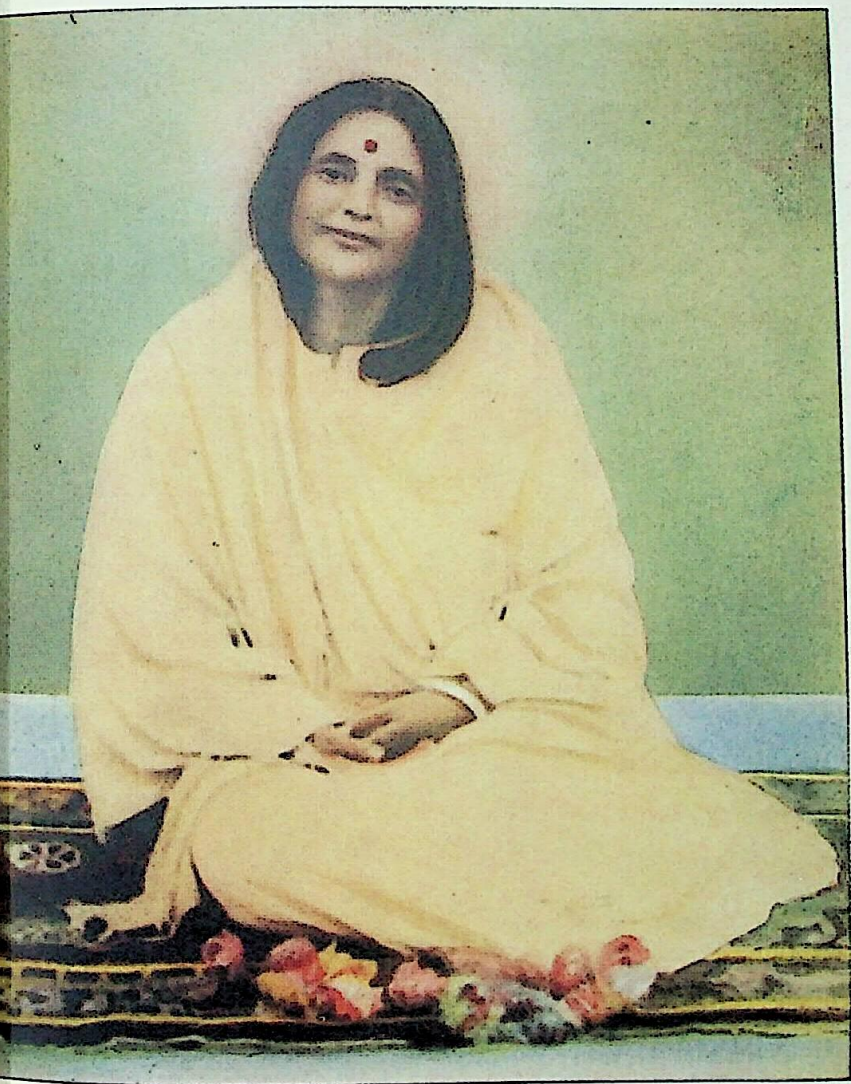
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

সপ্তম ভাগ

বৈদ্যনাথ ধাম

সন—১৩৪৫

১লা অগ্রহায়ণ—আজ বেলা ১০॥টায় আমরা বৈদ্যনাথ ধামে আসিয়া পৌঁছিলাম। সকলেই হয়ত অনুমান করিয়াছেন এখানে শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল বাবু আছেন, মা তাহাকেই দর্শন দিতে বৈদ্যনাথ ধামে আসিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এই চরিত্র বোঝা ভার। মা কর্নিবাগ আশ্রমে গেলেন না, নূতন ধর্ম্মশালায় উঠিলেন। ট্রেনে আসিবার সময় রাস্তায় পূরাণ নূতন অনেক দালান দেখা যাইতেছে। তাহা দেখিয়া আমাকে বলিতেছেন "দেখ্, খুকুনি! এই যে দেখিতেছিস, কত দালান কত সুন্দর করিয়া উঠাইয়াছে, আবার কত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি, কত রূপ, কি সুন্দর গঠন, দেখিয়া কত আনন্দ করিস, কিন্তু প্রত্যেকটার ভিতরই ভোগ করিতে যাইয়া পরিণাম চিন্তা করিস, কিন্তু এই দেখ, আবার নূতন দালানের সামনেই পুরাতন ভাঙ্গা দালান এইটাও একদিন নূতন ছিল, এই ত গতি। নূতন দেখিতে দেখিতেই পূরাতন হইতে চলিল। তাকেই বলে গতাগতি জগৎ। এই ভাবটা প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতর খাইতে শুইতে যদি চিন্তা করিস, তা হলেই অনেকটা আলাদা থাকতে পারবি।" আবার কথায় কথায় বলিতেছেন "উপনিষদ"

না উপ যেখানে সেখানেই নিষেধ। তাই উপ যা কিছু তা তোমরা বাদ দেও। ভাষায় বলতে গেলে বাদ দেওয়াই বলতে হবে। আবার সূর্য্য ত্রাটক সম্বন্ধে কথায় কথায় বলিতেছিলেন—

"একবার ভিতর হইতে এই ভাব আসিয়াছিল যে ত্রাটক করিতে হয় একেবারে বস্ত্রাদি সব পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত অবস্থায়। রাত্রিতে যে শুইবার ভাব থাকে, সকাল বেলা চোখ লাল থাকে, সেই ভাবের চোখ নিয়াই একেবারে বস্ত্রাদি শূন্য অবস্থায় সূর্য্য উদয়ের সময়টা সোজা সুজি হইয়া যতটা সময় হয় দাঁড়াইয়া থাকা। এই শরীরের আপনা আপনি সব হইয়া যাইত কিনা এমন হইত পাতলা একখানা কাপড় পরিয়া ঐ ভাবে গা ছাড়া ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা হইত; আস্তে আস্তে হাত দুই খানা উপরের দিকে উঠিয়া যাইত, পরে ধীরে ধীরে সোজা ভাবে খানিক সময় থাকিয়া নীচের দিকে হেলিয়া পড়িয়া যাইত। ঐ গা ছাড়া ভাবেই সূর্য্যের দিকে লক্ষ্য থাকিত এবং ঐ গা ছাড়া ভাবেই যতটুকু দরকার এই শরীরটা দাঁড়াইয়া থাকিত। আবার সূর্য্য প্রণামের সময় ভ্রূমধ্যে যে মুদ্রা টুদ্রা না কি তোদের বলে হাতে সেই সব হইয়া সূর্য্য প্রণাম হইয়া যাইত। জ্যোতি দেখা যাইত তাহা এই ত্রাটক ভাবটির পূর্ব্বেই আরম্ভ। ত্রাটক মাত্রই ত কিছু সময় হইয়াছিল। ত্রাটকের পর যে জ্যোতি, আলো ইত্যাদির মত প্রকাশ পায়, তাহা প্রথম দিক দিয়া অনেক সময় দেখা যায় সূর্য্যের দিকে তাকাইবার সংস্কারের ভাবটা থাকে কিনা, সেই জন্য সেই রকম এবং অন্যান্য অনেক রকম আলো দেখা যায়, শরীরের যন্ত্রাদির মধ্যে ছাপটা থাকে কিনা, এমনিও দেখ আগুনের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর চোখ বুঝলে দেখবি সেই রংই দেখা যায়। ফটো ইত্যাদির দিকে তাকাইলেও

এই রকম হয়, চোখ বুজিলেও সেই রূপই দেখা যায়। এই সব কিন্তু বাহিরের জিনিষ। আবার অন্ধকারে এবং অন্যান্য সময়ও সেই রকম আলোর প্রকাশ পায়। আরও অনেক এর ভিতর আছে বিচারে এই সব আসিত। এই যে সূর্য্যের তেজ রং শক্তি তৎস্বরূপ হইয়া প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ পাইত একেবারে তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া যাইত। যেমন ছেলে পিলেকে পড়াইতে পড়াইতে তাহার ভিতর যে যে জিনিষটা রহিয়াছে তাহার সঙ্গে যোগ হইয়া প্রকাশ পায়, সেই প্রকার সূর্য্য সহযোগে নিজের ভিতরের সূর্য্যের স্বরূপ তৎভাবাপন্ন হইয়া প্রকাশ পায় বাস্তবিকই তাই। ইহার ভিতর আরও কত বিষয়ের যোগাযোগ রহিয়াছে। আসল কথা আমাদের মধ্যে যে চন্দ্র সূর্য্য রহিয়াছে তাহার এবং তাহার গতিবিধির প্রত্যক্ষ প্রকাশ পায়। চক্ষু ইত্যাদির কোন বিঘ্ন না হয় ইহা যে গুরু পূর্ব্বাপর ভিতর নির্ব্বন্দ প্রত্যক্ষ ভাবে সব দেখিতে পারেন, তিনিই বলিয়া দিতে পারেন। এই শরীরের ভিতর হইতেই যতটুকু সময় যে ভাবে থাকা দরকার তাহা ত আপনিই সব হইয়া যাইত কিনা সাধারণতঃ গুরু সেটা পূর্ব্বাপর দেখে বলে দেন। সংশয় আসিলেও গুরুকে সব খুলিয়া বলিতে হয়।" এই বলিয়া আমাকে বলিতেছেন, "খুকুনি, মনে আছে একবার কলকাতায় একটি ছেলে কাহার কথায় সূর্য্য ত্রাটক করিতে যাইয়া চোখ দুইটি নষ্ট করিয়া ফেলে।" ডাক্তার দেখিয়া বলেন "একদিন পূর্ব্বে আসিলেও চেষ্টা করিয়া কিছু করা যাইত এখন আর কিছু উপায় নেই।" মা আবার বলিতেছেন, "হয় কি জানিস? আসন মুদ্রাদির ক্রিয়াগুলির সময় যে ভাবগুলি ভিতরে না থাকিলে উপকার পাওয়া যায় না তেমন ত্রাটকাদির সম্পূর্ণ উপকারিতাও আমরা পাইতে পারি না। অনেক সময় অপকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যেমন পথ্য ও ঔষধ সমান ভাবে চলিলেই আমাদের রোগ মুক্ত হইবার সম্ভাবনা।” আমরা ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছি। পাণ্ডাদের যন্ত্রণায় অস্থির। কোথায় বাড়ী কি নাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। যাক, এই ব্যাপার মিটিয়া গেলে খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যবস্থা করিয়া মাকে মুখ ধোয়াইতে নিয়া গেলাম। মুখ ধোয়াইতেছি, একটী স্ত্রীলোক দেখিয়া মাকে বলিতেছে, “তোমার হাত নাই তুমি ধুইতে পার না?” মা হাসিয়া তাহার হাত দেখাইয়া বলিতেছেন, “এ ও আমারই হাত।” সে একটু হতভম্ব হইয়া যাইতেই আমি বলিলাম ইনি একজন “সাধু মা”। এই কথা বলা মাত্রই সেই স্ত্রীলোকটি যেন কেমন ব্যস্ত হইয়া নিকটে আসিয়া বলিল “আমি পা ছুইতে পারি?” আমি বলিলাম হাঁ পারেন। তৎক্ষাণাৎ তিনি পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিয়াই মাকে জড়াইয়া ধরিয়া যেন চির পরিচিতার মত ভয়ানক কান্না। মা ও হাসিতে হাসিতে তার পিঠে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, “তুমি কোথায় ছিলে?” তাহার কান্না অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিল, থামে না। আমরা ব্যাপার দেখিয়া অবাক। খানিক পর সে উঠিয়া গিয়া তাহার সঙ্গীদের সকলকে আনিয়া মার পায়ে প্রণাম করাইল। শুনিলাম তাহারা নাসিক নিবাসী। মা নাসিকের দিকে গেলে তাহাদের খবর দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল। আজই তাহারা চলিয়া যাইতেছে। মা মুখ ধুইয়া আসিলে ঐ স্ত্রীলোকটি মাকে মালা পরাইল, ফল খাওয়াইল। পরে চরণ সেবা করিতে বসিয়া গেল। আমি হাসিয়া বলিলাম “যেখানেই লুকাইয়া থাক না কেন তোমার মালা চন্দনের পূজা সব জায়গাতেই চলিবে।” মা কলিকাতায় কাহাকেও খবর দিতে নিষেধ করিয়াছেন। কতটা সময়

এখানে থাকিবেন ঠিক নাই। বৈকাল ৪টায় ঐ স্ত্রীলোকেরা অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। মাকে বিশ্রাম করিবার জন্য দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল কিন্তু স্ত্রীলোকটি যেন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। ৩॥ টার দরজা খুলিয়া সে ঘরে গিয়া মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। মায়ের আকর্ষণী শক্তি এই রকম নানা ভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

২রা অগ্রহায়ণ—শঙ্করানন্দকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম তিনি আজ আসিয়া পৌছিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল বাবু খবর পাইয়া মাকে আশ্রমে অনিবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তাহার স্ত্রীও মাকে নিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "মা এ কি রকম কথা হইল? তুমি আসিয়া ধর্ম্মশালায় উঠিলে; আমরা তোমাকে একবার দেখিবার জন্য কত ব্যস্ত, আর তুমি একটা খবরও দিলে না। আমি মার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি।" মা অমনি হাসিয়া বলিলেন "মা ত মেয়ের জন্য ছুটিয়াই আসে এই ত মায়ের স্বভাব। পাগল মেয়েটা কোথায় কোথায় ঘোরে ফেরে, মা আসিয়া কোলে করিয়া নিয়া না গেলে কি হয়? এখন মার কোলে যাইব?" এই বলিয়া বৃদ্ধাকে ভুলাইয়া দিলেন। স্থির হইল ৪টার সময় আশ্রমে যাওয়া হইবে। সঙ্গীরা সকলে বৈদ্যনাথজীকে দর্শন করিতে যাইবেন তারপর যাওয়া হইবে। বৈকালে আবার প্রাণগোপাল বাবুর স্ত্রী আসিয়া সকলকে মার সঙ্গে আশ্রমে নিয়া গেলেন। প্রাণগোপাল বাবুকে দূর হইতে দেখিয়াই মা একটু হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "বাবা, বক্‌বে নাকি আমাকে, আমি যে বাবার কাছে আসি নাই?" প্রাণগোপাল বাবু মার মোটর দেখিয়াই নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি মা, তোমার সঙ্গে ঝগড়া আছে। তুমি সেবারও দেখা না দিয়ে চলে গেলে, এবারও

এসে খবর অবধি দেও নাই, এ কি রকম কথা। এখানে না এসে ধর্ম্মশালায় কি বলে গেলে?" মা অমনি হাসিয়া বলিলেন "বাবা, ওখানেও ত তোমার কাছেই ছিলাম। বাবা, তুমি ত আশ্রমে থাক তোমার আবার এখানে সেখানে কি? এক জায়গায়ই ত আমি ঘুরি-ফিরি। ওটাও ত আশ্রম।" প্রাণগোপাল বাবু হাসিতে লাগিলেন। মার থাকিবার জন্য কামধেনু মাতার মন্দিরের বড় কোঠাটী পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীই এখন আশ্রমের মোহন্ত। তাঁর এবং শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল বাবুর উপরই এখন আশ্রমের সব দেখা শুনার ভার। দুই জনই বেশ উপযুক্ত লোক। সন্ধ্যার সময় মোহনানন্দ আসিয়া মার গলায় মালা দিয়া ফল পুষ্পাদি দিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মার বুঝি এতদিনে ছেলের কথা মনে পড়িল?" তারপর মাকে সঙ্গে নিয়া আশ্রমের সব দেখাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন "এবার কিন্তু শিগ্‌গির মাকে ছেড়ে দোব না।" মার খবর পাইয়া অনেকে আসিয়াছেন। একটু ভীড় হইয়াছে দেখিয়া মোহনানন্দজী ও প্রাণগোপাল বাবু মাকে নিয়া মোটরে বেড়াইতে গেলেন। তপোবনে নূতন স্কুল দেখাইলেন। আমরাও ২।৩ জন সঙ্গে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসা হইল। মা কয়দিন থাকেন কিছুই স্থিরতা নাই।

৩রা অগ্রহায়ণ শনিবার—আজ কলিকাতা হইতে খবর আসিয়াছে, তাঁহারা স্বামী অখণ্ডানন্দজীর পত্রে মার দেওঘর আসিবার খবর পাইয়াছেন। মার খবর পাইয়া কেহ কেহ দর্শন করিতে আসিতেছেন। সকাল বেলা প্রায় ৯টায় এখানে একটি মাতাজী তাঁর আশ্রমে মাকে নিয়া গেলেন। ইঁহারা বানপ্রস্থী। বৈকালে অনেকেই মার কাছে আসিয়াছেন, কথাবার্ত্তা হইতেছে। মা বারান্দায় বসিয়াছেন।

একটী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ইনিও বালানন্দ মহারাজেরই শিষ্য। নাম সুরেন্দ্রনাথ সেন। তিনি বলিতেছিলেন এখানে একান্ত স্থানে কতকগুলি পাথর আছে তাহার ভিতর নানা মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতে দেখিতেছেন, অনেককে দেখাইয়াছেন বলিলেন এবং আগামী কল্য মাকে একবার তথায় নিয়া যাইতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন সূর্য্যোদয়ের সময় এবং সূর্য্যাস্তের সময়ই সে গুলি স্পষ্ট দেখা যায়। মার শরীর ভাল নয় তাই আমরা একটু বেলা হইলে যাইবার ভাব প্রকাশ করায় সুরেন্দ্র বাবুর যেন বেশী ভাল লাগিল না, কারণ সূর্য্যোদয়ের সময়ই সেগুলি বেশী ভাল দেখায় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। মা তাঁহার ভাব দেখিয়া বলিলেন "বাবা তোমার যখন ইচ্ছা আসিও। আমি শুইয়া থাকিলেও ডাকিয়া উঠাইয়া নিয়া যাইও।" সুরেন বাবুর সঙ্গে মার আরও অনেক ভাল ভাল কথা হওয়ার পর পাথরের কথা উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার পর আজও শ্রদ্ধেয় প্রাণগোপাল বাবু ও মহানন্দ ব্রহ্মচারীজী এবং আশ্রমের সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং ছাত্রীরাও ২।১ জন আসিয়াছেন। খানিক সময় মার সঙ্গে কথা বার্ত্তার পর সকলে বিদায় হইলেন। রাত্রিতে স্বামী শঙ্করানন্দ ও আমি মার নিকট বসিয়া আছি, নানা কথা উঠিয়াছে আমাদের জিজ্ঞাসায় মা নিজের অবস্থার কথা বলিতেছেন, সে দিনের ত্রাটকের কথাই উঠিয়াছে। মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন "দুইহাত যে ত্রাটকের সময় উপর দিকে উঠিয়া যাইত দেখ্ তোদের যে সন্ন্যাস নিবার সময় দুইহাত নাকি তুলিতে হয় অর্থাৎ সম্যক প্রকারে ন্যাস বলিস না? এই শরীরটা দিয়া যখন যাহা হইয়াছে পূজার্চ্চনা, ত্রাটক যোগের ক্রিয়া ইত্যাদি সবই সেই রকম সর্ব্বপ্রকারে ন্যাস জাতীয় হইয়া গিয়া আপনা আপনি পর পর সব হইয়া সেই সেই কর্ম্মের

সমাধান হইয়া যাইত।” আবার বলিতেছেন এই যে জ্যোতি দেখা গিয়াছে তাহা কি রকম জানিস? প্রথমে ভ্রূমধ্যে বাদামের আকারের মত ফুটিতে লাগিল পরে জ্যোতিটা ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল, আবার অনেকগুলি টুকরা টুকরা জ্যোতি কত রকম রং কত রকম আকারে পরিবর্ত্তিত, আবার ক্রমশঃ মিলাইয়া একটা জ্যোতি। এই ভাবে আস্তে আস্তে একটা জ্যোতিই বিরাট আকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। আবার অন্ধকারে পর্য্যন্ত চোখ খোলা বা বন্ধ সব অবস্থাতেই শরীরের একটা আলোর প্রকাশ থাকিত। অন্ধকার বলিয়া কোন কথাই নাই। আবার পূজা ইত্যাদি যে হইয়া যাইত সেকথা জিজ্ঞাসা করায় বলিতেছেন যে যে দেবতার পূজা হইত সেই সেই দেবতার প্রতি অঙ্গের গুণ ভাব ও জ্যোতি সহ সব ঠিক ঠিক ভাবে এই শরীরেই (নিজ শরীর দেখাইয়া) ফুটিয়া উঠিত। ঠিক আমি তাই। আবার ভিন্ন ভাবে পূজা করিবার সময় সেইরূপ গুণ সম্পন্ন দেবতা এই শরীরের ভিতর হইতেই প্রকাশ করিয়া আবার আমিই পূজা করিতেছি, আমিই দেখিতেছি। ইহা মাথার বিকৃত অবস্থা মনে করিস না, ধাঁ ধাঁ নয়—সত্য, প্রত্যক্ষ। যতই অগ্রসর হবে ততই সে সে লোকগুলি পর্য্যন্ত সত্য প্রত্যক্ষভাবে ফুটিয়া উঠিবে। ঐ যে তোরা ঋষিলোক, দেবলোক সব বলিস না? দেবতা বল, মানুষ বল, ঋষি বল, ইত্যাদি সবই তাদের ভাবগতিগুলি সেই সেই স্তরে এইরূপেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। রূপ গুণ ভাব ইত্যাদির অতীত হইতে হইলে এই ভাব জাতীয় যার যার যে তাহার সেই সেই ধারার ক্রিয়াদি হইয়া নির্দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশ পায়। একটা সময়তে আবার কিরূপ হইল জানিস? এই শরীরের ভিতরেই প্রতি অঙ্গে পূজা হইতেছে; সমস্ত অঙ্গেই বীজ এবং যথাস্থানে তৃতীয়

চক্ষু, নাক ইত্যাদি সব আঁকা হইয়া যাইতেছে। নিজের আঙ্গুল দিয়াই আঁকিতেছি। আপনা আপনি সব হইয়া যাইতেছে। আঙ্গুলটি কি ভাবে রাখিতে হইবে কোন কোন স্থানে স্পর্শ করাইতে হইবে সব ঠিক ঠিক হইয়া যাইতেছে। দেবতা এই শরীরের মধ্য হইতেই প্রকাশ করা হইতেছে আবার ঠিক ঠিক ভাবে পূজাদি হইয়া যাইতেছে। আঁকিবার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষুদানের সময় হইতেই সেই সময় তিন চক্ষুতেই দেখিতেছি। ভ্রূমধ্যে বাদামের আকৃতিতে যে জ্যোতি প্রথমে দেখা হইয়াছিল সেই স্থানেই তৃতীয় চক্ষুতে দেখিতেছি। এই যে রক্ত মাংসের শরীরটা দেখিতেছিস, তাহা কেমন যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। আঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ সঞ্চারের সময় যে যে রূপ আঁকা হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। একেবারে জীবন্তরূপে রূপ গুণ সব ফুটিয়া উঠিতেছে। আবার পূজা অন্তে দেবতা এই শরীরেই মিশান হইয়া যাইতেছে। এই শরীরটার ভাব গতিক দেখিয়া কেহ কেহ ভয় পাইত কিনা, তাই ঘরে আসা দূরে থাক উঠানে পর্য্যন্ত বিশেষ কেহই আসিত না। আর আপন ভাবে একান্তে ক্রিয়াগুলি হইয়া যাইত। যেমন তোদের উপস্থিত শরীরটা বা গাছ পালা ইত্যাদি তোরা বৎসর মাস দিন হিসাব করিয়া চলিস, অথচ তোদের কাছে আগেই বা কি ছিল পরেই বা কি থাকবে ভেবে দেখ। তোরা যেমন আসা যাওয়া করিস, ঐ মূর্ত্তিগুলিও জীবন্ত ভাবে সেই রকম প্রকাশ হয়ে হয়ে আবার যেইখানে সেইখানে······"

আমি বলিলাম, কিছু সময় মাত্র ত এই পূজাদির কথা, তারপর কি হইল? মা বলিলেন, "আবার এমন সুন্দর এই সব সমাধানের পর একই সত্ত্বা অবস্থার পর পর লীলা দর্শন টর্শন ইত্যাদি সৃষ্টি স্থিতি লয় এক

আমা হইতেই যে সব রকমারীর প্রকাশ একমাত্র আমিই যে সর্ব্বব্যাপী, এই সর্ব্বব্যাপী বলিলেও বলা হয় না, এই প্রকাশটা যখন হয় সৃষ্টি স্থিতি লয় বলিয়া যে কোন কথাই নাই কারণ সৃষ্টি হইলে ত স্থিতি ও লয় হইবে ? সেই যে নিস্তরঙ্গ, অবিকৃত নিত্যস্থিত, তার আগও নাই পরও নাই, আবার সবই আছে। এই আছে বা নাই বলিলেও বলা হইল না। তাই বলি ভাষা কোথায় ? ভাষা ত ভাসেই। জ্ঞানের স্বয়ং প্রকাশটা কিরকম ফুটিয়া ওঠে জানিস ? যেমন আপছা আপছা মেঘে সূর্য্য এবং তার আলো দেখা যায়, আবার বৃষ্টির পর হঠাৎ করিয়া যেমন ঝকমকে সূর্য্যটা ওঠে নির্ম্মল আকাশে সর্ব্বাংশে উপমা হয় না।" এই বলিয়াই ছেলে মানুষের মত খল খল করিয়া হাসিয়া বলিতেছেন "এই শরীরের ধবধবে রং দেখিয়া শরীরের মা নাকি আতুরেই নির্ম্মলা নাম দিয়াছিল, তাই ধর না নির্ম্মল আকাশ অর্থাৎ কিনা ময়লা নাই, মেঘ টেগ নাই, একেবারে পরিস্কার।" আবার একটু চুপ থাকিয়া বলিতেছেন "এই সব কথাও আভাষ মাত্র কথা বলতে গেলেই বলা যেন কিছুই হয় না। শরীরটার সাধনার ক্রিয়াদি ফুটিয়াছিল না, তাই এই যে কথা।" আবার কথায় কথায় বলিতেছেন, "আর একটা শোন, যে, যে ধারার কাজ করিতে থাকে, তাহার মনে ক্রিয়া থাকে ত ? তার মনে হয়, এই পথই পরম পদ লাভের একমাত্র উপায়। যেমন শিব পুরাণে শিবকে, বিষ্ণু পুরাণে বিষ্ণুকে বড় বলিয়া গিয়াছে। গণপতি উপাসক জানে গণেশই একমাত্র সিদ্ধিদাতা, এই রকম আর কি। আসলে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে যখনই নির্দ্বন্দ্ব হয় তখনই ফুটিয়া উঠে। কেমন ভাবে জানিস ? সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকার চলিয়া যায়, যেখানে যা আছে পরিস্কার ভাবে প্রকাশ হইয়া ওঠে। এও ত মাত্র আভাষ দেওয়া হইল। আসল কি

রকম তাহা ত জান," বলিয়াই শেষ করিলেন। পরে আবার বলিতেছেন, "সবই আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, একটা না থাকিলেই অঙ্গহানি।" আবার বলিতেছেন, 'ঋষি বল মুনি বল, এই যে সেইদিন কথা হইল না ওরা সব দেখা করিতে আসে, 'সবই যা কিছু এই হইতেই (নিজ শরীর দেখাইয়া) সৃষ্টি স্থিতি লয়।' এই বলিয়াই চুপ করিলেন। আবার একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তোরা এই শরীরটাই মনে করিস না কিন্তু।"

৪ঠা অগ্রহায়ণ রবিবার—আজ রাত্রি ভোর হইতে না হইতেই সুরেন বাবু দুই মোটর নিয়া আসিয়া উপস্থিত। মার সঙ্গে আমরা ৫।৭ জন গেলাম। সুর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম। সুরেন-বাবু মহা উৎসাহে মাকে দেখাইতে লাগিলেন। আমরা দেখিতে লাগিলাম। পাথরের মধ্যে তাঁহার ভাবে নানামূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন; আমরা তাঁহার ভাবে কতকটা সেইরকম দেখিলাম বটে কিন্তু সত্যি কথা মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন "বাবা! তোমার ভাব ও দৃষ্টি দিয়া না দেখিলে কেহ দেখিতে পাইবে না।" সত্যিই তাই, সুরেনবাবুর ভাবটি বেশ চমৎকার। তিনি নিঃসংশয় ভাবে সব দেখিতেছেন, দেখাইতেছেন। মাও তাঁহার ভাবে দৃষ্টিতে বলিতেছেন একই। ভারি চমৎকার ভাব। দুই তিনটা স্থানে আমাদের নিয়া গেলেন। বেলা প্রায় ৮॥ টায় আমরা আশ্রমে ফিরিলাম। মোহনানন্দজী এবং প্রাণ-গোপালবাবু যখন মাকে জিঙ্গাসা করিলেন, মা, কি দেখিয়া আসিলেন? মা উত্তরে বলিলেন "তিনি যখন দেখাইতেছিলেন তখন তার ভাব নিয়া চক্ষু নিয়াই আমি দেখিতেছিলাম তাই তার মতই দেখিয়াছি। একব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। সেই যে তাঁরই দর্শন। সত্যিই ইহা দেখিয়াছি ২।১টী স্থানে তিনি একটা দেখাইতে গিয়াছেন মা প্রথমেই বলিয়া

উঠিলেন বাবা! তুমি এই দেখাইবে না? আমি আগেই দেখিয়াছি। আজ বৈকালে ধ্যানমন্দিরে মোহনানন্দজী পাঠ করিতে বসিয়াছেন, মাকেও তথায় নিয়া যাওয়া হইল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মা সেখানেই রহিলেন। পরে মোহনানন্দ মাকে বলিলেন, "চল মা আশ্রমটা একটু ঘুরিয়া দেখিবে।" মা চলিলেন, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। প্রকাণ্ড আশ্রম। বেশ সুন্দর সব সুবন্দোবস্ত ভাবে চলিতেছে। সংস্কৃত কলেজ বোর্ডিং ডাক্তারখানা সবই আছে, সব কাজ সুনিয়মে চলিতেছে। সকালে বৈকালে কীর্ত্তন হয়। একটি পাথরের প্রকাণ্ড মন্দির উঠিতেছে, শুনিলাম এই মন্দিরে গোপাল ও গুরু মহারাজের মূর্ত্তি স্থাপিত হইবে। শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল বাবু মাকে নিয়া সব দেখাইয়া আনিলেন। রাত্রি হইয়া গিয়াছে আমরা কামধেনু মন্দিরে ফিরিলাম। প্রতিদিনই রাত্রিতে মোহনানন্দজী ও শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল বাবু আরও ২।৪ জন তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে মার কাছে আসেন, নানাকথাবার্ত্তা আলোচনা হয়। আজও আসিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টা অবধি কথাবার্ত্তা হইল। তারপর তাহারা চলিয়া গেলে সকলে প্রসাদ পাইতে যান। রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে শুইয়া পড়েন। আমাদের সঙ্গীরা সকলেই প্রায় আশ্রমে প্রসাদ পাইতেছেন। সেবা যত্নের কোন দিকেই ত্রুটী নাই। মোহনানন্দ মাকে বলিতেছেন—"এবার কিন্তু শীঘ্র তোমাকে ছেড়ে দোব না। ১১বৎসর পর ছেলেদের মনে করে এসেছ। একবার এখানে এসেও দেখা না দিয়ে চলে গিয়েছিলে, এবার কিছুদিন থাকতে হবে।" মা হাসিয়া বলিলেন "জানই ত এই মেয়েটার মাথা খারাপ, কখন কি খেয়াল হয়। এমন হয় বাবা, এত যে তোমরা আদর যত্ন করিতেছ, অনুরোধ করিতেছ, কোন দিকে যেন লক্ষ্য নাই। যে দিকে যাইবে চলিয়াই যাইতেছে। মাথা

খারাপ কিনা, বাবা কি বল?” এই বলিয়া ছেলে মানুষের মত হাসিয়া উঠিলেন। সকলেই বুঝিলেন খেয়াল হইলে আর রাখা যাইবে না। রাত্রিতে আমি ও শঙ্করানন্দ স্বামীজী মার কাছে বসিয়া আছি আজও মার পূর্ব্বের কথা উঠিয়াছে। পূজাদি যে আপনা আপনি হইয়া যাইত সেই কথা উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন “এমন হইত কি রকম জানিস? যা কিছু ফুল ফল পূজার সামগ্রী যাহাকে পূজা করিতেছি সবই একই, আমি যে পূজা করিতেছি আমিও তাই সবই এক। তারপর শরীরটা যেন কি রকম হইয়া একেবারে পড়িয়া যাইত, শরীরটা যখন উঠিত একেবারে অসাড়, আর ভাবটা এই রকম গাছ লতা, পাতা, এমনকি, খড় কুটাটি পর্য্যন্ত সবই এক”। আবার বলিতেছেন “কিছু নাই, কিন্তু এমন ভাবে পূজাদি হইয়া যাইতেছে যেমন ইহা হইতেই (নিজ শরীর দেখাইয়া) সব সাজান। পূজা এমন ভাবে হইতেছে যে, দেবতাদের সৃষ্টি স্থিতি লয় ভাব গুণ সব সহ যে যে দেবতার পূজা হইতেছে সেই সেই দেবতা সম্পূর্ণ ভাবে এই শরীরেই (নিজ শরীর দেখাইয়া) প্রকাশ হইতেছে। এই জাতীয় কোন একটা ভাবে স্থিত থাকিলেই কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারে তাহার সেই দেবতা সিদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু তা নয়। কারণ একটা ভাবে স্থিত থাকিলে পূর্ণ সিদ্ধিও বলা যায় না। কোন কোন জায়গায় বাক্য ইত্যাদি সিদ্ধ হইল বটে কিন্তু সেই দেবতার প্রকৃত সিদ্ধি তা নয়। কারণ সেই ভাবটা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হইবে।” আবার বলিতেছেন, “এই যে সেদিন ত্রিনয়নের কথা বলা হইল ইহা ত কতক্ষণ? যতক্ষণ মূর্ত্তভাব ততক্ষণ মাত্র। মূর্ত্তিরও কিন্তু প্রত্যেক দেবতার ভিন্ন রংয়ের খণ্ড জ্যোতি দেখা গিয়াছে। তার পর আর মূর্ত্ত অবস্থা নাই। পূর্ণ বিরাট জ্যোতি। সেই জ্যোতিও যে কি রকম?” এই বলিয়াই চুপ

করিলেন। আবার বলিতেছেন "কত রকম রকমেই যে শরীরটা খেলিয়াছে, তাহা আর কি বলব।" আবার বলিতেছেন "যখন মূর্ত্ত অবস্থায় মূর্ত্তিগুলি একটার পর একটা আসিতেছিল, যাইতেছিল তখনও সেই সব মূর্ত্তির উপর কোনও আকর্ষণের প্রকাশ থাকিত না। মূর্ত্তিগুলি চলিয়া যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরে একটা কেমন কেমন ভাব এবং খণ্ড শূন্য ভাব। এই শূন্য ভাবটা নিয়াও দিনের পর দিন চলিয়া গিয়াছে, যেন ধ্যান মগ্ন। কি, কে কোথায়? কে কার খবর নেয়? এই অবস্থা গুলির মধ্যেও আনন্দের স্রোত আসিয়া যেন বিভোর করিয়া দিয়াছে। রকমে রকমে যে আনন্দের ঢেউগুলি এই শরীরে কি ভাবে এসব জাতীয় কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে খেলিয়া গিয়াছে তা আর কি বলব। ভয়েরও আভাস আসিত। এমন হইত যে এই শরীরটা আছে কি না তাও খেয়াল থাকিত না। কেবল কোন সময় আছি এই একটা ভাব থাকিত মাত্র। আর এইরূপ একটা ভাব জাগিত সময় সময় ব্যবহারিক সকলের সঙ্গে কাজ চলিতেছে, কিন্তু ভাবটা জাগিত আমি একা। আত্মীয় স্বজন কাহার সঙ্গে যেন কোন আকর্ষণ নাই, কেউ নাই। এক বিরাট শূন্য এবং বিরাট জ্যোতি। আবার একমাত্র জ্যোতিই, আর কিছুই নাই। আবার আমিও ঐ একই জ্যোতি। আবার বলিতেছি শোন ঐ যে খণ্ড খণ্ড ভাবে শূন্য ভাব আসিতেছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জা ভয় ইত্যাদি পলাইতে লাগিল, যাহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিয়াছি, তখন হইল, দেখে দেখুক। মাথায় কাপড় দিবার ভাবই নাই। যাহাকে ঘৃণা বলে তাহাও যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। তার পর যখন সব মূর্ত্ত ভাব চলিয়া গেল, জ্যোতি ও চলিয়া গেল, তখন এক মহাশূন্য ভাব। কেমন যেন একটা মহাশূন্য একা। তখন আবার নিজেই ঐ

একই সেই শূন্য। আর কি তাহা ত ঐ জাতীয় প্রকাশের কাছে শূন্য বলিলেও কিন্তু বলা হইল না। পর পর চলিতে চলিতে খুঁজে দেখ, এখন তোদের বেদান্ত টেদান্ত কোথায়?" তারপর আবার শঙ্করানন্দজীর সঙ্গে কথায় কথায় বলিতেছেন "দেখ বাবা এই যে সেদিন কৃষ্ণ লীলার কথাটা হইয়াছিল না? এই যে কৃষ্ণ; কৃষ্ণ অর্থ তো তোমরা বল আকর্ষণ, তোমাদের যে কথা আছে কাত্যায়নী পূজা করিয়া কৃষ্ণকে পাইল, কাত্যায়নী অর্থাৎ শক্তি, শিব ছাড়া ত শক্তি নাই, শিব শক্তি ত অভেদ বল শক্তি পূজা করিয়া আকর্ষণ স্বরূপ কে? না একাত্ম সচ্চিদানন্দ প্রেম স্বরূপ ঐ যে নিত্য লীলা।" বলিয়া ছোট্ট একটি হাততালি দিলেন। আবার বলিতেছেন "দেখ তোমরা যে লীলার কথা বলেছিলে না? যে যতটা অধিকারী তার কাছে সেই ভাবেই প্রকাশ কিন্তু।" আবার বলিতেছেন, "আবার দেখ বাবা? শক্তিপূজা করিয়া শক্তির মিলনাত্মক পরম ব্রহ্ম পরম শিব তাহাও একাত্ম সচ্চিদানন্দ প্রেম স্বরূপ। আকর্ষণও ত কোথায়ও বাদ দেওয়া চলে না।" আবার কথায় কথায় আমাকে বলিতেছেন "দেখ, তোরা যে এক একজনে এক এক ধারার সাধনা করিতেছিস, হুসিয়ার থাকিস, কিন্তু জানিস, কি রকম গতি প্রকাশ হয়? কোন কোন সময় ভাবের গতিগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কেবল খেয়াল রাখবি, অভাব বোধটা কোথায়? আর অভাব বোধটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ পূর্ণ মীমাংসা হতে পারে না। কারণ অভাব বোধই জানাবে আমার কত অজানা, না পাওয়া রহিয়াছে। কাজেই একটু বুঝিয়াই একেবারে একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিস না। আর হয়ও না। জানবি তখনও মীমাংসার অধিকার হয় নাই। শোন, আরও একটা কথা, মীমাংসা করিতে গেলে সেটাও ত একটা

অহঙ্কারের প্রকাশ। যখন অধিকার হয়, তখন কি রকম হয় জানিস? যেমন ঘড়া ভরিয়া গেলে জল উপছাইয়া আপনিই পড়িয়া যায়। কলে জল ভরতে গেলে দেখিস না, ঘড়া ভরিয়া গেলে জল আপনা অপনিই মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া যায়। গাছের ফল পাকিলে আপনা আপনিই ঝড়িয়া পড়ে। ইহাই স্বাভাবিক প্রকাশ গতি। ভাবের গতিগুলিও এই ভাবে আসে; এই যে কৃষ্ণ, রাম, শিব, শক্তি উপাসক, ইত্যাদি নানাধারায় উপাসনা, এছাড়া অন্য কোন পথ নাই। এই ভাবটা আসিয়া সাধকদের বিভোর করিয়া দেয়। ইহা তাহাদের সাধনার সহায়ক। ইহা না হইলেও কিন্তু হইবে না। আবার ইহাও আসে যে আমার যে ইষ্ট বা গুরু তাঁহার সাধনা ছাড়া অন্য কোন ধারাই এত উচ্চ হইতে পারে না। কিন্তু ইহা বিচারে রাখবি অনন্তধারা, তিনি কোন পথে কাহাকে নিচ্ছেন তিনিই জানেন। অন্য পথের উচ্চ অবস্থার সাধকদের নাম শুনিয়া বা দেখিয়া তাহাদের মনে হইতে পারে আমার মত এই রকম রস উহারা পায় নাই। সাধকদের এই ভাবগুলি আসা স্বাভাবিক। সাধকদের পক্ষে এই ভাবগুলি কল্যাণকরও বটে, যদি এক দেশ দৃষ্টি না থাকে। এমন হইতে পারে, বিশেষ বিশেষ বিখ্যাত প্রচলিত নামী মহাত্মাদের সম্বন্ধেও তাহাদের এই রকম ধারণা হইতে পারে যে এত উঁচুতে কি উহারা উঠিয়াছে? তবে আরও একটা হইতে পারে যে আরও উন্নত হইলে তাহার মত সমান ভাবের ধারায় যাহারা সাধনা করে তাহারা সেই প্রকার উন্নত অবস্থার বলিয়া তাদের নিকট প্রকাশ পায়। কারণ সে সাধনের আনন্দের ধারায় এবং সন্তোষের আভাষে আসিয়াছে কিনা। এই ধারার মধ্যেও কিন্তু কেহ কেহ কত সময় কাটাইয়া দেয় ঠিক নাই। কেন না সন্তোষেও থেকে যেতে পারে

কিনা। সমান ভাবের ধারায় সাধকদের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাহার বেশ উঁচু বলে ধারণায় ফুটিতেও পারে। কিন্তু সে ভাবের মধ্যেও গোলমাল কি থাকে জান? সে ত তন্ন তন্ন করিয়া সব দিক সামঞ্জস্য দিতে পারিতেছে না। আর একদিক দিয়া ভিন্নত্ব রহিয়াছে কিনা! কারণ যাহার ছোট বড় আপন পর দুই ভাব থাকে তাহার ত সমদৃষ্টি সমভাব ফুটিল না। শিব, কালী, দুর্গা ইত্যাদি যে কোন ধারায় থাকুক না কেন সে সমালোচনা করিতে পারে না। সমভাবের প্রকাশ হইবে কি ভাবে জানিস? তখন সাম্প্রদায়িকের অর্থাৎ কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি কোন ভাবের সাধকগণের অসামাঞ্জস্য সে দেখিতে পারিবে না। কারণ নিজের শরীরের কোন অঙ্গের বা ভাবের অভাব থাকিলে নিজেরই যে অঙ্গহানি। সে পূর্ণ দৃষ্টি তবে কোথায়? আলোচনা কাহার কে করিবে? সে যে তখন নিজেই নিজেকে নিয়া। কে, কার, এ সব আর থাকে কই? যদি কিছু প্রকাশও হয় জানবি নিজের শরীরের আলোচনা নিজের কাছেই নিজে করিতেছে। তাহার সমভাব সমদৃষ্টিতে খণ্ড এবং সমষ্টিতে নির্দ্বন্দ্ব ভাবে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় প্রকাশ পায় তবেই না। এই যে……আবার শোন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, প্রলয়ের কোন কথাই আসে না কারণ শুধু লয়ে থাকিলেও ত হইল না।” রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা শয়ন করিলাম। তখন ও কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছেন, “কোন কোন মহাত্মা জগতের কল্যাণের জন্য এক এক ধারার সাধনায় বিশেষ করিয়া জোর করিয়া থাকেন।” একটা কথা লিখা বিশেষ আবশ্যক এই যে অবস্থার কথা সব আমি পর পর শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে ঠিক ঠিক লিখিতে পারিলাম না। তবে যতদূর সম্ভব লিখিতেছি।

৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার—আজ শাশ্বতানন্দ স্বামীজী আসিয়া

মাকে তাঁহার গুরুমার (ব্রহ্মজ্ঞমা) আশ্রমে অর্থাৎ নির্ব্বাচন মঠে নিয়া গেলেন। আজ সারাদিন আমরা তথায়ই কাটাইলাম। বেশ শান্ত ভাব। ২।৪টি ব্রহ্মচারী মাত্র আছে। ৭ জন ব্রহ্মচারী থাকবার স্থান আছে। বেশ একান্ত স্থান। এখানকার ব্রহ্মচারীদেরও বেশ সুন্দর ভাব। সকলকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন। মাকে কয়েকদিন আশ্রমে রাখিবার জন্য ব্রহ্মচারীরা খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন "যদি এখানে বেশী থাকা হয় দেখা যাইবে।" সন্ধ্যার সময় আমরা বালানন্দ ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি অনেকে বসিয়া আছেন, মার গাড়ী দেখিয়া অনেকে বলিয়া উঠিলেন, "ধড়ে প্রাণ এল।" অনেকেই ব্রহ্মচারী মহারাজের শিষ্য ও শিষ্যা। তাঁহারা বলিতেছেন গুরুমহারাজের দেহরক্ষার পর আর কাহারও নিকট হইতে কোন উপদেশ পাই না, মা আসাতে আমাদের বড়ই আনন্দ হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ৮টায় আজও মোহনানন্দজী ও প্রাণগোপাল বাবু আসিয়াছেন, মোহনানন্দজী মাকে বলিতেছেন, "আজ ত সারাদিন মা ছেলেদের ভুলেই ছিলেন।" মা বলিলেন আচ্ছা একটু দূরে গেলেই বুঝি ভুলে যাওয়া হয়? এসব কথার পর আবার আলোচনা আরম্ভ হইল। মোহনানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা প্রাণবায়ু স্থির করার উপায় কি?" মা বলিলেন, "সেদিন যে কথা হইয়াছিল প্রাণবায়ুর তরঙ্গ ত আছে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মন, মন্ত্র, শ্বাস, এক করিতে বলা হয়। দেখ গাছ, লতা, পাথর জীব, জন্তু ইত্যাদি যে হাওয়াতে পুষ্ট সেই এক যোগের বাতাস নিয়া আছে বলিয়া ত বসিয়া থাকে, সেই হাওয়া বাতাসের মূলকেন্দ্র কোথায়? যেখানে তরঙ্গ বলিয়া কোন কথা নাই, সেই চির শান্তত্ব ত চাহিতেছে, চাওয়াটা কেন? না, এটাও জীবের স্বভাব। তারপর বলিতেছেন "সবই

এক। এক বিরাট মহান ভাব সব বল্‌লেও এক বলা হয় না।" তার-পর মা যাত্রী সম্বন্ধে কি একটা কথা বলিলেন, শুনিয়া মোহনানন্দ ব্রহ্ম-চারীজী বলিলেন, "তিনি অনন্ত, তার পথের যাত্রা করিলে যাত্রাও ত অনন্তই হইবে? তবে কি এ যাত্রার শেষ নাই?" মা বলিলেন, "সে সব ভাবিবেই না, অন্তের মধ্যে অনন্ত, অনন্তের মধ্যে অন্ত সবই যে আছে।" এ কথার পর আরও সামান্য ২।৪টী কথাবার্ত্তা হইল। মোহনানন্দজী মার নিকট হইতে বিদায় নিবার সময় মা বলিলেন, "সেই অনন্তের কথা উঠিল না?" এই বলিয়াই বলিলেন, "আচ্ছা থাক্ এখন সে কথা, সেই কথা উঠিলে অনেক কথা আসিয়া যাইবে।" মোহনানন্দজী চলিয়া গেলে মা কথায় কথায় আমাদের কাছে বলিতেছেন, "সেদিন পানুবাবার (প্রাণগোপাল বাবু) সঙ্গে ভালবাসা সম্বন্ধে কথা হইল না? আমি ত আবোল তাবোল বলি। যা আসে তাই ত বলি ও বলব। কথাটা এই যে নিজেকেই নিজে ভালবাসে। নিজের-প্রাণ হইতে কাহাকেও বেশী ভালবাসে না, যেমন কেহ বলে অমুকের কথায় আমি এই কাজটা করিয়াছি। অমুকের কথার সঙ্গে যদি তাহার ভাবের একটুও যোগ না থাকে তবে কিন্তু করে না, সূক্ষ্মভাবে হইলেও ইচ্ছা থাকে। আর যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কেউ করায় তবে তাহার মধ্যে একটা গোলমাল থাকিয়াই যায়; এবং বাধিয়াই যায়। কারণ বোধ হয় কোন কিছু ছিল। কর্ম্মের ভিতর যতটুকু ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকে, ততটুকু পরিমাণেই ঐ ফলরূপেই প্রকাশ পায়। কর্ম্মস্থল কিনা, যেই যেই রকমের কর্ম্ম এলোমেলো হওয়াও সেই রকম স্বাভাবিক। আর সাধারণ দৃষ্টিতে ও দেখ্, যার সঙ্গে যার নিজের কর্ম্ম এবং মনের ভাবের সঙ্গে মিলে, সেই তাহার বন্ধুরূপে দাঁড়ায়। আসল বন্ধু ত সেই যে পার-মার্থিকের সহায়ক হয়। তাহাকেই ধর্ম্মবন্ধু বলা হয়। তবেই দেখ্,

তোমরা প্রাণময় ভাবটার উপরই জোর দিয়া কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে ও চলিতেছ। প্রাণ ত একটাই, আত্মা একই, যেমন জল ত একই। আবার সমুদ্রের জল, খালের জল, ডোবার জল বলিয়া থাকি, জলত বলবেই।” হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, “এখন এর মধ্যে ফিলটার লাগাও। তারপর বলিতেছেন—“এই যে দেখা যায়, রামের প্রাণ গেলে শ্যামের প্রাণ যায় না, সেটাও কি জানিস্? যেখানে বায়ুটা তরঙ্গ রূপে অপ্রকাশ উপস্থিত দেখতে পাই অর্থাৎ যার প্রাণটা চলে গেছে বলিয়া থাকি আসলে মুলে ত সেই এক সত্ত্বা চৈতন্য রূপে স্থিত নিত্যই আছেন। আবার বাইরের দিকে দেখ যেমন কূয়া হইতে এক ঘটি জল তুলিয়া আনিলে সমুদ্রে ফেলিলে সমুদ্র বাড়েও না কমেও না, কারণ আর ও তলে দেখ, যেখানেই খুড়বি জল ত বেরুবেই, সেই হিসাবে কূয়াও সমুদ্রত একত্র যোগ আছেই। বাড়বে কমবে কোথায়? আবার দেখ সেই দিন পানুবাবুর সঙ্গে কথা হইল, একটা বীজে গাছ হইল, আবার সেই গাছে কত শত ফল হইল। এক এক বীজের মধ্যেই কিন্তু অসংখ্যত্ব, একত্ব, অনন্তত্ব রহিয়া গেল। সেই হিসাবে আত্মা যে বহু তোরা বলিস্ কারণ একটা একটা বীজ হইতে একটা একটা গাছ হইবে কিন্তু তার মধ্যেই বহুত্ব রহিয়াই গিয়াছে। আবার পূর্ণ হইতে যদি আলাদা রূপে প্রকাশ দেখিস্, সেই-খানেও জানিস্ পূর্ণই থাকে।—তবে দেখ, তোদের হইল কি? যেমন দৃষ্টি, তেমনই তার কাছে সৃষ্টিরই প্রকাশ। দৃষ্টি সৃষ্টির বাইরে যাইতে হইবে। পূর্ণ, অপূর্ণের কোন কথাই আসিবে না, তুই এখন এক বল, একই বহু বল, বহুই যা বলিস্ তাই। কাজেই সব বলা হয় না। যে যে দৃষ্টি দিয়া যাহা বলে সবই ঠিক”। আমি বলিলাম—“মা মোহনানন্দজীর সঙ্গে অনন্ত যাত্রার কথাটা উঠিয়াই বন্ধ হইয়া গেল।” মা বলিলেন, দেখ, তুই অনাদি,

অনন্ত, আবার যতক্ষণ দৃষ্টি ততক্ষণই স্থষ্টি। শরীরটার স্থষ্টি হইল, সেই হিসাবে শরীরের ধারায়, ভাবের ধারায়, আদি, মধ্য, অন্ত সবই আছে। দেখ অনন্তের কথাটা যে তা ও অনন্ত। কতটুকু কথায় হবে? আর বাইরেই বা কতটুকু শোনা হবে? সাধনার গতিও অনন্ত। তোরা যে অনন্ত বলিয়া থাকিস তোদের কাছে অনন্তত্ব কখন প্রকাশ পায়? যখন অনন্ত বোধে আসে তখনই ত? বোধে এলেই স্বরূপের প্রকাশ, পাইলেই অনন্ত যাত্রার সফলতা। তুমি নিজেই যে অনন্ত, তুমি নিজেই এক, স্থূলতঃ ও ত দেখতে পাস, তোর-হাত ধরিলে ও কে? বলিস্ আমি। পা ধরিলেও বলবি আমি, যে কোন অঙ্গ ধরিব বলবি আমি। দেখ তোর শরীর রূপে যে প্রকাশ পাইয়াছে তোর স্থষ্টির কারণ ত বলতে পারবিই না, তোর জন্মটা বাদই না হয় দিলাম, তুই যে বলিস্ শৈশবের প্রথম জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কি কি করেছিস সব বলে দিতে পারবি? তাও বাদ দিলাম, গত পাঁচ বৎসরের কথাই বল্ত? তোর জীবনে কি কি ঘটনা হয়েছে বলতে পারবি না। এক বছরের কথাই বল? এক মাসের কথাই বল? একটা দিনের কথা, অন্ততঃ আজ সকাল বেলাটা হইতেই বলত? আচ্ছা তাও ছাড়িয়া দিলাম, গত পাঁচ মিনিটের কথাই বলত? তোর মনটা কোথায় কোথায় গিয়েছিল, তাও বলতে পারবি না। স্থূলতঃ তোর এই শরীরের— মধ্যেও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত স্থষ্টি, স্থিতি, লয় হইয়া যাইতেছে তারও ত সংখ্যা দিতে পারবি না। স্থূলতঃ সামান্য মনের গতিই যখন এইরকম, অনন্তঃ এখন দেখ। যাত্রাটা যদিও অনন্তঃ আবার একের গতির ধারাও ত রহিয়াছে। কোন মুহূর্ত্তে সেই জ্ঞানের যোগ আসবে কে বলতে পারে? কাজেই নিজের খোঁজেই নিজে যাত্রা করেছিস্, আসল কথা নিজকে জানা। আমি অনন্ত গতিরূপে আমিই এক, আবার আমিই বহুরূপে

প্রকাশ। জাগতিক যে সব তোমরা বহুরূপে দেখতে পাচ্ছ কিন্তু যেখানে রূপ অরূপের দ্বন্দ্ব নাই, সেইটা চাওয়াই জীবের স্বভাব। যেমন জঙ্গলের মধ্যে থেকে জঙ্গল কেটে রাস্তা করে বাহির হওয়া হয়; তোমরা সেইরূপ সব সময়েই জাগতিকের মধ্যে আছ কিনা তাই অস্থিরত্ব। কিন্তু তরঙ্গ শূন্য যে স্থিরত্ব তাহার আভাস পাইতে হইলে সব সময়ই তোমাদের সেই তরঙ্গরূপী শ্বাস প্রশ্বাস, তাহার দিকে স্থির লক্ষ্যে মনটা রাখিলে সহায়ক হয়।"

"এ সবকিছুই এক, আমারই স্বরূপ জানাই হইল লক্ষ্য।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"অখণ্ড মণ্ডলাকার আর কি?" আবার বলিতেছেন—"সাধকরা দেখিস্ এই এক লক্ষ্যের জন্য, এই মনের দ্বারাই, একত্বে পৌছিবার যাত্রী হয়। সেই সময়ই এক গুরুর কৃপায়ই খণ্ডত্ব ও অখণ্ডত্ব, ক্ষমা ও অসীম, অনন্ত গতি, অনন্ত রাস্তা, অনন্ত ভাব, সবই নির্দ্বন্দ্ব রূপে তার কাছে প্রকাশ পেয়ে থাকে। সৃষ্টি দৃষ্টির মধ্যে যতক্ষণ থাকিবে—এসব কথা আসিবেই। আর আসাটাও মঙ্গলকর। এই সব বিচারে না আসিলে নির্দ্বন্দ্বরূপে বাক নির্ব্বাক্যাতীত হইবে কিরূপে?

৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার—আজ বৈকালে মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী মাকে তপোবনে পাঠাইলেন। সেখানে পূর্ণানন্দ স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে একটা স্কুল খোলা হইয়াছে। **মাকে** স্কুল দেখাইতে প্রথমে নিয়া গেলেন। ছেলেরা দাঁড়াইয়া মাকে অভ্যর্থনা করিল, মায়ের স্তব গান করিল, মাকে কীর্ত্তন শুনাইল। তারপর সেখানে সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী মাকে পাহাড়ের উপরে নিয়া গেলেন।—**মার** শরীর দুর্ব্বল তাই মহানন্দ ব্রহ্মচারীজী মাকে চেয়ারে উঠাইবার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। এই পাহাড় শ্রীশ্রী বালানন্দজীর তপস্যার স্থান। তাই স্থানে স্থানে বেশ সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ব্রহ্মচারীরা দুইজন তথায় থাকেন। ব্রহ্মচারীজীর আসন সেখানে স্থাপিত করা হইয়াছে। প্রতিমূর্ত্তি রাখা হইয়াছে। ঘন্টা খানেক তথায় থাকিয়া **মা** ধীরে ধীরে হাঁটিয়াই নামিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারীদের বেশ সুন্দর ভাব। সাধন ভজন করিতেছেন। **মাকে** বলিলেন—**মা** শক্তি দিও। ছেলেরা যেন এইপথে অগ্রসর হইতে পারে। সকলকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া **মা** আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।—

মা আসিয়াই বলিলেন,—"খুকুনি আজই রওনা হইবার ব্যবস্থা কর। এখন এলাহাবাদের দিকে রওনা হওয়া হউক, তারপর দেখা যাইবে। আজই রওনা হইবার ব্যবস্থা কর। অনেকে মার দর্শনের জন্য বসিয়াছেন —মা তাহাদের নিকট গিয়া বসিলেন। আমরা যাওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। আজই রাত্রি ৩টায় ঃসিদি রওনা হইবার কথা। যশিদি হইতে ট্রেন ধরিতে হইবে। সন্ধ্যার পর প্রাণ-গোপালবাবু মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী আসিয়াছেন, **মা** আজই চলিয়া যাইতেছেন শুনিয়া আপত্তি করিতে লাগিলেন, কিন্তু মার ভাব দেখিয়া বুঝিলেন বাধা দেওয়া যাইবে না। মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী বলিলেন—**মা** এত ভোরে যাইবে তোমার ঠাণ্ডা লাগিবে।

মা বলিলেন—"তা কিছু হইবে না।" তিনি বলিলেন—"তোমার কিছু তাহাতে না হইলেও আমাদের চিন্তা হয় তোমার শরীরটার জন্য।"

মা বলিলেন, "কোন ভাবনা করিও না, শুধু সেই এক ভাবনা করিবে। যাওয়ার বিশেষ চেষ্টা করা হউক তারপর যা হইয়া যায়।" রাত্রি ৯টার পর সকলে বিদায় নিলেন। বুনি, তরুদি, অনু উহারা মার সঙ্গেই ছিল, উহারা এবার চলিয়া যাইবে। **মার** নিকট হইতে বিদায় নিতে হবে বলিয়া **মার** কাছে উহারা বসিল। এই ভাবে রাত্রি প্রায় ১২টা হইল।

এর মধ্যে মা বলিলেন, "সেদিন খেয়াল হইয়াছিল মোহণবাবার ঘরে যাইব।" প্রাণ গোপাল বাবুর ছোট ছেলে গোবিন্দকে নিয়া মা মোহনানন্দজীর ঘরে চলিলেন। মেয়েদের বেশী রাত্রিতে আশ্রমে যাওয়ার নিয়ম নাই তাই আমাকেও সঙ্গে নিলেন না। গোবিন্দকে বলিলেন, "মেয়েরা যে যায় না আমি যাইব ?" গোবিন্দ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কি বল মা তোমার যাইতে কি বাধা থাকিতে পারে ?" মা গোবিন্দের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"বাবা আমাকে ফল খাওয়াইয়া দিয়াছে।" গোবিন্দের নিকট শুনিলাম মোহনানন্দ মাকে ফল খাওয়াইয়া দিয়াছেন। তিনি ফল খাইয়াই থাকেন। মাসের মধ্যে ২।৪ দিন মাত্র স্বপাক অন্ন গ্রহণ করেন। একবার শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীজী মাকে নিজের হাতে ফল খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। আজ মহানানন্দজী সন্ধ্যায় আসিয়াই মাকে একখানা আসন দিলেন। তাহার উপর মাকে বসাইলেন। তারপর মাকে বলিলেন—"আজ তোমার বৈরাগী সাজতে হবে।" এই বলে একখানা সিল্কের নামাবলী মার গায় দিয়ে দিলেন। মা মোহানানন্দজীর ঘর দেখিয়া আসিয়া তাহার সামান্য শয্যার প্রশংসা করিলেন।—সত্যই এই আশ্রমের সুশৃঙ্খলা ও ব্রহ্মচারীদের ভাব বেশ প্রশংসনীয়।—

আমরা রাত্রি ৩॥ টায় রওনা হইলাম। শ্রদ্ধেয় প্রাণ-গোপাল বাবু সপরিবারে এবং মোহনানন্দ ব্রহ্মচারিজী উপস্থিত থাকিয়া মাকে নিজেদের মোটরে তুলিয়া দিলেন। পুনরায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া দিলেন। এত শীঘ্র মা চলিয়া আসিবেন ইহা তাহাদের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ৩।৪ দিনের পরিচয়েই—রাত্রি ৯টায় যখন মেয়েরা বিদায় হয় তখন মার জন্য ২।১ জন ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল। অনেক স্ত্রীলোক মাকে ঘিরিয়া বসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সকলের

বুকেই যেন একটা ব্যথা। একটি স্ত্রীলোক গান ধরিল। গানটী সময়োপযোগী বলিয়া সকলেরই প্রাণে লাগিল গানটী এই—

"যাইবেই যদি ছাড়িয়া মোদের কেমনে তোমারে রাখিব, নয়নের জলে বসন তিতায়ে শুধুগো বিদায় মাগিব। না পাইব তোমায় দেখিতে নয়নে, অন্তর হ'তে যাইবে কেমনে,বহুদূরে ওগো রহিবে তুমি, শুধু স্মৃতিটী তোমার পূজিব। শেষবার তোমায় বলি গো কাতরে রেখ স্নেহটুকু সন্তানের তরে, যদিও মোদের নাহি কোন গুণ, তবু স্মৃতিটী তোমার পুজিব।"

রাত্রি প্রায় ১০টায় সকলে বিদায় নিলেন। যশিদিতে গাড়ীতে উঠিতে গিয়া দেখা গেল, যতীশগুহ, দিদিমা ও ত্রিগুণাবাবু **মাকে** দর্শন করিতে সেই গাড়ীতেই আসিয়াছেন। দিদিমা, যতীশদাদা এলাহাবাদ সঙ্গেই চলিলেন।

৭ই অগ্রহায়ণ—বুধবার—আজ বৈকাল ৫টায় এলাহাবাদ পৌছিবার কথা টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছি। টিকিট সেখানকারই করিয়াছি। অখণ্ডানন্দ স্বামিজীকে বিন্ধ্যাচলে টেলিগ্রাম করিয়াছি। বিন্ধ্যাচলে পৌছিবার একটু পূর্ব্বেই **মা** বলিতেছেন, "খুকুণির যে কাণ্ড। টেলিগ্রাম করা কি আমার গতিবিধিতে পোষায়? এই ত এখন বিন্ধ্যাচল নামিয়া যাইতে পারিতাম।" আমি বলিলাম—"বেশত তাতে কি হল, চল তাই নামি।" তাই হইল। **মা** বিন্ধ্যাচল নামিয়া পড়িলেন। শঙ্করানন্দ স্বামীকে এলাহাবাদ খবর দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। **মা** জানেন ষ্টেশনে সকলে কি ভাবে **মার** জন্যে উৎসুক হইয়া থাকিবে। এদিকে অখণ্ডানন্দজী, নিবারণ-বাবু, উপেনবাবু ষ্টেশনে গিয়াছেন, এলাহাবাদ যাইবেন। এ দিকে মা নামিয়া পড়িলেন।

৮ই. অগ্রহায়ণ—বৃহস্পতিবার—আজ দুপুরে মোটরে শিবপ্রসাদ,

স্বামিজীও জীতেন দাদা যাইতে চাহিতেছেন। মেয়েদের আশ্রমের জন্য একটা স্থান ঠিক্ করা হইয়াছে। **মাকে** সেখানে একটু পদধূলি দিয়া যাইতে হইবে। এই তাহাদের প্রার্থনা। কিছুই ঠিক্ হইল না। যাহা হইবার হইয়া যাইবে এই কথাই প্রায় রহিল।

৯ই, অগ্রহায়ণ—শুক্রবার—আজ সকালে **মাকে** নিয়া সকলে একটু হাটিয়া আসিলেন। তারপর মোটর একটু বেড়াইয়া আনা হইল। শিবপ্রসাদ বাবু **মার** যাইবার জন্য মোটার রাখিয়া গিয়াছেন। আজই বৈকালে এলাহাবাদ রওনা হওয়া হইবে কথা হইয়াছে। কিছু সময় তথায় থাকিয়া যেখানে হয় রওনা হওয়া হইবে। আজ দুপুরে কথায় কথায় **মা** বলিতেছেন "সর্ব্বরূপেত সেই একই। দেখ্ খুকুনি এই যে নীচে দেখিয়া আসিলি সাধুরা আছে,—কোথাও কোথাও কি হয় জানিস্? গাঁজার আড্ডা থাকে সেই লোভেও সাধুরা সব একত্র গিয়া জমা হতে পারে। সাধন ভজনও কিছু কিছু করিতেছেন, গাঁজা ইত্যাদিও খাইতেছেন, গল্প গুজব ও করিতেছে এই-ভাব। আবার এক রকমের সাধু হতে পারে কিছু কিছু সাধন ভজনও করেন, কোন কোন বাক্য ফলিয়াও যায় এই প্রলোভনে সেই ভাবের লোকেরা তথায় সেই জন্যই যায়। অর্থাৎ যাহারা সাংসারিক ২।৪টী ভবিষ্যৎ কথা শুনিতে চায়। এইসব লোকেরা মনে করে ঐ সব কথার চেয়ে......আর বড় কিছুই নাই। তোরা এক এক সময় বলিস্ না? ওখানে বেশ ভবিষ্যৎ বলিয়া দেন। এটা ভাবিস্ না যে সাংসারিক সুখের জন্য ২।৪টী ভবিষ্যতের কথা, জানাই কি তোদের জীবনের উদ্দেশ্য নাকি? উদ্দেশ্য থাকবে—কিসে আত্মউন্নতি, কিসে চির শান্তি হয়। সব কর্ম্মের মধ্যেই উদ্দেশ্যটা বড় রাখ্তে চেষ্টা করবি। ধ্যান যত বড় রাখবি ততই সেই জ্ঞান পাইবার

আশা। ইহারাত চেষ্টা কর্‌ছে আনন্দ যতটুকু করে, ততটুকুই লাভ। সর্ব্বরূপেই তুমি। আবার এক জাতীয় সাধুর ভাব হতে পারে, তাহারা বড় বড় সাধুদের অনুকরণে পোষাক পরিচ্ছদ সব রাখে, ভিতরে জিনিষ বিশেষ কিছুই না। পাওয়ায় কি হয় জানিস্? তাহাদের সঙ্কুচিত ভাবটা থাকিয়া যায়, কারণ গ্রন্থিত আর খোলে নাই। আবার শোন্ এই যে সব নানা ভাবের কথা বলিলাম কখনও কখনও কোন শুভ মুহুর্ত্তে এই বাইরের বেশটা যে ধরিতে পারিয়াছে ইহাতেই কাহারও কাহারও এমনও হয় হঠাৎ হয়ত এই সব বাহিরের জিনিষ আর ভাল লাগে না। সত্যপথের দিক্‌টা খুলিয়া বিরাট মহান্‌ভাবে চলিয়া যায়। কাজেই বলি কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে নাই। সাধুভাবে আছে এই দেখিলেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হয়। যাহার যেটুকু ভাল দেখবি গ্রহণ করতে হয়। গোলাপফুল তোলাই উদ্দেশ্য কাঁটার দিকে লক্ষ্যও করিতে নাই। সেই বিরাট মহানেরও এই একরূপ এই ভাবিয়া প্রণাম করিবে। শ্রদ্ধার সহিত করিবে। শ্রদ্ধার ভাবে যে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। সেই ভাবেই কথাগুলি বলিবে। তাহাতেও তাহার তপস্যার যেটুকু প্রভাব আছে তাহারও একটা ছাপ তোমার মধ্যে আসিবে। এই ভাব নিয়াও তোদের উপকার হইবে। সকলের মধ্যেই সেই একেরই সত্ত্বা দেখিতে চেষ্টা করিতে করিতে দেখবি সেই বিরাট মহান্, ভাবে তাঁকে পাওয়ারই রাস্তার অনুকূল আশা।

তবে একটা কথা আবার শোন্, সঙ্গ ও প্রণাম যাহাকে কর্‌বে তাঁহার পূর্ণাঙ্গিন স্বভাবই কিন্তু দোষ গুণ সহ আসিতে পারে, সেইজন্য আপন আপন গুরু ইষ্ট এবং যাহাদের দীক্ষা হয় নাই, তাহারা ভগবদ্ ভাবের যে ভাব মনে স্বভাবতঃ অঙ্কিত থাকে, তদ্‌ভাবেই প্রণাম কর্ত্তব্য। তাঁহাকেই ত করা হইল। ফিল্‌টার করিলে জল পরিস্কার হয়, সেই

শুদ্ধজল যেমন এই জলেতে আছে, তেমন তিনি সর্ব্বেতে আছেন। তাঁহাকেই প্রণাম তাঁহারই সৎসঙ্গ করণীয়, এও একটা দিকের কথা কিন্তু।"

বৈকালে আমরা ২।৩ জন **মাকে** নিয়া মোটরে এলাহাবাদ রওনা হইলাম। অন্যান্য সকলেই ট্রেনে রওনা হইয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় আমরা এলাহাবাদ পৌঁছিলাম। দারাগঞ্জে যে বাগান বাড়ীটা মহিলা আশ্রমের জন্য সম্প্রতি নেওয়া হইয়াছে মা তথায়ই নামিয়া পড়িলেন। শিবপ্রসাদের মোটার তাহাকে খবর দিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

সুন্দর সাজানো বাগান। তারমধ্যে **মা** একটি বিল্ব বৃক্ষ তলে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"বাঃ বেশ স্থান ত। খুকুনি আমার বিছানা এখানেই বিছাইয়া দে, আমি এইখানেই বেশ রাত্রিতে থাকিতে পারিব।"

কথা হইয়াছে বরোদার দিকে যাওয়া হইবে। আজ আর গাড়ী নাই, তাই আগামী কল্য সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হইতে হইবে।

এদিকে শিবপ্রসাদ বাবু নিজের বাড়ীতে তাঁবু ফেলিয়া কতভাবে **মার** জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছেন। **মা** যাইবেন কিনা ঠিক্ নাই। গেলেও অতি অল্প সময়ইত থাকিবেন, কিন্তু তাহাতে তাহার ভ্রুক্ষেপও নাই, সে সব সাজাইয়া রাখিয়াছে। যেন **মা** সেখানে কিছুদিন থাকিবেন। **মার** জন্য একটা কিছু করিতেই তার আনন্দ। শ্রীশ্রীমার আগমন বার্ত্তা পাইয়াই শিবপ্রসাদ ভাই আসিয়া উপস্থিত। অনেক অনুরোধ করিয়া অল্প সময়ের জন্যই **মাকে** নিয়া যাইতে রাজি হইলেন। কথা হইল **মা** রাত্রিতে এই বাগানেই থাকিবেন। শিবপ্রসাদ **মাকে** এখনও তেমন ভাবে জানেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন **মাকে** নিয়াত যাই, যখন **মা** দেখিবেন

আমি কত কষ্ট করিয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া **মার** জন্য তাঁবু টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছি তখন বিশেষ অনুরোধ করিলে মাকে রাখিতেই পারিব।

কিন্তু **মা** তাঁবুতে আসিয়াই বলিতে লাগিলেন—"কতবার মানা করিয়াছি যে এসব করিও না, আমাকে কালীবাড়ী কিম্বা অন্য যে কোন স্থানে রাত্রিটা রাখিয়া দিও। এত অল্প সময়ের জন্য কেন এসব করিয়াছ? যাক্ আমি কিন্তু আজ এখানে থাকিব না। আমি সেই বেলতলায় বেশ থাকিব।" শিবপ্রসাদ অনুরোধ করিলেন কিন্তু মা মিষ্ট ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন তাঁর এখানে থাকা হইবে না। সকলে আর কি করেন, বাধ্য হইয়া সেই বাগান বাড়ীতেই খানিক পরে **মাকে** নিয়া গেলেন। সকলে **মার** সঙ্গে বেল তলায় যায়গা নিবে এই ভাবিয়া বারান্দায় থাকিতে রাজি হইলেন। আমরা সকলেই **মার** কাছে শুইবার স্থান করিয়া লইলাম। অনেকে মার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। রাত্রি ১১টায় সকলের শেষে জীতেনদাদা ও শিবপ্রসাদ ভাই বিদায় নিলেন। বেশ একান্ত স্থান। আমরা মহানন্দে **মাকে** নিয়া রাত্রি কাটাইলাম। কথা হইয়াছে দেরাদুন হইতে মন্মথদাদা মেয়েদের নিয়া এইখানেই আসিয়া থাকিবেন। এই বাড়ীটায় সম্প্রতি থাকা হইবে, পরে নূতন আশ্রয় করা হইবে। শুনিলাম এবাড়ীটাতেও কেহ বাস করে না।

১০ই. অগ্রহায়ণ—শনিবার—আজ বেলা প্রায় ১০টায় আমরা শিবপ্রসাদ ভাইয়ের বাড়ীর তাঁবুতে **মাকে** নিয়া আসিলাম। কথা হইয়াছে আজ সন্ধ্যার ৬টার ট্রেনে এখান হইতেই ষ্টেশনে রওনা হইয়া যাওয়া হইবে। আগ্রা হইয়াই যাওয়ার সুবিধা তাই আগ্রা হইয়া যাওয়া স্থির হইয়াছে। ১২টা হইতে প্রায় ৩টা অবধি **মাকে** একটু বিশ্রাম দেওয়া হইল। তাঁবুর চারিদিকে সকলে আসিয়া বসিয়া আছেন। মা উঠিয়া

বসিলেই একটু খাওয়াইয়া সকলকে ভিতরে যাইতে বলা হইল। বহুলোক মাকে নিয়া বসিলেন। তাঁবুর চারিদিকের পরদা উঠাইয়া দেওয়া হইল। যথা সময়ে মাকে উঠাইয়া ষ্টেশনে নিয়া আসা হইল। বহুলোক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। অনেকেই ফুলের মালায় মাকে সাজাইয়া দিলেন। অনেকেই ফুল ছিটাইতে লাগিলেন। এই ভাবে সকলের নিকট বিদায় নিয়া মা আমাকে ও রুমাদেবীকে সঙ্গে নিয়া বরোদা রওনা হইলেন।

১১ই অগ্রহায়ণ—রবিবার—আজ প্রাতে আসিয়া আগ্রায় পৌছিলাম। নিরোজ দাদাও বীরেন দাদা ষ্টেশনে আসিয়াছেন। নিরোজ দাদার বাসায় তাঁবু ফেলা হইয়াছে। মাকে সেইখানেই নিয়া যাওয়া হইল। মার আজ বরোদা রওনা হইয়া যাওয়ার কথা। মার আগমন বার্ত্তা পাইয়া অনেকেই মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। রাত্রি ৯টায় আমরা রওনা হইব। কথাবার্ত্তা হইতেছে—অনেক কথা হইল। একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শরীরে থাকিয়াই কি অশরীরীর ধ্যান করা যায়?" মা বলিলেন,—

"ধ্যান করা যায়, কিন্তু ধ্যান করা ও ধ্যান হওয়া আলাদা কথা। যখন ধ্যান হইয়া যাইবে—তখন আর কে কার ধ্যান করে?" একটি ভদ্রলোক বলিলেন,—

"আমার কিছুই জিজ্ঞাস্য নাই, আমি খাই দাই বেশ আছি, ওসব ধর্ম্মতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি?" মা হাসিয়া বলিলেন বেশ ত তাই থাক, কিন্তু তাও থাকিতে পারিতেছ না, উকি ঝুকি মারো বৈ কি। না হইলে মাথা ঘামাবার দরকার কি? এ কথাই বা আসে কেন? উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। সেই ভদ্রলোকটিও হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা আর এ কথা ও বলব না।" মা হাসিয়া বলিলেন, এই যে বল্‌ব না,

বল্‌ব না, বল্‌ছ এও সেই ভাবের উকি ঝুকি আছে বলিয়াই বল্‌ছ, বলব না, বলব না বল্‌লেও বলাই হইল।" আবার সেই ভদ্রলোকও অন্যান্য সকলে হাসিয়া উঠিলেন। এবং মার কথাই স্বীকার করিলেন। ছোট ছোট ছেলে পেলেদের বলিতেছেন "তোমরা আমার বন্ধু, কি বন্ধু হইতে রাজি আছ? তাহারা সকলেই মাথা নাড়িয়া রাজি হইল। মা বলিলেন "আচ্ছা বন্ধু হইলে বন্ধুর কথা ত শুনিতে হয়। কি কথা শোন, তোমরা ৫টি কাজ করবে। (১) সকাল বেলা উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া প্রথমে যার যে নাম ভাল লাগে ভগবানের সেই নাম করবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে আমরা যেন ভাল ছেলে ভাল মেয়ে হতে পারি। (২) সত্য কথা বল্‌বে (৩) পিতা মাতা এবং অন্যান্য গুরুজনদের কথা শুনে চল্‌বে। (৪) মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করবে। (৫) তারপর একটু একটু দুষ্টুমী কর্‌বে মানে খেলাধুলা করবে এই জাতীয় আর কি।" এই বলিয়া মা হাসিয়া উঠিলেন। বালক বালিকার দলের সর্ব্বশেষ কথাটিই সব চেয়ে মনের মত হইল, তাই এই কথাটি শুনিয়া মহানন্দে হাসিয়া উঠিল।

রাত্রি ৯টার গাড়ীতে বীরেনদাদা ও নিরোজ দাদা আসিয়া আমাদের তুলিয়া দিয়া গেলেন। কথা হইয়াছিল বীরেনদাদার দ্বিতীয় ছেলে দেবীদাস ও নিরোজ দাদার এক চাপরাশী আমাদের সঙ্গে ভরতপুর পর্য্যন্ত যাইবে তথায় ২ ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হইবে। পরে ১৷৷০ টায় আমাদের বরোদার গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া যাইবে। ষ্টেশনে আসিলে মার একটি আভাষ পাইয়া দেবীদাস বরোদা পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিবে স্থির হইয়া গেল।

১২ই অগ্রহায়ণ সোমবার—আজ রাত্রি প্রায় ৯৷৷০ টায় আমরা

বরোদা পৌঁছিলাম। সৈয়াদিগঞ্জের চিমনলালের ধর্ম্মশালায় গেলাম। রাত্রিটা এখানেই থাকিব স্থির হইল। এত রাত্রি দোকান ও খোলা নাই, খাওয়ার কি ব্যবস্থা হইবে সঙ্গে দেবু আছে তাই মা রান্নার ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন। কিন্তু কি করিব। পরে মার ব্যবস্থা মতে দরোয়ানের নিকট হইতে কিছু চাউল ভিক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গে ফল কিছু দেওয়া হইল। এই ভাবে রান্নার ব্যবস্থা করিয়া রাত্রি প্রায় ১২টায় খাওয়া শেষ করিয়া আমরা শুইয়া পড়িলাম। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত মহাশয় এখানেই ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল কিন্তু মা আজ তাঁকে খবর দিতে নিষেধ করিলেন, বলিলেন "কাল যাহা হয় দেখা যাইবে। কাল কখন খাওয়া হয় ঠিক নাই তাই আজ কিছু কিছু খাওয়াইয়া নেওয়া হইল।"

আজ ট্রেনে মাকে বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করায় আরও কথা পাওয়া গেল। সব সময়ত সব কথা বাহির হয় না; হয়ত আমরা অধিকারী নই তাই বাহির হয় না। কথাটি এই মার মুখ হইতে যে বাজিতপুর নিজের পরিচয় বাহির হইয়াছিল সেই কথা উঠাইয়া আজ আমি বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা মা ভোলানাথ ও নিশিবাবু যখন তোমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তুমি কি অবস্থায় ছিলে? মা উত্তর দিলেন "তখন আপনা আপনি পূজা জপ ইত্যাদির ক্রিয়া এই শরীরের মধ্যে হইয়া যাইতেছিল!' আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "জানকীবাবু আসিয়া যখন তোমার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন তখন তুমি কি অবস্থায় ছিলে?" মা বলিলেন "বাঃ তখন ত ভোলানাথের দীক্ষা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সেই সব কথা আলোচনা হইতেছিল।" আমি বলিলাম,

"ভোলানাথের দীক্ষার তারিখ, মাস বার নক্ষত্র এসব তোমার কি ভাবে আসিল?" মা হাসিয়া বলিলেন, শোন, ভোলানাথ ও নিশিবাবুর জিজ্ঞাসায়

মুখ হইতে যখন বাহির হইতে লাগিল অমুকবার, অমুকমাস, অমুকতিথি অমুক তারিখ, তখন তাহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া পঞ্জিকা বাহির করিয়া এক একটা করিয়া মিলাইতে লাগিল, সব মিলিয়া গেল। ওরা জানে ত পঞ্জিকা টঞ্জিকা এই শরীরটা কখনও দেখেও নাই জানেও না, এই ভাবিয়া দুইজনে পরামর্শ করিয়া মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে করিতে কতকটা পরীক্ষার ভাবে বলিল 'আচ্ছা বলত, সেই দিন কি নক্ষত্র হইবে?' মুখ হইতে নক্ষত্রের নাম বাহির হইল কিন্তু ওরা ভাল করিয়া শব্দটা বুঝিল না।" আমি হাসিয়া বলিলাম "ঠিকই হইয়াছিল ওরা তোমাকে একটু পরীক্ষার ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল কিনা তাই নিজেরাই ঠকিয়া গেল। কোন কোন সময় দেখিয়াছি তোমাকে পরীক্ষা করিতে গেলে আমরা নিজেরাই ঠকিয়া বসি। আচ্ছা তারপর কি হইল?" মা বলিতে লাগিলেন "শেষে বলা হইল জানকী বাবুকে ডাকিয়া আন্, সে অমুকস্থানে পুকুর ধারে বসিয়া মাছ ধরিতেছে। তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। সে আসিয়া নক্ষত্রের কথা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করায় নক্ষত্রের কথা আবার বলা হইল। জানকীবাবু নক্ষত্রের কথা বুঝিলেন এবং তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন। দেখা গেল পঞ্জিকার সহিত মিলিয়া গেল। জানকীবাবু সংস্কৃতাদি জানিতেন, পরে উহাদের নিকট সব কথা শুনিয়া এবং এই শরীরটার অবস্থা দেখিয়া জানকীবাবুরও যেন কেমন একটা কৌতূহল জাগিল। কারণ এই শরীরটাকে ত সে দেখিত না, আড়ালেই থাকিত। আর এখন মাথায় কাপড় পর্য্যন্ত নাই কোনরূপ সঙ্কোচই নাই, যেন ছোট্ট মেয়েটি বাবার সঙ্গে কথা বলিতেছে। তখনই জানকীবাবু জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি কে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তখনও কি পুজাদির কোন ক্রিয়া হইতেছিল?" মা বলিলেন "না, তখন শুধু আপন ভাবে থাকিয়া তাহার কথার জবাব হইতেছিল।"

আবার কথায় কথায় বলিতেছেন "দেখ্ গোপন করার ভাবটা কতক্ষণ থাকে ? অভাব বোধহয় যতক্ষণ। অভাব বোধ কি ? না, সাধকের হইল পাছে সাধনার ক্ষতি হয়। আর সর্ব্বসাধারণের হইল পাছে নিজের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই গোপনের ভাবটা থাকে। আবার মহাত্মাগণ যে কখনও কখনও সব কথা বলেন না তার কারণ, শুনিবার অধিকারী নয় বলিয়াই বলেন না। যেমন ম্যাট্রিক্ পাশের নিকট এম এ পাশের খবর বলিলে বুঝিবে না।"

আমি বলিলাম "মা কেহ কেহ বলেন মাত আমাদের মত সংসার করেন নাই, আমাদের সাংসারিক সুখ দুঃখ এত বোঝেন কি করিয়া ?" মা উত্তর দিলেন "বাঃ কি রকম জানিস্ না ? আমিই যে তুমি, তুমিই যে আমি, এই আর কি। না বোঝার প্রশ্ন কোথায় ?"

ট্রেনে পায়খানায় গিয়াছেন বৈকালে প্রায় সাড়ে পাঁচটায়। আসিয়া বলিতেছেন "দেখ্ কি রকম হয় জানিস্ এই যে পায়খানার দরজাটা খোলা ইহা কি ভাবে খোলে তা কিন্তু আমি জানি ; কিন্তু এমনই একটা সময় আসে যে কিছুতেই এই শরীরটার দরজাটা খুলিবার ভাবই জাগিতেছে না, যেন দরজা খুলিতেই জানিনা পরিষ্কার এই ভাব। আবার তামাসা শোন্ এই ভাবটা যে আসিবে তাও কিন্তু আমি জানি এবং ঐ সময়তে যে খুলিতে না পারিয়া ছেলেমানুষের মত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তদ্রূপ ধারণ করিয়া পরে হা করিয়া দাড়াইয়া থাকিব। এই যে শরীরের মূর্ত্তিটা তাও কিন্তু আমার চোখের সামনে আসিয়া গিয়াছে আবার তোকে কোন কোন সময় বলিতেছি বন্ধ করিস্ না, খোলবার ভাব না এলে কিন্তু আমি খুলিতে পারিব না। বাস্তবিকই তখন অজানার মত পূর্ণ ভাবটী শরীর দিয়া দেখাইয়া যাইতেছে। এই যে সগুণ আর নিগুর্ণ আমরা বলিয়া থাকি

না? কোন গুণেরই প্রকাশ নাই আবার সব গুণই প্রকাশ পাইতেছে। এটাও স্বভাব আর কি। কি সুন্দর সব। এই যে গতাগতির ক্রিয়াদি দেখিতেছিস্ ইহা শরীর আছে কিনা তাই একটু আধটু হইয়া যায়। আবার কখনও কখনও দেখিতে পাস, শরীর থাকা সত্ত্বেও তোদের মত ক্রিয়াদি হইতেছে না।”

ট্রেনে আর একটি ঘটনা হইয়াছিল তাহাও উল্লেখযোগ্য বলিয়া এই স্থানে লিখিতেছি। দেবু আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। আমিও সেকেণ্ড ক্লাসে আছি মার শরীর অসুস্থ বলিয়া। কিছুদিন যাবৎ সেকেণ্ড ক্লাসেই চলাফেরা করা হইতেছে। দেবু থার্ড ক্লাসে। ভোরে দেবু একবার আমাদের কাছে আসিয়াছিল কিন্তু তারপর বেলা ১০টা বাজিয়া গেল আর কোনও খবর নাই। কি একটা কথা বলিবার জন্য আমি নামিয়া দেবুকে খুঁজিলাম, পাইলাম না। প্রত্যেক ষ্টেশনেই নামিতেছি আর খুঁজিতেছি কিন্তু পাইতেছি না। চিন্তা হইল, ছেলে মানুষ কখনও এই ভাবে বাহির হয় নাই। এদিকে কখনও আসে নাই। মা আমার চেয়েও বেশী চিন্তার ভাব দেখাইয়া ভাল করিয়া খুঁজিতে বলিতেছেন। তারপর না পাওয়া গেলে আগ্রায় টেলিগ্রাম করা হইবে, এই ষ্টেশনে নামিয়া থাকিব, এসব ব্যবস্থারও কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। মাও যেন চিন্তার ভাবেই চুপ করিয়া আছেন আর প্রত্যেক ষ্টেশনেই আমাকে নামিয়া খুঁজিতে বলিতেছেন। এই ভাবে ৩।৪ ষ্টেশন পার হইয়া গেল আবার একটা ষ্টেশন আসিতেই আমি বলিলাম, “এবারও নামিয়া দেখি যদি না পাওয়া যায় একটা ব্যবস্থা করা যাইবে।” এই বলিয়া গাড়ী থামিতেই যেই নামিতে যাইব অমনি মা গম্ভীর ভাব যেন আর রাখিতে না পারিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। আমিও মার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম, “তুমি

দেখি হাসিতেছ, ব্যাপার কি ? এতক্ষণ ত যেন আমার চেয়েও তুমি বেশী চিন্তায় পড়িয়াছ এই ভাব দেখিতেছি, এখন পাওয়া যাইবে নাকি ?” মা আর কিছু বলিলেন না হাসিতে লাগিলেন। আমি নামিয়া পড়িলাম অনেক ডাকাডাকি ও প্রত্যেক গাড়ী খুঁজিতে খুঁজিতে এক গাড়ীতে গিয়া দেখি শ্রীমান দাড়াইয়া আছেন, নামিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া মাকে বলিলাম “সব জানিয়া শুনিয়া কি ভাবে তুমি এমন সব ব্যবহার কর ভাবিয়া অবাক হই। শেষটা বুঝি আর থাকিতে পারিলে না হাসিয়া ফেলিলে ?” মা হাসিয়া বলিলেন, “হাসি আসিয়া পড়িল।” অথচ প্রথম দেখিলে সকলেই বলিত মাও চিন্তান্বিতা হইয়াছেন। আমি ভাবিলাম হয়ত আমাদের কর্ম্মক্ষয় করাইবার জন্য মার যখন যে ভাবে থাকা দরকার তাই হইয়া যায়। প্রথম হইতেই মার হাসিমুখ দেখিলে আমার যেটুকু চিন্তা করিবার ছিল তাহা হইত না, তাই ঐ ভাব। আমার যখন সে কর্ম্মটুকু শেষ হইয়া গেল মা হাসিয়া ফেলিলেন, কারণ মা ত জানেন আমার চিন্তা বৃথা, দেবু গাড়ীতেই আছে। এসব ভাবেরও যে দরকার আছে তাহা বেশ বুঝিলাম। দুভাবেরই যে খেলা মার সর্ব্বদা চলিতেছে বাহিরে আমরা ইহাই দেখিতেছি। আমার সঙ্গে সঙ্গে মারও ব্যস্তভাব ফুটিয়া উঠিল। আমি মাকে বলি, “মা সব জানিয়া শুনিয়া কি করিয়া অজানার ভাবের খেলা খেল ?” মা হাসেন অথচ ফাঁকিও কিন্তু নয়। কে এই সব ভাব বুঝিবে ? আমাদের ধারণারও অতীত।

১৩ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার—

আজ প্রাতে উঠিয়াই ধর্ম্মশালার পাশেই কমলেশ বাবুর স্ত্রীকে খবর দিয়া আসিলাম। ইহার কথা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। মার জন্য

ইনি বড়ই ব্যাকুলা। তারপর শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বাবুকে খবর দিতে চলিয়া গেলাম। নূতন দরোয়ান মাকে চেনে না। নীচের একটা কোঠা আমাদের ছাড়িয়া দিল। প্রাতে মালিক পঞ্জিলাল মার আগমন বার্ত্তা পাইয়া ধর্ম্মশালায় আসিয়া মার জন্য উপরের কোঠা খোলাইয়া দিলেন এবং লোক দিয়া জিনিষ পত্র উপরে নিতে প্রস্তুত হইতেই মা বলিলেন "এখন নিও না, যদি থাকা হয় তবে উপরে যাইব, দেখা যাক কি হয়।" আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখি এই সব ব্যাপার। কমলেশ বাবুর স্ত্রীও মার জন্য দুধ নিয়া উপস্থিত। আমার সঙ্গেই গঙ্গাচরণ বাবুর স্ত্রী ও কন্যা আসিলেন। গঙ্গাচরণ বাবু বলিলেন "আমি কলেজে যাইবার পথেই মার কাছে যাইব। এখন কয়েক দিন মাকে এখানে রাখিবার চেষ্টা করিব।"

আমি আসিতেই মা বলিলেন "চান্দোদের গাড়ী কয়টায়?" খবর নিয়া জানিলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রওনা হইলেই গাড়ী পাওয়া যাইতে পারে। মা বলিলেন "তাই চল"। তখনই প্রস্তুত হইলাম। ৫।৬ মাইল দূরে গোয়া গেইট হইতে গাড়ী ধরিতে হইবে। তাড়াতাড়ি করিয়া বাসে রওনা হইলাম। গঙ্গচারণ বাবুর ধারণাও হয় নাই যে মা এখনই রওনা হইবেন। তিনি ধর্ম্মশালায় আসিয়া মা ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া প্রথমে বিশ্বাসই করেন নাই। পরে ষ্টেশনে গিয়া মার চরণ দর্শন করিলেন। পঞ্জীলাল বাবুই আমাদের নিয়া ষ্টেশনে গেলেন। সব যেন সুবন্দোবস্ত। বেলা ১১টায় আমরা রওনা হইলাম। দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টায় চান্দোদ পৌছাইবার কথা। মধ্যে গবই ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া অন্য গাড়ীতে উঠিলাম। সেকেণ্ড ক্লাসে একজন মাত্র স্ত্রীলোক বসিয়াছিলেন। মাকে দেখিয়াই তিনি মার বসিবার জন্য নিজের স্থান

ছাড়িয়া অন্য বেঞ্চিতে গিয়া বসিলেন। এখান হইতে অল্প সময়ের রাস্তা। এই অল্প সময়েই ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে বেশ আলাপ হইয়া গেল। মাকে দেখিয়াই তার কেমন একটা ভক্তির ভাব জাগিয়াছে, দেখিয়াই বুঝিয়াছেন মা নাকি সাধারণ স্ত্রীলোক নন। তার পরিচয় পাইলাম—নাম জানকী-বাই। ইনি রাজপিপলার রাণীর সঙ্গে থাকেন, কুমারী। উদয়পুর হইতে ফিরিতেছেন। মার জন্য একান্ত স্থানের খবর করিয়া তিনি জানাইবেন বলিলেন। সম্প্রতি আমাদের ব্যাস যাইবার কথা হইয়াছে। বেলা প্রায় ১॥০টার সময় আমরা চান্দোদ পৌছিলাম। এখান হইতে টিঁকমজীর মন্দিরে হাটিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। কারণ এখানে কোনরূপ যান বাহনই নাই। মাকে এই রৌদ্রের ভিতর নিয়া যাওয়া ঠিক মনে করিলাম না, মাকে ষ্টেশনে বসাইয়া আমি ও উমাদেবী জিনিষ পত্র নিয়া রওনা হইব এর মধ্যে একটা লোক আসিয়া বলিল, "আমি রাজপিপলার ষ্টেটের লোক। আমাকে জানকী বাই পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন মাতাজী নাকি ব্যাস যাইবেন, এখনই চান্দোদ হইতে "বোট" ব্যাস যাইতেছে, যদি কিছু করিতে হয় তাই আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" জানকী বাই ট্রেন হইতে নামিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। যাক এই খবর পাইয়া মা বলিলেন "তবে চল এখনই রওনা হওয়া যাক", এই বলিয়া রৌদ্রের ভিতরই রওনা হইতেছেন। কথা হইল পথে আমি টিঁকমজীর মন্দিরের মোহন্তকে খবর দিয়া যাইব, সেখানে সাধন ব্রহ্মচারী আছে তাহাকেও খবর দিয়া যাইব। মা ঘাটের দিকে রওনা হইলেন। "ওয়েটিং রুম" হইতে বাহির হইয়া কয়েক পা অগ্রসর হইতেই ঐ লোকটি আবার আসিয়া বলিল "জানকী বাইয়ের জন্য রাজ ষ্টেটের গাড়ী আসিয়াছে, তিনি বলিলেন তাঁহাকে পৌছাইয়া এখনই মাতাজীকে ঘাটে

পৌঁছাইয়া দিবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিতেছেন, মা যেন হাটিয়া না যান। মা "ওয়েটিং" রুম হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন তাই আর সেখানে গেলেন না, ষ্টেশনের ভিতরেই একটা বেঞ্চিতে বাহিরে বসিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম "সবই বন্দোবস্ত ঠিক আছে, বেশ চুপ করিয়া থাক"। মা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা পূর্ব্বে এত কথা কি বলা যায় যে জানকী বাইয়ের সহিত দেখা হইবে, সে যাওয়ার সময় কিছু দূর যাইয়া তাহার গাড়ীর কথা মনে পড়িবে, তারপর এই এই ব্যবস্থা করিবে, এত কথা কি বলা যায়? দেখা পেলেও এত সব কথা বলা যায় নাকি? তবে ত তন্ন তন্ন করিয়া তোদের মনের গতি কখন কিরূপ হইবে, কেন হইবে এসব বলিয়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইবে। ইহাও যে অনন্ত কি বলিব বল্। চান্দোদেও থাকা হইল না। একেবারে ঘাটে আসিয়া নৌকায় উঠিলেন। চান্দোদের মোহন্ত মহারাজও বড় ভদ্র ও ধার্ম্মিক; তাহার সঙ্গেও জানা শুনা আছে। মা একেবারে অপরিচিত স্থলে চলিলেন। সাধন আমাদের সঙ্গে আসিল। ঘন্টা খানেকের মধ্যে বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা ব্যাস পৌঁছিলাম। এই স্থানের নীরবতা বড় চমৎকার, নর্ম্মদার তীরে জঙ্গলময় স্থান। গত বৎসর একরাত্রি এখানে বাস করিয়া যাওয়া হইয়াছিল। এখন আরও ২।৩টী দালান বেশী উঠিয়াছে। কয়েকটী মন্দির ও আশ্রম এখানে আছে মাত্র। দ্বীপের মত স্থান। নিকটেই নর্ম্মদার ওপারে স্ুকদেব ও অনুসূয়া গ্রাম। এখানে প্রবাদ এই যে কাশীধাম হইতেও এই স্থানের মাহাত্ম্য বেশী। তপোভূমি কত কত মহাত্মাগণ এই নর্ম্মদার তীরে বসিয়া কত সাধনা করিয়া গিয়াছেন। কাল-ধর্ম্মে এখন সবই লুপ্তপ্রায়। তবুও স্থানের গাম্ভীর্য্যে মনটা ভরিয়া গেল। আমরা রাম মন্দিরে স্থান নিলাম। তথায় মোহন্ত ও ২।১টী

ব্রহ্মচারী আছেন। একটু পরেই মা ঘুরিতে বাহির হইলেন, সঙ্গে সাধন ও দেবু গেল। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "খুকুনী, আরও একটা থাকিবার জায়গা দেখিয়া আসিয়াছি, তুই দেখিয়া আয়।" শুনিলাম অতি নিকটেই যোগানন্দ স্বামীজীর আশ্রম। সেখানে নূতন দালান উঠিয়াছে এখনও গৃহসঞ্চার পর্য্যন্ত হয় নাই। আশ্রমে স্বামীজী মহারাজ ও তাহার কয়েকটি শিষ্যা আছেন। স্ত্রীলোকেরা এখানে থাকেন না মাঝে মাঝে গুরুর আশ্রমে অসিয়া কিছুদিন বাস করিয়া যান। সকলেই গুজরাটি। মাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা মাকে তাহাদের আশ্রমে যাইয়া থাকিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। রাত্রিতে আমি আসিয়া স্বামীজী মহারাজ ও স্ত্রীলোকদের সহিত আমাদের আগামী কল্য আসিবার কথা পাকা করিয়া গেলাম। রামজীর মন্দিরেও কোন অসুবিধা নাই, তাহারাও যথেষ্ট ভদ্রলোক কিন্তু উপরে স্থান হওয়াতে সিড়ি দিয়া নামা ওঠা করিতে মার Palpitation পাছে বাড়িয়া যায় এই ভয়ে আমরা অন্যত্র বন্দোবস্ত করিলাম। এখানকার সকলেই যথাসম্ভব সাহায্য করিতে প্রস্তুত। কাজেই এই জঙ্গলে আসিয়াও কোন অসুবিধা নাই। মার কৃপায় সবই ঠিক আছে। এখানে খাবার দাবার কিছুই পাওয়া যায় না। চান্দোদ হইতে সব আনিতে হয়। চান্দোদে হাটা পথও আছে, প্রায় ৩/৪ মাইল। একটি ধর্ম্মশালাও আছে। তাহাতে অন্নছত্রও আছে, দণ্ডী ও পরমহংস সন্ন্যাসীরা তাহাতে প্রত্যহ ভিক্ষা পান। একটি অগ্নিহোত্রী সস্ত্রীক এখানে বাস করেন। সম্প্রতি তিনি পাকা কোঠা তুলিতেছেন। একটু দূরেই একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একান্তে সাধন ভজন করিবার জন্য নিজেই একটি ছোট পাকা বাড়ী তৈয়ার করিয়া নিয়া তথায় আছেন। তিনি ফলাহারী, বয়স ৭০।৭৫ বৎসর হইবে, নাম সরস্বতী প্রকাশ। আরও একটু

দূরে গিয়া একটা মন্দির ও পাকা বাঁধান খানিকটা স্থান আছে, তথায় অনেক শিব লিঙ্গ স্থাপিত আছে। সেখানটার নাম কৈলাশ। আরও কয়েকখানা পাকা দালান খালি পড়িয়া আছে। চারিদিকেই আতা গাছ, জঙ্গল হইয়া আছে। একটি লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে তাহাতেই গতবার আমরা একরাত্রি বাস করিয়া গিয়াছিলাম। রামজীর মন্দিরে রাত্রিতে মার নিকট আমরা বসিয়াছি, একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মধ্যে সাংসারিক ভাবগুলির প্রকাশ দেখিয়া আসিয়া সেই সম্বন্ধে আমরা মার নিকট বলিতেছি, সাধন ভাই জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মা, এতকাল সন্ন্যাস বৃত্তিতে থাকিয়াও সেই ভাব গুলি কেন থাকে? তবে আমাদের ভরসা কি?" মা বলিলেন, "দেখ, যুবক বয়সে অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য দিয়া চলা যায়, সব দিক বজায় রাখিয়া চলিবার মত শক্তি থাকে, কিন্তু শিশু ও বৃদ্ধ বয়সে ভিতরের ভাবগুলি পরিষ্কার ভাবে বাহিরেও প্রকাশ পায়। রাগ, দ্বেষ, যা কিছু ভিতরে আছে সবই বাহিরেও প্রকাশ পায়। তাহারা আর রাখিয়া ঢাকিয়া চলিতে পারে না। তবুও ত এইভাবে জীবন যাপন করছে, ইহাতেও আশা বৈকি।"

১৪ই অগ্রহায়ণ বুধবার—

আজ প্রাতেই যোগানন্দ স্বামীজীর আশ্রমে জায়গা নিয়াছি। তাহার আশ্রমে যে নূতন কোঠা উঠিয়াছে তাহাতেই আমাদের থাকিতে জায়গা দিয়াছেন। একেবারে নূতন, দালান সঞ্চারও এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। ২/৪ দিন পূর্ব্বে আসিলেও এ ঘর পাওয়া যাইত না, কারণ কাজ শেষ হয় নাই। সবই যে সুবন্দোবস্ত। মা বলিলেন, "দেখ্ ত ঘর দরজা পর্য্যন্ত তোদের জন্য তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে, তোরা বৃথা চিন্তা না করিয়া তাঁর

উপর সব ছাড়িয়া দিতে পারিলে দেখ্‌বি সব ঠিক আছে। এই জঙ্গলে আসিয়া দেখ নূতন কোঠা সব তৈয়ার। ২।৪ দিন পূর্ব্বে আসিলেও পাওয়া যাইত না। ২।৪ দিন পর আসিলেও অপর সাধুরা কে আসিয়া পড়িত।" মা হাসিতে লাগিলেন। আমিও ভাবিতেছি ইহা সত্যিই। কত অসুবিধার মধ্যেও নিজেরা যখন কোনরূপ চেষ্টা করি নাই, মার উপর ভরসা করিয়াই চলিয়াছি তখন শত অসুবিধার স্থানেও একটা সুবিধা হইয়াই গিয়াছে, যাহা হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। এখানেও তাহাই দেখিতেছি। মা আগ্রা, বরোদা, চান্দোদ কোথাও দেরী না কবিয়া ঠিক ঠিক সময় আসিয়া এখানে উপস্থিত। জিনিষ পত্র গুছাইয়া আমিও হাটিতে বাহির হইলাম। সাধন ও দেবু বরোদা রওনা হইয়া গেল। মা প্রথমে সরস্বতী প্রকাশ মায়ের আশ্রমে গেলেন; সেখানে খানিক সময় বসিলেন। মাতাজী একান্তে সাধনা করেন। শুনিলাম প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ সাধনা করিতেছেন। পূর্ব্বে নানা স্থান খুঁড়িয়া কিছুদিন হয় এখানে আসিয়া বসিয়াছেন। ইনি সুরথের (গুজরাটি) লোক। মাকে দেখিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন, বসিতে বলিলেন। তখন তাহার পূজার সময় তাই আমরা উঠিয়া আসিলাম। বৈকালে আবার আমিও তথায় গিয়া বসিলাম, নির্জ্জন স্থান। এবার বৃদ্ধা অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন। আবার যাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। মাকে বলিতেছেন "তোমাকে আমার খুব ভাল লাগিতেছে।" মাও হাসিয়া বলিলেন "তা লাগিবে না? আমি যে তোমার মেয়ে। মেয়েকে দেখিলে মার ভালই লাগে" ইত্যাদি ইত্যাদি ২।৪ কথা হইল। পরে মা উঠিয়া আসিলেন। আমি হাসিয়া আস্তে আস্তে মাকে বলিলাম "এই বৃদ্ধার মাথাটি খাইতেছ—দেখিতেছি। একান্তে আছে, এবার তুমি ব্যস্ত করিয়া তুলিবে।" মাও একটু হাসিলেন। রাত্রিতে শুইয়া

মা একটু একটু হাসিয়া বলিতেছেন "কি সাহস দেখ্। এই নির্জ্জন স্থানে ৩টি মেয়ে লোক কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি।" এই ভাবের আরও ২।৪টি কথা বলিতে লাগিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম "কত রঙ্গই জান। ভাবিলে ত সত্যিই তাই, কিন্তু তুমি আছ একবারও মনে হয় না এসব কথা। আসিবার সময় ত কতজনেই চাহিয়াছিল আমাদের বরোদা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিবে কারণ আমাদের সঙ্গে পুরুষ নাই। আমি হাসিয়া তাহাদের বলিয়াছিলাম এখনও এই কথা ভাবেন নাকি? আপনারা পুরুষ হইয়া কতটা বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন? মা আছেন এই কি যথেষ্ট নয়?"

১৫ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার—

এই নির্জ্জন স্থানে বেশ দিন কাটিতেছে। উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা আজ নাই।

১৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার—

আজও বিশেষ কোন ঘটনা নাই। মার ত দুধই আহার। এখানে গরুর দুধই পাওয়া যায় না। খাওয়া কিছুই প্রায় হইতেছে না। দুর্ব্বল শরীর আমার ভয় হইতেছে, কিন্তু মা বলেন "চিন্তা করিস্ কেন? যেখানে যেমন তাই নিয়াই চলিতে হইবে।" দেখা যাক্ কি হয়। তরকারীও এখানে নাই। চান্দোদেও অতি সামান্যই কিছু কিছু তরকারী পাওয়া যায়। ফল মূল ত নাইই, কি করিব ভাবিতেছি, সামান্য সুজি—সিদ্ধ রুটী ও এখানে পেঁপের গাছ হইতে কাচা পেঁপে পাওয়া যায় তাহাই দিয়া একটু ঝোল করিয়া একদিন দেওয়া হইল। দুদিন আবার রুটী নিলেন না,

এ ভাবেই চলিতেছে। কেন এভাবে অসুবিধায় থাকিতেছেন মা-ই জানেন। আশ্রমের স্ত্রীলোকেরা মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়াই নিজেদের আশ্রমে মাকে আনিয়াছে ; এখন আমার মুখে ২।৪ কথা শুনিয়া মার কাছে আসিয়া বসিল। মার মুখের কথা শুনিতে চাহিল। মাও হাসি খেলায় ২।৪টি অমূল্য উপদেশ দিতেছেন। তাহাদের মহা আনন্দ। ইহারা সকলেই সুরথের লোক তবে হিন্দি অল্প অল্প জানে। আমরাও একটু একটু গুজরাটি বুঝিতেছি এভাবেই চলিতেছে। মা আজকাল অনেক সময়ই বলেন "তোমরা সকলে রিটার্ণ টিকিট করিয়া আস কিনা তাই আসা যাওয়া চলিতেছে। তাই বলি রিটার্ণ টিকিট না থাকে এমন কাজ কর।"

সরস্বতী প্রকাশ মাতাজীর আশ্রমে গতকল্য বা আজ আর যাওয়া হইল না। মাতাজী একবার আসিয়া খবর নিয়া গেলেন মা আছেন কি চলিয়া গিয়াছেন। দেখিলাম বৃদ্ধার মনে ঢেউ আসিতেছে।—

১৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার—

আজ সকালে আমি ও মা হাটিতে বাহির হইয়া ব্যাস দেবের মন্দির, ধর্ম্মশালা, সত্যনারায়ণের মন্দির সব ঘুরিয়া অগ্নিহোত্রির ঘরে গিয়া খানিক সময় বসিলাম। তাহারাও বিশেষ যত্ন দেখাইয়া বলিল যখন যাহা দরকার আমাদের বলিবেন। পরে আমরা হাটিতে হাটিতে ফলাহারী মার (সরস্বতী প্রকাশ) আশ্রমের নিকট দিয়া যাইতেছি, মাকে দেখিয়াই বৃদ্ধা তপস্বিনী ব্যস্ত হইয়া ডাকিতে লাগিল এবং তাহাদের ভাষায় বলিতে লাগিল "এই কি রকম মেয়ে মার কাছে আসে না, এদিকে ওদিকে শুধু ঘুড়িয়া বেড়ায়।" মাও হাসিতে হাসিতে তাহার আশ্রমে ঢুকিতে

ঢুকিতে বলিলেন "মার স্বভাব মেয়ে পাইয়াছে, মাও যেমন তেমনই মেয়ে।" বৃদ্ধা মহাখুসী। মাকে বসিতে বলিয়া কতভাবে বলিতে লাগিল "তুমি দুইদিন আস নাই আমি ভাবিতেছিলাম তুমি কি চলিয়া গেলে নাকি? আবার ভাবিলাম আমাকে না বলিয়াই চলিয়া গেল?" ইত্যাদি ইত্যাদি। বৃদ্ধার দাবির কথা শুনিয়া আমরা হাসিতে লাগিলাম। মাকে হাসিয়া হাসিয়া বলিলাম "আচ্ছা এই বৃদ্ধা একান্তে একা একা আছে তপস্যা করে, তুমি চলিয়া গেলে কিনা সেই চিন্তায় সে ব্যস্ত কেন? আবার দাবী দেখ? দুই-দিনেই তাহার মনে হইতেছে আমাকে না বলিয়াই কি চলিয়া গেল?" বাংলা কথা বৃদ্ধা বুঝিল না। মা ও আমি এই কথা নিয়া হাসিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম "পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি—বুড়ার মস্তিস্কটী ঘুরাইয়া দিতে আসিয়াছ।" মাও হাসিলেন। আমরা খানিক সময় বসিয়াই চলিয়া আসিলাম। পুনরায় যাইবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়া দিল।

দুপুরে বৃদ্ধা আবার মার ঘরে আসিয়া বসিলেন। এবং মাকে বলিতে লাগিলেন "তোমাকে আমার খুব ভাল লাগিয়াছে তবে আমি মুখে দেখাইতে পারি না মনে মনে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মাও হাসিয়া বলিলেন "মেয়েকে কি মার খারাপ লাগিতে পারে!"

মা কাহাকেও ছাড়িবেন না। কতবার দেখিয়াছি মার কাছে আসিয়া অনেকেরই ভিতরের প্রকৃত ভাবটি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। হয়ত বেশ সামঞ্জস্য দিয়া চলিতেছিল কিন্তু এখানে আসিয়া আর পারে নাই। যাক্ জঙ্গলের মধ্যে আনন্দেই দিন কাটিতেছে।

১৯শে অগ্রহায়ণ সোমবার—

আজ ১০টার বোটে মার সঙ্গে আমি ও সাধন চান্দোদ রওনা হইলাম। দেবীজী ব্যাসে রহিয়া গেল। চান্দোদ গিয়া আমরা চিকমজীর মন্দিরে উঠিলাম। মোহন্ত মহারাজ মাকে দেখিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং চান্দোদে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। মা বলিলেন "পিতাজী তোমার পাগল মেয়েটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন হয় আসিবে।" দুপুর বেলা মা একটু শুইলেন, বেলা ২টার গাড়ীতে গঙ্গাচরণ বাবু সস্ত্রীক এবং সেই সঙ্গে অভয়ও আসিয়া উপস্থিত। অভয় ১৫।১৬ দিন কাশীতে শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ বাবুর বাসায় ছিল। বৈকালে ৪ টার সময় মা কর্ণালী হইয়া আসিলেন, সন্ধ্যার সময় চান্দোদ হইতে আমরা ব্যাস রওনা হইলাম। নৌকায় প্রায় ৩ ঘণ্টায় ব্যাস পৌছান যায়। জ্যোৎস্না রাত্রি, নর্ম্মদাতে মার সঙ্গে নৌকায় আমরা বড়ই আনন্দ পাইলাম। দুই দিকের দৃশ্যও অতি নির্জ্জন। মনে হইল কত সাধক এইস্থানে কত ভাবে সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাব আজও সম্পূর্ণ ভাবে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। রাত্রি প্রায় ৯॥ টায় আমরা ব্যাস পৌছিলাম। শুদ্ধতায় চারিদিক যেন ঝিম ঝিম করিতেছে।

২০শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার—

আজ গঙ্গাচরণ বাবু বরোদা ফিরিয়া গেলেন। মার সঙ্গে আমাদের দিন বড়ই আনন্দে কাটিতেছে।

২১শে অগ্রহায়ণ বুধবার—

আজ ভোর রাত্রিতে মা হঠাৎ আমাকে বলিতেছেন "একটা মূর্ত্তি দেখিলাম। কয়টা বাজিয়াছে দেখ ত ?" আমি দেখিয়া বলিলাম ৪।০ টা।

মা বলিলেন "সোয়া চার হইয়া গিয়াছে? এই ত বেশ উঠিয়া নাম করিবার সময়।" আমি বলিলাম, "কি মুর্ত্তির কথা বলিতেছিলে?" মা আর কিছু বলিলেন না।

২২শে অগহায়ণ বৃহস্পতিবার—

মা, আমি, অভয়, সাধন ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বাবুর স্ত্রী বসিয়া আছি কথায় কথায় নানা কথা উঠিল। আমি বলিলাম "মার কখনও কখনও কথা না বলিবার হইলে আঙ্গুল দিয়া মুখ চাপা থাকে।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ এই রকম হয় হয়ত। কত লোক বসিয়া আছে, কথা হইতেছে হঠাৎ যে কথা বলিবার নয় সে কথা উঠিল কোন জবাব আসিল না আর এই আঙ্গুল দুইটা মুখে বেশ চাপিয়া বসিয়া গেল। তারপর এক এক ভাবের সময় যে এক এক প্রকার আসন স্বাভাবিকই হইয়া যায় আসন দেখিলেই বোঝা যায় লোকের ভিতরটায় কি ভাব তখন খেলিতেছে" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা মা বলিলেন।

এই আশ্রমের যোগানন্দ স্বামীজির কয়েকজন শিষ্যা (গুজরাটের) গুরুর কাছে আশ্রমে আসিয়া মাঝে মাঝে থাকেন। তাহাদের মধ্যে একজন আমাদের একটু বিশেষ খোঁজ খবর নেন। মহিলাটির ধর্ম্মভাব বেশ আছে। মার পরিচয় ইহারা কিছুই জানেনা বলিলেই হয় তবুও মার মুর্ত্তি দেখিয়াই মার প্রতি একটু আকর্ষণ হইয়াছে, ব্যবহারে একটু প্রকাশ পায়। বিশেষ আসা যাওয়া করেন না। মধ্যে মধ্যে আসিয়া বসেন, কথাচ্ছলে মার মুখের ২।১টী কথা তাঁহার খুব ভাল লাগিয়া গিয়াছে। তাহারা সকলে নিকটবর্ত্তী স্থান সিনোর গিয়াছিলেন ফিরিয়া আসিয়াছেন। মাকে আসিয়া বলিতেছেন কি "আশ্চর্য্য আমি দেখিলাম নৌকায়

বসিয়া আছি, পরিস্কার দেখিতেছি আপনি যেমন অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় মাঝে মাঝে শুইয়া থাকেন ঠিক তেমনই ভাবে শুইয়া আছেন। এমন হইল আমি যে দিকে চাই ঐ মূর্ত্তিই দেখি, শেষে থাকিতে না পারিয়া সঙ্গীয় বহিনদের বলিলাম। কিন্তু তাহারা কিছু দেখিল না।" হিন্দি ভাষায় অনেক করিয়া এই কথা কয়টি আমাদের বুঝাইল। মা শুনিয়া একটু হাসিতে লাগিলেন। আমাকে বলিতে লাগিলেন "কি বলে শুনেছ ?" বৈকালে মাকে নিয়া চারিদিক একটু হাটা হইল। বৈকালে মা প্রায়ই সন্মুখস্থ একটি তেঁতুল গাছের তলায় নর্ম্মদার দিকে মুখ করিয়া বসেন। গাছের তলাটা বাঁধান। আমরাও মার সঙ্গে বসিয়া থাকি, আজ সন্ধ্যার পরও আমরা ঐ স্থানে বসিয়া ছিলাম।

২৩শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার—

আজও দৈনন্দিন ব্যাপার একভাবেই প্রায় চলিয়া গেল। বৈকালে আজও তেঁতুল তলায় গিয়া বসিলেন। আজ মার শরীরটা তেমন ভাল না, বলিতেছেন "কি জানি কেমন কেমন লাগিতেছে।" সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ফলাহারী মার (স্বরস্বতী প্রকাশ) কাছে গেলেন। আমি ও অভয় সঙ্গে আছি। বৃদ্ধা মাকে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইয়া বলিলেন "বেটি এত দেরী করে এলি কেন ?" মা তাহার বারান্দায় কিছু সময় বসিয়া আছেন, বৃদ্ধার শুচিবাই আছে। মা বলিতেছেন "মা আমি জল খাইব।" আমাকে বলিতেছেন "দেখ মার সঙ্গে একটু দুষ্টামি করি।" বৃদ্ধা ত ছুইবে না, বৈকালে স্নান করিয়া আসিয়াছে এখন মন্দিরাদি দর্শনে বাহির হইবে। কি করেন প্রথমে বলিলেন "আমাকে মায়ায় ফেলিতে এসব বলিতেছ।" পরে যখন বুঝিলেন সত্যিই জল খাইবেন তখন জল এক
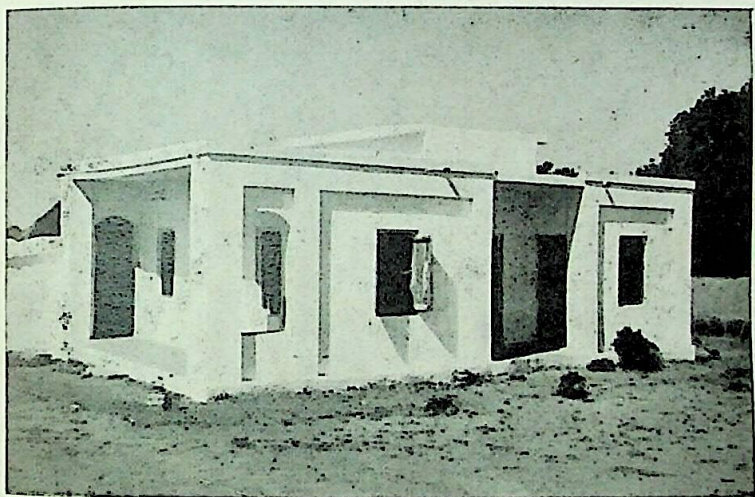
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম—ভীমপুরা (চান্দোদ)

বাটি আনিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিতে বলিতেছেন। মা ত একেবারে ছেলে মানুষের মত হা করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়াছেন। বেচারা কি করে এক গণ্ডুষ জল মার মুখে ঢালিয়া দিয়া ব্যস্ত হইয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ খাওয়াইয়া দিতে বলিতেছেন। আমি হাসিয়া বলিতেছি 'মার হাতে খাইবে আমি দিব না"। বৃদ্ধা মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন দেখিয়া পরে আমি গিয়া জলপান করাইয়া দিলাম। পরে বৃদ্ধাকে বলিতেছেন "মা মা সকলে আমার মা হইতে চায় না, তুমি ত মা হইয়াছ আমি যদি তোমাকে জোরে জোরে ডাকি তুমি কিন্তু রাগ হইও না।" বৃদ্ধা অতি আদরের সহিত বলিল "তা কি হয় আমি রাগ হইব না। আর বিশেষতঃ সাধুর বেশ পরিয়া রাগ করাত ঠিক নয়।" মা হাসিয়া বলিলেন "বেশ একথা বেশ খুসীর কথা।" পরে ছেলেমানুষের মত মা—মা—মা—মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে কেমন যেন একটু ভাবের পরিবর্ত্তন দেখা গেল, চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, আমার ও অভয়ের ভয় হইল "এ আবার কি ?" বৃদ্ধার এক কন্যা ছিল ১৫ বৎসর বয়সে ২ মাসের গর্ভ নিয়া বিধবা হইয়াছিল। সেই কন্যা ২০ বৎসরের হইয়া মারা যায়। বিধবা সেই শোকেই গৃহত্যাগ করিয়াছেন, কাল একথা মাকে বলিয়া ফেলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন "তুমিই কি আমার সেই মেয়ে ?" "তুমি কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলে ? আমি একান্তে আছি কাহার ও সঙ্গে যাই না" ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ মা ডাকিতে ডাকিতে বলিতেছেন "তুমি মেয়ের জন্য অনেক কাঁদিয়াছ তাই আমি আজ কাঁদিতেছি।" বৃদ্ধা প্রথমে বেশ হাসি খুসি ভাবে ছিল, তাহার ভিতর যে কিছু ব্যথা আছে বোঝাই যায় নাই। কিন্তু মার এই ভাবে ডাকে ও কথায় বৃদ্ধা মার নিকটে আসিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে

বৃদ্ধার চোখে জল আসিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে আমি ও অভয় বলিলাম "এ কি মা, এ বেচারা জঙ্গলে একা থাকে এর কাছে আসিয়া আবার এ কি আরম্ভ করিলে?" মার মুখে একটু হাসি, চোখে জল, কিছুই বলিলেন না। খানিক পরে বৃদ্ধাকে নিয়া বাহির হইলেন। বৃদ্ধার নিত্য কর্ম সন্ধ্যায় দেবতা দর্শন, মাকেও সঙ্গে নিয়া চলিল। আমিও সঙ্গে চলিলাম। মা এখন একেবারে শিশুটির মত পিছনে পিছনে একটু দ্রুত গতিতে চলিয়াছেন। বৃদ্ধার হাসির ভাব নাই। গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। মন্দিরে মন্দিরে দর্শন করিয়া বৃদ্ধা ফিরিলেন। আমি মাকে বলিলাম "ভিতরে যাহা আছে তাহা বাহির করিতেছে বুঝি?" মা বলিলেন "ভিতরেরটা বাহির হইয়া যাওয়াই ভাল।" বৃদ্ধা নিজের আশ্রমে চলিয়া গেলেন। আমরাও রাস্তায় নিজেদের স্থানে রহিয়া গেলাম। বৃদ্ধার আশ্রমে কোন কারণে আমি গিয়াছি, বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন "আমি একান্তে ঠাকুর নিয়া এই জঙ্গলে পড়িয়া আছি। একা থাকায় আমার আনন্দ। এ বেটি কোথা হইতে আসিল? ইহার চেহারাও আমার মেয়ের সঙ্গে কতকটা মেলে। দেখ, কোথায় বাঙ্গাল কোথায় গুজরাট, কি ভাবে মিলন। কি সংযোগ আছে জানিনা আমি দর্শন করিতে গিয়াছি কিন্তু আমার বুকের মধ্যে কি ভাব হইতেছিল একমাত্র ঠাকুরই জানেন। ও বেটি মা ত আমারই হইয়া গিয়াছে।" ভাবিলাম এ ব্যবহার কি? কোথায় যে কি জন্য কাহার জন্য কি ব্যবহার করিতেছেন বোঝা আমাদের দায়, দেখিয়া যাইতেছি মাত্র।

আজ চান্দোদের মন্দিরের পূজারী আমাদের কিছু - জিনিষ পত্র নিয়া আসিয়াছেন। তিনি আজ সন্ধ্যায় কীর্ত্তন করিলেন। অভয়

ও যোগ দিল। দেখিতেছি মার সঙ্গে ২ কীর্ত্তন চলিবেই। পূজারী এস্‌রাজ নিয়াই আসিয়াছে মাকে কীর্ত্তন শুনাইবে।

২৪শে অগ্রহায়ণ শনিবার—

কাল রাত্রিতে মার শুইবার ভাবই ছিল না। আমরা ঘুমাইয়াছিলাম অনেকক্ষণ নাকি উঠিয়া বসিয়া ছিলেন। পরে আমাকে একবার ডাকিতেই আমিও খানিক সময় বসিয়া রহিলাম, নানা কথাবার্ত্তা হইল। প্রায় রাত্রি ৩টায় মা শুইলেন পরে আমিও শুইয়া পড়িলাম। আজ বলিতেছেন কাল রাত্রিতে একটি ঘটনা হইয়াছিল সূক্ষ্মশরীরীরা আসিয়া মাকে নিয়া গিয়াছিল; আবার রাখিয়া গিয়াছে, কেমন ভাবে তিনজন ধরাধরি করিয়া নিয়া গিয়াছিল পরিস্কার দেখিয়াছেন বলিতেছেন। একস্থানে নিয়া গেল সেখানে মার বাংলা ভাষায় এবং অপর ভাষায় অনেক গুলি কথা হইয়াছে। এই মাত্র বলিলেন। মা বলিতেছেন "পরিস্কার হাতগুলি যে জোর ভাবে ধরিতেছে দেখা গেল।" মা হাসিতে ২ বলিতেছেন। আমরা জানি না কখন কত কি হয়? মাকে বলিলাম "আমরা জাগিয়া থাকিলে কি রকম হইত?" মা বলিলেন "হয়ত তোদের তখন একটা ভয়ের ভাব জাগিয়া কতকটা আড়ষ্ট ভাব করিয়া দিত। বিশেষ কিছু না দেখিলেও ঐ ভাব হওয়া স্বাভাবিক।"

সন্ধ্যাবেলা আমি, অভয় ও সাধন মাকে নিয়া ফলাহারী মায়ের আশ্রমে গিয়া খানিক সময় বসিলাম। পরে আসিয়া মা বিছানায় শুইয়া আছেন আমরা বসিয়া আছি, সুক্ষ্ম শরীরীদের কথায় বলিতেছেন, "বেরিলিতে একবার একখানা নূতন কম্বল গায় দিয়া রাত্রিতে শুইয়া আছি পরিষ্কার দেখিতেছি এই বড় বড় লোম ওয়ালা এক ছাগল আসিয়া আমার গায়

লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্পর্শটা পর্য্যন্ত পরিষ্কার অনুভব হইতেছিল। বেশ বোঝা গেল ইহার লোমেই এই কম্বল খানা তৈয়ারী। স্পর্শেই বোঝা যায় ইহা স্থূল শরীরের ইহা সূক্ষ্ম শরীরের। আবার বেশ হয় সেই সব সূক্ষ্ম শরীরীদের সঙ্গে ব্যবহার হইয়া গেলে গা ঝাড়া পাড়া দিয়া বসিলাম বা শুইয়াই রহিলাম, তোদের ডাকিলাম আবার যেন তোদের সঙ্গে ব্যবহার আরম্ভ হইল। কখনও২ দুই দিকেই এক সঙ্গে ব্যবহার চলিতেছে—।"

আবার কথা উঠিয়াছে। অভয় বলিতেছে "কেহ ২ গোপীনাথ বাবুকে আসিয়া বলে আনন্দময়ী মা এত ঘোরাঘুরি করেন কেন?" তিনি জবাবে বলিলেন 'মা ত ঘোরা ফেরা করেন না, তিনি এক স্থানেই আছেন। দেখেন না লাটিম যখন ঘোরে তখনও তাহার মধ্যস্থানটা স্থির ভাবে থাকে, চারিদিকটাই ঘোরে, সেই রকম সঙ্গের সকলে ঘোরে মাত্র, মা স্থির ভাবেই আছেন।" ইহা কিন্তু ঠিকই দে দুর্ব্বল শরীর হইলে শয্যাগত হইয়া পড়িবার কথা। অথচ মার যেন এই ঘোরা ফেরা গায়ই লাগিতেছে না। যেন একস্থানেই আছেন, একটু লক্ষ্য করিলেই ইহা বোধ করা যায়। কারণ আর কিছু নয়, কারণ হইল মা যে ঐ ভাবেই স্থিত আছেন তাই আমাদেরও তাই মনে হয়। মাত সর্ব্বদাই বলেন "আমি ত ঘুরিনা আমি ত একস্থানেই আছি। আর ঘোরা ঘুরির দৃষ্টিতেও তোমরা যদি বল নিজের এক ঘরের ভিতরই হাটিতেছি, বসিতেছি, শুইতেছি"। এই ভাবটা শুধু কথায় নয়, বাস্তবিক তাঁর শরীরেই এই ভাব প্রকাশ হইতেছে।

২৫ শে অগহায়ণ রবিবার—

কালও রাত্রিতে মার শুইবার ভাবই ছিল না। রাত্রি প্রায় ১৷৷০টায়

বিছানা ছাড়িয়া পাকের কোঠায় অভয় শুইয়াছিল তার কাছে বসিলেন, ৪৷৷০টায় আসিয়া বিছানায় বসিয়া রহিলেন। ৫টায় শুইলেন। কথায় কথায় উঠিয়াছে মার আমাদের মত ঘুম ছোট বেলায় কখনও হইয়াছে কি না? না হইয়া থাকিলে আমাদের মত ঘুমের কথা জানেন কিনা? মা বলিলেন "দেখ তা না জানিবার কারণ কি? তোদের ভাবেও যে আছে, সেই ঘুমের খবর ত না জানিবার কোন কারণ নাই। আর এই শরীরটার কথা যদি জিজ্ঞাসা করিস্ তবে বলা হয় এইমাত্র যে তোদের দৃষ্টিতে ছোট বেলায় যেমন ঘুম বলিস্ এখনও তাই, মধ্যে যোগক্রিয়া গুলি যখন শরীরের মধ্যে হইয়া গিয়াছে তখন এই ভাবের ঘুমের মত দেখাতনা ও শরীরটা পড়িয়া থাকিতনা, তখন একেবারে জাগ্রত ভাব দেখাত। আর এখন যদি তোরা ঘুম বলিস্, তাহলে তোদের দৃষ্টিতে ছোট বেলায়ও এই রকমই হইয়াছে।"

২৬শে অগ্রহায়ণ সোমবার—

আজও সকাল বেলা মাকে নিয়া একটু হাটাইয়া আনিলাম। ফলাহারী মার প্রাণটা মা সেদিন হইতেই কেমন করিয়া দিয়াছেন। তবে ইনি বেশ গম্ভীর প্রকৃতির, একান্ত ভাবে বহুকাল সাধন ভজন করিতেছেন। তাই প্রকাশ খুবই কম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় চেহারা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আজও সেখানে গিয়াছিলাম তিনি একটা গল্প-চ্ছলে বলিতেছেন "অন্দর কা বাৎ ত রামজী জানেন।" এই বলিয়া মাকে দেখাইয়া বলিতেছেন "এই সব জানে।" আর মাকে ইহাও বলিতেছেন "তুমি ত আমারই হইয়া গিয়াছ। আমার প্রাণ তোমারই কাছে থাকে। তবে বাহিরে দেখাইবার আদত আমার নাই বাহিরে দেখাইয়া কি হইবে?

সেই হইতেই আমার ভিতরে তুমি কি করিয়া দিয়াছ আজও আমি স্থির হইতে পারিতেছি না।" গম্ভীর ভাবে দূরে বসিয়া উদাস ভাবে যখন ঐ সব কথা বলেন বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হয় সেই কথা গুলি। এদিকের অনেকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। সর্ব্বদাই তপস্যায় নিযুক্তা থাকেন। বলেন "মেয়েই আমার গুরু ছিল। তাহার শোকেই ত আজ ৪০।৫০ বৎসর বাহিরে থাকিয়া ভগবানের সেবা করিতেছি।" বৃদ্ধার চেহারা দেখিয়া ভক্তি হয়।

অভয় আজ কথায় কথায় মার দীক্ষার কথা জানিতে চাহিল। মা বলিতেছেন শুনিলাম "প্রথমে যজ্ঞের মণ্ডলাদি—তৈয়ার হইয়া গেল, পরে যজ্ঞের পূর্ব্বে যেমন প্রথমে মণ্ডলাদিতে পূজা এবং অন্যান্য পূজাদি কিছু করিতে হয় সেইরূপও কিন্তু হইয়া গেল। তারপর অন্যান্য সব আপন ভাবেই (তোদের দৃষ্টিতে বাহিরের কোন দ্রব্যাদি লওয়া হয় নাই,) নিজ হইতেই সব আর কি হইয়া যাইতে লাগিল।—"

আবার কথায় কথায় অভয় বলিতেছে "শুনিয়াছি যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।" "দেখ এ কথা সত্যিই যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।" এই বলিয়া কথায় কথায় অনেক কথা উঠিল। মা বলিতেছেন "প্রায়শ্চিত্ত যে করিতে হয় তাহাও এই শরীরটার মধ্যে হইয়াছে।" এই কথায় অনেক কথা হইল; মার হাতে যে ২।৩টি দাগ আছে কখনও আগুনে পোড়াইয়া কখনও ক্ষত করিয়া দাগ করিয়াছেন। সেই সব কথায় শ্রদ্ধেয় নিশিকান্ত মিত্র মহাশয়ের দৌহিত্রির কর্ণমূল হইয়াছিল এই কথা উঠিল। মাকে আসিয়া ধরিলেন ও মা সেই দিনই শাহবাগে হাতের পিঠে একটি ক্ষত করিলেন তারপরের দিনেই ছেলেটির কর্ণমূল ফাটিয়া গেল। আবার কথা হইল রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে

মাকে নিয়েছেন। মা ভোগ পাক করিতেছেন এই সময়তে ভূদেব বাবু গিয়া বলিলেন "নবাব জাদি প্যারি বানুদের একটা ভয়ানক মোকর্দ্দমা বাধিয়াছে বড়ই ভয়ের কারণ হইয়াছে, এই মোকর্দ্দমায় যেন নবাব জাদি জিতিয়া যান এই কার্য্যটী মাকে করিতেই হইবে। এখন কলিকাতায় সেই মোকর্দ্দমার কি হইতেছে জানিতে চাই।" ভোলানাথও এজন্য মাকে খুব ধরিয়া পড়িলেন। মা তখনই উনান হইতে একটা জ্বলন্ত কয়লা নিজের হাতের পিঠে রাখিয়া স্থানটা জ্বালাইয়া নিলেন (এখনও সেই স্থানে দাগ আছে) পরে বলিলেন "এই এই হইতেছে এবং জিতিয়া যাইবে" তাহাও বলিলেন। মা বলিলেন যোগৈশ্বর্য্যের ব্যবহার ত করিতেন না। আপনা আপনি যেটা হইয়া যাইত। ভোলানাথের পীড়াপীড়িতে যখন এই কথার উত্তর দিবেন স্থির করিয়া ফেলিলেন, তখনই জ্বলন্ত কয়লা রাখিয়া নিজের শরীরের কতক অংশ জ্বালাইয়া লইলেন। কিছু সময় পরই খবর আসিল তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, ইহার ভিতরে আরও কত কি থাকে। এতদিন একথা গোপন ছিল আজ কথায় কথায় প্রকাশ হইল। মাকে এই কথা বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন "একটা আছে যোগৈশ্বর্য্য-বিভূতি প্রকাশ করা হয় সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। আবার আর একটা আছে এই যে শরীরের অংশটা জ্বালাইয়া একটা ক্রিয়া করা হইল, এই ক্রিয়ার ফলটা সেই কর্ম্মস্থানে গিয়া তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা কারীদের সহায়ক একটা ফল প্রদান করিল। অর্থাৎ যাহা হইতেছিল তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া প্রার্থনাকারীদের অনুকূল ক্রিয়া হইতে লাগিল। এখন যাহা ধরিয়া লও।" আবার বলিলেন "কখন এমনও হইয়াছে একটা কথা হয়ত মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে কোন ক্রিয়া হইতেছে না কিন্তু ঐ কাজটি হইতে বাধ্য।—আবার এমনও হয় ভবিষ্যতের

গর্ভে যাহা আছে তাহা কেহ জানিতে চাহিলে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে হইবে অথবা হইবে না।" এই সব নানারকম আছে।

আজও রাত্রিতে মা ২।১ ঘণ্টা চুপ থাকিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমি ও অভয় সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিলাম। কথাবার্ত্তা হাসিগল্প হইতে লাগিল, যেন দিন হইয়াছে। এর মধ্যে খানিক সময় মা আমাদের চুপ করিয়া বসিতে বলিলেন। মা দুলিতে লাগিলেন। মার এই দোলার সময় এমন হইত বুকের পাশের হাড় গুলির খসার শব্দ পাওয়া যাইত।

আজও বৈকালে ফলাহারী মার কাছে গিয়াছি, আজ কথায় কথায় বৃদ্ধা গাম্ভীর্য্য যেন বজায় রাখিতে না পারিয়া হাতযোড় করিয়া মাকে বলিয়া ফেলিল "আমি চলিয়া যাইব এই কয়দিন ২।১ ঘন্টা আসিয়া আমার কাছে বসিও।" আমাকে বলিল "মাকে নিয়া আসিও।" আমি বৃদ্ধার দিন দিন ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক অথচ তিনি যে মার ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকেন তাহা নয়, নিত্য নিয়মিত নিজের কাজ নিয়া আশ্রমেই আছেন। কোথাও বাহির হওয়া তাহার স্বভাবও নয় কিন্তু মা কাছে গেলেই যেন কি হারা নিধি পাইলেন, উঠিতে চাহিলেই বলিয়া কহিয়া একটু বসাইয়া রাখিতেন। মা এতদিন একটু দুষ্টুমী করিয়াছেন কিন্তু বৃদ্ধার এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মাও যেন তাহার কাছে স্থির হইয়া যান। বড়ই প্রাণের সঙ্গে বৃদ্ধা কথাগুলি বলেন। বৃদ্ধা একটা কূয়া তৈয়ার করাইবেন বলিতেছেন "এই কূয়া করা আমার বাকী আছে এই কার্য্যটি শেষ হইলেই আমার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে"। তিনি ৪০।৫০ বৎসর পর নিজের দেশে একবার সকলের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন বলিলেন।

২৭শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার—

আজ প্রাতে উঠিয়াই আমাদের চান্দোদ যাওয়া স্থির হইল। মা গিয়া ফলাহারী মার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলেন। আমরা বেলা ১০টায় বোটে রওনা হইলাম। আসিবার সময় বৃদ্ধা যখন রৌদ্রের ভিতর নিজের নিত্য নৈমিত্তিক পূজাচ্চর্না ফেলিয়া রাখিয়া নদীর ধারে দুরে দাঁড়াইয়া মাকে দেখিতে লাগিল তখন এদিকের অনেকেই তাহার এই ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কারণ তাহাকে এই ভাবের ব্যবহার করিতে কেহ কখনও দেখে নাই।

অভয় মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করিয়া বসে "এসব আমার ভাল লাগে না, ইহাতে লাভ কি ? বেচারা স্থির ভাবে ছিল অস্থির করিতেছ কেন ?" মা মৃদু মৃদু হাসেন।—একবার বলিলেন "উহার ভিতরে যে জ্বালা (কন্যার শোক) ছিল তাহা বাহির হইয়া যাওয়া ভাল।" আবার বৃদ্ধার মন এমন ভাবে দোলাইয়া আজই চান্দোদ রওনা হইয়া গেলেন; ২।৪ দিন পরই বৃদ্ধা চলিয়া যাইতেছেন কিন্তু সেজন্যও অপেক্ষা নাই। চরিত্র দেখিতে২ বিস্ময়ে পুলকে স্তম্ভিত হইয়া যাই। সকলকে নাচাইতেছেন কিন্তু তিনি স্থির ধীর অবিকৃত। তাই না এত লোককে অস্থির করিতে পারেন।

আমরা আসিয়া বিষ্ণু মন্দিরে উঠিলাম। মোহন্ত রামরতন দাসজী মহা আনন্দিত হইলেন। কত রকমে সকলকে যত্ন করিতে লাগিলেন। মা কয়দিন এখানে থাকিবেন কিছুই ঠিক নাই।

২৯ শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার—

আজ সন্ধ্যার পর মার শরীরটায় একটু এলোমেলো ভাবে ক্রিয়া

হইয়া গেল। কয়েকদিন পর্য্যন্তই মা বলিতেছেন "আমার শরীরটা কিন্তু এলোমেলো হইয়া যাইবে।—তোরা ভয় পাবি না এই রকম হইয়া কখনও কখনও শরীরটা ভালও হইয়া যায়।

৩০ শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার—

আজ মা ছোট বেলার ২।৪টি গল্প বলিলেন। আমি ও অভয় মার নিকট বসিয়া আছি ছোটবেলার কথা বলিতেছেন "ভোলানাথ বলিয়া দিল কোন পুরুষের মুখের দিকে চাহিতে নাই। বাস, নাই ত না-ই, বাপ ভাইয়ের মুখের দিকেও চাওয়া হয় না। একবার এ শরীরের জ্যেঠাত ভাই বলিল 'একটা পান নিয়া আয়ত।' পান নিয়া আসিলাম, কি কাজ করিতেছিল তাহার দুই হাত জোড়া ছিল হাঁ করিয়া বলিল মুখে দিয়া দে, কি করি তখন মুখের দিকে ত চাহিব না, আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল শেষে হঠাৎ খেয়াল হইল শুধু মুখের ভিতরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পানটা ফেলিয়া দিয়াই ছুটীয়া চলিয়া গেলাম, এমন আশ্চর্য্য মুখের অপর অংশে দৃষ্টি পড়িল না। শুধু ভিতরটাই দেখা হইল।

১লা পৌষ শনিবার—

আজ মা বেলা প্রায় ১০টায় উঠিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর বসিয়াছেন। মা বৈষ্ণবীদের সুরে গান ধরিলেন —

"আমি ব্রজে যাব মেগে খাব
ব্রজের চরণ ধূলি মাখব গায়
আমার মাকে মা বলিও ভাই নিতাই"

হাত তালি দিতেছেন, আর গাহিতেছেন। এই দুই লাইন ছাড়া আর কিছু

বলিতেছেন না। একটু পরে বলিতেছেন "শোন, ছোট্ট বেলায় গ্রামে কোন কোন দিন বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা টুন টুন করিয়া হয়ত কিছু বাজাইয়া ভোরে বাড়ী বাড়ী গান গাহিয়া গেল। কি গাহিল কিছুই বোঝা হইল না অথচ এই শরীরটা তাহাদের পিছে পিছে দৌড়াইয়া যাইত।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন "যেদিন ভোরে গান গাহিয়া যাইবে সেই দিন তাহারা পরে আসিয়া বাড়ী বাড়ী হইতে ভিক্ষা লইবে এই তাহাদের নিয়ম ছিল।"

৩রা পৌষ সোমবার—

আজ বেলা ২॥০টার বোটে আমরা ব্যাস ফিরিয়াছি। সাধন ও রুমাদেবী চান্দোদ আছে, আমি ও অভয় মার সঙ্গে আসিয়াছি।

৪ঠা পৌষ মঙ্গলবার—

আজ এতদ্দেশীয় কয়েকজন লোক মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। সকাল বেলা একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক (এতদ্দেশীয়) মাকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া গেল। আমরা তাহাকে কখনও দেখি নাই। কথা কিছুই বলিল না। মা তখন শুইয়া ছিলেন। আজ রাত্রি প্রায় ১॥০টায় মার শরীরে ক্রীয়া হইতে লাগিল। আমি ও অভয় বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি, মা একটু একটু কথার জবাব দিতেছেন ক্রিয়াও হইয়া যাইতেছে। প্রায় ঘন্টা খানেক চলিল। আজ রাত্রি প্রায় ২টায় মা কথা বলেন তবে বেশীর ভাগ চুপ করিয়াই থাকেন। শুইবার ভাব থাকে না, কখনও শুইয়া কখনও বসিয়া বাকী রাত কাটান, আমি ও অভয় সেই রাত্রে অনেক সময়ই জাগিয়া থাকি।

৫ই পৌষ বুধবার—

আজ ভোরে উঠিয়া আমি ও অভয় মার সঙ্গে নর্ম্মদার তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে ব্যাস দ্বীপ খানা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম। জঙ্গলের ভিতর দিয়া দিয়া পথ চলিয়া আসিয়াছি।

৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার—

কাল কেশব (ছেলেটি ব্রহ্মচারী হইবার জন্য আসিয়াছে ককস্ বাজারে মাকে প্রথম দেখে) আসিয়া পৌছিয়াছে। সে ঢাকা আশ্রমে কিছুদিন ছিল। আজ প্রাতে মার সঙ্গে আমরা তিনজন নর্ম্মদার তীরে তীরে অনেক দূর হাটিয়া আসিলাম। আসিয়া খানিক পরেই মা শুইয়া পড়িলেন।

৮ই পৌষ শুক্রবার—

আজ ভোরে আমি ও মা নর্ম্মদার তীরে তীরে অনেক দূর যাইয়া একটা জায়গায় বসিলাম। তথায় বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা হইল। বেলা প্রায় ৯টায় আমরা ফিরিয়া আসিলাম। আজও একটু কিছু খাওয়াইয়া দেওয়ার পর মা শুইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় ১টায় উঠিলেন। বৈকালে আমরা নৌকায় অনেক দূর বেড়াইয়া আসিলাম। সন্ধ্যায় নর্ম্মদার মধ্যে নৌকায় বিশেষতঃ মার সঙ্গে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পর আমরা আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

৯ই পৌষ শনিবার—

আজ সকালে আমরা মার সঙ্গে নৌকায় নর্ম্মদার অপর তীরে শুকদেব নামক স্থানে গিয়া অনেকক্ষণ কাটাইলাম। তথায় মন্দিরাদি আছে

পূজারী আছেন, নিত্য পূজা হয়, পূজারী মাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু বেলা প্রায় ১২টায় আমরা ফিরিয়া আসিলাম। ওপারটা আরও যেন নির্জ্জন, পুরাণ মন্দিরাদি আরও নির্জ্জনতা বাড়াইয়া দিতেছে। আমরা নর্ম্মদার দিকে একটা বারান্দায় মার সঙ্গে বসিয়াছিলাম। এই ভাবে নর্ম্মদার তীরে মার সঙ্গে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটিতেছে।

১০ই পৌষ রবিবার—

কাল সারারাতই মা প্রায় বসিয়া ছিলেন। আজ সকালে একটু হাটিয়া আসিলেন পরে একটু দুধ ইত্যাদি খাওয়াইয়া দিলাম। অভয়কে নিয়া একঘরে গিয়া বসিলেন খানিক কথাবার্ত্তার পরই বেলা প্রায় ১১॥টা হইতে মার আবার শারীরিক ক্রিয়াদি আরম্ভ হইল। ঘণ্টা খানেক ক্রিয়াদি হইল তারপর পড়িয়া রহিলেন। বেলা ৫টায় ডাকিয়া ডাকিয়া উঠাইয়া সামান্য একটু দুধ ও তরকারীর "জুস" খাওয়াইয়া দিলাম। কিন্তু শরীরের ভাব অন্যরকমই দেখিতেছি। বলিলেন, "একটা ঘরে আমাকে একটা বিছানা করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দে" তাই দিলাম। মা শুইয়া পড়িলেন। আজকাল ঘন ঘন ক্রিয়াদি হইতেছে।

১১ই পৌষ সোমবার—

কাল রাত্রি হইতেই একা ঘরে শুইতেছেন। কথায় কথায় বলিলেন আজ দুপুরে এক বৃদ্ধ সাধু মার কাছে আসিয়াছিল (সূক্ষ্মশরীরী) কোন কথা হয় নাই।

আজ দেরাদুন হইতে হরিরাম যোশী, গোবিন্দ পাণ্ডে এবং দিল্লী হইতে শিশির আসিয়াছে। মা আজও অনেক সময়েই পড়িয়া ছিলেন।

১২ পৌষ মঙ্গলবার—

আজ দুপুরে মা আমাকে এক সময়েতে বলিতেছেন "দেখ, ভিতরটা ত এক ভাবেই থাকে কিন্তু বাহিরটা যে তোরা দেখিতেছিস সব ভাবেই যোগ দিয়া নাড়া চাড়া হইতেছে এমন কি দেখিতেছিসত', আগুন জল প্রভৃতির উপমাটা দিতেছি এই সব শারীরিক ক্রিয়া যাহা তোরা দেখিতেছিস, তাহাও যেন কেমন বন্ধ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। তাই এক এক সময় দেখিস, কো্ন কথা ভুল হইয়া যাইতেছে কিন্তু ভুল নয় ঐ কি রকম যেন এলোমেলো হইয়া যাইতেছে।" এই বলিয়া চুপ করিলেন খানিক পর শুইয়া পড়িলেন।

১৩ই পৌষ বুধবার—,

আজ বরোদা হইতে গঙ্গাচরণ বাবু আসিয়াছেন। মার গতকল্যের ভাবের কথায় আমার আশংকা জাগিতেছে কি জানি কি করেন। ব্যবহার বন্ধ হইয়া গেলে কি হইবে কে জানে ?

কাল হইতেই মার একটু জ্বর জ্বর ভাব। একা ঘরেই শুইতেছেন। অনেক সময় আপন ভাবে থাকেন। আজও বেলা ১০টায় শুইয়া পড়িলেন। বেলা ৩টায় উঠিলেন। পরে নর্মদায় একটু নৌকায় ঘুরিয়া আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। হরিরাম ভাই স্তোত্রাদি পাঠ করিলেন, তাঁহারা মায়ের এক স্তোত্র রচনা করিয়াছেন তাহাও পাঠ করিলেন স্তোত্রটি এই—

"জয় জয় মাতা, জয় জয় মাতা
জয় জননী জগ বন্দনী হে

তুমঁ রুদ্রাণী, জগ মহারাণী জয় জয় বিশ্ব বিনোদিনী হে
বিশ্ব বিনোদিনী মঙ্গল কারিণী, জয়জয় বীণা বাণী হে

(তুম) রূপ শিরোমণী শান্তি প্রদায়িণী জয় জয় মঙ্গল কারীণী হে
পাপ সংহারিণী শক্তি প্রসারিণী—জয় জয় কমল বিহারিণী হে
নিবিড় নিশাময় জগমে অব তুম চমকে নভসে দামিনী হে
শত শত বার প্রণাম করু মৈ জয় জয় কে হরি আসনি হে।”

কীর্ত্তনাদির পর রাত্র প্রায় ১০টায় মা শয়ন করিলেন।

১৪ই পৌষ বৃহস্পতিবার—

আজ সকাল বেলা ত্রাটক সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল। মা বলিতেছেন "ত্রাটক যখন হইত দৃষ্টি একেবারে বাকা হইয়া গিয়াছে, আবার উর্দ্ধদিকে, নিম্নদিকে, সম্মুখে, বামদিকে, ডানদিকে দৃষ্টি স্থির হইতেছে। আবার এই দিক হইতে (বক্ষঃস্থল দেখাইয়া) দৃষ্টি ধীরে ধীরে শরীরের নিম্নদিকে যাইতে যাইতে সম্মুখের দিকে চলিয়া গিয়াছে। কত রকম হইয়াছে কি বলিব।" ঘরে গঙ্গাচরণ বাবু, হরিরাম ভাই, গোবিন্দ পাণ্ডে, অভয়, শিশির সাধন, আমি সকলেই আছি, কথা হইতেছে।

বেলা প্রায় ৩॥ টায় আমরা মার সঙ্গে অনুসূয়া দেখিতে চলিলাম। এই ২।৪ দিনের মধ্যেই দেখিতেছি দল পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনের জন্য ও সাধন ভজনের জন্য যে সব স্ত্রীলোক আসেন সকলেই উপস্থিত হইতেছেন। আজ নৌকায় বাহির হইবার সময় অনেকেই সঙ্গে চলিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম "এবার ঠিক হইয়াছে। মা ২।১ জনকে নিয়া চলিবেন এ কি কথা?" রাত্রি প্রায় ৯॥ টায় অনুসূয়া দেখিয়া ব্যাস পৌছিলাম। অনুসূয়াতে ২টী মন্দির আছে। একটী অনুসূয়া দেবীর মন্দির। দ্বিতীয়টীতে যজ্ঞ কুণ্ড কালীমাতা এবং দত্তাত্রেয় ঋষির আসন ইত্যাদি আছে। একটি ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। শুনিলাম বরোদা

সরকার হইতেই সদাব্রত চলে। এবং কুষ্ঠের একটি ডাক্তার খানা আছে তাহাও সরকার হইতে চলিতেছে। বেশ একান্ত স্থান। প্রবাদ এই যে এখানকার মাটি দিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। বাহিরে একটি বড় গাছ দেখিলাম, শুনিলাম এই গাছের শিকড়ই মন্দিরের ভিতর গিয়াছে, তাহার উপর অনুসূয়া স্থাপিত। ব্যাস এখান হইতে প্রায় ২ ঘণ্টার রাস্তা। শুক্লা অষ্টমী তিথি, জ্যোৎস্নায় নর্ম্মদায় নৌকায় কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা ফিরিলাম। যাওয়ার সময়ও কীর্ত্তন চলিয়াছে। গোবিন্দ পাণ্ডে অষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকেন, তিনি নৌকায় মার পূজা করিলেন। স্তোত্রাদি পাঠ করিলেন। ব্যাস পৌছিবার কিছু পূর্ব্বে মা নৌকার একধারে গিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন আমি নিকটে দাঁড়াইয়া আছি প্রথমে একটু স্তোত্রের মত কি ধীরে ধীরে বলিলেন তারপর হাসিলেন, আমিও হাসিতেছি, সকলে একটু দূরে নৌকার অপর ধারে বসিয়াছেন। খানিক পরে মা নাম ধরিলেন। "হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।" ঘুরাইয়া ২ এই বলিতে লাগিলেন। চোখ বুজিয়া গা ছাড়া ভাবে বসিয়া ঐ নামই করিতে করিতে আবার বলিতেছেন "হরিবোল হরিবোল।" অনেকক্ষণ বলিলেন চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সকলে স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছেন। প্রকৃতিও যেন স্তব্ধ, একি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে যেন সকলে ডুবিয়া গেলাম। এর কিছু পূর্ব্বেই মার মুখ হইতে বাহির হইল "আঃ", একটু হাসিয়া বলিলেন "আরও একদিন এই শব্দ বাহির হইয়াছে, না?" আমি বলিলাম "হাঁ এর মধ্যেই একদিন বাহির হইয়াছে।" তার পরেই নাম ধরিলেন "হরে মুরারে।" আশ্রমে আসিয়া মাকে বলিলাম "অনেকক্ষণ বসিয়াছিলে একটু শোও।" মা বলিলেন "আচ্ছা।" এই বলিয়া শুইয়া পড়িলেন। বোম্বাই হইতে শান্তি ও তার স্বামী আসিয়াছে,

আমেদাবাদে দেখা হইয়াছিল। শান্তি ও আমি মার কাছে বসিয়া আছি, হঠাৎ সম্মুখের বটবৃক্ষ হইতে একটি পেচক ডাকিয়া উঠিল, মা বলিলেন "কি ডাকিতেছে ?" আমি একটু শুনিয়া বলিলাম "পেঁচা ডাকিতেছে ; এ আবার কি আমার ভাল লাগিতেছে না।" মা হাসিয়া বলিলেন "কখনও কখনও খারাপ খবরও আসে।" আমি বলিলাম, "তোমার মুখ হইতে 'আঃ' শব্দ বাহির হইতেছে আবার চোখের জল পড়িয়াছে ইহা দেখিয়াই আমার সে বিষয় আশংকা হইতেছে। মাও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন বলিলেন "তাইত চোখ দিয়া আবার জলও পড়িল।"

আজও কীর্ত্তন হইল। পাণ্ডেজী মার আরতী করিলেন। এখানে কাঠিয়া ওয়াড়ের একটি বিধবা স্ত্রীলোক কয়দিন হয় আসিয়াছেন, রাম মন্দিরের ব্রহ্মচারী বাবার শিষ্যা। ইনি এখানে একটি ছোট বাড়ী করিয়াছেন একান্তে সাধন ভজন করিবার জন্য। স্ত্রীলোকটির বেশ শান্ত ভাব। গুজরাট খুব ধর্ম্ম-প্রবণ স্থান। ইহারা সরল বিশ্বাসী। প্রায় সকলের ঘরেই খাওয়ার আছে তাই কাহারও বড় অভাব নাই। সকলেই প্রায় বেশ খুসী। স্ত্রীলোকটী কয়েকদিন যাবৎ মার কাছে মধ্যে মধ্যে আসিতেছেন। শুনিলাম তিনি কাল স্বপ্নে মাকে দুর্গা মুর্ত্তিতে দেখিয়াছেন। আগামীকল্য তিনি মাকে নিজ কুটীরে নিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গেলেন। স্বামী যোগানন্দ মহারাজজী ও তাঁহার শিষ্যাদের যত্নে আমরা এখানে বেশ আনন্দেই আছি।

১৫ই পৌষ শুক্রবার

আজ সকালে মাকে নিয়া সকলে নর্ম্মদার তীরে একটু বেড়াইয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মুখ হাত ধোয়াইয়া দিলাম। বেলা

প্রায় ১০টায় আজ কাঠিয়া ওয়াড়ের স্ত্রীলোকটী মাকে তাহার কুটিরে নিয়া গেলেন। গিয়া দেখি পূজার সমস্ত সরঞ্জাম তৈয়ার করিয়াছেন। ব্যাসের সকলেই প্রায় এক স্থানে উপস্থিত। তিনি মায়ের পূজা করিলেন। পরে একটু কীর্ত্তন করিলেন। মাও নাম করিলেন ও করাইলেন অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ধরিল।

"কৃষ্ণ কনইয়া বংশী বজইয়া
গউ চরাইয়া হা রে রে....রে···রে···রে···"

আবার ধরিলেন

"জয় শিব শঙ্কর বম্ বম্ হর হর"

প্রায় ঘণ্টা দুই তথায় বসা হইল। স্ত্রীলোকটি হিন্দি ভাষা ভাল বলিতে পারে না, গুজরাটি ভাষাতেই বলিতেছেন "কাল রাত্রি ২টায় উঠিয়া মা আসিবেন বলিয়া সব পরিষ্কার করিতেছি। আর মাকে কত মুর্ত্তিতে যে দেখিতেছি বলিতে পারি না। কীর্ত্তন করিতে করিতে কেবলই ভুলিয়া যাইতেছি রোজইত এই গান করি কিন্তু আজ যেন চোখে জল ভরিয়া আসিতেছে সব ভুল হইয়া যাইতেছে।" আমি হাসিয়া বলিলাম "মার এই রকম ভুল করানই কাজ।" মা হাসিয়া বলিলেন "কোথায়, ভুল হয় তবে ত; এতটুকু ভুল হইলে কি হইবে?" অনেকেই মাকে ভগবতী মাই এই বলিয়া প্রণাম করিতেছেন। পুনঃ পুনঃ ইহা দেখিয়া আসিতেছি তবুও আশ্চর্য্য হইতেছি এই ছোট্ট জঙ্গলি স্থান টুকুর মধ্যেও দিন দিনই মায়ের প্রভাব প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। অথচ বলিতে গেলে ২।১ জন ছাড়া হিন্দি ভাষাও কেহ বোঝে না বা বলিতে পারে না, আমরাও গুজরাটি বুঝি না বা বলিতে পারি না। বোম্বাই হইতে শান্তি মেয়েটি ও তার স্বামী

যে আসিয়াছে সেই মেয়েটিও হিন্দি বোঝেনা বলিলেই হয়। অথচ মার সেবার জন্য তার কি আগ্রহ। দুইদিন মাত্র আমেদাবাদে মাকে দেখিয়াছেন। আর এখন কত ভাবে ঠিকানা জানিয়া খুজিয়া খুজিয়া আসিয়া উপস্থিত। মায়ের কথা বোঝে না মাকে তাহার ভাষা বোঝান বাইরের দিক হইতে আমারা দেখিতেছি বড়ই দুঃসাধ্য কিন্তু মার প্রতি তাহার ভক্তি বিশ্বাস কি সুন্দর ও গভীর। বড়ই সরল বিশ্বাসী। ওখান হইতে আসিয়া মা শুইয়া পড়িলেন।

আজ বৈকালেও আমরা মার সঙ্গে নর্ম্মদার তীরে গিয়া বেড়াইয়া আসিলাম।

১৬ই পৌষ শনিবার—

মার ফটো এখানে প্রায় প্রত্যেকেই নিতেছেন। রোজই সন্ধ্যা বেলায় ও প্রাতে কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনে প্রায় অনেকেই আসিয়া যোগ দেন।

১৭ই পৌষ রবিবার—

আজ রাম মন্দিরের ব্রহ্মচারী বাবার আর একজন শিষ্য (সিনোরের চুনীলাল শেঠ) মাকে রাম মন্দিরে নিয়া গিয়া পূজাদি করিলেন। কীর্ত্তনও হইল। ইনি কয়েকদিন যাবৎ গুরুর কাছে আসিয়া আছেন। এতদ্দেশীয় গৃহস্থ লোকদের দেখিতেছি এই ভাবটা আছে মধ্যে মধ্যে কিছুদিন তীর্থ স্থানে বা গুরুর আশ্রয়ে আসিয়া বাস করা। আলমোড়ার একজন সাধু, নাম নারায়ণ স্বামী (রুমা দেবীর বিশেষ পরিচিত ইহারা একত্রে খেলার নিকটে আশ্রম করিয়াছিলেন) গত কল্যই এখানে আসিয়াছেন, সাধুটী মহীশূর নিবাসী, মৌন আছেন এদিকে তাহার

অনেক শিষ্য আছে। রুমা দেবীর অনুরোধে তিনি এখানে আসিয়াছেন। সাধুটিকে দেখিয়া বেশ ভালই বোধ হইল। বেশ লম্বা, গায় কোন আবরণ নাই, পরণে এক টুকরা চট। মাকে প্রণাম করিলেন ও মার হাত হইতে ফল নিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মা তাহার হাতে ফল তুলিয়া দিলেন। আজই তাঁহারা (সঙ্গে ২টি সেবক) চলিয়া যাইতেছেন। নৌকার মধ্যেই গিয়া ভোর বেলা হইতেই বসিয়া আছেন। মাকে রাম মন্দিরে নিতেই মা বলিলেন "সাধু বাবাকেও ডাকিয়া নিয়া আইস।" তাহাই করা হইল। মাকে জরির কাজ করা আসনে বসিতে দিয়াছে। ফুলের মালা ফুলের বালা আনা হইয়াছে। মার হাতে ফুলের বালা পরাইয়া দিল। গলায় মালা দিতে যাইতেই মা হাত পাতিয়া মালা ছড়া নিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন এবং নারায়ণ স্বামীর গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন "আমি হাতে পরিয়াছি বাবা গলায় পরিবে।" তিনি হাত যোড় করিলেন। মা জরির আসনেও বসিলেনা না। স্বামীজির কাছে গিয়া বসিয়া বলিলেন "আমি বাবার কাছে বসিব, বাবার কোলে শুইব" এই বলিয়া তাহার কোলে শুইয়া পড়িলেন। মার এই সহজ সরল ব্যবহারে প্রথমে তাহার সঙ্কুচিত ভাব একটু হইলেও পরক্ষণেই তাহা চলিয়া গেল। মা তাহার কাছেই বসিয়া রহিলেন। মাকে যখন দুধ এবং ফল খাওয়াইতে নিল মা বলিলেন "আগে বাবাকে দিয়া নেও।" স্বামীজীকে কিছু কিছু উঠাইয়া দেওয়া হইলে পর মা গ্রহণ করিলেন। মার প্রত্যেক কাজটীই এইরূপ। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক তথায় থাকিয়া আমরা মাকে নিয়া চলিয়া আসিলাম। আজ বেলা প্রায় ১টায় স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গেই হরিরাম ও গোবিন্দ পাণ্ডেজী ও গুজরাটি ভদ্রলোকটি (শান্তির স্বামী) বিদায় লইলেন। যাইবার পূর্ব্বেই স্বামীজী মার হাত হইতে

ফল চাহিলেন মা তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। হরিরাম প্রভৃতি যাইবার সময় কাঁদিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া স্বামী যোগানন্দ মহারাজজীর শিষ্যা মঙ্গল গৌরবের চোখে জল আসিল শান্তিরও চোখে জল উপস্থিত, সকলেরই প্রায় ঐ ভাব। মা হাসিতেছেন। ইহা দেখিয়া মঙ্গল গৌরব মার হাত ধরিয়া বলিল, "একি মা তুমি হাসিতেছ আমাদের ত সকলের কান্না আসিতেছে" মা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেখত, যে হাসে তাহার জন্য কাঁদিতে হয় নাকি ?" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

১৮ই পৌষ সোমবার—

আজ রাত্রিতে মা অভয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, রাত্রি ১০॥ টায় আমি শুইবার কথা বলিলাম। কাল রাত্রি প্রায় ৩টায় শোওয়া হইয়াছে। শুইবার ভাবই নাই। আজকাল দিনে অথবা রাত্রিতে ৩।৪ ঘন্টা হয়ত একটু চুপ করিয়া শুইয়া থাকেন আর শুইবার ভাবই থাকেনা। আজও আমি বলিবার পরই বলিলেন "আমি একটু হাটিয়া আসি।" আমি ও অভয় সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। প্রথমে গিয়া তেঁতুল গাছের নীচে বসিলেন আমরাও বসিলাম। একাদশীর চন্দ্র, চারিদিকে জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। খানিক পরে মা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "তোরা এখানে থাক আমি একটু নর্ম্মদার তীরে হাঁটিয়া আসি" আমি বলিলাম "আমরাও আসি ?" মা বলিলেন "আমি ত নিষেধ করিতেছি।" আমি তেঁতুল তলায় বসিয়া রহিলাম অভয় বাধা মানিলনা সঙ্গে গেল। একটু দূরে গিয়াই মা বসিলেন, আমি বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি প্রায় ঘণ্টা খানেক এই ভাবে গেল। মা গায়ের কাপড় না

নিয়াই বাহির হইয়াছিলেন, আমি গায়ের কাপড় দিতে গিয়া দেখি মা মাথায় কাপড় দিয়া মাথা গুজিয়া বসিয়া আছেন। আমি মার আদেশ মত চলিয়া আসিয়া তেতুল তলায় বসিলাম! খোলাস্থানে মা বসিয়া আছেন দেখিতেছি। মা ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। আমি অভয় বসিয়া আছি। অভয় বলিতেছে "আমি মনে করিয়াছিলাম আমার সঙ্গে কথা বলিতে বুঝি যাইতেছে, ওঃ বাবা তারপর দেখি তা নয় কাহার সঙ্গে যেন কথা বার্ত্তা কহিল "এই বলিয়া হাসিতে লাগিল। খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর অভয় শুইতে চলিয়া গেল আমি বসিয়া আছি, জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা মা, যাহারা (অশরীরী) আসেন, আমাদের কাছে তুমি বসিয়া থাকিলে কি কিছু তাহাদের বাধা হয় ?" মা বলিলেন "বাধা কি? তবে অনেক সময় ত তোদের কাছেও বসিয়া থাকি। তবে হয় কি জানিস্? আমি হয়ত কখনও হাসি কখনও নানারকম অস্পষ্ট শব্দাদি বাহির হয় এই নানা রকম হয় বলিয়া কখনও কখনও খেয়াল হইলে দূরে একা চলিয়া যাই।" আজও হাসি অস্পষ্ট, শব্দাদি বাহির হইয়াছিল।—তাই অভয় যে মার ঐ ভাবের হাসি ও অস্পষ্ট কথা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছিল, তাহাও শুনিতেছিলাম। খানিকটা দূরেইত আমি বসিয়া দেখিতেছিলাম। মা বালুর চরের মধ্যে গিয়া বসিয়াছিলেন।

আজ বৈকালে পূর্ব্বকথা উঠিয়াছে তাহাতে কথায় কথায় মা বলিতেছেন "তোর দিদি বলিয়াছিল মা, তুমি আমাদের কাছে ছেলে মানুষের মত যেমন। শরীরটা ছাড়িয়া দাও, পুরুষদের কাছে হয়ত এমনটা পার না ?" তখন বলা হইয়াছিল—"স্ত্রীপুরুষ ছোট বড় ভেদ ত' তোমাদের কাছে, এ শরীরটার কাছে কোনই পার্থক্য নাই, সবই সমান!

কাজেই সকলের নিকটই এক ভাবেই ছোট্টমেয়ের মত থাকতে পারে। কিন্তু তোমাদের জন্যই আড়াল পরদা যেখানে যতটুকু থাকবার থেকেই যাচ্ছে।" আবার বলিতেছেন "সন্তান ভাব নিয়া আসিয়া মাতৃভাবেই পাইয়াছে ও পাইবে।" হাসিয়া বলিতেছেন, "শরীরটা যেন কি রকম কাট পাথর গোছের না ?" এই বলিয়া হাসিতে লাগিবেন। পরে আবার বলিতে-ছেন "তোর দিদি এই সব শুনিয়া বলিল মাগো, তোমার শরীরে আমাদের মত কোন জাগতিক বিকারের প্রকাশ হয় নাই কিনা, তাই হাত, পা, মাথা সর্ব্বাঙ্গই তোমার কাছে একই রকম।" অনেকেই অনেক সময় বলেন "মা আমাদের বহুভাগ্য যে আমরা এই শরীর স্পর্শ করিতে পারিতেছি।" আমাদের জিজ্ঞাসায় মা আবার একদিন বলিতেছেন "প্রথম দিক দিয়া ত শরীরের ভাসুরের সংসারেই সেবায় কাটিয়া গেল। পুলিসের চাকুরী যাওয়ায় ভোলানাথ তখন চাকুরীর চেষ্টায় ঢাকাতেই ছিলেন। ভোলানাথের বড় ভাইয়ের বহুমুত্রের ব্যারাম ছিল, তাই একবার চিকিৎসার জন্য এবং ক্বচিৎ কখনও দেখিবার জন্যও ভোলানাথ আসিতেন। তারপর বড় ভাই মারা যান তখন ভোলানাথ উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর পর আমাদের সকলকে দেশের বাড়ীতে রাখিয়া ভোলানাথ চাকুরীর চেষ্টায় গেলেন। অষ্টগ্রামে চাকুরী হইল, তথায়ই রহিয়া গেলেন। এই শরীরের প্রায় ৬মাস জায়ের নিকট দেশের বাড়ীতে কাটিয়া গেল। ভোলানাথের ভাতৃবধু ছোট ছোট ছেলে পিলেদের নিয়া দেশের বাড়ীতে থাকিলেন। পুরুষ কেহ ছিল না। ভোলানাথের কথার পরে বিদ্যাকূটে শরীরের বাপ মার নিকট যাওয়া হইল। সেখানেও অনেক দিন কাটীয়া গেল তারপর কিছুদিনের জন্য ভোলানাথ যখন চাকুরী-স্থলে অষ্টগ্রাম নিয়া গেলেন তখন অল্প দিন ভাল থাকিয়া এই শরীরের এমন অসুস্থতা দেখা যাইত যে প্রায়ই

ভোলানাথকেই পাক করিয়া এই শরীরটাকে খাওয়ান দাওয়ান করাইতে হইয়াছে। কয়েক মাস এইভাবে কাটিয়া গেল, অনেকে বলিত বেচারার আবার বিবাহ করা দরকার তারপর শরীর ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরিনামে শরীর কেমন হইয়া যাইতে আরম্ভ হইয়া গেল। ভোলানাথ বাজিতপুর বদলী হইলেন। তথায় পরিবার রাখার সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারায় আবার মা বাবার কাছে বিদ্যাকূট আসিয়া অনেকদিন কাটিয়া গেল। ঐ অষ্টগ্রাম হইতে ত কীর্ত্তনাদিতে শরীরের নানা ভাবের প্রকাশ আরম্ভ।—বিদ্যাকূট অনেকদিন থাকার পর ভোলানাথের দেশের বাড়ী আটপাড়া যাইয়া কয়েকদিন থাকিয়াই বাজিতপুর চলিয়া যাওয়া হয়।”

আবার আমাদের জিজ্ঞাসায় মা বলিতেছেন “প্রথম দিকটায় ভোলানাথ এই শরীরের ভাব গতিক দেখিয়া বলিতেন তোমার বয়স কম আরও একটু বয়স বেশী হইলে তোমার সব ভাব ঠিক হইয়া যাইবে। কাহারও একটু বেশী বয়সে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। ভোলানাথ সেই আশাতেই ছিলেন। কিন্তু একটু বয়স হইলেও যখন এই শরীরের ভাবের কোনই পরিবর্ত্তন দিখিতেছিলেন না তখনই ডাক্তার দেখাইবার কথা বলিয়াছিলেন।

ভোলানাথের আমার বিষয় একটা ঔৎসুক্য থাকিত ভাবিতেন কি ব্যাপার? তাই কোন সাধু সন্ন্যাসী আসিলে জিজ্ঞাসাও করিতেন। কারণ দেখিতেন ছোট মেয়ে অথচ ধর্ম্ম কথাও বেশ বলেন; এবং সত্য কথা স্বামীর সেবা ও প্রসাদ চরণামৃত নেওয়া এই সব ছোট বয়স হইতেই করিতেন। সেবা ও নিষ্ঠা দিতে নিখুত ভাবে দেখিয়া তিনি অনেক সময় মুগ্ধ থাকিতেন। ঐ সময়তে আবার বিবাহ করিবার ভাবনা জাগিবার

কারণ বোধহয় যে মার এই বাল-সুলভ সরল সত্য স্বভাবে সন্তানদের নিয়া পিতা সারাজীবন অপর বিবাহাদি না করিয়া সংযম ভাবে কাটাইয়া দেন ইহাও কতকটা সেই রকমই। কিভাবে কাহাকে নিয়া কি খেলা খেলিতে হয় মা তাহাই আমাদের দেখাইলেন মারত' আমাদের জন্যই এই সব খেলা। আবার একদিন কথায় কথায় বলিতেছিলেন "কোন কোন সময় এমনও হইয়া গিয়াছে ভোলানাথকে দেখা মাত্রই শরীর ভয়ানক ভাবে কাঁপিতে লাগিল। ইহা ভয়ে নয় কিন্তু। যেমন ম্যালেরিয়া জ্বরে কাপুনি ওঠে তার চেয়েও যেন কত বেশী। এই রূপ কাঁপিতে কাপিতে কখনও রং কালো কখনও হলদে, কখন ও সাদা ফ্যাকাসে হইয়া যাইতেছে। এই রূপ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া শরীর পড়িয়া রহিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল।"

আবার কোন কোন সময় এমনও হইত শরীরটা শুইয়া আছে ভোলানাথ শরীরটার কাছে বিছানায় বসিল বাস, শরীরের নিশ্বাসের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পূরক, রেচক, কুম্ভক ইত্যাদি হইয়া মৎস্যাসন এবং আরও অন্যান্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যৌগিক আসন, দৃষ্টির উৎকৃষ্ট প্রখরতা ইত্যাদি প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভোলানাথ কখনও ছেলেমানুষের মত ভয়ে অস্থির হইয়া কি করিয়া শরীর ঠিক করিবেন ভাবিয়া হাত পা ঘষা এবং আমি কি করিলাম আমি ত বসিয়াছিলাম, আহাঃ আমি কিসের মধ্যে কাহাকে নিয়া পড়িয়াছি, এই বলিয়া শরীর যাহাতে ঠিক হয় সেই ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিতেন, ভিতরে কি ভাব থাকে তাহা সব সময় নিজেরাত ধরিতে পারে না। আবার সময় সময় শরীরটা পড়িয়াই থাকিত ঘণ্টার পর ঘন্টা কাটিয়া যাইত। আবার দেখ শরীরটারত বয়স কম ছিল বাজিতপুরে একা বাসায় রাখিয়াই মফঃস্বল চলিয়া যাইতেন। যদি বলা হইত একা

বাসায় এই শরীরটা থাকিবে, কোন ব্যববস্থা করিলে না? লোকে তোমায় কি বল্‌বে? সে কথায় কান দিতেন না। কারণ ভোলানাথ এই শরীরটাকে নানা ভাবে দেখিয়াছে ত? তাই কোন আবশ্যকতাই বোধ করিতেন না।"

ভোলানাথ অনেক সময় বলিতেন "এই কিরকম? তোমার মত ভাবের মেয়ে মানুষ আছে বলিয়াত শুনি নাই।" পরে সাধন ভজনের খেলার দিকটা শরীরে দেখিতে লাগিল, আর সেবার ভাবগুলিও কিরকম করিয়া যেন চূড়ান্ত ভাবে ফুটিতে লাগিল। শরীরের মা বলিয়া দিয়াছিলেন পতি গুরু তাই শরীরের পতির সেবাও কি রকম করিয়া যেন বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল। গুরু যিনি তাঁর সঙ্গে ত মিথ্যা বা ঠাট্টা চাতুরী ইত্যাদি চলেই না। আর আসলেত এই শরীরের স্বভাবই ছিলনা মিথ্যা, চাতুরী, ঠাট্টা ইত্যাদির ব্যবহার। কাজেই সেবা ও আদেশ পালন কিরকম করিয়া যেন শরীরে ফুটিয়া গিয়াছে। ভোলানাথকে প্রথম তুমি বলিয়া সম্বোধন এই ভাবেই হয় যে ভগবানকেত তুমি বলা হয়। ভোলানাথ এই ভাব গুলি দেখিয়া অবাক (ও) হইতেন সন্তুষ্টও থাকিতেন।"

ভোলানাথ নিজের হাতে নানা ভাবে মাকে বাজাইয়া দেখিয়াছেন। ভোলানাথের সম্মুখেও এই সব কথা আলোচনা হইয়াছে এবং তিনি নিজের মুখেও এই সব কথা আমাদের কাছে বলিয়া গিয়াছেন।

ভোলানাথের জীবনও যে মায়ের কৃপায় কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মা ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। মাকে যে কত ভাবের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শীরা অনেকেই জানেন ও বলিয়াছেন। মার নিকট কিছু২ শুনিয়াছি ;মার কৃপায় ভোলানাথের

জীবনের সাধনার দিকটাও অতি চমৎকার ফুটিয়াছিল। তাঁহার জীবনের দিকটা বড়ই সুন্দর ও উন্নত হইয়াছিল তাহা দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

রাত্রি প্রায় ১১টায় আজ আমরা শয়ন করিলাম।

১৯ শে পৌষ মঙ্গলবার—

আজও বৈকালে ভোলানাথের কথা উঠিয়াছে। আমাদের জিজ্ঞাসায় মা বলিতেছেন "কি সব ভাবের ভিতর দিয়া এই শরীরটা চলিয়াছে তোরা ত তার অনেক কথাই জানিস্ না"। এই বলিয়া জাগতিক ভাবের প্রকাশটা কোন দিনই না পাওয়ায় মাঝে ২ ভোলানাথের কি রকম অবস্থাটা দেখা দিত, আর সেই সব ভাবের মধ্য দিয়াই মাকে আসিতে হইয়াছে ভাবিয়া অবাক হইতেছিলাম। কিন্তু মা হাসিতে ২ স্বাভাবিক ভাবেই বলিতেছিলেন "বাঃ এর মধ্যে অবাক হইবার কি আছে? এই শরীরের কাছে ত কিছুই ভয়ানক বলিয়া নাই। কারণ ইহাত জগতের অতি স্বাভাবিক ভাব। আমি শুধু দেখিয়া যাইতাম আর খেলাইয়া ২ ভোলানাথকে চালাইয়া নিয়া যাওয়া হইত। যেমন মা সন্তানকে ক্ষতিকর হইতে ভুলাইয়া রাখে।

একজন বলিতেছিলেন "মা ভোলানাথকে এইভাবে খেলাইয়াছ তা তাহার এই ভাবগুলি একেবারে স্থায়ীভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন না কেন?" ছুইবা মাত্রই যেমন ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত তাহা স্থায়ী হইত না কেন?" মা উত্তরে বলিয়াছিলেন "তাহা যে হইতে পারিত না তা নয়। কিন্তু এই সব রকম গুলিই যে তোমাদের দরকার ছিল তাই এই ভাবেই হইয়া গিয়াছে। এই শরীরের যা কিছু হইতেছে

তোমাদের ভাব, তোমাদের জন্যই, তোমরাই করাইয়া নিতেছ।" মা আবার বলিতেছেন ভোলানাথেরও কিছুই দোষ নাই।

এই শরীরের প্রথম খেলার দিকটা তাহার যে কি সুন্দর ভাবটা জাগিয়াছিল, পরে কাহারও কাহারও সাংসারিক ভাবের সহায়ক কথাবার্ত্তার ও সঙ্গগুণে তাহার সেই সুন্দর ভাবগুলি কোন কোন সময়ের জন্য একটু পরিবর্ত্তিত দেখা গিয়াছিল। এই অবস্থায় কখনও ছেলে মানুষের মত কান্নার ভাব অথচ আমি গায়ের কাছেই শুইয়া আছি, বসিয়া আছি, কিছুই বলিতে সাহস পাইতেছেন না। আবার কি রকম হইত জানিস? কীর্ত্তনের পর পাথরের মত এই দেহটাকে তোরা ভোলানাথের বিছানাতেই শোয়াইয়া দিয়া গিয়াছিস, শরীরের সেই একই অবস্থায় হয়ত রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। পরের দিন আসিয়া আবার হয়ত উঠাইয়াছিস্। ঐ অবস্থায় ছেলে মানুষকে নিয়া যেমন শুইয়া থাকে ঐ রকম ভাব নিয়া কোন দিন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আবার কখনও কাছে থাকিতেও ভয় পাইতেন। আবার কখনও শুইবামাত্রই এই দেহের প্রভাবে যে জাগতিক ভাব নিয়া শুইতে গেল, শুইবামাত্রই সেই ভাব ভোলানাথের একেবারেই নাই। শান্তভাবে শুইয়া রহিল। আবার কখনও কি রকম হইয়াছে জানিস্? যেমন বিদ্যুতের একটা ধাক্কা লাগে; সেই রকম ভাবে শুইবামাত্রই ছিটকাইয়া দূরে পড়িয়া গিয়াছেন।" মা কিন্তু আবার সেই সময় ধীর স্থির, শান্ত অটল ও গম্ভীর, বলিতেছেন কি সুন্দর তামাসা দেখা এই রকম কত ভাব যে গিয়াছে তার অন্ত নাই। "কখনও আবার এমনও হইয়াছে কাঠ পাথর বা গাছ পালা ছুঁইয়া যেমন তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ এই শরীরটারও জাগতিক ভাবের কোনই সাড়া না পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে। কখনও কখনও ভোলানাথকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য

ধূম কীর্ত্তন পূজা যজ্ঞ, ভোগ রাগের, মৌনের জপের সৃষ্টিতে সহায়তা করা হইয়াছে। তারপর আবার নানাস্থানে ঘুরিতে বাহির হওয়া হইল যেন এই সব ভাবের সাড়া কেহ না পায়। কারণ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া অনেকের এই ভাবের সহায়ক পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ফেলিতেন তাই তাহাদের সঙ্গ হইতে দূরে রাখা হইত। সিদ্ধেশ্বরীর একবার হঠাৎ অসুখ হইল, রাত্রিতে ভয়ানক পেটে ব্যথা। তারও কারণ এই-ই। পূর্ব্বে যে আমি ভোলানাথকে ঢাকায় রাখিয়া শরীরের যাবাকে নিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলাম যেই ফিরাইয়া আনিল তখন রাগে জ্ঞানহারা। তোরাও শুনিয়াছিস, কেবলি বলিত "ঘরের বউ করিব। আমি ছাড়িয়া দিব না। এই স্বভাব কিন্তু অন্য লোকদের সহানুভূতিতেই বেশী জাগিয়া ছিল। তারপর ত কিছুদিন তোদের কাহাকেও সিদ্ধেশ্বরীতে থাকিতে দিত না। আমাকে দিয়াই পাক করাইতে চেষ্টা করিত। শরীর অবশ তবুও আমার ত কথাই আছে বেশ আমি ত বলিতেছি যাহা পার করাইয়া নেও। একা একা বেশী সময়ই থাকা হইত তখন কাছে বসিয়া গৃহস্থালী ভাবের কথাই অনবরত বলিতেছে। এই শরীর তখন মৌন তাই দুঃখে রাগে আরও উত্তেজিত হইতেন। তারপর যখন একটু একটু কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম তখন একদিন সকাল বেলা এমন সব কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন যে কি বলব একদিন রাগের বশে বলিতেছেন যে তোমার দ্বারা ত আমার সারাজীবনই এই ভাবে কাটিল এখন আমি অন্য বিবাহ করিয়া আশ্রয় নিব কিনা দেখি।"

"রাত্রিতে আশ্রমের আসনের কাছেই বিছানায় বসিয়া বসিয়া এই সব কথাই বলিতেছেন, আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছেন। কত সব কলিতেছেন—আমি বলিলাম "দেখ এই আসনের ঘরে বসিয়া এই সব

সংসারী কথা ভাবাও অন্যায় আর তুমি মুখে উচ্চারণ করিতেছ ইহাতে আসনের অমর্য্যাদা করা হয়। এই কথা শুনিয়া আরও চটিয়া গিয়া এই শরীরকে যাহা মনে আসিল বলিতে লাগিলেন। সারাজীবন আমার এই ভাবেই কাটিল এই সব ব্যাপারে আমাকে ফাকিই দিলে ইত্যাদি ইত্যাদি সেই দিন রাত্রি হইতেই পেটে ভয়ানক ব্যথা আরম্ভ হইল। ভাল মানুষ খাইতে বসিয়াছেন হঠাৎ অসহ্য ব্যথা। সারারাত ছটফট করিলেন। দেখ এই সব ব্যাপারে কি হইল, না সেই আসন ঘরে আর থাকা হইল না। অন্য বাসায় যাইতে হইল। কত কি যে ঘটনা ঘটিয়াছে তোরা ত সে সব কিছুই জানিস্ না। আমি ত কিছুই বলিতাম না। কিন্তু উপস্থিত কর্ম্মের ফল গুলি কি করিয়া তখনই ভোগ হইয়া গেল।"

আবার কখনও ভোলানাথ বলিতেন "কেহ যদি পূর্ণস্থ হয় তবে সে সবই করিতে পারে। তোমার ত সারাজীবনেও এই ভাবের প্রকাশ পাইলাম না। সেই মহাশক্তিও পূর্ণ যে হয়, তাহার যদি কোন দিন কোন ভাব প্রকাশ নাও থাকে তবুও সেই মহাশক্তি ইচ্ছা মাত্রই সব করিতে পারে। পূর্ব্বকালের ঋষিমুনিদের উপমাও মধ্যে মধ্যে দিতেন।"

"আমি ত এখনও তোদের বলি, তোদের যাহা দরকার তাই শুধু এই শরীর দিয়া হইয়া গিয়াছে।" এই কথায় আমাদের মধ্যে কথা হইল যে ইহাই যদি অপূর্ণতার লক্ষণ হইয়া থাকে তবে ত মার মধ্যে অনেক অভাব আছে। যেমন মা কেন ইংরেজ হইলেন না। অথবা অপর অপর কত দেশ আছে সেই সব দেশের লোক হইলেন না। আবার বলা যায় মা ত পুরুষ হইলেন না। পশু পাখী কীট পতঙ্গ কিছুই হইলেন না। মা বাহিরের দিক হইতে বি, এ, এম. এ পাশ করিলেন না

ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক আছে। আবার ক্রোধ, হিংসা দ্বেষের ভাবও দেখা যায় না। এইরূপ বলিতে গেলে কত অপূর্ণতার ভাবই দেখা যায়। কিন্তু ইহাত কথা নয়। শরীর রূপে প্রকাশ হইলে তাহাতে সব কিছু এই ভাবে দেখা যাইতে পারে না। অথচ তাঁর পূর্ণতার ভিতর সবই আছে আবার কিছুই নাই। তাইত মা বললেন "তোমাদের যাহা দরকার তাহাই শুধু এই শরীরটার মধ্যে প্রকাশ হইয়া যাইতেছে।"

"আমার এ সব কথা কেহ যেন ভুল না বোঝেন। ইহার মধ্যে কোন রূপ ভাবই নাই। যাহা ঘটিয়াছে তাহাই প্রকাশ করা হইল মাত্র।" যেরূপ কোন ভাব হইলে মা কখনও এসব বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেও বলিতেন না। মা ত নিন্দা হিসাবে কখনও কিছু বলেন না। সত্য যাহা তাহাই বলিয়াছেন যাহা ঘটিয়াছে তাহাই শুধু লেখা হইল।

ভোলানাথের জীবনে প্রথম সাধারণ ও স্বাভাবিক ভাব ও তার এইরূপ পরিবর্ত্তনে আমরা মার লীলায় একটা বিশেষ কি দেখিতে পাই। নানা দিক প্রকাশ করিবেন বলিয়াই মা হয়ত এই খেলাটা আমাদের কাছে খেলিলেন। ভোলানাথের মধ্যে যে সুন্দর একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল তাহা তাহার নিজের কথাতেই প্রকাশ হইয়াছে। তিনি নিজেই কাহারও কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে মা তাঁহাকে নানা ভাবের ভিতর দিয়া এমন অবস্থায় নিয়া আসিয়াছেন যে এখন তাঁহার সেই জাতীয় জাগতিক ভাবের আর কথাই নাই। একেবারেই যেন নিবিয়া গিয়াছে। মার লীলার এই দিকটা না জানিলে অনেকের পক্ষে তাঁর সম্বন্ধে ধারণা সম্ভবপর নহে —হয়ত অপূর্ণ থাকিয়া যাইত সেই জন্য এই দিকটার যতটুকু শুনিলাম লিখিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিলাম। আর এক কথা এই যে ভোলানাথের ভিতর দিয়া এই

ভাবগুলি ঐরূপে প্রকাশ না পাইলে মার লীলায় এই দিকটা এত সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইত না। কাজেই মা সব সময়ই প্রায় বলেন সবই দরকার দোষ কাহাকেও দেওয়া চলে না। আমরা ভিতরের কথা পূর্ব্বে এতটা জানিতাম না সত্য কিন্তু ক্বচিৎ কখনও ভোলানাথের অগ্নিমূর্ত্তি নানারূপ বাক্যবলা এসব নিজেরাও দেখিয়াছি, ভিতরের কথা অনেক সময় উপরোক্ত কারণই হইবে। কিন্তু এই সব ভাবের মধ্যেও মা আমাদের স্থিরা ধীরা, অবিকৃত। জগতে এই ভাব অতুলনীয় সন্দেহ নাই। অথচ পতিকে ত্যাগ করিয়া ও যান নাই। এক বিছানাতেই অনেক দিন শুইয়াছেন গায়ের কাছেই রাখিয়াছেন, একেবারে নিশ্চিন্ত নির্ভয় নির্ব্বিকার। এখনও বলিতেছিলেন "কাহাকে কোথায় সরাইব জায়গা কোথায়? অন্য জায়গা বলিয়াত এই শরীরের কাছে কিছু নাই। আর কাহাকে সরাইব? সবই যে ঐ—ঐ। কি সুন্দর সব নানারূপ নানাভাব। আমি ত তোমাদের কাছে আছি। তোমরা যে ভাবে চালাইয়া নিতে পার নেও। বলিয়াছি ত এমনও হইয়াছে হয়ত ভোলানাথের এই জাতীয় ভাব বাহিরে কিছু প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু ভিতরে জাগিবামাত্রই এই শরীরের এমন একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে ভয় পাইয়া ভোলানাথের এই জাগতিক ভাবগুলি তখনই চলিয়া গিয়াছে। আবার একদিন ত তোদের ডাকিয়া ঘরে নিয়া এই শরীর ঠিক করিবার জন্য কীর্ত্তন করাইয়াছে। তোরা ত তখন জানিস নাই কি জন্য কি হইয়াছে।"

সত্যিই একদিনের ঘটনা আমার স্পষ্টই মনে আছে। শাহবাগে আমরা পুকুরের ধারে গোলঘরে শুইয়া আছি, মা ও ভোলানাথ রাস্তার ধারে গোল ঘরে শুইয়াছেন। হঠাৎ একদিন রাত্রিতে ভোলানাথ চীৎকার

করিয়া আমাদের ডাকিতেছেন। আমি বাবা ও কমলাকান্ত দোড়াইয়া মার ঘরে যাইয়া দেখি ,ভোলানাথ মার মাথাটি কোলে নিয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থায় বসিয়া আছেন, আমাদের দেখিয়া বলিলেন আপনারা শীঘ্র হরিনাম করুন মাকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন, "কই গো তুমি ঠিক হও।" দেখি যে মার সর্ব্বশরীরে কালো আভা পড়িয়া গিয়াছে। এখন বুঝিতেছি মা যেন ভোলানাথের বাসনাটুকু নিজ শরীরে গ্রহণ করিয়া কালো হইয়া গিয়াছিলেন। দেহ অসাড় নখ পর্য্যন্ত নীল হইয়া গিয়াছে। আমরাও দেখিয়া ভয়ে অস্থির, আমাদের কান্না আসিল। ভয়ানক আশঙ্কা জাগিল মা বুঝি দেহ ছাড়িয়া দিতেছেন ভোলানাথ তাড়াতাড়ি—আমার কোলে মাকে দিয়া নিজে সরিয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলেন। এখন বুঝিতেছি—ভোলানাথ হয়ত ভাবিলেন পাছে তাঁহার স্পর্শেও মার ক্ষতি হয় তাই মাকে আমার কোলে দিয়া নিজে সরিয়া বসিয়াছিলেন। এই রকম কত ভাবের খেলাই যে মার শরীরে হইয়া গিয়াছে দেখিয়াছি তাহার অন্ত নাই। লিখিবার ক্ষমতা কোথায় ? সমুদ্রের ঢেউ কে গুনিতে পারে। এই প্রসঙ্গে মা বলিতেছেন শরীরটা কি রকম হইত জানিস্ ? ভোলানাথ হয়ত কোন কথা বেশ ভাল ভাবে নিজের জনের কাছে যেমন বলিতে আসে এই ভাবে সংসারিক প্রসঙ্গ বলিতে আসিল, আর এই শরীরের নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি এমন দীর্ঘ ও কোন কোন সময় অতি দ্রুত, কীর্ত্তনে যেমন শীররটা ওলট পালট এলোমেলো হয় এইভাবে বাস্।" বলিয়া ছোট্ট একটি হাততালি দিলেন। আবার বলিতেছেন "কোন সময় আবার এই সময়তে যোগের ক্রিয়াদি এমন উৎকট ভাবে আরম্ভ হইল ভোলানাথ ত ভয়ে অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন আমি কি বলিলাম ? আমি কি করিলাম ? আমিত ভাল ভাবেই কথা বলিতেছি

তাহার ভিতর ও তোমার এই রকম ভাব, এই অবস্থা, আমি কি করিব? কোন কথাও কি তোমার সঙ্গে আমার বলার উপায় নাই? আবার কোন সময়তে ভোলানাথ কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই শরীরটা স্থির পাথরের মত হইয়া গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এই জাতীয় কত রকম যে হইয়াছে। পরে ভোলানাথ আধ্যাত্মিক আলোচনা ছাড়া সাংসারিক আর কোন প্রসঙ্গই এই শরীরের নিকট বড় করিতেন না। ভোলানাথ নিজেও একেবারে বদলাইয়া গেলেন। তোরা এই শরীরের গতিবিধি শুন্‌বি কিনা তাই ভোলানাথের আবার এইরূপ একটা দিকের প্রকাশ পূর্ব্বে মাঝে মাঝে বিশেষ করিয়া দেখা দিত। একটা কথা কিন্তু সত্যই বলিতে হইবে তিনি সাধারণ জীব ছিলেন না। আজকাল অনেকের ভিতর যেমন সব কথা শোনা যায়, এবং নিজেরাও শুধরাইবার জন্য আসিয়া বলে, সেই তুলনায় তুলাই কিছুই ছিল না। ভোলানাথকে বিশেষ সংযমী বলিতেই হইবে। এই শরীর ত দেখেছে, তাহার সর্ব্বদা ব্যবহারের ভিতর এই ভাবটা ছিল যেমন আমি ছোট্ট মেয়ে সেবা করে যাচ্ছি। কোন রকম বাচালতা ইত্যাদি একেবারেই ছিল না। ঐ সব ভাব দেখা গিয়াছে।

২০এ বুধবার—

আজ ভোরেই মা উঠিয়া অভয়কে বরখাল গ্রামে প্রভাস মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন, বলিয়া দিয়াছিলেন, "পারিস্‌ত ওখানে কিছুদিন থাকিস্‌" কিন্তু অভয় থাকিতে পারিল না খানিক পরেই আসিয়া হাজির হইল। অভয়কে যে পাঠাইলেন তাহাও কেহ জানিল না শুধু আমি উঠিয়াছিলাম তাই দেখিলাম। মা অভয়কে নিয়া খানিক দূরে পৌছাইয়া দিলেন। পরে অভয়কে কোথায় পাঠাইলেন তাহা বলিলেন না। অভয় ফিরিয়া আসিলে

জানিতে পারিলাম তাহাকে একান্তে সাধন ভজন করিবার চেষ্টা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। মা যাহার কথা তাহার কাছেই বলেন ইহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

দুপুরে মা আমাকে "বলিলেন বরখাল যাইব, জিনিষ পত্র এখানেই থাক কম্বল কাঁধে ফেলিয়া থলির মধ্যে সামান্য কিছু নিয়া চল্।" মার গলার একধার ঠাণ্ডা লাগিয়াই হউক বা অন্য কারণে হউক, ফুলিয়া উঠিয়াছে। জ্বর জ্বর ভাব। প্রভাস যাইতে প্রায় দেড় মাইল হাঁটিয়া যাইতে হইবে। অনেকেই বাধা দিলেন কিন্তু মা বলিয়াছেন 'খেয়াল হইয়াছে যাই।' সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমরা রওনা হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে যোগানন্দ স্বামীজীর শিষ্যা দুইটিও চলিলেন এবং রাম মন্দিরের ব্রহ্মচারী বাবার শিষ্য চূনীলালও আসিলেন। আসিয়া দেখি এস্থান আরও নির্জ্জন চারিদিকে অশ্বত্থ ও বেল গাছ, অন্যান্য গাছও আছে। একটি শিব মন্দির, বেশ সুন্দর, মন্দিরটি, শিবলিঙ্গ, বৃষ সবই সুন্দর, মন্দিরে মার্ব্বেল পাথর বসান। মন্দিরের দুই দিকে দুইটা লম্বা ঘর, টিনের চাল, মাটির ভিটি; সাধু এবং যাত্রীদের থাকিবার আরও ছোট ছোট ২।১টী মন্দির এই মন্দির সংলগ্নই আছে। এ ছাড়া আর কিছুই নাই। একটা বড় অশ্বত্থ গাছের ওলাটা বাঁধান। জ্যোৎস্না রাত্রি, আমাদের পৌছাইয়া দিয়া এই স্থানে যতটা বন্দোবস্ত হইতে পারে করিয়া দিয়া ব্যাসের সঙ্গীরা চলিয়া গেলেন। এখানে ২।১টী সাধু আছেন। একটি সাধুর এক শিষ্যা সঙ্গে আছেন। মা আসিয়া খানিক সময় শুইয়া রহিলেন। রাত্রি প্রায় ৯ টায় উঠিয়া বাহির হইলেন। সঙ্গে আমি ও শিশির এবং গুজরাটি মেয়ে শান্তি আসিয়াছিল, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইলাম বাঁধান বটবৃক্ষ তলে গিয়া মা বসিলেন। একটি সাধু ও তাহার চেলাটি

ও আসিয়া বসিল। শুনিলাম প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নাকি অমর পুরীর ন্যাংটা স্বামী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সন্ন্যাসী দুইটী তাঁহারই সম্প্রদায়ের। সম্মুখে বালুচর তার পরই নর্ম্মদা প্রবাহিতা। নর্ম্মদা নিকটে নয়, তবে চারিদিক খোলা। কাজেই নর্ম্মদা বেশ দেখা যায়। দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না। এই অসুস্থ শরীর নিয়া হাঁটিয়া এতটা পথ মা সন্ধ্যাবেলায় কেন আসিলেন কে জানে! রাত্রি প্রায় ১০টায় আমরা ঘরে আসিলাম। রাত্রিতে শুইয়া মা বলিতেছেন "সেদিন ব্যাসে এই স্থানটা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছিল, মন্দির উঠিবার পূর্ব্বে যে স্থানটা ছিল সেই স্থান। তাই দেখিতে আসিলাম।" এই স্থান সম্বন্ধে দু-একটি প্রশ্ন করিলাম। কিন্তু আর কিছু জবাব পাইলাম না।

২১শে বৃহস্পতিবার—

আজ একটু বেলায় উঠিয়াছেন। উঠিয়া হাঁটিতে বাহির হইলেন। গাছের তলায় তলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক বেল গাছ তলায় গিয়া বসিলেন। আমি শিশিরকে একটু কাজে অন্যত্র পাঠাইয়া মার মুখ ধুইবার জল নিতে উপরে আসিয়াছি, মাকে ওখানেই রাখিয়া আসিয়াছি, ফিরিয়া গিয়া দেখি মা তথায় নাই। একটু চিন্তা হইল, কারণ মার ত কিছুই বিশ্বাস নাই, এজন্য আমরা সর্ব্বদাই একটু শশঙ্কিত থাকিতাম। ঢাকায় অনেক সময় এজন্য মা যখন একা ঘরে শুইতেন ভোলানাথ বাহিরের দিক হইতে শিকল লাগাইয়া বারান্দায় কমলাকান্তকে শোয়াইতেন। এমন স্বাভাবিক ভাবে উঠিয়া হয়ত কতদূর চলিয়া যাইতেন দেখা হইলে ভাবটা এমন যেন কিছুই করেন নাই। ঘরের ভিতরই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন অথচ আমরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়ত ভয়ানক ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি।

আজও চারিদিক চাহিয়া দেখি মা বালুর চরে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। আমি জলের ঘটি ইত্যাদি বেল গাছ তলায় রাখিয়া মার কাছে ছুটিয়া গিয়া দেখি কে যেন পায়খানা করিয়া গিয়াছে আর সেই ময়লার সন্মুখেই মা বসিয়া আছেন, হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন "বসিয়া আছি ময়লার গন্ধও পাইতেছি কিন্তু গায়ের কাছেই যে ময়লা সে খেয়ালই হয় না, প্রায় ১০ মিনিট পরে দেখি এখানেই ময়লা। দেখত, ময়লার উপরেই বসিয়া আছি নাকি?" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি দেখি চারিদিকেই ময়লা মাকে উঠিবার জন্যে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। মা হাসিতেছেন "আর বলিতেছেন যখন বসিয়া পড়িয়াছি একটু বসি।" খানিক পরে মা উঠিলেন। অভয় ও দেবীজী ব্যাস হইতে আসিয়াছে। মার শরীর খারাপ, জ্বর আছে, গলার ধারের ফুলাটাও বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজও রাত্রিতে মা মন্দিরের পাশে একটা গাছ তলায় গিয়া বসিলেন। আমরা কয়েকজন পাশে বসিয়া আছি। আজও রাত্রি প্রায় দশটায় আমরা ঘরে গেলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি, নির্জ্জন স্থান, মার সঙ্গে আজও বড়ই আনন্দ উপভোগ করিলাম।

২২শে পৌষ শুক্রবার—

আজও মার শরীরের একই অবস্থা। রাম মন্দিরের ব্রহ্মচারীবাবা ঔষধ পত্র দেন, তিনি মার অসুখ শুনিয়া যোগানন্দ স্বামীর আশ্রমে আসিয়াছিলেন কিন্তু মা শুইয়াছিলেন তাই দেখা হয় নাই। আজও তাহার শিষ্য চুনীলাল শেঠের হাতে তিনি লাগাইবার ঔষধ পাঠাইয়া দিয়াছেন। মা বলিলেন "রাখিয়া দাও দরকার হইলে লাগাইবে।" বৈকালে

প্রায় পাঁচটায় মা আবার ব্যাসে ফিরিলেন। সাধন ব্রহ্মচারীকে প্রভাস রাখিয়া আসা হইল। নর্ম্মদার তীরবর্ত্তী এ সবই তপোভূমি। সাধন একান্তে সাধন ভজন করিতে চায় তাই তাহাকে রাখিয়া আসা হইল। যোগানন্দ স্বামীজীর আশ্রমে ঢুকিবার পূর্ব্বেই মা রাম মন্দিরে গেলেন। মন্দিরের অতি নিকটেই উক্ত স্বামীজীর আশ্রম। রাম মন্দিরে ব্রহ্মচারী বাবা এবং মোহন্তজী মাকে দেখিয়া আসন দিলেন এবং মার গলার ফুলাটা দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, দেখিয়াই মা বলিলেন "এখন থাক যদি বাড়ে তবে ত বাবা আছেই যদি ঔষধ খাই ত বাবার নিকট হইতেই ঔষধ নিব। বাবার যে মেয়েটাকে সুস্থ করিবার জন্য ঔষধ দিবার ভাব জাগিয়াছে ইহাতেও ভাল হইয়া যাইতে পারি। দেখা যাক কি হয়।" এই সব দুই চার কথাবার্ত্তার পর মা উঠিলেন। ব্যাসের যে কয়জন আছেন প্রায় সকলেই মাকে দেখিয়া মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন এবং মার পুনরাগমনে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

২৩শে পৌষ শনিবার—

আজ মার গলার ধারের ফুলাটা এবং জ্বরের ভাব অনেকটা কম। আহমেদাবাদের ল কলেজের প্রিন্সিপাল মুকুন্দঠাকুর মহাশয় সস্ত্রীক মার দর্শনে আসিয়াছেন। কাল প্রভাসও গিয়াছিলেন। আজ তিনি চলিয়া যাইবেন। বেশ ভক্ত প্রাণ। কাল রাত্রিতে কীর্ত্তনের সময় মা অনেকক্ষণ নাম করাইয়াছেন। পরে দু-একটি গান করিয়াছেন। আজ সকাল বেলাই তাঁহারা সকলে মাকে নিয়া বসিলেন। দুই চারটি কথাবার্ত্তা হইল। আজ বেলা প্রায় সাড়ে দশটার

মা আহার করিলেন। অভয়ের সঙ্গে কথায় কথায় মা বলিতেছেন "সত্যি শরীরটা যেন কেমন ছাড়া ছাড়া হইয়াছে।" অভয়ও হাসিয়া বলিল "আপনি বৃদ্ধা হইয়া যাইতেছেন কিনা তাই কানেও কম শোনেন আর স্মরণ শক্তিও নাই" মাও হাসিয়া বলিলেন "সত্যি খুকুনী বাম কানে একটু কম কম শুনি নাকি? আর তোদের দৃষ্টিতে স্মরণ শক্তির আরও অভাব প্রকাশ পাইবে নাকি?" অভয় বলিল "তাহলে ত সর্ব্বনাশ দেখিতেছি।" এই সব কথাবার্ত্তার পর খাওয়া দাওয়ার পর শুইবার ঘরে আসিয়াছেন, হাঁটিতেছেন এবং কি কথায় বলিতেছেন "শরীরটা ছাড়া ছাড়া হইতে হইতে একেবারে শেষ", এই বলিয়াই একটা তুড়ি দিয়াই অন্যমনস্ক ভাবে যেমন অশরীরীদের সঙ্গে কথা হয় বা ভবিষ্যত কথা হয় সেই ভাবে কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়াই বলিতেছেন "তাড়াতাড়ি" আবার হাসিয়া বলিতেছেন "তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া নাও সময় ত চলিয়া যায়।" আমি ও অভয় ঘরে ছিলাম আমি বলিলাম, "এসব কি বলিতেছ?" বলিলেন "দেখ তোদের কত বকি রাগ করিস্ না তোদের না বলিলে আর কাকে বলব?" এই বলিতে বলিতে হাসিতে হাসিতে একটু ছল ছল চোখ হইল। আমার উপরোক্ত কথাবার্ত্তায় চোখে জল ভরিয়া যাইতেই মা বলিতেছেন "এ আবার কি? চোখের জল কেন? আমি কি মন্দ বলিলাম নাকি?" আমি চোখের জল মুছিতেছি, মা বলিলেন "তবে আমিও একটু চোখের জল ফেলি?" এই বলিতে বলিতেই আমি বাধা দিয়া বলিলাম "না না তোমার চোখের জল ফেলিতে হইবে না।" মা বলিলেন "তবে চোখ মুছিয়া ফেল, জল দিয়া ধুইয়া আস। এর মধ্যে অভয় বলিল "আচ্ছা মা আপনি একটু কাঁদেন না দেখি।" আমি একটু বাধা দিলাম কিন্তু অভয়ের বিশেষ আগ্রহে মা প্রথমে হাসি হাসি মুখে

কাঁদিবার পূর্ব্বাভাস করিতে লাগিলেন আর বলিতেছেন "আও ভাই আও" এই বলিতে বলিতে হঠাৎ শুইয়া পড়িয়া ভয়ানক কান্না, আমি গায় হাত বুলাইতে লাগিলাম অভয় বসিয়া বসিয়া দেখিতেছে, খানিক পরে মার শরীর কান্নায় এলাইয়া পড়িল ভয়ানক কাঁদিতেছেন, কিছু পরে উঠিয়া বসিলেন, তখন চোখ লাল, নাকের অগ্রভাগ লাল, অভয় হাসিয়া বলিল "বাঃ বাঃ কত কাণ্ডই না দেখালেন।" মাও হাসিলেন কিন্তু কান্নার ভাবটা ভিতরে থাকায় বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া শ্বাস উঠিতেছে। আরও কিছু সময় কাটিয়া গেল। অভয় বলিতেছে "আচ্ছা আমরা ৩ জনে (শান্তিও ঘরে ছিল) যদি এই সঙ্গে কাঁদিতে বসিয়া যাই তবে কেমন হয় লোকে কি ভাবে?" বলিলেন, "আয় ভগবানের জন্য কাঁদি, দরজা সব বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া বস।" এবার দেবীজীও আসিয়াছে, আমরা চার জনে মার কাছে বসিয়া রহিলাম, ঘর অন্ধকার করিয়া দেওয়া হইল। মা দুলিয়া দুলিয়া আরম্ভ করিলেন "হরিবোল হরিবোল" একই সুরে বলিতে বলিতে মার কান্নার ভাব আবার আসিল তারপর ভয়ানক শ্বাস চলিতে লাগিল। শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ক্রিয়া হইতে লাগিল। পরে শুইয়া পড়িলেন। দু'টী এতদ্দেশীয় যুবক তিন মাইল দূরবর্ত্তি বুরবজ নামক স্থান হইতে মায়ের নাম শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছে, তাহারা মার নিকট বসিয়া আছে। মা অনেকক্ষণ পর তাহাদের সঙ্গে দু-চারটী কথা বলিলেন। তারপর আবার চোখ বুজিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে উঠিয়া বসিলেন।

রাত্রি দশটার পর সকলে শুইতে চলিয়া গেলে আমি মার কাছে বসিয়া আছি নানা কথা হইতেছে কথায় কথায় উঠিল ঢাকা অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে (সিদ্ধেশ্বরী) স্বামী নিগমানন্দ আসিয়াছিলেন, অশ্বিনীবাবুর বৌ তাঁহার শিষ্যা, তিনি মারও ভক্ত তাই মাকে ও গুরুকে একত্রে

মিলাইবার জন্য নিয়া গেলেন কিন্তু মা গিয়া বসিয়া আছেন, অনেক পর স্বামীজী বাহির হইলেন, মা মাটিতেই গিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। স্বামীজী আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। কথাবার্ত্তা অতি সামান্যই হইল। মায়ের সঙ্গের ভক্তেরা এই ব্যবহারে বড়ই মনক্ষুন্ন হইলেন। কিন্তু মার কোন ভাবান্তর নাই। তিনি বলিতেছেন "বাবা ত উপরেই বসে তাহাতে কি হইয়াছে ?" কিন্তু হৃষিকেশে স্বামী পূর্ণানন্দজীর আশ্রমে মা গেলেই অনেক সময় অসুস্থ শরীর নিয়াই তিনি নীচে নামিয়া আসিতেন। মাকে আহার করিতে বলিলে মা আহারে না বসা পর্য্যন্ত তিনি আহার করিতেন না। হয়ত এক একদিন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে তাহার অসুস্থ শরীর কিন্তু তিনি কখনও মাকে আহারে না বসাইয়া আহারে বসিতেন না। মাকে আহারে বসাইয়া নিজে ও পাশেই বসিতেন আহার করিতে। একটা ভুল পূর্ব্বে লিখিয়াছি স্বামীজী নিজের হাতে মাকে কত রকম রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছেন একথা ঠিক নয় আমার শুনিবার ভুল আজ শুনিলাম স্বামীজী নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অন্যকে দিয়া রাঁধাইয়া মাকে খাওয়াইয়াছেন। আজও কতগুলি বিশেষ বিশেষ কথা উঠিল মারও শুইবার ভাব নাই, রাত্রি প্রায় একটায় শোওয়া হইল। স্বামীজী মাকে খুবই আদর করিতেন।

২৪শে পৌষ রবিবার—

অভয় সেদিন কথায় কথায় মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "আচ্ছা মা আপনার কাছে যে সূক্ষ্ম শরীরীগণ আসেন তাহারা কি আমাদের সম্বন্ধেও কিছু বলেন ?" মা বলিলেন "বিশেষ নয়, তবে কখনও বলে না তা নয়, কখন ও হাত দিয়া দেখাইয়া পর্যন্ত যায় এই লোক।" আজও বেলা প্রায়

৮ টায় মা উঠিয়া বসিয়াছেন, অভয় পুরান কথা শুনিতে চাহিতেছে। কথায় কথায় উঠিল বাজিতপুরের জ্ঞানচন্দ্র দে মহাশয়ের কথা। ইনি বাজিতপুরেই চাকুরী করিতেন। ভোলানাথের সঙ্গে শালা ভগ্নিপতির মত ঠাট্টা তামাসা চলিত, তাস পাশা খেলাও চলিত। শেষে একদিন হঠাৎ জ্ঞান দে ভোলানাথকে বলিলেন "আমার ত ছোট বেলা হইতেই মা নাই, আমি আপনার স্ত্রীকে মা ডাকিব, এত দিন ত বোন বলেছি এখন আর ঠাট্টা করিতে পারিবেন না।" মা কাহার সম্মুখে বাহির হইতেন না কিন্তু এর পর হইতে ভোলানাথ কখনও কখনও জ্ঞান বাবুকে ডাকিয়া ঘরের ভিতর নিয়া আসিতেন কিন্তু মা নিয়ম মত ঘোমটা দিয়াই থাকিতেন। জ্ঞানবাবুর সন্তান না হওয়ায় পিতা পুত্রকে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করাইতে ইচ্ছুক, কিন্তু জ্ঞানবাবুর তাহাতে ঘোর আপত্তি অথচ পিতাকে বাধা দিবার মত সাহস তাঁহার নাই। সাধুর নিকট হইতে কবচ নিবার কথা হইল, এর মধ্যে একদিন জ্ঞানবাবু ভোলানাথকে গিয়া বলিলেন "আমি আর কোথাও যাইব না, মা যখন নিজের কাজ করিয়া উঠিবেন সেই সময়তে আমি মার পা স্পর্শ করিয়া একবার প্রণাম করিব এবং আমার যাহা বলিবার মনে মনে বলিব।" ভোলানাথ একদিন তাহার প্রণামের সুযোগ করিয়া দিলেন। তিনি পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেই কেমন যেন একটা ভাবে একেবারে এলাইয়া পড়িলেন, মা যেন কিছুই হয় নাই, এই ভাবে দাড়াইয়া আছেন, ভোলানাথ মহাব্যস্ত হইয়া মাকে বলিতেছেন "একি হইল শীঘ্র ইহাকে ঠিক কর, পুনঃ পুনঃ বলার পর জ্ঞানবাবু উঠিয়া বসিলেন। চোখ মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পরে ভোলানাথের কাছে বলিয়াছে "আমার যেন কি হইয়া গিয়াছিল কি রকম যেন একটা আনন্দ এখনও বোধ করছি আমি

যাহা বলিতে আসিয়াছিলাম কিছুই বলা হইল না।" ভোলানাথ বলিল কি বলিতে আসিয়াছিলে? তখন বলিল "সন্তাত কামনা করিতে আসিয়াছি।" মা হাসিয়া বলিলেন "এক বছরের মধ্যেই হইবে", তাহাই হইয়াছিল।

২৫শে পৌষ সোমবার—

আজ বিশেষ কোন ঘটনা নাই। মার ভাবটা কয়দিন যাবৎই একটু চুপচাপ দেখা যাইতেছে। আজও তেমনই আছে।

২৬শে পৌষ মঙ্গলবার—

আজ বৈকালে আমরা মার সঙ্গে গিয়া তেঁতুল গাছ তলায় বসিয়াছি। কথায় কথায় মা বলিলেন "বাজিতপুরে এক ভদ্র লোকের স্ত্রী (নাম বলিলেন না) আমাকে ভালবাসিত আমি ও অভিভাবকের মত তাহার কাছে সব কথা বলা বা জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করা এই রকম ব্যবহার করিতাম। বেশ খোলা ভাবই চলিত। একবার হইল কি, বৎসরান্তে নবাব-ষ্টেটের কর্ম্মচারীরা কি বাবদ কিছু টাকা পায় স্ত্রীলোকদের তাহা জানা থাকে, সেই মাহিনা ছাড়া বেশী টাকাটা দিয়া তাহারা কেহ কেহ গহনা ইত্যাদি করে; এ শরীর এসব কিছুই খেয়াল রাখিত না জানিবার দরকারই বা কি? আমি আছি রান্না বান্না করি আর তখন ক্রিয়াদিও আরম্ভ হইয়াছিল এই সব নিয়া আছি। হইল কি, আমি ঐ স্ত্রীলোকটির বাড়ীতে গিয়াছি তিনি বলিলেন, "কি, এবারকার টাকা দিয়া গহনা কি গড়াইবেন? আমি বলিলাম, "আমি ত কিছু এ বিষয় বলিতে পারি না, কিসের টাকা পাইবে? তিনি সে কথা একেবারেই বিশ্বাস করিলেন না। ভাবিলেন আমি গোপন করিয়া এত মিশামিশির মধ্যেও এই কথা গোপন

করিতেছি বিশ্বাসটা তাহাকে একেবারে বদলাইয়া দিল। সে বলিল ইহা কি কখনও হইতে পারে, আপনি জানেন না আমার নিকট গোপন করিতেছেন, তাহার এই মিথ্যার উপর দৃঢ় বিশ্বাসে আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম আমি তাহাকে দু' তিনবার বুঝাইতে গেলাম। কিন্তু সে উপেক্ষা ভাবে চুপ করিয়া গেল। আমি বাসায় আসিয়া ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভোলানাথ বলিল, "হঁা কিছু পাইব তাহা দোকানে বাকী শোধ করিতেই যাইবে?" আমি তাহাকে ঘটনা বলিলাম। পরে আর ও একদিন আমি উক্ত স্ত্রীলোকটিকে যাইয়া বলিলাম আমি জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া জানিলাম কিছু কিছু টাকা পাইবে, আমি এ বিষয় পূর্ব্বে কিছু জানিতাম না। দেখিলাম তাহার ভাবটা এই রকম যেন আমি একটা মিথ্যা বলিতেছি। আমার সঙ্গে তাহার খোলা ব্যবহারই চলিয়া গেল। আমি আর কি করিব। এরপর দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বাড়ী গেল। ছুটীর পর তাহার স্বামী আসিল কিন্তু সে আসিল না শুনিলাম প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়া দেবীর কি এক ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে তাই নিয়া আসিতে পারে নাই। তখন এই শরীরটার মধ্যে পূজা আসন ইত্যাদির ক্রিয়া গুলি খুব চলিতেছে তাই তাহার স্বামী ভাবিল এখানে বলিলে বোধহয় কিছু উপকার হইবে। সে আসিয়া একদিন স্ত্রী যাহাতে ভাল হয় তাহার জন্য অনেক বলিল।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারপর কি হইল?" মা বলিলেন "কি রকম করিয়া জানি শেষে ভাল হইয়া উঠিল।" মাও হাসি হাসি মুখে বলিলেন আমরাও হাসিতে লাগিলাম। ছোট খাট কত ঘটনার মধ্যেও যে কত কথা রহিয়া গিয়াছে তাহার অনেকেই হয়ত আমাদের অজানা রহিয়া গিয়াছে। এ ঘটনাও ইতি পূর্ব্বে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

২৭শে পৌষ বুধবার—

আজ প্রাতে মার হাতের নখ কাটিয়া দিতেছি। মার বাম হাতের তিনটা নখ খারাপ, প্রথম ডান হাতেরই ছিল খারাপ, শেষে একদিন মার ইচ্ছাতেই ডান হাতের নখ ভাল হইয়া বাম হাতের নখ গুলি খারাপ হইয়া গেল। আজ বলিতেছেন "এই বৃদ্ধাঙ্গুলিটি একেবারে ভাল হইয়া গিয়াছিল একবার ভোলানাথের কলেরার মত হয়, তখন ভাব হইল নখটা খারাপ হউক অমনি নখটা খারাপ হইতে লাগিল, ভোলানাথ ভাল হইয়া উঠিল।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। এই নখ খারাপের ঘটনা ও, বধূজীবনে অবিচারে প্রাণ দিয়া সকলের সেবা, সে সব কথা বিস্তারিত ভাবে এখন না লিখাই ভাল। আজও মার শরীরটা ভাল নয়। বৈকালের দিক দিয়া মা শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা উঠিলে আমরা নর্ম্মদার তীরে মার সঙ্গে গিয়া বসিলাম। একটি বৃদ্ধ সাধু তথায় একা বসিয়াছিলেন মা গিয়া তথায় বসিলেন, আমি শিশির ও শান্তি মার চারিদিকে বসিলাম। এই বৃদ্ধ সাধুটি দুদিন মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, ইনি দণ্ডী সন্ন্যাসী, এখানে একটি ধর্ম্মশালা আছে তথায় দণ্ডী ও পরমহংস সাধুদের থাকিবার আলাদা স্থান আছে ইনি সেখানেই আছেন। দণ্ডী সাধুরা যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারেন না। শুনিয়াছি এই সাধুটি বেশ বিদ্বান ও সাধক। বেশ শান্ত চেহারা। মা বসিয়া হিন্দিতে বলিলেন "পিতাজি মন স্থির হইবার উপায় কি?" তিনি বলিলেন "আপনাকে আমি কি বলিতে পারি? আপনি ত পূর্ণ হইয়া বসিয়া আছেন।" তখন আমরা বলিলাম "আমাদের জন্য বলুন।" তখন বৃদ্ধ কয়েকটি কথা বলিল তার মূল এই যে সদাচারই প্রথম সাধনা শুধু বাহিরে নয়, বাহিরে ভিতরে সদাচার পালন করা দরকার। নিত্য নিয়মিত আচার বিচার গুলি করিতে

করিতে মনের চঞ্চলতা কমিয়া আসে, ঘোড়ায় চড়িবই না পাছে ফেলিয়া দেয়, একথা ঠিক নয়, ঘোড়ায় চড়িব এবং তাহার রাশ হাতে রাখিয়া তাহাকে ঠিক ভাবে চালাইব। এই ভাবটা রাখা দরকার। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলেই মন বশে আসে ইহাই গীতায় ভগবান বলিয়া গিয়াছেন। অভয়ের কি কথা মা বলিতেই সাধুটি বলিলেন "উহাদের চিন্তা কি? উহারা আপনার সঙ্গ পাইয়াছে। এইরূপ সঙ্গ দুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ শাস্ত্রে বলিয়া গিয়াছে। দুর্লভ অর্থাৎ পাওয়া মুস্কিল, অনেক ভাগ্যের ফলে পাওয়া যায়। অগম্য অর্থাৎ কিনা বুদ্ধি ধরিতে পারে না তাই পুনঃ পুনঃ সংশয় সন্দেহ আসে, আর অমোঘ কিনা এই সঙ্গ-ফল কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। আমিও কাহারও নিকট বড় যাই না কিন্তু আপনার মুর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিয়াছি আপনি আকর্ষণ করিয়া কাছে আনেন। গত বছর কর্ণালীতে আপনি আসিয়াছিলেন আমিও এই দিকেই ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকি কিন্তু সে সময় আমি কর্ণালীতে ছিলাম না বোধহয় আমার দর্শনের সময় হয় নাই এবার সংযোগ হইয়া গেল। আমার আজ ভাগ্য যে আপনার নিকট নর্ম্মদার তীরে বসিয়া থাকিতে পারিলাম। আমি এসব শাস্ত্রের কথা বড় কাহাকেও বলিনা আপনি অনুমতি করিয়াছেন বলিয়া বলিলাম। এ সব কথায় কি হইবে? অন্তরে অনুভব চাই। এই বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিলেন। সন্ধ্যার সময় নর্ম্মদার তীরে বিস্তৃত বালুর চরে আমরা কয়েক জন বসে আছি। চারিদিক নিরব নিস্তব্ধ। অমরা সকলেই খানিক সময় চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম। তারপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে চলিলাম। নর্ম্মদার তীর হইতে অনেকটা বালুর চর ভাঙ্গিয়া আশ্রমে যাইতে হয়। আশ্রমে আসিয়া কীর্ত্তন হইল। মা ত নাম করাইলেন। রাত্রি প্রায়

দশটায় সকলে বিশ্রাম করিতে গেলাম। মা শুইয়া পড়িলেন। মার শুইবার ভাবটা কিছুদিন যাবৎ খুবই কমিয়া গিয়াছে। প্রায়রাত্রিতে শোওয়া প্রায় হয়ই না। চুপচাপ উঠিয়া বসিয়া থাকেন। দিনেও শুইবার ভাব নাই। তবে আমাদের কথায় খানিক সময় চুপ করিয়া শুইয়া থাকেন।

২৮ শে পৌষ বৃহস্পতিবার—

আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা মার সঙ্গে নর্ম্মদার তীরে গিয়া বসিয়া আছি। মা বলিলেন "সকলে চুপ করিয়া খানিক সময় বসিয়া থাক দেখি।" তখন সন্ধ্যা হয় হয় আমরা মার কাছে স্থির ভাবে বসিয়া রহিলাম। বেশ একটা শান্ত আনন্দের ভাব প্রাণে জাগিতেছিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে এবং একটু ঠাণ্ডাও পড়িতেছে দেখিয়া মা বলিলেন "চল এখন যাওয়া যাক্।" আমরা উঠিয়া মার পিছনে পিছনে ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে চলিলাম।

আজও কীর্ত্তনের সময় মা তুএকটি গান ধরিলেন। নামও একটু করিলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে নাম করিলাম। আজ হইতে নিয়ম হইল রাত্রি ৩টায় উঠিয়া ৬টা পর্য্যন্ত মার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া মনে মনে জপ ধ্যান যাহার যাহা ভাল লাগে করিব। যদি কাহারও ইচ্ছা না হয় সে বসিবে না। এখানে সাতটায় সূর্য্যোদয়।

২৯শে শুক্রবার—

রাত্রি ৩টায় আমরা সকলে উঠিয়া বসিয়াছিলাম ৬টা হইতে মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সাতটা বাজিল, মা ও অভয় একটু নর্ম্মদার তীরে বেড়াইতে গেলেন। আমরা সন্ধ্যা পূজা সারিলাম।

আটটায় মা ফিরিয়া আসিলে মার মুখ ধোয়াইয়া দিয়া একটু ফলের রস খাওয়াইয়া দিলাম। অভয় মার সঙ্গে নানা কথা বলিতেছে আমরাও বসিয়া আছি। অভয় বলিল "জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে যে দেরাদুনের দিকে ছিলেন সেই দু-তিন বছরের কথা কিছু কিছু বলুন না ?

মা কিছু কিছু বলিতে লাগিলেন। মা সেই সময়তে ভিক্ষা যাহা মিলিত তাহাই খাইতেন। একদিন শুধু কিছু আটা মিলিল তাহাই জলে গুলিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। ভোলানাথ বৈশাখ মাসে কমলাকান্তকে নিয়া বদ্রিনারায়ণ চলিয়া গেলেন, মা ও জ্যোতিষ দাদা রহিলেন, মুসুরী হইতে হাঁটিয়া টপকেশ্বর শিব মন্দির আসিয়া রাত্রিবাস করিলেন, পরে হরিরাম ও হংস ভাই আসিয়া মাকে দেরাদুন সহরে নিয়া গেলেন, সেখানে প্রথমে একটা মন্দিরে নিয়া গেল, জ্যোতিষ দাদার সেই স্থানটা পছন্দ হইল না, তারপর আবার অন্যত্র দেখিতে যাইবার জন্য মোটরে উঠিতেই মা বলিলেন "এবার যেখানে যাইব, সেখানেই থাকিব, যখন যেখানে যে স্থান পাওয়া যায় তাহাতেই থাকা হইবে গাড়ী করিয়া যায়গা দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইব নাকি ?" সত্যিই সেইবার মনোহর মন্দিরে যাওয়া হইল, মা তথায়ই রহিয়া গেলেন, পরে হৃষিকেশ, লছমন ঝোলায় এক সাধুর আশ্রমে গিয়া জায়গার কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি সাধারণ ভাবে বলিলেন "সবই ত আপনাদের জায়গা, যেখানে ইচ্ছা থাকুন" এই কথায় মা দুষ্টামী করিয়া একটু দূরে একটি ঘরে গিয়া বলিলেন "তুমি যদি বল এই ঘরে থাকিব" এই বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন. সেই ঘরটিতেই ঐ সাধুটি নিজে থাকেন, তাই তিনি একেবারে চুপ হইয়া গেলেন। তিনি ধারণাই করেন নাই মা সম্মুখের সব ঘর ফেলিয়া একটু দূরে তাহার থাকিবার ঘর খানিতেই গিয়া উপস্থিত হইবেন। মা এই ভাবে দুষ্টামী করিয়া সেখান হইতে চলিয়া

আসিলেন। শনিবাই যে ধর্ম্মশালায় থাকে গঙ্গার উপরে সেই ধর্ম্মশালায় রহিলেন। শনিবাই মার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিত। স্বর্গ-দ্বারে বেড়াইতে গিয়া এক অতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইয়াছিল। এই সব পুরান গল্প করিতে লাগিলেন। জানা কথা হইলেও মার মুখে শুনিতে মিষ্টি লাগিতেছিল, তারপর অভয় বলিল "আচ্ছা মা আপনার কাছে যে কত সুক্ষ্মশরীরীরা আসেন তাহাদের মধ্যে কত মহাপুরুষরাও আসেন, বিজয় গোস্বামী, গম্ভীরানাথ বাবাজী আসিয়াছিলেন কি? পরমহংসদেব ত আসিয়াছিলেন বলিয়াছিলেন।" মা বলিলেন "হ্যাঁ মেয়েটাকে দর্শন দিতে ত সকলেই আসেন।" অভয় বলিল "আপনি তাঁহাদের দেখেছেন?" মা বলিলেন "হ্যাঁ দেখিয়াছি, তখন পরমহংস দেবের সঙ্গে মার দেখা হবার ঘটনাটি উঠিল, ঘটনা এই যে মা যখন বিদ্যাকূট তখন একদিন দেখিতেছেন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের ঘর আর সেই ঘরে ঠাকুরের বিছানায় মা শুইয়া আছেন, আর ঠাকুর কোলের কাছে শুইয়া আছেন, ছেলে মানুষের মত ভাব। আবার মা ইহাও দেখিয়াছিলেন মাও ছেলেমানুষ ঠাকুরও ছেলেমানুষ, দুজনেই ঐ ভাবে বিভোর বিছানায় শুইয়া আছেন। যদিও তাঁহার তখন একটু একটু দাড়ি গোঁপ পাকিয়া উঠিয়াছে ইহাও মা দেখিতেছেন। কিন্তু ভাবটি সুন্দর শিশুর, খানিক পরে মার কোলের নিকট হইতে উঠিয়া খড়ম্ পায় দিয়া খুট্ খুট্ করিয়া ঘর ময় হাঁটিতে লাগিলেন, গরম জল গামছা সব সেই ঘরের সামনেই সাজান ছিল। মা ইহার পূর্ব্বে বাহিরের দিক দিয়া দক্ষিণেশ্বর দেখেন নাই। পরে ওখানে গিয়া দেখিলেন বিদ্যাকূটে যেমন দেখিয়াছিলেন ঠিক সেই রকমই, এই ভাবে প্রথম দেখা, তারপর আরও একবার হরিদ্বারে যে কল্যানবন দেখিয়া-

৭

ছিলেন তাহার মধ্যে সকলকেই দেখিয়াছেন। সেইখানেও সকলেই দর্শন দিবার জন্য আসিয়াছিলেন; "মেয়েটাকে দেখা দিতে আসেত ?" এই ভাবের কথাবার্ত্তা অনেক সময় চলিল। তারপর আমরা কাজে চলিয়া গেলাম, অভয় ও মা কথা বলিতে লাগিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর মা শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই মার চুপ চুপ ভাব।

আজ আর বেড়াইতে বাহির হইলেন না। সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন করিতে বড় ঘরটায় যাওয়া হইল। অভয়ের কি খেয়াল হইল আজ নাম করিবে না। আমি মাকে বলিলাম, "মা তুমি নাম কর আমরা সঙ্গে সঙ্গে করি।" মা নাম আরম্ভ করিলেন "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল," প্রথমে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম শেষে মা বলিলেন "তোরা মনে মনে কর্ আমি একা করিতেছি।" এ বলিয়া দুলিয়া দুলিয়া ঐ নামই করিতে করিতে চোখের জলে ভাসিতেছেন শরীরও যেন বাতাসে বাম ও ডান দিকে দুলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর নাম বন্ধ হইলেও মা চোখ বুজিয়া খানিক সময় বসিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে চোখ খুলিলেন। আরও খানিক পরে আমি একটু দুধ আনিয়া খাওয়াইয়া দিলাম মা উঠিয়া বারান্দায় হাঁটিতে লাগিলেন। তারপর শিশিরকে ডাকিয়া একান্তে কি বলিলেন, রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে শুইয়া পড়িলেন। মাও শুইয়াছেন কিন্তু শরীর আজ শান্তভাবে পড়িতেছে না। এই ভাবেই প্রায় সারা রাত কাটিয়া গেল। রাত্রি তিনটায় প্রায় আমরা উঠিয়া বসিলাম।

৩০শে পৌষ শনিবার—

প্রায় সাড়ে সাতটায় আমি সন্ধ্যা বন্দনাদি সারিয়া মাকে বলিলাম, "মা একটু বেড়াইতে যাইবে না?" মা বলিলেন "চল্" এই বলিয়াই উঠিয়া

খাওয়াইলেন। আমি নর্মদার তীরে একটা জঙ্গলের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা দেখিয়া বসিয়া পড়িলাম কথাবার্তা হইতেছে এর মধ্যে অতর মাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই দিকে গেল। রৌদ্রও উঠিয়াছে আমরা তিন জনে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। মাকে মুখ ধোয়াইয়া আঙ্গুর একটু রসের জল খাওয়াইয়া দিলাম। মার শরীরটা আজও চুপচাপ, মা কখনও শুইতেছেন, কখনও বসিতেছেন, অতো কাছে বসিয়া রহিল, শিশিরও মার আদেশ মত ৮টা হইতে ১২টা অবধি নিজের ঘরে বসিয়া জপ, ধ্যানাদি করে। কেশবও সন্ধ্যা পূজাদি করিতে গিয়াছে। দেবীজী ও শান্তি আমার সাহায্য করিতেছে। বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় তরকারীর জুস্ ও এখানকার বজরী আটার ২।১ খানা ছোট ছোট রুটী এবং একটু জল মাকে খাওয়াইয়া দিলাম। খাওয়ার পর মা একটু হাঁটাহাঁটি করিলেন। আমি বলিলাম "মা এখন একটু বিশ্রাম কর," মা বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যাবেলায় কীর্ত্তন হইতেছে এর মধ্যে নারায়ণ স্বামীর সহিত ৪০ জন লোক আসিয়া উপস্থিত। ইতি পূর্ব্বে নারায়ণ স্বামী আসিয়া একদিন ছিলেন। তারপর বরোদা গিয়া পত্র দেন, সকলকে নিয়ে মার দর্শনে আসিবেন এবং মার কাছে কীর্ত্তনাদি হইবে। আজ সকালে আসিয়া মার কাছে কীর্ত্তন করিতে বসিলেন। বাদ্য যন্ত্রাদি সকলে সঙ্গেই নিয়া আসিয়াছেন। রাত্রি ১০টা অবধি কীর্ত্তনাদি হইল। ব্যাস দর্শনে নানা স্থান হইতে লোক আসে সত্য কিন্তু এত লোক দেখা যায় নাই। জঙ্গল যেন মুখরিত হইয়া উঠিল। তাহারা রাত্রি বাসের জন্য ডাক বাংলো ঠিক করিয়াছেন। মাকে দর্শন করিয়া অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ আমেদাবাদ ও বরোদাতে মাকে দর্শন করিয়াছেন।

সন্ ১৩৪৫ সাল, ব্যাস

১লা মাঘ রবিবার—

আজ নারায়ণ স্বামীজির শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর খাবার ব্যবস্থা যোগানন্দ স্বামীজির আশ্রমেই করা হইল। কীর্ত্তনাদিও হইল। বেশ আনন্দ হইল। বিকালের দিকে সকলে রওনা হইয়া যাইবেন তাই একে একে আসিয়া সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইতেছেন। মা পায়খানায় যাইবেন বলায় আমি জল নিয়ে সঙ্গে চলিলাম। আতাগাছের ঝোপের মধ্যেই পায়খানা, মা যেই ঝোপের মধ্যে ঢুকিবেন অমনি পিছন হইতে ডাক আসিল "মা" ফিরিয়া দেখি একটি অর্দ্ধ বয়স্কা দক্ষিণী মেয়ে লোক ছুটিয়া আসিতেছেন, ইনিও নারায়ণ স্বামীর সঙ্গেই আসিয়াছেন। কাল রাত্রিতে ও আজ একতারা বাজাইয়া ইনি মাকে গান শুনাইয়াছেন। স্ত্রীলোকটি কৃষ্ণা বর্ণা হইলেও মুখ চোখ বেশ সুন্দর, একটা উজ্জ্বলতা চোখে আছে। আনন্দের ভাবটা মুখে যেন মাখানো। মা ডাক শুনিয়া ফিরিয়া আসিতেই স্ত্রীলোকটি পা জড়াইয়া ধরিয়া প্রণাম করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে (ভাল হিন্দিও জানেন না) বলিলেন "মা দয়া রাখিবেন।" এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মার হাতখানা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের মাথায় দিতেছেন, বুকে দিতেছেন কত রকমে স্ত্রীলোকটি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া মার প্রতি তাঁহার ভালবাসা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন তাহা লেখা যায় না। চোখ দুটি ছল ছল। মাও হাত দুইখানি তাঁহার হাতের মধ্যেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমি দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। এত লোক আসিয়াছেন স্ত্রীলোকটি কালই মাত্র মাকে দেখিলেন কিন্তু ভাবে মনে হইতেছে মাকে

ছাড়িয়া যাইতে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিতেছে। নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যমুনাবাই। মায়ের হাত দুখানি ধরিয়া মাকে একবার বরোদা যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন ; ইনি বরোদাতেই থাকেন। স্বামীও সঙ্গে আসিয়াছেন। শেষে বলিতেছেন "মা গোপী যেমন শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া যাইতে কাতর হইতেন আমারও যেন তেমনই হইতেছে। তোমাকে ছাড়িয়া আমার শরীরটা যাইবে কিন্তু প্রাণ আমার এখানেই থাকিবে।" এই বলিতে বলিতে আবার প্রণাম করিতেছেন। নিকটে আর কেহ নাই আমিও তাঁহার ভাবে বাধ্য হয়ে ভয়ে একটু দুরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছি। মা বলিতেছেন "গান শুনাইয়া কত আনন্দ দিয়াছ।" তারপর বলিতেছেন "বেশ তুমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যখনই হউক মনে মনে অথবা মুখে উচ্চারণ করিয়াই হউক গান করিও আমিও সে সময় খেয়াল করিব, মা আমার গান করিতেছে।" স্ত্রীলোকটি মায়ের হাত দুইখানি আবার গভীর ভাবে জড়াইয়া বলিলেন "আমাকে মা বলিওনা, তুমি মা ; আমি তোমার সন্তান। আমার ছোট ছোট সন্তান সন্ততি আছে তাহাদের সব রাখিয়া আসিয়াছি পাছে তাহাদের নিয়া আসিলে তোমাদের সঙ্গ পাইবার বাধা হয়।" অনেকক্ষণ পর বলিলেন, "আর তোমাকে বাধা দিবনা আমি এখন যাই, সকলে রওনা হইতেছেন, আমি ছুটিয়া তোমার কাছে চলিয়া আসিয়াছি।" এই যাই যাই করিয়াও ১০।১৫ মিনিট ধরিয়া যাইতে পারিতেছেন না।

রওনা হইবার পূর্ব্বে আবার স্ত্রীলোকটি আসিলেন মা তখন শুইয়াছিলেন। এবার স্ত্রীলোকটি আসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। মা হাঁসিয়া হাঁসিয়া বলিতেছেন "যে হাঁসে, তাহার জন্য আবার কেহ কাঁদে নাকি! কিন্তু স্ত্রীলোকটির কান্না আর থামেনা। যাইবার সময়

পুনঃ পুনঃ দেখিতে দেখিতে দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। সকলে নৌকায় উঠিবার সময় আবার **মাকে** দর্শন করিতে আসিলেন। যমুনাবাইও আবার আসিয়াছিলেন। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ বহু চেষ্টায় **মার** নিকট বিদায় নিয়া, সকলে রওনা হইলেন।

নারায়ণ স্বামীর কয়েকদিন এখানে থাকার কথা, তিনি সকলকে তুলিয়া দিতে চান্দোদ অবধি যাইবেন স্থির হইয়াছে। রুমা দেবী ও এই নারায়ণ স্বামী একত্র হইয়া কৈলাসের পথে 'খেলা' নামক স্থানে আশ্রম করিয়াছিলেন, সেইখান হইতেই রুমা দেবী **মার** সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন।

আজ **মা** বৈকালে বসিয়া আছেন, অনেকগুলি চিঠি আসিয়াছে; আমি মাকে পড়িয়া শুনাইলাম, **মাও** সন্ধ্যা অবধি শুনিলেন। বাহিরে গিয়া বসিবার কথা বলায় বলিলেন "চিঠি শেষ কর্।" আমি ভাবিলাম একি, আজ যে এতগুলি চিঠি এক সঙ্গে শুনিতেছেন, সন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে তবুও বলিতেছেন "চিঠি তোর শেষ কর্ দেখি।" আমার এ ভাবটা দেখিয়া **মা** বলিয়া উঠিলেন "বাঃ কাজ গুছাইতে হয় না? য়্যায়সা দিন নহি রহেগা।" **মার** এই ভাব দেখিয়া ও কথাগুলি যে ভাবে বলিলেন তাহা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম বাহির হইল। আমি কাতর ভাবে বলিলাম "এই রকম বলিতেছ কেন?" **মা** বলিলেন, "বাঃ, কত কথাইত বলি, কিছু মনে করিয়া বলি নাই।" আর কিছু বাহির করিতে পারা গেল না।

চিঠি পড়া শেষ হইলে **মা** তেঁতুল তলায় গিয়া বসিলেন। নর্ম্মদার তীর তখন জন শূন্য। আমরা সকলে চুপ করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার পর সকলে উঠিয়া আসিলাম, কীর্ত্তন হইল। আজ **মা** প্রায় ৯॥ টায় শুইয়া পড়িলেন।

২রা মাঘ সোমবার, ৩রা মাঘ মঙ্গলবার, বিশেষ কোন ঘটনা নাই। ৪ঠা মাঘ বুধবার আজও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কোন ঘটনা নাই।

কয়েকদিন যাবৎই মার কথাগুলিও মধ্যে মধ্যে কেমন অস্পষ্ট, এলো মেলো হইয়া যাইতেছে। কথা বলিতে বলিতে যেন ছেলে মানুষের মত অস্পষ্ট হইয়া যায় আর হাঁসিয়া ফেলেন। বলেন, "কি রকম যেন হইয়া যাইতেছে, তোরা শুনিতেছিস্ ত! কতদিন যাবতই "রণ্ কর, রণ্ কর" একটা শব্দ মুখ হইতে বাহির হইতেছে।" কেমন যেন কথার ভাবগুলি বন্ধ হইয়া যাইতেছে। অনেক চেষ্টাতেও শরীর ঠিক ঠিক্ মত ভাল হইয়া উঠিতেছেনা, একটু ভাল হইলেন আবার খারাপ হইতে আরম্ভ হয়, এই ভাবেই চলিতেছে।

আজ বৈকালে ফলাহারী মার কাছে গিয়া কিছু আবদার করিয়া আসিয়াছেন। ব্যাসের মন্দিরের দিকে যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া বিপরীত দিকে চলিলেন, ফলাহারী মার বাড়ী গিয়া কথায় কথায় নর্ম্মদার জলের ছিটা দিতে বলিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন "নর্ম্মদার জল ঘরে নাই।" মা বলিলেন, "একটুও নাই?" বৃদ্ধাও দুষ্টামী করিয়া বলিলেন, "না, একটুও নাই।" তখন মা আবদার ধরিলেন, "জল খাইব, মা আমায় জল দাও, আমার ঠোঁট শুকাইয়া যাইতেছে।" বৃদ্ধার কাছে মাটিতে বসিয়া করুণ ভাবে জল জল করিতে লাগিলেন। প্রথমে বৃদ্ধা কিছুতেই দিবে না, শেষে মার অবস্থা দেখিয়া না দিয়া পারিলেন না।. জল আনিয়া দিতেই মা আধ গ্লাস জল খাইয়া ফেলিলেন। পরে হাঁসিয়া বলিলেন, "এখন জল কোথা হইতে আসিল? এই রকম করিয়া বুঝি মেয়েটাকে মিথ্যা কথা শিখাইতে হয়? আমিও তবে এই রকম বলিব নাকি?"

এই সব কথা নিয়া রঙ্গরস করিয়া আবার মা ব্যাসের মন্দিরের দিকে

চলিয়া গেলেন। সঙ্গে আমরাও আছি। আহমেদাবাদ হইতে শুদ্ধপ্রিয়া, কল্যাণপ্রিয়া (গুলবাইয়েরা দুই বোন), পার্শি মেয়ে দুইটি কয়েক দিনের ছুটি নিয়া মার কাছে আসিয়াছেন, তাহারাও সঙ্গেই আছেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তথায় থাকিয়া আশ্রমে আসিয়া কীর্ত্তন হইল। রাত্রি প্রায় ১১টায় মা শয়ন করিলেন।

শুদ্ধপ্রিয়া, কল্যানপ্রিয়ার নিকট তাহাদের পৈতার ইতিহাস শুনিলাম। ৭ হইতে ১৩ বৎসরের ছেলে মেয়ে সকলেরই পৈতা হয়। পৈতা কোমরে জড়ানো থাকে, তিনবার কোমর ঘুরিয়া আসে এত বড় লম্বা হওয়া চাই। ৪টি গেরো থাকে, তাহার অর্থও আছে।

৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার, আজও লিখিবার বিশেষ কিছু নাই। দুপুর বেলা মার ভাবের একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। মুখের চেহারা অনেক রকম পরিবর্ত্তন হইতেছিল; অভয় ও আমি বসিয়াছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত দেখিতেছিলাম। মধ্যে মধ্যে অভয় বলিতেছিল, "বাবা, এ যে মার মুখ বলিয়াই চেনা যায় না!" অভয় মাকে বলিতেছিল, "মা আর একবার ঐ রকম করুন।" শেষ দিকে মা বলিতেছিলেন, "এও ত খেলা, যেমন তোদের কথায় একটা কোন কাজ কখনও কখনও করিতে পারি, তেমন এই সব ক্রিয়া কখনও কখনও তোদের কথায় সামান্য কিছু কিছু হইয়া যায়; আবার কখনও কখনও হয়ও না। আজও নিয়মিত কীর্ত্তনাদি সন্ধ্যায় হইয়া গেল।

৬ই মাঘ শুক্রবার: আজ ক্রিয়াদির কথায় মা বলিতেছিলেন, "যখন শরীরের ক্রিয়াদি হয় স্পষ্ট বোঝা যায় সম্মুখস্থ স্থানের শিরাগুলির মধ্যেও কেমন প্রবাহ চলে, কারণ গ্রন্থি খোলে কিনা। কখনও কখনও যে কীর্ত্তনাদিতে কাহারও কাহারও একটু ভাবের আভাষ

দেখা যায় এবং মনে হয় হাত পা ছিটাইতেছে ও শরীরে একটা চাঞ্চল্য ভয়ানক ভাবে দেখা যাইতেছে, তার কারণ হইল, গ্রন্থি-গুলি খোলা থাকেনা কিনা। স্বভাবের গতিগুলি খেলিতে পারে না কিনা, তাই একটা ভাবের আবেগ ভিতরে ভিতরে জাগে এবং ইহাই বাহির হইতে গিয়া বাধা পায়। আর গ্রন্থিগুলি খোলা থাকে না, তাই ঐরূপ ছট্‌ফট্ করে।"

৭ই মাঘ শনিবার ঃ—আজ বৈকালে মা গিয়া তেঁতুল তলায় বসিলেন আমরাও সকলে বসিয়াছি। নানা কথাবার্ত্তা হইল। মার ভাবটা কিছু চুপ্ চাপ দেখা যাইতেছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মা উঠিয়া আশ্রমে চলিলেন। শিব মন্দিরের সম্মুখে স্বামী যোগানন্দজী এবং আরও দু'তিন জন সাধু বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, মা গিয়া সেখানে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। যোগানন্দ স্বামীজির জিজ্ঞাসার উত্তরে মা বলিলেন, "পিতাজীর কাছে বসিয়াছি।" স্বামীজী আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "বেশ, মা বস।" সঙ্গে সঙ্গে আমি মার আসন নিয়া দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু দিতে পারিলাম না কারণ জানি স্বামীজীরা মাটিতে বসিয়া আছেন, মা এখানে আসনে বসিবেননা। মা যেন কিছুই জানেননা, কথাবার্ত্তা শুনিতে বসিয়াছেন। স্বামিজী বেদান্তের কথা শুনাইতে লাগিলেন। আমরা সকলেই বসিয়া শুনিলাম। সন্ধ্যার পর মা উঠিয়া হাত যোড় করিয়া স্বামীজীকে বলিলেন "আচ্ছা পিতাজী এখন যাই" (মা সব হিন্দি-তেই বলিলেন আমি সর্ব্বত্রই বাংলাতেই লিখিয়া যাইতেছি) স্বামীজীও, 'আচ্ছা' বলিয়া অনুমোদন করিলেন। মা ঘরে চলিয়া আসিলেন।

মা সব সময়ই সকলের সম্মান এই ভাবে রক্ষা করেন, কাজেই বিরোধ করিবার কাহারও কিছুই থাকে না। অন্যান্য স্বামীজীরা কেহ

আসিলেও মা তাঁহাদের আসন দিবার জন্য ব্যস্ততা প্রদর্শন করেন, আসন না আনিলে নিজেও মাটিতে নামিয়া বসেন। বিদায়ের সময়ও হাতযোড় করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করেন। যথাযোগ্য ব্যবহারে মার ত্রুটি নাই। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনাদি হইল। আজও বরোদা হইতে কয়েকজন মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

৮ই মাঘ রবিবার—আজ ভোর বেলা শুদ্ধপ্রিয়া, কল্যাণপ্রিয়া ও শান্তি আহমেদাবাদ রওনা হইতেছে। মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "খুকুনী, চল্ আমরাও চান্দোদ যাই।" আমি বলিলাম, "বেশ চল, কখন যাইবে ?" মা বলিলেন, "বোটে যাই।" আমি বলিলাম, "বেশ, চল।" তখনই সব গুছাইতে লাগিলাম। ৯টা ৯৷৷টায় আমরা রওনা হইলাম। খবর পাইয়া সকলেই আমাদের তুলিয়া দিতে নর্ম্মদার তীরে আসিলেন। দু-একজন চোখের জলও ফেলিতে লাগিলেন,—মা হঠাৎ চলিলেন, আবার ফিরিবেন কিনা, কে জানে! এই ভাবিয়া সকলেই দুঃখিত।

চান্দোদে টিকমজীর মন্দিরে আসিয়া আমরা উঠিলাম। মাকে দেখিয়া মোহন্তজী খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর, বেলা প্রায় ২৷৷টায় মা আমাকে ডাকিলেন, আমি যাইতেই বলিলেন, "চল্ আজই ৫টার গাড়ীতে বরোদা যাইব।" আমি বলিলাম, "বেশ, চল"। শুনিলাম অভয় কথায় কথায় বলিয়াছিল, "আপনি চলিয়া যান, আমি এখানে একা সাধন ভজন করিব।" এই ভাবের কি কথাবার্ত্তা হওয়া মাত্রই মা বলিলেন, "বেশ ভাল কথা।" এই বলিয়া, যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অভয় কিন্তু পরে আর মাকে ছাড়িয়া থাকিতে রাজি হইল না। কিন্তু মা বলিলেন, "যখন বলিয়াছি যাব, তখন চল্, যাই।"

আমরা বৈকালে ৫॥ টার গাড়ীতে বরোদা রওনা হইলাম। এক ইঞ্জিনীয়ার—(মিষ্টার মজুমদার) কাল বরোদা হইতে মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, আজ ফিরিয়া যাইতেছেন। ইঁহার স্ত্রী **মার** কাছে দিল্লী-সিমলায় অনেক আসিয়াছেন কিন্তু ইঁহার সহিত পরিচয় ছিল না। এই ভদ্র লোক সেলুনে বরোদা যাইতেছেন, **মাকে** ষ্টেশনে দেখিয়া তাঁহার গাড়ীতেই নিয়া গেলেন। আমি ও অভয় মার সঙ্গে তাঁর গাড়ীতেই চলিলাম।

রাত্রি প্রায় ৭॥ টায় আমরা বরোদা পৌঁছিলাম। 'চিকালালবাদশা,' ধর্ম্মশালায়ে উঠিলাম। গঙ্গাচরণবাবু খবর পাইয়া মেয়েদের নিয়া আসিয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মার ভাবটা চুপ চাপই চলিতেছে। কাল বৈকাল হইতেই বেশী। আবার নড়াচড়াতে একটা চঞ্চলভাবও দেখিতেছি। কোথায় যান, কোথায় থাকেন, কিছুই স্থিরতা নাই এই ভাবেরই কথাবার্ত্তা। আমরা 'ভিতরে ভিতরে একটু চিন্তিত হইলাম।

৯ই মাঘ, সোমবার--

আজও মার ভাবটা চুপ্ চাপ। কয়েকদিন যাবৎ আমাদের বসাইবার জন্যে রাত্রি ৩টায় উঠিতেছেন; কালও ৩টার পর হইতেই আর শুইবার ভাব নাই। বারান্দায় হাঁটিতে বাহির হইলেন। তারপর আমি ও **মা** বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলাম। আর সকলেই ঘরের ভিতর ছিল। এই ভাবেই ভোর হইয়া গেল। একটু বেলা হইলে **মা** আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু শুইবার ভাব নাই। আমার সঙ্গে কয়েকটা বিষয়ের কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। কমলেশবাবুর স্ত্রী, গঙ্গাচরণবাবুর মেয়েদের নিয়া আসিয়াছেন। বেলা ১২টা বাজিয়া গেল সকলেই চলিয়া গেলেন। **মা** শুইয়া পড়িলেন। খাওয়া দাওয়া হইলনা। বেলা প্রায় ২॥ টায় **মা** উঠিলেন, ভোগ দেওয়া হইল। তারপর

ধীরে ধীরে ২।৪ জন লোক আসিতে লাগিলেন। মা ২।৪টি কথা বলিতেছেন, কিন্তু আজও চুপ চাপ ভাব।

গঙ্গাচরণ বাবু এবং আরও একটি ভদ্রলোক আসিয়াছেন, মাকে বলিলেন, "মা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ভাবগুলি যাহাতে শুদ্ধ থাকে তাহাই একটু বলুন।" মা বলিলেন "তোমরাইত শিক্ষাদি দিয়া থাক, তোমরাই ত তাহা বোঝ।" তাঁহারা আবার অনুনয় করাতে মা বলিলেন (হিন্দিতে) "দেখ, তোমরা ছোট ছোট ছেলেদের পৈতা দাও, কিন্তু আজকাল ছেলেরা সব পৈতা ফেলিয়া দিতেছে। আমার কাছে কেহ বলিলে, আমি বলি, 'ঠিকইত করিয়াছে, তোমরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য অর্থকরি বিদ্যার জন্য কত চেষ্টা কর, কত ভাবে শিক্ষা প্রদান কর; কিন্তু পৈতার প্রয়োজন কি, সন্ধ্যা বন্দনাদি কেন করে, না করিলে কি ক্ষতি হয়? এসব বিষয়ে শিক্ষা বিশেষ কিছুই তোমরা দাওনা, তাই তাহারাও সেই কাজটা বাজে কাজ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকে। কাজেই শুধু তাহাদের দোষ নয়ত', তোমরাও এজন্য দোষী।

তাঁহাদের দুইজনের সঙ্গে দু-তিনটি মেয়ে আসিয়াছে। তাঁহাদের কিছু বলিতে বলায় মা মেয়েদের বলিতেছেন, "তোমরা এই ৫টি কাজ করতে চেষ্টা করিও। ১। পিতামাতার কথা শোনা; ২। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা—সন্ধ্যা এবং সকালে; ৩। মন যোগ দিয়া লেখাপড়া করা; ৪। সত্যকথা বলা; এবং ৫। মাঝে মাঝে দুষ্টামী করা"। এই বলিয়া শিশুর মত উচ্চ হাঁসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমি কি করব, বাবা বলতে বলিল তাই যাহা আসিল তাই বলা হইল।" "শিশুদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট"—এই বলিয়া মেয়েদের বলিলেন "কি কি করবে বলত?" তাহারা বলিল। একটি বলিতে বলিতে আবার ভুলিয়া গেল।

গঙ্গাচরণবাবুর সঙ্গীয় ভদ্রলোকটি এদেশীয়, তাই মা হিন্দিতেই কথা-বার্ত্তা বলিতেছেন। গঙ্গাচরণবাবু বলিলেন, "আচ্ছা মা, এইত হইল শিশুদের জন্য, এখন আমাদের জন্য কিছু বলুন।" সঙ্গীয় ভদ্রলোকটিও ইহা অনুমোদন করিয়া আবার প্রার্থনা করাতে মা বলিতে লাগিলেন, "বাবাজীদের ত পেন্সনের সময় আসিয়াছে, এই পেন্সন ত শ্বাসের সঙ্গে শেষ হইয়া যাইবে। তোমরাত' অখণ্ড আনন্দ চাও, পেন্সন পাইবার আশায় যেমন অখণ্ডভাবে বরোদায় আসিয়া কাজ করিতেছ, এই রকম সর্ব্বদা অখণ্ডভাবে তাঁর নাম শ্বাসের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিতে চেষ্টা কর। তবেই সকলে যে অখণ্ড শান্তি চায় সেই অখণ্ড শান্তি মিলিবে। তাই বলি সেই দিকে খেয়াল রাখ। পুরাভাবে কাম চালাও তবে পুরা দামও মিলিবে। প্রথম প্রথম বাচ্চাদের মত ধীরে ধীরে চেষ্টা করিতে হয়, ইচ্ছা না করিলেও করিতে হয়, তারপর ধীরে ধীরে তাহা করা অভ্যাস হইয়া গেলে তখন আর ছাড়াও যায় না। এই রকম নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া অভ্যাস করিতে থাক।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন "মা কৃপা হইলে হইতে পারে"। মা বলিলেন "কৃপাত' বৃষ্টির মত পড়িতেছে, তাহা গ্রহণের জন্যই কিছু কিছু সাধন ভজন করা দরকার। তোমার যতটুকু শক্তি আছে তাহাকে কাজে লাগাও। সৎগ্রন্থ পাঠ কর, নাম কর, জপ্ কর, তোমার যথাশক্তি করিয়া যাও, তারপর তিনি যাহা করিবার করিয়াই যাইতেছেন। মুখে দিলে ত পেট ভরিবে না।" একজন বলিলেন "যদি আমার সাধন ভজনের শক্তি না থাকে?" মা বলিলেন, "ও কথা শুনিনা,

এই যে শক্তি, যদি শক্তি না থাকে বলা হইল, ইহাতেই দেখা গেল শক্তি আছে। তোমার যে'টুকু কর্ম্মশক্তি আছে তাহা যদি না লাগাও তবে তোমার দোষ, "তিনিই সব করাইতেছেন 'আমি যন্ত্র মাত্র', এ কথা বলার তোমরা অধিকারী নও। নিয়ম গত কার্য্য করিতে করিতে যখন বাহিরের দিক হইতে বহির্মুখী কর্ম্মক্ষয় হইয়া যায়, তখন সে দেখে, আরে, আমি নিজে ত ইচ্ছা করিয়া কিছুই করিতে পারি না, তিনিই আমাকে করাইতেছেন, আমি যন্ত্র মাত্র। এই অনুভব তখনই তাহার আসিতে পারে, যখন সে দেখে, তাহাদ্বারা কোন কার্য্য হইতেই পারে না, তিনি যন্ত্রী সে যন্ত্র মাত্র। কাজেই এখন তাহার কৃপাতেই সব হইতেছে, একথা বলিবার অধিকারই নাই। সব সময়ই তোমাদের ঐ পথের যাহা সহায়তা করিবে তাহাই ধরিয়া থাকিতে হয়, যাহা সহায়তা করেনা তাহা ত্যাগ করিতে হয়।" এই বলিয়া একটু হাঁসিয়া বলিতেছেন, "পিতাজী হিন্দি ভাল আসে না, পক্ষী যেমন শুনিয়া শুনিয়া বলে, সেই রকমই বলা হয়; যেমন তোমরা বলাও, তাই বলা হয়।"

কথাবার্ত্তার পর প্রায় ৬টায় গঙ্গাচরণবাবুর সঙ্গীয় ভদ্রলোকটির মোটরে মাকে বেড়াইতে নিয়া গেলেন। মার সঙ্গে আমি ও গঙ্গাচরণবাবুও গেলাম। মোটরে মাকে সহর ঘুরাইয়া আনিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজান সহর। তারপর নিজের বাসার দরজাতে নিয়া গেলেন, মেয়েরা আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। ডাক্তারবাবু (ভদ্রলোকটি ডাক্তার), বলিলেন, 'মা, মেয়েদের কিছু বলুন।' মা বলিলেন, "বলিবার কি আছে? পতি সেবা কর। মনেরাখিও, সেই পরমপতিকে ত

তোমরা দেখিতে পাওনা ; সেই পরম-পতিই ঘরে ঘরে পতিরূপে তোমাদের কাছে আছেত। সেই ভাবে সেবা করিবে। আর সান্তন সন্ততিরা 'বাল গোপাল, কুমারী মূর্ত্তিতে তোমাদের কাছে আছে। সেই ভাব নিয়া তাহাদের সেবা যত্ন করিয়া যাও। আর, পতি কে? আসলে, সেই পরমপতিই সকলের পতি ; এই যে পুরুষ দেখিতেছ ইহারাও যখন একজনকে চাহিতেছে তখন সকলেই স্ত্রী। স্ত্রীলোক যেমন চায় পতিকে, ইহারাও (পুরুষদের দেখাইয়া) সকলেই সেই রকম পরম-পতিকে চাহিতেছে। তাই, সকলেই স্ত্রীলোক, সকলেই সেই একজনকে চাহিতেছে, এই বলিয়া হাঁসিতে লাগিলেন।" খানিক সময় ওখানে থাকিয়া আমরা ধর্ম্মশালায় চলিয়া আসিলাম।

রাত্রিতে জ্যোতীষ দাদার স্ত্রীর কথা উঠিয়াছে, তিনি মার ভয়ানক বিরুদ্ধ বাদী। ইহা পূর্ব্বেই কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার কথায় মা বলিতেছেন, "দেখ, একবার একজন আসিয়া বলিল, 'মা ; জ্যোতীষবাবুর স্ত্রী রাগের বশে তোমাকে এমন সব কথা বলে, চোখে জল আসে, কানে হাত দিতে হয়।" আমি বলিলাম, "তুমি কি উত্তর দিলে?" মা হাঁসিয়া বলিলেন, "আমার ত এক কথা জানিসই, যা বলিয়া থাকি ; তারও ত কোনও দোষ নাই, সে যে এই শরীরটার বিষয় জানেনা, চেনে না। তাই, নিজেদের ভাব নিয়া ঐ সব কথা যা মনে আসে বলিয়া থাকে। আমি তাহাকে আরও বলিয়াছিলাম, 'তোমরা এই শরীরটাকে পরীক্ষা করিয়া দেখনা। যে কোন ভাবে এই শরীরটাকে পরীক্ষা করনা কেন, শরীরের যে সেই একই ভাব, কোন কথাই সেই ভাবের কোন পরিবর্ত্তন

করিতে পারিবে না। পিতা মাতার কোলে শিশু যেমন তোমাদের কোলে এ'শরীরত তা'ই ?"

পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। পিতা মাতার কোলে শিশু যেমন তোমাদের কোলে এ'শরীরত তা'ই ?"

আজ রাত্রি ৩টায় সকলে উঠিয়া বসিয়াছি মা বাহিরে গেলেন, আমিও সঙ্গে গেলাম। মা গিয়া বারান্দায় বসিলেন, আমিও মার কাছে বসিলাম। নানা কথা হইতে লাগিল। ভোর হইয়া গেল, আমরা বসিয়া বসিয়া কথাই বলিতেছি।

১০ই মাঘ মঙ্গলবার—

আজ মাকে যমুনাবাই পুলির বাড়ীতে নিয়া গেল। বেলা ৫টায় আমরা তাঁর বাসায় গেলাম, বারান্দায় মার বসিবার জায়গা করা হইয়াছে; মা বারান্দায় যাইবেন না, তাই রাস্তার ধারেই বসিয়া পড়িলেন। যমুনাবাই এক মাসের জন্য মৌন নিয়াছেন, তিনি ইসারা করিয়া মাকে বারান্দায় যাইতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন। মা অমনি সব দিক রক্ষা করিবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমি মার কোলে বসিব।" বেচারা আর কি করে! অগত্যা বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইলেন। সকলেই রাস্তার ধারে বসিয়া পড়িলেন। ইঁহারা গুজরাটি, অল্প অল্প হিন্দি বোঝেন। মা হিন্দিতেই কথা বলিতেছেন। কীর্ত্তনাদি হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। খবর পাইয়া অনেকেই দর্শন করিতে আসিয়াছেন, আজও রাত্রি প্রায় ১০টা অবধি সকলে বসিয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রায় ১১টায় মা আমাকে নিয়া বারান্দায় গেলেন ও বলিলেন "শুইবার ভাব নাই।" মা ও আমি বারান্দায় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছি। মায়ের ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছিল, আমাকে শীঘ্রই সরাইবেন।

ইতি পূর্ব্বেই আমাকে কিছুদিন মহিলা আশ্রমে থাকিয়া কাজ চালাইয়া দিয়া আসিবার জন্য এলাহাবাদ হইতে শিবপ্রসাদবাবু ও জীতেনদাদা লিখিতেছিলেন। আমি মাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হই নাই। আজ বারান্দায় বসিয়া মার ঐ ভাবের আভাষ পাইয়া (মা কয়েকদিন যাবৎ খুবই চুপ্‌চাপ), আমিই বলিলাম, 'ব্যাপারটা কি বলত? তোমার হাবভাব ত ভাল দেখি না।' আমি এমন ভাবে কথাগুলি শুনিলাম, আর বিশেষতঃ ভাবটা ধরিয়া ফেলিয়াছি দেখিয়া, মা হাঁসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বাঃ কি যে বলিস্" আমি বলিলাম, 'তোমার হাঁসি দেখিয়া আমার আরও ভয় হইতেছে।' শেষে কথায় কথায় আমার যাইবার দরকার ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া বুঝাইতেছেন। "আর কেহ যখন এইসব কাজ করিবার নাই, তোকেইত করিতে হইবে। মহিলা আশ্রম আরম্ভ করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছিস্; যখন আরম্ভ করিয়াছিস্ ভালভাবে চেষ্টা করা দরকার। **যে কাজ স্বইচ্ছায় হাতে নেবে পূর্ণাঙ্গীন চেষ্টা করা দরকার।** কিছুদিন থাকিয়া কাজটা ঠিক্‌ভাবে আরম্ভ করিয়া দিয়া আয়। আর দিল্লীতেও যাইতে হইবে, দাম্মু সম্বন্ধে কথা চলিতেছে। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হয়, মিটাইয়া আয়। অখণ্ডানন্দ স্বামীজী যেন ঢাকায় কিছুদিনের জন্য যায়। (কারণ তথায়ও ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে এবং গৃহস্থ ভক্তদের সঙ্গে একটু কথা চলিতেছে) সেই সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সন্ন্যাসী। তাহার কিছুদিন ঢাকা থাকা এই সময়তে দরকার। তারপর যদি শরীর ইত্যাদি ঠিক্ ঠিক্ থাকে, দেখা যাক, কাছে আনিব। তুইও শীগ্‌গির কাজগুলি শেষ করিয়া ফেল্।" আমি কাঁদিতে লাগিলাম, মাকে ছাড়িয়া অন্য কোন কাজ ভাল লাগে না; সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা হইল, মা বলিলেন, **"সবই তাঁর সেবা, দূরে পাঠাইতেছি মনে**

করিস্ না, সবই দরকার আবার যখন হয় আস্‌বিইত।" ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথায় সান্ত্বনা দিতেছেন।

রাত্রি প্রায় ৩টা। আমি বলিলাম "তুমি কোথায় থাকিবে? সঙ্গেই বা কে থাকিবে? খাওয়া দাওয়ার কি হইবে?" মা বলিলেন, "যখন খেয়াল হয় তখন ত শরীরের দিকেও চাইতে পারিনা তোকেও পাঠাইয়া দেই। যাক একরকমে চলিয়া যাইবে। রুমাদেবী আছে অভয়কেও ত অন্যত্র যাওয়ার কথায় পাঠাইতে চাহিলাম, গেল না, দেখা যাক্ কি হয়। তুই চিন্তা করিস্ না, এক রকমে চলিয়া যাইবেই। জলে তরকারী সিদ্ধ করিয়া দিলেইত আমার চলিবে, না হয় দুধ হইলেই হয়, এসব এক রকমে চলিয়াই যাইবে। আমিও কোন দিকে যাই দেখি। একবার নাড়া চাড়া হইল, দেখা যাক্ কোন দিকে যাই। খবর পাবিই।" আমি বলিলাম, "কবে আমাদের যাইতে হইবে?" বলিলেন, রাত্রি ৩টায় গাড়ী আছে ত?" আমি বলিলাম, "৩টাত' বাজিয়া গেল, সকালে একটা গাড়ী আছে।" মা বলিলেন "তবে চল্, ঘরে যাই, ঘরে গিয়া শিশিরদের উঠাইয়া, বন্দোবস্ত কর্।" আরও খানিকক্ষণ বারান্দায় কাটাইয়া রাত্রি প্রায় ৩॥টায় আমরা ঘরে গেলাম। তখনই বন্দোবস্ত করা হইল। মা বসিয়াই রহিলেন। ভোর ৬টার গাড়ীতে আমরা রওনা হইব স্থির হইল।

১১ই মাঘ বুধবার—

আজ ভোর ৫॥টায় মাকে প্রণাম করিয়া, চোখের জলে সিক্ত ও অবসন্ন শরীর ও মন নিয়া ষ্টেশনে আসিলাম। মার ভাবটা চঞ্চল দেখিয়া আসিয়াছি, কোথায় যান কিছুই ঠিক্ নাই বলিয়াছেন। আবার কবে মাকে দেখিব,

জানিনা! মা অনেক সময় বলেন, "খুকুনি বলে,—খুকুনি মুক্তি টুক্তি চায় না, ও বলে, সেবা করিতে পারিলেই আনন্দ।" কিন্তু সেবা করিবারই বা আমার শক্তি কোথায়! মা কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমাকে দূরে সরাইয়া একান্তে বেশী সময় বসিতে উপদেশ দিয়া দেন। বেশী সময় মৌন থাকাটাও সাধনার খুব সহায়ক—মা বলেন। মৌনের সময় লেখা বা ইসারা যতটা না করা যায় এই উপদেশই দেন। বলেন, **"তাঁর জন্য মন, প্রাণ, শরীর দিয়া কাজে লাগিয়া যাও সময় ত চলিয়া গেল"।**

১২ই মাঘ বৃহস্পতিবার—

আজ ভোরে দিল্লি পৌঁছিয়া আশ্রমে গেলাম। তথা হইতে পঙ্কজদাদার বাসায় আসিয়া আবার আশ্রমে গিয়া পঞ্চুদাদাকে খবর দেওয়া হইল। পঞ্চুদাদা আসিলেন বেলা প্রায় ৯টায়। তাঁহার বাসায় আমাদের নিয়া গেলেন। আমরা সে বাসা হইতে খাওয়া দাওয়া করিয়া আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। আগামী কল্যই এলাহাবাদ রওনা হইয়া যাইব স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু পঙ্কজদাদা খুব আপত্তি তুলিয়াছেন। দেখা যাক্ কি হয়।

১৫ই মাঘ রবিবার—

অভয়ের পত্রে জানিলাম মা ১২ই মাঘ ডাকুর রওনা হইয়া গিয়াছেন, সঙ্গে সাধন, অভয় ও রুমাদেবী। সেখানে গিয়া রামবাগ ধর্ম্মশালায় আছেন। এলাহাবাদ আসিয়াও সাধনের পত্রে ঐ খবরই পাইলাম।

১৭ই মাঘ মঙ্গলবার—

আজ ভোরে দিল্লি হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় এলাহাবাদ পৌছিলাম। দিল্লিতে পাঁচ দিন ছিলাম। মায়ের ভক্তবৃন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইয়া আসিতে পারিলাম না। তাই এ কয়দিন থাকিতে বাধ্য হইলাম। ভাই-বোনদের যথেষ্ঠ আদর যত্ন পাইয়া আসিলাম। মাকে তাঁহারা সকলেই প্রাণের সহিত ভালবাসেন। তাই আমাদেরও কত যত্ন করেন। আমরা কিন্তু এ সব আদর যত্ন পাওয়ার মোটেই উপযুক্ত নই। কিন্তু মায়ের কৃপায় কিছুরই ত্রুটী নাই।

দিল্লি আশ্রমে মেয়েরা রবিবারে রবিবারে সকাল বেলা একত্র হইয়া মায়ের নাম কীর্ত্তন করেন। নিজেরাই খোল করতাল বাজায়, বেশ প্রাণ খুলিয়া নাম করে। অল্প বয়স্কা মেয়েরা বেশ নাচিয়া নাচিয়া নাম করে। বড়ই আনন্দ পাইলাম। কোনও কারণে আমি যেদিন ছিলাম সেই রবিবারে মেয়েরা একত্র হইয়া বৈকালেও কীর্ত্তন করিল। মাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কাজেই এত আনন্দের মধ্যেও আমার অন্তরটা যেন হাহাকার করিতেছিল।

১৯শে মাঘ বৃহস্পতিবার—

আজ সাধনের এক কার্ড আসিয়াছে, তাহাতে লিখিয়াছে,—"মা কাল পুনরায় বরোদা আসিয়া আজই রতলামের দিকে রওনা হইয়া গেলেন। আমাকে চান্দোদ থাকিতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে অভয় ও রুমাদেবী গিয়াছে।" মা বলিয়া গিয়াছেন "বাবাকে (অখণ্ডানন্দ স্বামীজী) লিখিয়া দাও আমার জন্য যেন চিন্তা না করে" মা কোনদিকে যাইবেন কিছুই নিশ্চয়তা নাই।

মা কোথায় যান, ভাবিয়া মনটা অস্থির হইল কিন্তু উপায় নাই। এদিকে আশ্রমেরও এখনও ভাল কিছু ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। চেষ্টা করিয়া যাইতেছি। এখানেও প্রতি রবিবার আশ্রমে মেয়েদের কীর্ত্তন করার চেষ্টা করিতেছি।

২১শে মাঘ শনিবার—

আজ খবর পাইলাম মা মথুরা আসিয়াছেন। তথা হইতে মা কোথায় যান ঠিক নাই।

২২শে মাঘ রবিবার—

আজ মথুরা হইতে অভয়ের পত্র পাইলাম মা বাবাকে লিখাইয়াছেন, **"আমার জন্য চিন্তা করিও না, একের চিন্তায় থাকিতে চেষ্টা করিও এ শরীরটার গতিবিধি জানিতে পারিবে" ইত্যাদি ইত্যাদি।**

২৭শে মাঘ শুক্রবার—

আজ কলিকাতা হইতে অভয়ের ও যতীশ গুহ মহাশয়ের পত্রে জানিলাম মা অভয়কে কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন, কয়েকদিন পর সে আবার মার কাছে যাইবে। মা কিছুদিন গুপ্তভাবে থাকিবেন। মা কোথায় আছেন বা মার কাছে কে কে আছে, তাহা অভয় কিছু প্রকাশ করিতেছে না। সাধনের চিঠিও পাইলাম। মার ঠিকানা তাহাকে জানাইয়াছে। কিন্তু তাহা প্রকাশ করা নিষেধ, তাই জানাইল না। মার নামের চিঠিপত্র সব মার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছে।

৩রা ফাল্গুন, বুধবার—

খবর পাইলাম অভয় ১লা ফাল্গুন পুনরায় মার নিকট চলিয়া গিয়াছে।

৪ঠা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—

আজ দুপুরে অভয়ের টেলিগ্রাম আসিয়াছে,—'স্বামী অখণ্ডানন্দজী ও মনোরঞ্জন ব্রহ্মচারীকে মার নিকট যাইতে মা আদেশ দিয়াছেন।' নবদ্বীপ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। আগামী কল্যই স্বামীজী রওনা হইবেন স্থির করিয়াছেন।

৫ই ফাল্গুন, শুক্রবার—

আজ অখণ্ডানন্দ স্বামীজী মনোরঞ্জনকে নিয়া মার কাছে রওনা হইয়া গেলেন। আমিই শুধু মেয়েদের নিয়া বাগানে রহিলাম। মার কি ইচ্ছা, মা'ই জানেন! আজ শিবরাত্রি। মেয়েদের নিয়া রাত্রি প্রায় ২॥০টা পর্য্যন্ত পূজা, জপ, কীর্ত্তনাদিতে কাটাইলাম।

৭ই ফাল্গুন রবিবার—

নবদ্বীপ হইতে অভয়ের পত্র আসিয়াছে। মা কতদিন নবদ্বীপে থাকেন ঠিক নাই। শরীর ঠিক থাকিলে আর কিছুদিন হয়ত এই ভাবেই থাকিবেন। কাল যতীশ দাদার পত্রে জানিলাম মার নবদ্বীপ অবস্থানের খবর অভয় কলিকাতাতেও টেলিগ্রামে জানাইয়াছে।

৮ই ফাল্গুন সোমবার—

আজ বৈকালে বাবার টেলিগ্রাম পাইলাম। মা আজই পুরী পৌছিয়াছেন। শরীর ভাল নয়।

১০ই ফাল্গুন বুধবার—

আজ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর ও কলিকাতা হইতে যতীশ গুহ মহাশয়ের পত্রে জানিলাম মা তের দিন পর্য্যন্ত ছোট একটা ভাঙ্গা নৌকা

করিয়া খেওয়া ঘাটে ছিলেন। দিনে লোকালয় ছাড়িয়া দূরে গিয়া গোপনে থাকিতেন। রাত্রিতে ঘাটে আসিয়া থাকিতেন। মাঝিদের পাহারাতে কাটাইতেন। অভয় সেইখানেই মাকে রাখিয়া কলিকাতায় যায়; মা ও রুমাদেবী নৌকায় ছিলেন। ৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বাইরে দেখা দেন। সেই দিনই অভয় নানাস্থানে টেলিগ্রাম করে, টেলিগ্রাম পাইয়া বহরমপুর, কলিকাতা, শ্রীরামপুর, প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকেই মার কাছে যায়। ৬ই ফাল্গুন শনিবার মা উপস্থিত সকলকে নিয়া সখীমার কাছে যান, তাঁহার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। ৭ই ফাল্গুন রবিবার—মা সকলকে নিয়া বেলা ৪টায় নবদ্বীপ ছাড়িয়া প্রায় ৭॥০ টায় শিয়ালদহ পৌছিয়া তথা হইতেই হাওড়া চলিয়া গিয়া ৮॥০ টার ট্রেনে পুরী চলিয়া যান। সঙ্গে শুধু অভয়, রুমা দেবী, স্বামীজী এবং মনোরঞ্জন গিয়াছে। স্বামীজীকে শীঘ্রই ঢাকা পাঠাইবেন। মা কতদিন পুরী থাকেন ঠিক নাই এবং তথা হইতে কোথা যান ঠিক নাই। মা পুরীতে স্বর্গদ্বারে আনন্দময়ী আশ্রমেই আছেন।

১২ই ফাল্গুন শুক্রবার—

আজ পুরী হইতে স্বামীজীর লিখিত পত্র পাইলাম। তিনি লিখিতেছেন মার আদেশে আজই ঢাকা রওনা হইতেছেন। মার শরীর ভাল নয়, দুধ ও একটু তরকারী সিদ্ধ খান। কতদিন এখানে থাকেন ঠিক নাই।

১৭ই ফাল্গুন বুধবার—

আমি আজ ৪।৫ দিন যাবৎ বিন্ধ্যাচল আশ্রমে মেয়েদের নিয়া আসিয়াছি। আজ কলিকাতা হইতে সজ্জা দেবীর চিঠিতে জানিলাম

মা পুরী হইতে কলিকাতা হইয়া, দেওঘর চলিয়া গেলেন। বির্গার মন্দিরে ছিলেন। কুমিল্লার সোভামার সহিত মার দেখা হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। দেওঘর হইতে ভ্রমর ও শাশ্বতানন্দ চিঠি লিখিয়াছেন তাহা বৈকালে পাইলাম। মা গত ১৪ই ফাল্গুন রবিবার প্রাতে কলিকাতা পৌঁছিয়া দুপুরের গাড়ীতেই দেওঘর চলিয়া যান। দেওঘরে নির্ব্বাণ মঠে আছেন। সঙ্গে ভ্রমর ও মেজদিদি প্রভৃতি ৭।৮ জন কলিকাতা হইতে গিয়াছেন।

১৯শে ফাল্গুন শুক্রবার—

আজ বেলা প্রায় সাড়ে বারটায় এক তার পাইলাম। দেওঘর হইতে শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল বাবু জানাইয়াছেন, মা গতকল্য কাশী রওনা হইয়া গিয়াছেন। তার পাইয়াই আমি ১।। টার গাড়ীতে কাশী যাইয়া হরির বাঙ্গালীর ধর্ম্মশালায় মাকে পাইলাম, মার শরীর খুব দুর্বল দেখিলাম। আমার ৪।৬ দিন যাবৎ জ্বর, দাঁড়াইলেই সমস্ত শরীর কাঁপে। এই অবস্থায় মার কৃপায় পাহাড়ের উপর হইতে একলাই চলিয়া আসিয়াছি। ভালই আছি।

২০শে ফাল্গুন শনিবার—

আজ এক ভদ্রলোক মার সঙ্গে নানা কথা বলিতেছিলেন। ভদ্রলোকটি কথায় কথায় বলিতেছেন, "আমার অবস্থা দেখিয়া আপনার কি মনে হয়, আমি সংসার না করিয়া একেবারে ত্যাগের পথেই চলিতে পারিব, না বিবাহাদির ভিতর দিয়াই আমার উন্নতি হইবে ?"

মা বলিলেন "সকলের ত এক পথ নয়, কাহারও কাহারও হয়ত একেবারে ত্যাগের পথই দরকার আবার কাহারও কাহারও হয়ত ভোগের

ভিতর দিয়াই যাইতে হয়।" এই রকম অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। শঙ্করানন্দ স্বামীজী কাছে বসিয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন "মা এই ছেলেটি বিবাহ করে নাই। সাধন সমর আশ্রমের সত্যদেব ঠাকুরের গুরু বিজয় চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ১৪ বৎসর ছিল। তারপর এখন জিতেন ঠাকুর মহাশয়ের ওখানে থাকে।" মা মৃদু হাঁসিয়া বলিলেলন, "বিবাহ করিবার কি ইচ্ছাও নাই?" তখন জানা গেল, ছেলেটির সম্প্রতি বিবাহ করিবার ইচ্ছা, কিন্তু দ্বিধায় পড়িয়াছে। মাকে পুনঃ পুনঃ, তাহার কি পথ জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন "দেখ ব্যক্তিগত ভাবে এই রকম বলা সব সময় হয় না তবে তোমাকে বলিতেছি তুমি সৎসঙ্গ কর এবং একটা আশ্রয় নিতে চেষ্টা কর, গুরুর আশ্রয় নিলেই তোমার কোন পথ তাহা তোমার নিকট আসিয়া যাইবে।"

কথায় কথায় বেলা প্রায় ১০টা বাজিয়া গেল। মা কিছু পূর্ব্বেই বলিয়াছে, "আজ দুপুরের গাড়ীতে বিন্ধ্যাচল যাওয়ার ব্যবস্থা কর"। কিন্তু বেলা ১০টা বাজিতেই দেখা গেল সহরে ভয়ানক ভাবে হিন্দু মুসলমানের মারামারি লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মশালার নিকটেও কিছু কিছু হইয়া গেল। অবস্থা খারাপ দেখিয়া ১২টার পর হইতে ২৪ ঘণ্টার জন্য রাস্তায় বাহির হওয়া নিষেধ হইয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল "মা আজ তাহা হইলে যাওয়া হয় না।" মা বলিলেন "১২টার পুর্ব্বে ষ্টেশনে গেলে হয়" কিন্তু সকলের তাহাতে বিশেষ মত হইল না। তখন মা বলিলেন, "বেশ তোমাদের উপর ভার রহিল তোমাদের যাহা ভাল মনে হয় তাই করিও।" বেলা প্রায় ১১টায় বাচ্চুর মা শ্রীশ্রীমাকে খাওয়াইতে বসিয়াছেন এর মধ্যে এলাহবাদ হইতে জীতেনদাদা আসিয়া উপস্থিত, মার কাশী রওনা হইবার খবর তাঁহাদের দেওয়া হইয়াছিল। জীতেন

দাদা সব শুনিয়া বলিলেন, 'আমার বন্ধুর ২ খানা মোটরে তোমাদের ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিতে পারি। যদি যাইতে হয় এখনই রওনা হওয়া দরকার। তখনই আমরা মাকে নিয়া রওনা হইয়া গেলাম। বৈকালে বিন্ধ্যাচল পৌছিলাম।

মার আদেশে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি হইতে দোল পূর্ণিমা পর্য্যন্ত দৈনিক হোম ছাড়াও অন্ততঃ ১০ হাজার হোম বেশী হয়। এবার শ্রদ্ধেয় নিবারণ বাবু ঐ সময়েতে এক লক্ষ আহুতি সঙ্কল্প করিয়াছেন। আগামী কল্য দোল পূর্ণিমা, নিবারণ বাবু ও বিরাজ দিদির মহা আনন্দ যে আহুতি শেষ হইবার সময় মা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মা বলিলেন "দেখ যাহা হইবার তাহা এই ভাবেই হইয়া যায়। জীতেন গিয়া উপস্থিত হইয়া নিয়া না আসিলে, আজ ত আসা বন্ধই হইয়া গিয়াছিল। আমি দেখিয়াছিলাম যে জীতেন আসিতেছে কিন্তু এসব প্রায় প্রকাশ হয় না।"

সম্প্রতি স্বামী অখণ্ডানন্দজী একখানা নূতন ঘর উঠাইয়া গিয়াছেন তাহাতেই মার শুইবার জায়গা করা হইল। পাহাড়ের উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর; ডাক্তার উপেন্দ্রবাবুও এখানেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেরই মাকে পাইয়া আনন্দ। রাত্রি প্রায় ১১টায় মা শয়ন করিলেন।

২১শে ফাল্গুন রবিবার—

আজ বেলা আটটায় মা উঠিলেন। উঠিয়া শঙ্করানন্দ স্বামীজীকে বলিলেন "চল বাবা একটু হাটিয়া আসি।" প্রায় আধ ঘণ্টা হাঁটিয়া আসিলেন। পরে মেজদিদি মাকে খাওয়াইতে বসিলেন। খাইতে

বসিয়াছেন এর মধ্যে নানা কথা উঠিয়াছে; স্বামীজী ও আমি কাছে বসিয়া আছি। আমার জ্বর, তাই আজ খাওয়াইতেছি না। কথা হইতেছে, ঢাকা আশ্রম হইতে চিঠি আসিয়াছে, কথা এই যে—সকলেই **মার** কথানুসারে চলিতে রাজি আর কাহারও কথা প্রায় কেহ শুনিতে রাজি নয়। এই জন্য কাজ কর্ম্মের মধ্যে গণ্ডগোল লাগিয়াই আছে। **মাকে** এ বিষয়ের কথা অনেক বলা হইয়াছিল। কিছু পরে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তুমি কি বল মা?" **মা** যেন কোথা হইতে আসিলেন, বলিলেন, "কি কথার কি বলিব?" স্বামীজী বলিলেন 'বেশ আছ এতক্ষণ আমরা কি বলিলাম?" **মা** বলিলেন, "সত্যি বাবা দিন দিনই যেন আরও কেমন হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কি রকম জান? যেমন, একটা কোন স্থানে একটা কিছু (ধর পাথরের টুকরা), লাগিয়া একটু শব্দ হইল, শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই দেখ, পাথরের টুকরা পড়িয়া গিয়াছে, যেইখানে সেইখানে। এই রকম আর কি,—শরীর আছে তাই এই টুকু হইতেছে। এক এক সময় হয়ত কত কথা বলিয়া আসিলাম"। এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "**মা** তোমার ত এই অবস্থা, সকলেই বলে '**মার** মুখের কথা ছাড়া, অন্য কথা শুনিব কেন?'—এত আশ্রম হইতেছে, ইহাতে কত কাজ চলিবে, এই ভাবে কি করিয়া হইবে? একটা শৃঙ্খলা চাই ত?" **মা** বলিলেন, "আমার ত এক কথা, **'তোমরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া যাহাতে তোমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয় তাই কর। আর দেখ যাহা যাহা হইবার তাহা হইয়াই যাইবে"**—এই বলিয়া হাঁসিতে লাগিলেন।

এতক্ষণ **মা** তরুকুটীরে, যেখানে **মার** শুইবার জায়গা করা হইয়াছে, বসিয়াই হঠাৎ উঠিয়া বাহিরে চলিলেন, এদিক ওদিক ঘুরিয়া বজ্র মন্দিরে

গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠিক সেই সময়তেই নিবারণ দাদা লক্ষ আহুতি শেষ করিয়াছেন। তিনি ঠিক ঐ সময়তে মাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। ভূমিতে লুটাইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। নিবারণ দাদা বড় ভাল মানুষ। তাঁহার বেশ নির্ভর ভাব আছে। মা আসুক এ প্রার্থনাও তাঁহার নাই 'দরকার হইলে মা আসিবেনই'—এই তাঁহার ভাব। মা বলিলেন, "লক্ষ আহুতি পূর্ণ হইল, আরতি টারতি করিলি না? একটু আরতি কর। আমরা সকলে দেখি।" অমনি নিবারণ বাবু আরতির ব্যবস্থা করিলেন। মা যজ্ঞ মন্দিরেই বসিয়া আছেন নিবারণদাদা, বিরাজদিদি, স্বামীজী (শঙ্করানন্দ), শান্তিপ্রিয়া, অভয় ও আমি আছি। মা চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিতেছেন, "আগুন থাকায় চারিদিকে দেওয়াল ছাদ এমন কি বাসন গুলি পর্য্যন্ত ধূয়ার রং হইয়া গিয়াছে। এমনই হয় কিন্তু। আগুন থাকিলেই রং বদলাইয়া যায়।" এই বলিয়াই বিরাজ দিদির দিকে চাহিয়া বলিতেছেন "তোমরা এই বাসনগুলি মাজিতে পার না? পূজার বাসন পত্র ঝক ঝক হওয়া চাই, জায়গা পরিষ্কার থাকা চাই, তাহা হইলে পূজা করিতে বসিয়াও মনটা পরিষ্কার হয়। (শরীর দেখাইয়া বলিতেছেন) এই বাসনটাও তোমরা ময়লা রাখ, বাহিরের বাসনও তাই" তখন বিরাজ দিদি বলিলেন "বাহিরের বাসন না হয় মাজিয়া পরিষ্কার করিলাম কিন্তু এই ভিতর কি করিয়া পরিষ্কার করি?" মা বলিলেন, "শরীরটাও ত পূজার বাসনই, তোমরা এই কথা মনে রাখিও যে এটা পুজার বাসন ও ইহার দ্বারা শুধু পূজারই কাজ করিতে চেষ্টা করিও, তবেই দেখিবে ভিতরও পরিষ্কার হইয়া আসিবে।"

এই সব কথা বার্ত্তার পর মা শুইবার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বিরাজ দিদি এবং অন্যান্য অনেকেই মার পায়ে আবির দিতে গেলেন। মাও সকলের কপালে ফোঁটা দিয়া দিলেন, বলিলেন, "নারায়ণের কপালে দিতেছি।" এই ভাবে আনন্দ করিয়া মা আবার শুইয়া পড়িলেন।

বৈকালে মির্জাপুর হইতে অনেকে আসিয়াছেন। কথাবার্ত্তা হইতেছে, কথায় কথায় মা একজনকে বলিতেছেন, "আচ্ছা বাবা সংসার ভাল, কি ত্যাগের পথে যাওয়া ভাল?" ভদ্রলোকটী বলিতেছেন, 'আমরা সংসারী, আমাদের পক্ষে সংসারই ভাল। তবে সংসারে দুঃখই বেশী, ইহা ঠিকই।" মা বলিলেন, "তবে ত্যাগের পথে যাও না কেন?" ভদ্রলোকটি বলিল, 'এইত মোহ, মোহ যাইতে দেয়না। আমরা জানি কিন্তু পারি না।" একজন বলিলেন, 'মা আমাদের কর্ত্তব্য কি?' মা বলিলেন, "তোমরা খাল কাটিয়া যাও, জল যখন আসিবার আসিবে। দেখ না, ক্যানেল কাটিয়া এই গঙ্গাজল কত স্থানে নিয়া সকলে শান্ত হইতেছে, অর্থাৎ জল খাইতেছে, জলে শস্যাদি হইতেছে। তাহা খাইয়া সকলে বাঁচিয়া যাইতেছে, অমৃতের সন্ধান কর।" একজন বলিলেন, 'রাস্তা কোনটা তাই জানিনা। কোন্ পথে চলিব?" মা বলিলেন, "তোমরা দরজা বন্ধ করিয়া থাকিলে রাস্তা কি করিয়া দেখিবে? যে কোন সাহায্যে দরজা খুলিয়া বাহির ত হও, দেখিবে রাস্তা দেখা যাইবে। সেই রাস্তায় চলিতে থাক, দেখিবে পথের যাত্রী, লোক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে কোথায় যাইবে? এই রাস্তা ঠিক নয় ঐ রাস্তায় যাও। এই রকম হইয়া যায়। তুমি শুধু সেই লক্ষ্য ধরিয়া চলিতে থাক, দেখিবে কেহ না কেহ আসিয়া রাস্তা দেখাইয়া দিয়া যাইবে। তোমরা শুধু যাইবার চেষ্টা করিতে থাক, যতটুকু শক্তি, করিয়া যাও—সাহায্য পাইবেই।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে মাকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। মা বলিতেছেন, "দেখ সংসার কি রকম জান? যেন কাঁটার মধ্যে গিয়া ঢুকিয়াছ চারিদিকে কাঁটা লাগিয়া যাইতেছে; একদিক ছাড়াইতেই অন্যদিকে লাগিতেছে। এইভাবে চেষ্টা করিতেছ, তোমার এই অবস্থা দেখিয়া একজন আসিয়া তোমাকে সাহায্য করিয়া কাঁটা ছাড়াইয়া বাহির করিয়া দিল। এই রকম হয়। তুমি চেষ্টা করিতে থাক দেখিবে সাহায্য মিলিবেই।" আজও রাত্রিতে শুইতে শুইতে প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল।

২২শে ফাল্গুন সোমবার—

আজ সকালে মা ঘুরিয়া আসিয়া বসিয়াছেন। ঘরে শঙ্করানন্দ স্বামীজী ও উপেন্দ্রবাবু প্রভৃতি বসিয়া আছেন। মা উপেন্দ্রবাবুকে বলিতেছেন, "আচ্ছা বাবা, এই যে কেহ কেহ বলে, সংসার ত্যাগ করিয়া গেলে পাছে পরিবারদের ভোগে কাঁটা দেওয়া হয়? এই মনে করিয়া যে তাহাদের দুঃখ হয় ও এই দুঃখের জ্বালায় আবার ফিরিয়া আসিতে হয়; আবার এই ভয়ে বাহিরই হয় না।—এ কথাটা তোমার কেমন মনে হয়?" উপেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমার মনে হয় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়া যাওয়া উচিত। তাহাকেও আশ্রমে রাখিয়া তাহাকেও ধর্ম্মাভাবে চালাইবার চেষ্টা করা উচিৎ। তবেই ধীরে ধীরে দুই জনেরই শান্ত ভাব আসে"। শঙ্করানন্দকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "একেবারে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত কর্ত্তব্য বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে ছাড়া ঠিক নয়। কিন্তু একটু যদি ঐ দিকে দৃষ্টি যায় তখন আর কর্ত্তব্য বুদ্ধি এইভাবে থাকে না।" এই সব কথা বার্ত্তার পর মা বলিলেন, "দেখ, এই কর্ত্তব্য বুদ্ধি যতক্ষণ, মায়াও ততক্ষণ। তুমি রক্ষা করিবার কে?

তোমায় যিনি চালাইতেছেন, তোমার পরিবার বর্গকেও তিনিই চালাইয়া নিবেন,—এ বুদ্ধি ত আসে না। তোমার মধ্যে যে বাসনা আছে তাই তোমার কাছে কর্ত্তব্যরূপে দেখা দিতেছে।"—এই বলিয়া হাঁসিতে লাগিলেন।

২৩শে ফাল্গুন মঙ্গলবার—

আজ দুপুরে কয়েকজন স্ত্রীলোক মির্জাপুর হইতে আসিয়াছেন। শ্রীশবাবুর স্ত্রীও আসিয়াছেন, তাঁহার সন্তানাদি নাই। মা কথায় কথায় হাঁসিয়া বলিতেছেন, "আমার খেয়াল হইতেছে ছেলে মেয়ে দুইটা আমি হইয়া যাই।" এই বলিয়া হাঁসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এই সন্তান-টাকে পালিতে হইলে কি কর্‌বে? আমার অল্পে সল্পে চলবে না।" আমি হাঁসিয়া বলিলাম, "এ যে ষোল আনা চাই।" এর মধ্যে ব্রহ্মচারীণী মেয়েরা আসিয়াছে, আমি বলিলাম, "এই দুটি মেয়ে বাপ্ মা ছাড়িয়া আশ্রমে আসিয়াছে। মা অমনি হাঁসিয়া বলিলেন "বাপ মা ছাড়িয়া আসিয়াছে কোথায়, বাপ মা পাইতে আসিয়াছে।"

একটি এ দেশীয় উকিলের স্ত্রী মাকে বলিতেছেন, "মা, মনটা স্থির ত হয় না। বরং ভগবানের নাম করিতে বসিলেই আরও যত বাজে চিন্তা আসে।" মা হাঁসিয়া বলিলেন "দেখনা আয়নাটা সাম্‌নে রাখিয়া যদি মুখ খানা ঘুরাইতে ফিরাইতে থাক, তবে কি কিছু দেখা যায়? কিন্তু যদি আয়নাটা সাম্‌নে রাখিয়া মুখ খানা স্থির ভাবে আয়নার দিকে রাখ, তবেই মুখের ভিতর, চোখের ভিতর, নাকের ভিতর, সব জায়গায় কি কি আছে খুঁটি নাটি সব দেখিতে পারিবে। আয়নার ভিতর ফুটিয়া উঠিবে। আর শান্তি পাওনা বল ত? শান্তি কিসে পাইবে? কাঁচা খাও কিনা তাই অসুখ হয়। ভাল করিয়া পাক করিয়া খাও তবে ত তৃপ্তি। পাক করিতে হইলেও প্রথমে হয়ত তরকারীটা কাটিলে, তাহাতেই

কিন্তু সিদ্ধ হইল না, তবে, ছোট ছোট হইল বটে। তারপর আগুনের উপর না চড়াইলে সিদ্ধ হইবে না কিন্তু জলদিয়া, মসলা দিয়া, আগুনের উপর চড়াইয়া ঢাকিয়া দাও তবে ত সিদ্ধ হইবে। আর সেই সিদ্ধ জিনিষ নামাইয়া তারপর খাও, দেখিবে তৃপ্তি হইয়াছে, আগুনের উপর বসাইয়া চলিয়া গেলেই কিন্তু হইবে না—অনবরত দেখিতে হয়, আগুন ঠিক জ্বলিতেছে কিনা। না জ্বলিলে, লকৃড়ি দেও"—এই বলিয়া মধুর হাঁসি হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীশবাবুর স্ত্রীর সন্তানাদি নাই, তাই ভাসুরের ছেলে মেয়েরা কাছে থাকে, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আসিয়াছে। মা তাহাদের সহিত কত রকমে আনন্দ করিতেছেন ; তারপর তাহাদের বন্ধু বলিয়া ডাকিলেন, বন্ধুদের কি কি করিতে হইবে, অর্থাৎ পাঁচটি কাজ (১) সকালে উঠে ভগবানকে ডাকবে ও বলবে হে ভগবান আমি যেন ভাল মেয়ে বা ছেলে হতে পারি। ২। সত্য কথা বলিবে। ৩। গুরুজনদের আদেশ পালন কর্‌বে। ৪। মনযোগ দিয়ে লেখাপড়া করিবে। ৫। তারপর খুব দুষ্টামি করবে।" এই বলিয়া আনন্দ করিতেছেন।

আবার মধ্যে মধ্যে অন্যান্য সকলের সঙ্গেও উপদেশ পূর্ণ কোন কোন কথা বলিতেছেন, "যেমন ফলের মধ্যে বীজ থাকে, তেমনই বাসনা কামনার ও বীজ আছে। বীজযুক্ত ফল যেমন কত যত্নে সিদ্ধ করিয়া ফেলিলে তবে তাহার ভিতরের বীজের বীজত্ব নষ্ট হয়, তেমনই সাধন ভজন দ্বারা বাসনার বীজ নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়।" আবার খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিতেছেন, গাঠরী খোল, বহুতদূর যানে পড়ে গা, এ'ত সব ধর্ম্মশালার আছ, আপনা ঘর ঢুঁড়ো। দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া গেলেই শরীর পড়িয়া থাকিবে, তখন কে কার ? সব ঝুট, ঝুটত' ফুটই জাতা হায়।"
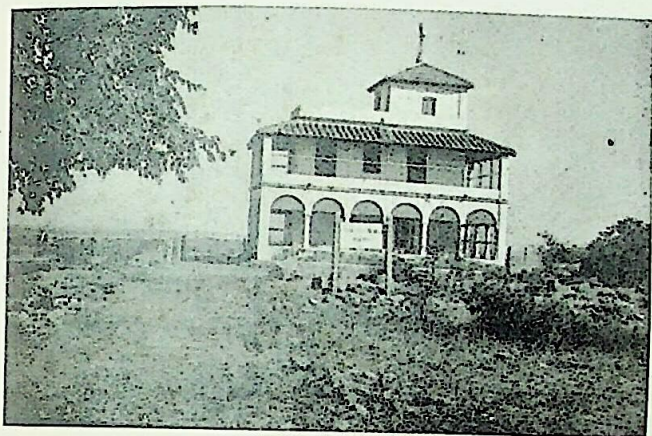
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম বিন্ধ্যাচল
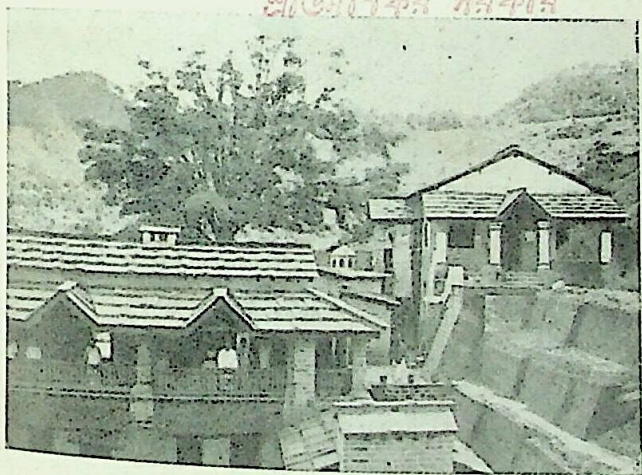
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম আলমোড়া

২৪শে ফাল্গুন বুধবার—

আজ দুপুরে কথায় কথায় বলিতেছেন, "যখন এই শরীরটার ভিতর পূজাদির ক্রিয়াগুলি ঐ ভাবে হইয়া গিয়াছিল, তারপর যখন আবার ঐ ক্রিয়াগুলি বন্ধ হইয়া গেল তখন ভিতরে মন্ত্র এমন চলিত যে, অনবরত ঘড়ির কাঁটার মত টক্ টক্ টক্ শব্দ হইত। যদি সাম্‌নে কেহ খেয়াল করিয়া বসিত, তবে সে শুনিতে পাইত, এমন আওয়াজ হইত। আল্ জিহ্বাটা যেন ঐ মন্ত্র চলার দরুণ অনবরত নড়িত। ঐ স্থানেই শব্দ হইত। আজও অনেকে আসিয়াছেন নানা কথাবার্ত্তা হইল।

২৫শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার—

প্রতিদিনেই ভোরে ও বৈকালে মা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতেছেন। আমরা বলিয়াছি, "একটু হাঁটিলে শরীর একটু ভাল হইবে।" ২।৪ দিন যাবৎ হাটিতেছেন, ক'দিন চলিবে ঠিক নাই।—

রাত্রিতে মা ও আমি নূতন টিনের ঘরটায় আছি। রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। হঠাৎ আমি শুনিলাম মা যেন ডাকিতেছেন, "খুকুনী, খুকুনী" দুইবার ডাক শুনিয়া, হঠাৎ আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম। মা কতকটা অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দে।" তাই দিলাম। পরে গরম বেশী হওয়ায়, আমি বাতাস করিতে বসিলাম। মা চোখ বুজিয়াই অস্পষ্টস্বরে বলিতেছেন, "দেখিতেছি কি জানিস, যেন নিজেই মারিতেছি নিজেই চোট পাইতেছি"—এই রকম বলিয়াই চুপ করিলেন।

২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার—

আজও সকালে মা হাঁটিয়া আসিয়াছেন তাহার পর কথাবার্ত্তা

হইতেছে। বেলা প্রায় ১১টায় ভোগে বসাইয়াছি। এমন সময় হঠাৎ চালের একটা কাঠ খুলিয়া শঙ্করানন্দের মাথায় পড়িয়া হাতের উপর পড়িয়া গেল। তিনি মার খাওয়ার নিকটেই বসিয়াছিলেন। কাঠটা মোটা ও ভারি তাই মাথা ও হাত কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সকলে ব্যস্ত হইয়া জল দিতে লাগিলেন। মা খানিক পরে একটু মৃদু হাঁসিয়া বলিলেন "খুকুনী কাল রাত্রিতে বলিয়াছিলাম" প্রথমে আমার সবটা মনে পড়িতেছিলনা পরে মনে পড়িল মা বলিয়াছিলেন "নিজেই মারিতেছি, আবার এই শরীরেই চোট পাইতেছি।" মা বলিলেন "বাবার (স্বামীজীর) এই মূর্ত্তিটাই চোখে পড়িয়াছিল, খেয়াল হইলে কি হয় জান? অনেক সময় খুব বেশী হওয়াও থাকে কিন্তু খুব অল্পের ভিতর দিয়া যায়।" তাই হইল, স্বামীজীর চোট খুব বেশী হয় নাই ব্যথাও বেশী হইল না।

আজ কথায় কথায়, "শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী" বইতে দ্বিতীয় ভাগে যে একখানি ফটো দেওয়া হইয়াছে যাহার নীচে লেখা হইয়াছে,—"মা জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়াছেন, দেখ্‌না বসিয়া বসিয়া কেহ কেহ দেহত্যাগ করে"—সেই কথায় মা বলিতেছেন, "এই শরীরটারত তোমাদের মত ইচ্ছা করিয়া কিছু হয়না আপনা আপনি হইয়া যাইত।" আজও মির্জাপুরের এক জজ্‌ সাহেব এবং আরও ২।৪ জন আসিয়াছেন, মার কথায় সকলেই একটা আনন্দ পাইয়া যাইতেছেন। সুমধুর ভাবে ও ভাষায় কত অমূল্য উপদেশ বিলাইতেছেন।

২৭শে ফাল্গুন শনিবার—

আজ অনেকে আসিয়াছেন কথাবার্ত্তা হইল। একটি ভদ্রলোক

তাঁহার রুগ্ন ছেলেকে নিয়া পাহাড়ে আসিয়াছেন। কয়েকদিন যাবৎ তিনি মার নিকট আসিতেছেন, মা একদিন হাঁটিতে হাঁটিতে ঐ ভদ্রলোক যে বাংলায় আছেন সেদিকে গিয়াছিলেন, বাহিরে বাহিরে হাঁটিয়া আসিয়াছেন। আজ ভদ্রলোকটি আসিয়া অনেক অনুরোধ করিয়া মাকে একবার ছেলেটিকে দর্শন করাইবার জন্য নিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে মা আমাকে বলিতেছেন, "কত জনে কত স্থানে কত মন্দিরে নিয়া যায়, আজও তেমনিই বাবাজী আমাকে রোগের এক মূর্ত্তি দেখাইতে নিয়া যাইতেছেন। এ ও ত' তাঁহারই এক মুর্ত্তি।"

আজ সন্ধ্যায় গোবিন্দ পাণ্ডেজি ও তাঁহার সঙ্গীটী কাশী হইতে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহার মুখে কাশীর ভয়ঙ্কর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার কথা শুনিতেছি। বড়ই ভয়ানক অবস্থা চলিতেছে।

মা আজ বৈকালে বিছানায় বসিয়া আছেন, আমরা ২।৪ জন কাছে বসিয়া আছি। মা নিজেই রচনা করিয়া গান ধরিলেন—

'গোকুল বিহারী, দয়াময় হরি,
বৃন্দাবন বনচারী,'

অতি সুমধুর স্বরে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এই গান গাহিতেছেন। আমি হাঁসিয়া সকলকে বলিলাম, "এই গান কিন্তু নিজেরই রচনা হইতেছে।" মা হাঁসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাঁসিয়া উঠিলেন। আমি হাঁসিয়া বলিলাম, "তোমার বৈষ্ণবভাব প্রবল কিন্তু," মা হাঁসিয়া বলিলেন, "তোমরা এমন কর কেন? বৈষ্ণব শাক্ত কি? নিজেই নিজেকে নিয়ে খেলা! আত্মারামের লীলা" আবার বলিতেছেন, "সবই আরাম কিছুই নাই বেয়ারাম"—এই বলিয়া হাঁসিতে লাগিলেন। কে একজন হাঁসিয়া বলিল "ছন্দ টন্দের দরকার

নাই। যাহা মুখে আসিতেছে, মিলাইয়া যাইতেছেন।" মাও অমনি জবাব দিলেন, "ছন্দ দিয়া বন্ধ করিতে চাও কেন? ছন্দ বন্ধের আমার দরকার কি? তোরা বন্ধে আছিস্ বন্ধ কর। বন্ধে থেকে যেন গন্ধ করিস্ না, যাতে সুগন্ধ হয়, যে বন্ধে বন্ধন বন্ধ হয়, সেই বন্ধন নে। নিজেকে বান্ধ। তাঁকে নিয়ে কাঁদ পাবি। তাঁহাকে পাওয়ার ফাঁদ, হয়ে যাবে তার চরণে বান্ধ।"

"একজন নাকি বলেছিল আরে কবিতাত এও "ওগো লক্ষ্মী ধর দেখি পক্ষী," এই শরীরের কবিতাত এই রকমই, তোদের কিছু একটা নিয়ে হাঁসিবার ব্যবস্থা আর কি!" সকলেই এ কথায় হাঁসিয়া উঠিলেন। মাও হাঁসিতে লাগিলেন। লোক জন আসিলে তাদের জিজ্ঞাসার মধ্যে মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছে। আবার কখনও কখনও শুধুই আমোদ আনন্দ চলিতেছে।

২৮শে ফাল্গুন রবিবার—

আজ সকালে কথায় কথায় অভয় জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'আচ্ছা মা ভোলানাথ যে রাগ করিতেন, আপনার ভিতরে কি। কিছুই লাগিত না?" মা হাঁসিয়া বলিলেন, "কিছুই না।" অভয় বলিল, "আচ্ছা, কেউ যদি একটা কিল দেয় আপনার গায়. তবুও কিছু লাগিবে না?" মা বলিলেন, "কি করিয়া বুঝাইব যে কিছুই লাগে না; কি বলিলে বুঝ্‌বি?" আমি বলিলাম, "আবার ত দেখা যায় বলিতেছেন মশায় কামড়াইল কি এই রকম কিছু; ইহা হয়ত শরীরে হইয়া যাইতেছে?" মা বলিলেন, "শরীর আছে বলিয়া যেমন দেখছিস' খাওয়া হয়, বাহ্য প্রস্রাব হইতেছে, সেই রকম আর কি!" তখন আমাদের মধ্যে কথা হইল, লাগিতেছে আবার লাগিতেছে না।

এই দুইটাই যুগপৎ চলে। মা বলিলেন, "সবই এই রকম দেখিস।" মার শীত লাগে কিনা, এই কথা হইল। মা বলিতেছেন, "এখন তোমরা জামা জুতা পরাইতেছ, আমিও গায় দিতেছি, আবার যখন শ্রীপুর, নরুন্দি, আওর বাবার (ভোলানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) কাছে থাকা হইত. তখন বলিয়া দিয়াছিল, স্নান করিয়া রান্না করিতে হইবে।' মাঘ মাসে ভোরে বাসি জল দিয়া স্নান করিয়া আসিতাম, স্নান করিতে হইবে, স্নান করিলাম, ঠাণ্ডা গরমের কোন কথাই নাই। গায় জামা কখনও দেওয়া হইত না। এই ভাবেই কাটিয়া গিয়াছে।"

কথায় কথায় উপেন বাবুর কথা উঠিল, তিনি এক সময়েতে মার পা খানি মাথায় দিয়া শুইয়া থাকিতেন এবং অনুভব করিতেন যেন মাথা হইতে একটা ঠাণ্ডা জিনিষ নামিয়া আসিয়া সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা শান্ত করিয়া দিতেছে; ২।৩ দিন পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ ভাব থাকিত। উপেন বাবু এখানেই আছেন, তাঁহাকে অভয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ঐ কথা আবার বলিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁর ভাবটা ঐ রকম হয়।

আজ মহারতন ছেলে মেয়েদের নিয়া এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছে। দুপুরে মার ঘরে সকলে মিলিয়া অনেকক্ষণ নাম কীর্ত্তন করা হইল ও কথা বার্ত্তা হইল। বিন্ধ্যাচল হইতে দেশীয় স্ত্রীলোক কয়েকজন আসিয়াছেন, মা হঠাৎ বলিতেছেন "তোমাদের দেখিয়াছি," তাহারা বলিল "না মা' আমরা ত আর কখনও এখানে আসি নাই, এই প্রথম তোমাকে দেখিলাম।" মা একেবারে যেন অবাক হইয়া বলিতেছেন, "এ কি জান? তোমরা যে সব ভুলে আছ! এই রকম ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। ভুললে কষ্ট পেতে হয়। কি রকম জান না? যেমন একটা জিনিষ ঘরে আছে, তোমার মনে নাই। তুমি দরকারের সময় খুঁজিয়া পাইতেছনা। খুঁজিয়া

খুঁজিয়া হায়রান হইতেছে।" তখন তাহারা কিছু যেন বুঝিয়া বলিতেছে "হাঁ মা আমরা অন্ধ দুঃখ ত পাবই।" মা বলিতেছেন, "মনে কর তোমাদের সঙ্গে দেখা না-ই কখন? তোমাদের মেয়েটা তোমাদের কোলে বুকেই যে সব সময়।" আবার মা তাহাদের ভাবাতে তাহাদের বলিতেছেন "তোমাদের ঘর কোথায়? কে আছে?" তাহারা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, বলিতেছেন "অমুক স্থানে ঘর, ঘরে আত্মীয় স্বজন আছে।" পরে বুঝিল, বুঝিয়াই আবার বলিতেছে। মা হাঁসিয়া বলিতেছেন, "আমিই যদি আছি, তবে আমাকে ছাড়িয়া এখন যাইতেছ কেন? মনে রাখিও কিন্তু, বহুদূর যাইতে হইবে।" আবার বলিতেছেন "তোমরা একটু কিছু কর, রাস্তায় চল। (অর্থাৎ তাঁর নাম) তারপর আমাকে ভাগ দিও, খাবার না দিলে এ শরীরটা থাকিবে কেন? রবিবার সরকার ছুটি দেয়, তোমরা সংসার হইতে একদিন ছুটি নাওনা কেন? ছুটিতেই ত শান্তি।" ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া সকলকে আনন্দ ও শান্তি দিলেন।

নবতরু দাদার এক চিঠি আসিয়াছে; তিনি লিখিয়াছেন, "রামরাজ (মা যে ভাঙ্গা নৌকায় ১৩ দিন নবদ্বীপ কাটাইয়াছেন সেই নৌকার মাঝি) তোমার দান পেয়ে খুব খুসী হয়েছে। ও নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করিতেছে! সে বল্লে, 'তোমাকে সে প্রায়ই স্মরণ করে এবং তুমি চলিয়া আসিবার পর ৪ দিন সে তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে।' সে আরও বল্লে, 'প্রথমে মনে করেছিলাম, বুঝি বা একটা সাধারণ মেয়ে কিন্তু পরে লক্ষ্য করিতে থাকিলে দেখিলাম, যে ইনি সাধারণ নহেন, কোনও একজন দেবী। কারণ নানা সময় নানা রকম ভাব দেখিতাম। মা করুণাময়ী দেবী।' পুলিশ আসিয়া খবর লইয়াছিল 'মাঝি যাহা

দেখিয়াছিল সবই পুলিশদের কাছে বলিয়াছিল। পুলিশ শুনিয়া রাম রাজকে বলিয়াছিল, 'খুব যত্নের সহিত সাবধানে রাখবি।' মা এই চিঠি শুনিয়া হাঁসিয়া বলিলেন, "আমিও দেখিতাম মাঝি মধ্যে মধ্যে খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে, আবার যেই আমি তার দিকে চাহিতাম অমনি চোখ ফিরাইয়া লইত।" সন্ধ্যাবেলায় কীর্ত্তনাদি হইল।

২৯শে ফাল্গুন সোমবার—

আজ মার সঙ্গে কথায় কথায় উঠিল যে, যাহার যাহা ইচ্ছা আমরা মাকে বলিতে সাহস পাই। এমন সব কথাও বলা হয় যাহা আত্মীয় স্বজনেরা সহ্য করিতে পারেননা বা তাহাদেরও এত নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। যাহার রাগ হইতেছে যাহার অভিমান হইতেছে সেই নিঃসঙ্কোচে মাকে যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিয়া যাইতেছে। এমন নীরবে সহ্য করিতেছেন যে তাহাতেই আবার নিজেরাই আঘাত পাইতেছি, অনুতপ্ত হইতেছি। দ্বিধাশূণ্যভাবে মাকে যা'র যা ইচ্ছা রাগের সময় বলিয়া যাওয়া হইতেছে। এই কথায় মা নিজের শরীর দেখাইয়া বলিতেছেন "এই শরীর-টার যদি কোনরূপ সঙ্কোচ থাকিত তবে তোদেরও সঙ্কোচ আসিত। তোরা জীব জ্ঞানে বলিয়া যাইতেছিস, আবার তোরাই ব্যথা পাইতেছিস, ছাড়িয়া কোথাও যাইতেও পারিস্ না। তোদেরও আড় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তোরা জীব বুদ্ধিতে বলিয়া যাস্ বটে, আবার সত্য তোদের ভিতরই ফুটিয়া ওঠে। তখন তোরা বুঝিতে পারিস্।" এই বলিয়া হাঁসিতে লাগিলেন; বাস্তবিকই কোনও সাধুর জীবনেও এইরূপ হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই।

আবার একটা কথা মা মধ্যে মধ্যে বলেন "আচ্ছা তোরা এই শরীরটার

মধ্যে এমন অসাধারণ কি দেখিতেছিস্? তোদের দৃষ্টিতে শিশুকালেও যেমন আবার এখনও তেমনি।" ইহাও ঠিক। "প্রায় সাধু মহাত্মাদেরই দেখা যায় প্রথম অবস্থা হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া একটা ধারায় গিয়া পড়ে সেই ধারাতেই তাঁরা চলিতে থাকেন। কিন্তু এখানে তাও নেই।" বাস্তবিকই মার এখনকার চলাফেরা ও কথাবার্ত্তায় বিশেষ একটা অসাধারণ কিছুই নাই। ছেলেমানুষের মতন খান ঘোরেন শোন। কোনও বাজে গল্প উঠিল তাহাতেই যোগ দিতেছেন, আবার উপদেশপূর্ণ কথাও বলিতেছেন। এক এক সময় এমন সব গল্প গুজব মার কাছে বসিয়া হইতেছে তাহাতে হাঁসি আনন্দ চলিতেছে, অপরিচিত লোক আসিয়া দেখিলে বা শুনিলে তাহার হয়ত একটু আশ্চর্য্যই বোধ হইবে যে, কি সব বাজে কথা নিয়া মার নিকট গল্প ও গুজব চলিতেছে। মাও তাহাতে যোগ দিয়া আনন্দ করিতেছেন। এই কথায় একদিন হাঁসিতে হাঁসিতে বলিতেছেন, **"ঘরে ময়লা আছে, এমন ঝাড়ু দেওয়া হইল যে সব ময়লা কোথায় চলিয়া গেল। এই সব খেলাও তেমনি। ক্ষনেকের জন্য সব নিয়া খেলা হইতেছে, বাহিরে এই রকমই প্রকাশ হইতেছে; আবার তখনই হয়ত সব ধুইয়া মুছিয়া কোথায় চলিয়া গেল।"**

আজ সন্ধ্যায় মা বারান্দায় বসিয়া আছেন। শঙ্করানন্দ স্বামীজী বলিতেছেন, "মা একদিন গীতা শুনাইয়াছিলে, আজ আবার শুনাও।" জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। পাহাড়ের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখা যাইতেছে। মা ছোট ঘরখানার বারান্দায় বসিয়াছেন। আমরা ২।৪জন কাছে বসিয়া আছি। খানিক পরেই মার মুখ হইতে সুন্দর সুরে ধীরে ধীরে স্তোত্রের মত বাহির হইতে লাগিল। মা দুলিতে দুলিতে গানের সুরে ঐ সব

বলিতেছেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে হইল। তারপর অন্যান্য কথাবার্তা আরম্ভ হইল। একবার এই বিন্ধ্যাচলেই মা ছাতের উপর বসিয়া, গীতার কথা উঠিয়াছে। কথায় কথায় মা বলিয়াছিলেন, "গীতা শুনিবে ?" এই বলিয়া কি এর্ক সুরে মা খনিক সময় কিছু শুনাইয়াছিলেন, সেই ভাষা কেহ বুঝিতে না পারলেও বেশ মিষ্টি লাগিয়াছিল। সেদিনও সন্ধ্যার সময়তেই হইয়াছিল। আজ সেই রকম নয়, ভিন্ন এক রকম। রাত্রি প্রায় ১১টায় মা বিশ্রাম করিতে গেলেন।

৩০শে ফাল্গুন মঙ্গলবার—

আজ সকালে শঙ্করানন্দ স্বামী, অভয়, আমি ও আরও ২।১ জন মার ঘরে বসিয়া আছি অনেক কথাবার্তা হইতেছে। কথায় কথায় মার শরীরে যে পূজাদি হইয়া যাইত সেই বিষয়ের কথা উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন, "ঐ ভাবে ক্রিয়াদি হইতেছে, শরীরের ভিতরেই সব প্রকাশ। হয়ত এমন ভাবে আসন করিয়া বসিয়াছি" এই বলিয়া দেখাইতেছেন। আসন গুলি, ছবির ভিতর দেবীরা যে আসন করিয়া বসিয়া আছেন, সেই রকমের,"—মা বলিতেছেন, "এই ভাবে হয়ত বসিয়া আছি। এই অবস্থায় হয়ত কখনও কখনও প্রস্রাবও পাইল তখন উঠিয়াছি। এই ভাবে পা পড়িতেছে (এই বলিয়া পা ফেলিবার ভঙ্গী দেখাইতেছেন)। তাহা কতকটা কালীমূর্ত্তি যদি হাঁটিতেন, তবে বোধহয় এই ভাবের; অথবা কি এক রকম যেন, বুঝাইতে পারিলাম না, দেবী বা দেবভাবের মতই। সাধারণ ভাবে পা ফেলা নয়।" আবার বলিতেছেন, "সমস্ত শরীরে এই রকম ভাবে হইয়া যাইতেছে, (কতকটা অঙ্গন্যাসের মত), কত কি রকম হইয়া যাইতেছে; আবার সমস্ত শরীরে এমন কি বাহ্যদ্বারে প্রস্রাবের

দ্বারেও পূজার মত হইয়া যাইতেছে। এই শরীরটাও যেন একেবারে অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। এই যে তোমরা কি বল, ন্যাসাদি, ন্যাসাদির পর প্রাণ প্রতিষ্ঠার মত হইয়া (এই যে ন্যাস ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা বলা হইল ইহাও আমাদের ভাষা, মা শুধু অঙ্গভঙ্গিগুলি দেখাইতেছেন, তাহা দেখিয়া বোঝা গেল ন্যাস, প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি)-জপ আরম্ভ হইল। তারপর কি হইল জান ? নিজের শরীরের মধ্যেই পূজাদি হইয়া পরে আবার হাতদু'খানি এইভাবে নিজের শরীরের মধ্য হইতেই দেবতা বাহির করিয়া যেন দুই হাত দিয়া বাহিরে বসাইয়া পূজা হইল : আবার ধীরে ধীরে উঠাইয়া নিজের শরীরের মধ্যেই মিলাইয়া দেওয়া হইল ! শরীরের প্রত্যেক স্থানে পূজাদি হইয়া তারপর বাহিরে পূজা হইল।"

আমরা মার কথার ভিতর দিয়া একটা বিশেষ ভাব দেখিতেছি, সাধকগণ প্রথমে দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে যান, আর মার হইল কি ? অদ্বৈতে অবস্থিতই আছেন তার মধ্যে দ্বৈতভাব আনিয়া বাহ্য পূজাদি হইল, আবার অদ্বৈত সেই অদ্বৈতেই অবস্থিত। অদ্বৈত ভাবের মধ্যেই যেন নিজেই দ্বৈত ভাব আনিয়া নিজ হইতে দ্বৈতের সৃষ্টি করিয়া পূজা বা লীলাদি করিলেন, আবার অদ্বৈতেই অবস্থিত হইতেছেন। আমাদের সঙ্গে ব্যবহারও এই ভাবেরই হইতেছে, একটু লক্ষ্য করিলেই ইহা দেখা যায়।

আবার ত্রাটকের কথায় বলিতেছেন, "কখনও দেখ বহুদূরে দৃষ্টি স্থির হইল, ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিতে আসিতে নিজ হইতে ধীরে ধীরে দৃষ্টি উপরের দিকে উঠিতে উঠিতে নাভি, কণ্ঠ, নাশিকা হইয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি গিয়া তথায় লীন হইয়া গেল। কারণ তৃতীয় নেত্র আছে কিনা, সেই বিন্দু তাহাতেই আর কি। আবার কোন সময় চোখের দৃষ্টি দুই চোখেতেই। অর্থাৎ সেই নেত্রবিন্দুতেই আর কি! ঐ বিন্দুতে সিন্ধু। ত্রাটকের

লক্ষ্য বিন্দু-যে উহা অন্তর্বিন্দুতে পাওয়া। আবার ঘাড় বাঁকাইয়া পিছনের দিকে গিয়াছে, পাও হয়ত উল্টাইয়া পিছনের দিকে আছে; সেই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির হইল; আবার হয়ত হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে, আবার হয়ত স্কন্ধে দৃষ্টি স্থির হইল।" এই সব দেখাইয়াও দিতেছেন এইভাবে হইত। আবার বলিতেছেন "এই সব দেখিয়া সাধারণ লোক ভূত পেত্নীর দৃষ্টি হইয়াছে বলিবেনা কেন?" এই বলিয়া হাঁসিতে লাগিলেন।

১লা চৈত্র বুধবার—

আজও অনেকে আসিয়াছেন। মির্জাপুর হইতে স্ত্রী পুরুষ অনেকেই আসেন, কথাবার্ত্তাও অনেক হয়। কিন্তু সব শুনিতে সময় পাইনা বলিয়া লিখিতে পারলাম না।

২রা চৈত্র বৃহস্পতিবার—

আজ বৈকালে অনেকে আসিয়াছেন। মাকে গান করিতে অনুরোধ করায় মা ২।১টী গান করিলেন। কথাবার্ত্তা অনেক হইল।

৩রা চৈত্র শুক্রবার—

মার কথাগুলি অনেক জড়াইয়া যাইতেছে; তোর বলিতে "তোন" এরূপ, আরও অনেক কথা উল্টা পাল্টা হইয়া যাইতেছে, মা নিজেই হাঁসিয়া কুটি কুটি হন। একদিন বলিতেছেন, "এসব কি কোন রকম ভাষা বাহির হইতেছে নাকি?" আবার বলিতেছেন "সব শরীরই যেমন শিথিল হইয়া যাইতেছে কথাগুলিও তেমনই শিথিল হইয়া যাইতেছে।"

৪ঠা চৈত্র শনিবার—

আজ মাকে বেশ একটু চঞ্চল দেখা যাইতেছে। তবে এ'ও ঠিক, এই যে বাহিরে একটা চঞ্চল ভাব, এ' ভাবের ভিতরেও একটা স্থির ভাব থাকে বলিয়াই এই চঞ্চলতাও এত সুন্দর দেখায়। আমরা অনুমান করিতেছি হয়ত মা আর বেশীদিন এখানে থাকিবেন না। সারা দুপুরটা দুষ্টামী করিতেন। সকলে মহানন্দে সঙ্গে সঙ্গে ঐ রসে বিভোর হইতেছে। ধোপীর বউ আসিয়াছে কাপড় নিতে, তাহার পায়ের মল, এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন মোটা মোটা মল পায় দেয়, সেই মল চাহিয়া নিজে পায় দিয়া নিজেই হাঁসিয়া কুটি পাটি হইতেছেন। ধোপানীকে বলিতেছেন, "যাও এখন তুমি, আমি নিয়া নিয়াছি।" ছেলে মানুষের মত সেই মল পায় দিয়া মহা আনন্দ করিতেছেন। সেই রসে সকলে ডুবিয়া আছেন। মার রঙ্গ দেখিতেছেন।

বৈকালে মাকে বলিলাম, "মা চিঠি পত্র কতগুলি আসিয়াছে, তোমাকে শুনাইতে হইবে।" মা হাততালি দিতে দিতে গুণ গুণ করিয়া গান করিতেছেন। বলিলেন, "যা ইচ্ছা কর।" আমি চিঠিগুলি শুনাইলাম। ঢাকার আশ্রমে ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে ও গৃহস্থ ভক্তাদির সঙ্গে একটু গোলমাল চলিতেছে সেই সংক্রান্ত চিঠি পত্র। মা ঐ একইভাবে ধীরে ধীরে হাততালি দিতেছেন ও গান করিতেছেন। এত যে কথাবার্ত্তা, যেন কানেই গেল না; আমি একটু মৃদু অনুযোগের ভাবে বলিলাম, "আছ বেশ সকলে ত ভাবে মার কাছে জানাইলাম একটা ব্যবস্থা মা করবেন। আর মাত আছেন আপন ভাবে। এত কথা পড়িলাম তুমি ত যেমন হাততালি দিয়া গান করিতেছ মনে হয়, হয়ত কিছুই শুনিলে না।"

মা হাঁসিয়া বলিলেন, "কি করিব বল্? তোরা ত জানিস্—মা কত

ব্যবস্থা করে। খাই, দাই, আছি, ঘুরি, ফিরি। তোদের ইচ্ছা হয় খাইতেও না হয় না দিলি।" আমি বলিলাম, "তোমার ভাব ত বরাবরই দেখিয়া আসিতেছি, এতগুলি আশ্রম হইয়াছে একটা ব্যবস্থা করিবার লোক ত চাই। না হয় একজন তৈয়ার কর যে সব ব্যবস্থা করিতে পারে। নতুবা কাজ চলে কি করিয়া?" মা অমনিই উত্তর দিলেন, "তোদের আশ্রম, তোরা জানিস্। আর লোক ঠিক করিব কি? এমন একজন সব দেখিতেছেন যে ভাল ভাবে চল্‌বি ভাল থাক্‌বি, বিপথে চল্‌বি ঠোক্কা খাবি। আগুণে হাত দিবি হাত পুড়্‌বে না? তিনি সব দেখিতেছেন ঠিক ঠিক সব চলিতেছে, কে কোথায় যাবি? তাঁর দৃষ্টি এড়াইয়া কাহারও কোথাও যাইবার উপায় নাই। সব ঠিক ঠিক চলিতেছে, চলিবে।" এমন ভাবে মা এই সব কথা বলিলেন যে উপস্থিত সকলেই চুপ হইয়া গেলাম।

আজ পুরুষাকার ও দৈবের কথা উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন, "দেখ সেই স্রোতে যদি একবার পড়িতে পার, দেখিবে তখন আর তোমার কিছু করিবার শক্তি নাই। স্রোতেই তোমাকে ভাসাইয়া নিয়া যাইবে। কিন্তু সেই স্রোতে পড়িবার জন্য তোমার যতটুকু শক্তি আছে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার কর। যেমন মাটিতে হাঁটিয়া তুমি নদীর ধারে আসিতে পার তার পর যতক্ষণ সাঁতার কাটিতে পার সাঁতার কাট, এই পথ চলিয়া সাঁতার কাটিয়া তার পর যেই সেই স্রোতে গিয়া একবার পড়িতে পারিবে, আর তখন তোমার কিছু করিবার নাই, করিবার শক্তিও নাই। তখন স্রোতের প্রবল বেগই তোমাকে

টানিয়া নিয়া যাইবে। তাই বলা হয় তোমরা যে শক্তিটুকু পাইয়াছ, ইহাও তাঁহারই, সেই শক্তিটুকুর সদ্‌ব্যবহার করিয়া শ্রোতে পড়িতে চেষ্টা কর।"

৫ই চৈত্র রবিবার—

গতকল্য বৈকাল হইতেই মার একটা চুপচুপ ভাব। দুপুরে এলাহাবাদ হইতে বাঁকে বিহারী, শঙ্কর সহায়, আরও ৩।৪ জন উকিলরা আসিয়াছেন। আরও ২ ৪ জন আসিয়াছেন, তাহারা সকলে মার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। দুপুরে আর মার একটুও বিশ্রাম হইল না। রাত্রিতেও ভাবটা খুব চুপচাপ। আজ সকাল হইতে ঐ ভাবই চলিতেছে। আজও এলাহাবাদ হইতে কাশ্মীরী স্ত্রীলোকেরা কয়েকজন আসিয়াছেন। মা খানিক সময় এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেলা প্রায় ৯॥০টায় আবার শুইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যায় মির্জাপুর হইতে শ্রদ্ধানন্দ স্বামীজী, কয়েকজন ভদ্রলোককে নিয়া আসিয়া মাকে কীর্ত্তন শুনাইলেন। আজ মার শরীর বড়ই খারাপ দেখা যাইতেছে। কথাও বেশী বলিতেছেন না। জিজ্ঞাসা করায় বলিতেছেন, "শরীর ত কিছু বুঝি না, শুধু চুপ হইয়া আসিতেছে। আর কিছু খাওয়ার ভাবই নাই।" মুখ যেন কালো হইয়া গিয়াছে। রাত্রেও শুইবার ভাব না থাকায় আরও খারাপ হইল। আমি বসিয়া রহিলাম। এই ভাবে রাত্রি কাটিয়া গেল।

৬ই চৈত্র সোমবার—

আজ মা সকালে উঠিয়াই বলিলেন "আজ কাশী যাইব।" বেলা ১১॥০

টার গাড়ীতে মা কাশী রওনা হইয়া গেলেন। স্থির হইল আমি কয়েক-দিন পরে যাইব।

৭ই চৈত্র মঙ্গলবার—

আজ বৈকালে টেলিগ্রাম পাইয়া কাশী রওনা হইলাম। রাত্রি প্রায় ১১টায় কাশী পৌছিলাম।

৮ই চৈত্র বুধবার—

কাল সারারাত মার শুইবার ভাব ছিলনা। আমিও রাত প্রায় ২॥০টায় একটু শুইতেই মা আমাকে উঠাইলেন। তারপর মা নানাকথা বলিতে বলিতে নিম্নলিখিত কথা কয়টিও বলিলেন। আমি তখনই লিখিয়া নিলাম। এই সব কথা বিন্ধ্যাচলে উঠিয়াছিল।

মার কথা—"স্থূল শরীরে মনের বাসনানুযায়ী কোন কাজ করিবার জন্য যেমন শরীরটা তোমাদের অপর জায়গায় চলিয়া যায়, ঠিক তেমনই এই দেহাত্মজ্ঞান যখন তোমাদের, ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া অন্তর্মুখী চলিতে থাকে, তারপর দেহটাতে যখন বিশুদ্ধ ভাবের স্থায়ীত্ব হয় তখন সূক্ষ্ম শরীরের গতাগতিও ক্রিয়ার সময়।"

"যেমন কোন সিদ্ধ জিনিষ ঢালিয়া ফেলিলে জিনিষের সবটা থেকেই ধূয়া দেখিতে পাই, সেই ধূয়াটা, যেই দিকের বাতাস, অর্থাৎ যেখানে প্রয়োজন, সেই দিকেই নিয়া যায়। সেটা আবার হয়ত আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে জিনিষ বলিয়াই অদেখা হয়। কিন্তু যাদের ঐ রকম সূক্ষ্ম শরীরে আদান প্রদান চলে, তাহাদের আবার সময়ানুযায়ী, ঐ ধূয়াটা যেমন বাহির হইতে

পারে, সেই রকম ভিতরে প্রবেশ করিয়াও অদেখা থাকিতে পারে। এর মধ্যেও তিনটা অবস্থা আছে। প্রথম হইল নিজেই যাচ্ছে। দ্বিতীয়,—নিজে যাচ্ছে বটে, তার মধ্যে শুদ্ধ ইচ্ছা অনিচ্ছা সুপ্ত থাকে ত, কিন্তু তার মাত্রা শিথিল। তৃতীয় হইল,—যেই দিকে প্রয়োজন সেই দিকে আপনা আপনিই যাচ্ছে, ইচ্ছা অনিচ্ছার আর এখানে প্রকাশ নাই। মাত্র তিনটা বলা হইল বটে কিন্তু এর মধ্যে আরও অনেক আছে।"

আবার বলিতেছেন "দেখ, যেমন বলা হয় সাধক সাধনায় পূর্ণ হইলে, সেই পূর্ণের শরীর থাকে না। কর্ম্ম থাকেনা বলিয়া শরীর থাকে না। আবার বলা হয় শরীরটা থাকিতেও পারে। থাকিলেই কর্ম্মের একটু আঁশও থাকে বটে কিন্তু সেই আঁশ তার কোন বন্ধনের কারণই হয় না। আবার আঁশ বলিয়া কোন কথাই নাই। কারণ ঐখানে সবই যে সম্ভব। জীবন্মুক্ত, প্রারব্ধ ভোগ করে বলিয়া বলে। আবার প্রারব্ধ বলিয়া কোন কথা নাই, কেন না যে জ্ঞান-অগ্নিতে এতটা জ্বালাতে পেরেছে, সেই অগ্নি কি আর ঐটা পারে না? তবে স্থানে স্থানে সবই সত্য কথা। যে যে দিকে বলে, সেই সেই স্থানে—সব ঠিক। তবে তার পক্ষে শরীর থাকা না থাকা, সব সমান হতে পারে।" আবার দেখ! "তাহাদের শরীর অদেখা হইলেই হউক, আর দেখার মধ্যে থাকিলেই হউক, যারা দর্শন পায় তাদের এক হয়, জাগতিক দর্শন পেয়েছিল, সেই সংস্কারানুযায়ী দূর হইতেও তাহারা দর্শন পাইতে পারে। কিন্তু এই যে সব দর্শনাদি, যাঁরা দর্শক হবেন, তাঁহাদের স্তরে স্তরে ক্রমোন্নতিতে দর্শনের বিশেষত্ব

রহিয়াছে। আর হয়, শুনিয়াছে, তা' বহুদিন পূর্ব্বেই হউক, অথবা অল্পদিন পূর্ব্বেই হউক, তাহাতেও দূর হইতে দর্শন পাইল। আর একটা হয়, কখনও দেখা বা শোনা নাই, কিন্তু দর্শন পাইয়া যাইতেছে। সেটা কি রকম জানিস্? যেমন সাধনার অবস্থায় বাণী পায়। আবার সাম্‌নে মূর্ত্তি দেখিতেছে, মূর্ত্তির সঙ্গে কথারও আদান-প্রদান চলিতেছে। আর একটা হয়, নিজের ভিতরেই অভেদ ভাবে সব পেয়ে যাচ্ছে। সেই সাধকের একটা অবস্থা আছে যারা সর্ব্বাঙ্গীন পেয়ে পূর্ণেতে গেছেন, তাঁদের বাহিরের কোন কোন মূর্ত্তি, কোন কোন সাধকের কাছে প্রকাশ পায়; কিন্তু বাহিরের দিক হইতে জানা শুনা নাই। তার কারণ হইল এই, যাঁহারা সেই হয়ে যান, তাঁদের বাহিরে যে রূপেতে প্রকাশ হচ্ছিল, সেই মূর্ত্তভাবগুলি, যতক্ষণ আমরা বাহিরের ভাবে থাকিব, ততক্ষণ এই সব দর্শনাদি, স্বাভাবিক ভাবেই সাধকরা পেতে পারে। আর যিনি মুক্ত হয়ে গেছেন, তাঁর এসে দর্শন দিতে হয়, এই আসা যাওয়ার, কোন কথাই হতে পারে না। কিন্তু তাঁর বাহিরে যে সব প্রকাশ থাকে, সেইরূপ গুণ বা ভাবগুলি প্রয়োজন মত পাইতে পারে। তাই এই দর্শনে সাধকের কল্যাণ।"

এই বলিয়া একটু হাসিয়া বলিতেছেন, "দেখ্ আজ আমাকে কতগুলি মালা দিয়াছিল, মালাগুলি খুলিয়া ঘরে ফেলিয়া বাহিরে গিয়াছি পরও মালার গন্ধ পাইতেছিলাম। আবার দেখ্, একটা লোকের গায়ে-সুগন্ধ আছে, সে হয়ত পাশ দিয়া চলিয়া গেল, তার যাওয়ার পরও সেই স্থানে সুগন্ধটা পাওয়া যায়, লোকটা কিন্তু কোথায় চলিয়া

১০

গিয়াছে। সাধকদের শরীর অদেখা হইয়া গেলেও শিষ্য বা অপর কোন সাধকের প্রয়োজন অনুযায়ী যার যার তার তার কাছে রূপ, গুণ বা ভাবে সব কিছু প্রকাশ হ'তে পারে।"

"আবার দেখ্, যাহা নাকি স্বাভাবিক প্রকাশ, যেমন তোদের মধ্যে রূপ, গুণ ও রস ইত্যাদির প্রকাশ রহিয়াছে, ঠিক সেই রকম, যেই স্বভাব হইতে জিনিষগুলি প্রকাশ হয়ে থাকে, প্রকাশটাও স্বভাব। স্বভাবতই, যে প্রকাশ তাহা ত স্বাভাবিক ভাবেই রয়েছে। আর অপ্রকাশ, যাহা প্রকাশ হতে পারে না, অব্যক্ত, উহাও স্বাভাবিক ভাবেই রয়েছে। যেমন সাধনা করিতে করিতে সাধকের কাছে সাধনের লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে, ঠিক তেমনই স্বভাবতঃ, যাহা স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ হতে পারে, তাহা সাধকের কাছে, সেই রূপ, গুণ, সম্পূর্ণ আকারে, মুর্ত্তিটী যাহার যে রকম প্রয়োজন, সেই রকমে, তাহারা পাইয়া থাকে। সাধনার যেমন অনন্তগতি, সেইরূপ সাধকেরও এমন অবস্থা আসিতে পারে যে উপস্থিত, অজানা, অদেখা বহু বহু সাধক, মহাপুরুষ, এবং যাঁহাদের পূর্ণ প্রকাশ মূর্ত্ত আকারে ছিল, তাঁহাদেরও বাহিরের ঐ মূর্ত্তরূপ, কাহারও দর্শন হইতে পারে। তাহাও যে অনন্ত। নিজে আসিবার কথা যদি হয়, তবে, সাধক পূর্ণ, বলিবে না ত! কারণ সাধক রূপ গুণ ও ভাবের মধ্যে আছে কিনা? সাধক যখন অখণ্ড সত্ত্বা-স্বরূপে তাঁহাকে, অর্থাৎ পূর্ণকে পাইবেন, তখন যে তাহাই হইয়া যাইবেন; অর্থাৎ অভেদ, কাজেই তাহাকে পাওয়াও হইল। তিনি আসেনও, আবার আসেনও না, সবই বলা চলে। তোরা যুগপৎ টুগপৎ যাহাই বল্। তার পর যা কিছু, সে আর কি দিয়া বল্‌ব?"

"তবেই দেখ্, সেই যোগী সাধনায় পূর্ণ হলেও তোরা

দর্শনাদি পাইতে পারিস্ ; তোদের যাহা প্রয়োজন তাহা তোরা পাইতে পারিস্। তার কারণ স্থূলই বল্ আর সূক্ষ্মই বল্, ক্রিয়ার মধ্যে যাহা যাহা, তাহা রূপ, গুণ, ভাবের মধ্যে স্বগুণে রহিয়া গেল। কারণ দেখা দেখির মধ্যে কিনা? তারপর ত যাহা তা হয়ই।"

'লীলা', 'একাত্মত্ব, 'নির্ব্বাণ, পূর্ণ সবই সম্ভব। কাজেই, পূর্ণ হয়েও শূন্য, আবার শূন্য হয়েও পূর্ণ, পূর্ণ বললেও যে বলা হয় না। আবার এইগুলি কিন্তু তোমরা দুই ভাগ করিবে না। ওতপ্রোতভাবে যুগপৎ সবই স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ হতে পারে। যখন সৃষ্টি স্থিতি লয় লীলারূপে একটি প্রকাশ, তখন যেমন একেরই লীলা এবং লীলাতে তরঙ্গের প্রকাশ, সেইটী ত অতিন্দ্রিয় ছাড়া হয় না। এক হিসাবে বলা চলে যে, সেই তরঙ্গই, অর্থাৎ লীলাই শেষ ; এক হিসাবে এ'কথা ঠিক। আবার "একাত্মত্ব," অর্থাৎ লীলার ভিতরেও যে শান্তত্ব, স্থিরত্ব, রহিয়াছে। আবার বলিতে পারিস্, ক্রিয়াশূন্য যে পর পর স্থিতিত্ব, সে জায়গায় 'নির্ব্বাণ', পূর্ণ ইত্যাদি যাহাই বলিস্। তবেই দেখ যুগপৎ সবই আছে, পূর্ণ বললেই কিন্তু তাহাকে বলা হ'ল না জেনো।"

আবার কৃপার কথায় বলিতেছেন, 'আগুনের কাছে গেলে তাপ যেমন স্বাভাবিক, যদি কিছু কৃপা এই শরীরে দেখিস্ তবে তাহাও স্বাভাবিক।"

এই সব কথা বার্ত্তায় রাত্রি ভোর হইয়া গেল।

ভোর বেলাই মা বলিলেন, "আজ রওনা হবার ব্যবস্থা কর"—কথা হইল দিল্লী হইয়া দেরাদুনের দিকে যাইবেন। ফ্রান্সের একটি সাহেব সস্ত্রীক আসিয়াছেন ; রামকৃষ্ণ মিশনের একটি সাধু তাহাদের নিয়া আসিয়াছেন।

বেশ বাঙ্গালীদের মত তাঁহারা কাপড় পরিয়াছেন। শুনিলাম, মন্দিরে মন্দিরে তাঁহারা দর্শনাদি করিয়া বেড়াইতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে প্রাণকুমার বাবু ইঁহাদের কথা মাকে লিখিয়াছিলেন যে ফ্রান্সের একটি সাহেব ও মেম্‌সাহেব শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম হইতে তোমাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়া এখানে বসিয়া আছেন। তোমার বিন্ধ্যাচলের ঠিকানা তাঁহাদের দেওয়া হইবে।" শুনিলাম, কাশী হইয়া তাঁহারা বিন্ধ্যাচল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এর মধ্যে মা আসিয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা কালই মার নিকট দুইবার আসিয়াছিলেন, কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল।

কাল একটি সাধু মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মা, অপাত্রে কৃপা করিয়া ফল কি? সে হয়ত এমন মুর্খ যে কৃপা অনুভবই করিতে পারিল না।" মা বলিলেন, "এক ত' কিছুই বৃথা যায় না; আর, তাহার প্রাপ্য না হইলে সে পাইল কেন? তোমরা বাহিরে তাহাকে যেমনই দেখ, হয়ত কৃপা পাইবার সে উপযুক্ত হইতেও পারে।" এই রকম আরও কি কি বলিয়াছিলেন। সাধুটি আরও বলিয়াছিলেন, "মা, আমাদের একটু ধাক্কা দাও না! মা বলিয়াছিলেন, "সৎসঙ্গ কর, সৎসঙ্গই হইল ধাক্কা।" সাধুটি অন্য সম্প্রদায়ের কিন্তু তাঁহার সাম্প্রদায়িক ভাব কম বলিয়াই মার নিকট আসিয়া কৃপা প্রার্থনা করিতে-ছিলেন। এই সব কথাবার্ত্তায় মা বলিলেন, "দেখ, তোমরা যদি নিজ নিজ গুরুকে একটী গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ করিয়া দেখ তবে ঠিকমত দর্শন হইল না। যখন গুরুকে সর্ব্বময় দেখিতে পারিবে, সেই হইল গুরুকে প্রকৃত দেখা।" মা আরও এইভাবের কথা বলিয়া

ছিলেন। সাধুটি শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। সাধুটি মার নিকট দু'দিন যাবৎ আসিতেছেন, বেশ একটু শ্রদ্ধার ভাব!

আজও, সাহেব-মেমসাহেবের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মেম-সাহেব মার একটু স্মৃতি-চিহ্ন চাহিলেন। মা বলিলেন, "যোগাযোগ ত শ্বাস প্রশ্বাসে আছেই তা'ছাড়া বাহিরের জিনিস চাও ত', এই সবই আছে যা' ইচ্ছা নিয়া যাও।" মেমটি বলিলেন, "আপনি নিজের হাতে দিন।" এই সব কথা বার্ত্তার সময় চিরুণীখানা নিকটে ছিল। মেমটি মার একটু চুল নিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নিজেই মার চুল আঁচড়াইয়া দিলেন। মা চিরুণীখানা তাঁহাকে নিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি মহা আনন্দিত হইলেন। পরে মাকে সিন্দুর দিয়া দিলেন। সিন্দুরের কৌটাও মেমটিকে দিয়া দেওয়া হইল। অনেকক্ষণ মার নিকট বসিয়া থাকিয়া, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় মার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। এর মধ্যে আরও একটু আনন্দ হইল, চিহ্ন নিবার কথায় মা যখন বলিলেন, 'সব রহিয়াছে যাহা ইচ্ছা নাও', তখন সাহেব বলিলেন; "আমাদের ইচ্ছামত যদি নিতে বলেন, তবে আপনাকে আমরা নিয়া যাইতে চাই।" এই নিয়াও আনন্দ করা হইল।

আজই মা রওনা হইবেন, সকলেই দুঃখ করিতেছেন। দুপুরের গাড়ীতে মা দিল্লী যাইবেন। কথায় কথায় বাচ্চুর মা বলিতেছেন, "মা, প্রথম প্রথম যখন তুমি আমাদের বাড়ীতে আসিলে তখন ত তুমি বেশী সময় পড়িয়াই থাকিতে, সকলের মধ্যে হয়ত পড়িয়াই আছ। একবার রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রিতা কয়েকটি স্ত্রীলোক তোমাকে দেখিতে আসিলেন, আমি বলিলাম, 'মা সমাধিস্থ অবস্থায় পড়িয়া আছেন, তাঁহারা দরজায় দাঁড়াইয়া তোমাকে একটু দেখিয়াই চলিয়া যাইতে যাইতে

উপহাসের ভাবে বলিতেছিল, "ও বাবা, এখন আমাদের ঠাকুর (শ্রীশ্রীপর-মহংসদেব), কি বলে, সমাধিস্থ অবস্থায় পড়িয়া আছে। দিব্বি বিছানায় শুইয়া আছে, আর বলে সমাধিস্থ!" মা, আমার যেন এসব শুনিয়া বুকটা ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি তোমার নিকটই প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "মা, ইহাদের, তোমাকে বুঝিবার শক্তি দাও।" মা হাসিয়া বলিলেন, "বাঃ, এতে দুঃখ করিবার কি আছে? তুমিই কি আর সব সময় সবটা বুঝিতে পার? ও'রা যতটুকু বুঝিতেছে সরল ভাবে প্রকাশ করিতেছে। এ'ও যে তাঁরই আর একরূপে বাণী হইতেছে। আবার যখন বুঝিবে তখন অনুতপ্ত হইবে। ইহাতে দুঃখ করিবার কি আছে! সবই তাঁর রূপ, তাঁর বাণী।"

আমরা বেলা ১১টায় দিল্লী রওনা হইলাম। গাড়ীতে মা কথায় কথায় বলিতেছেন, "অনেকে বলে ধ্যানে স্থিত থাকিতে পারি না, কি করিব? তখন বলা হয় যখন ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল, তোমরা ভাসিয়া উঠিলে, তখন অবলম্বনটা এইরূপ রাখা দরকার, যে পড়িলেও ওখানেই পড়িবে। যে সহায়কে ধ্যান জন্মে, সেই সহায়ক নিয়া থাকিতে হয়। ছোটবেলায় দেখিতাম, শরীরটা ছোট ছিল, যখন বসিতে শিখিলাম তখন বারান্দার চারিদিকে বেড়া দিয়া দিল যেন শিশু বাহিরে পড়িয়া না যায়; যদিও বাঁশ ধরিয়া দাঁড়াইতে গিয়া পড়িয়া যায়, ও'খানেই বসিয়া পড়িবে।"

৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার—

আজ ভোর বেলা ৭টায় সকলে দিল্লী পৌছিলাম। ষ্টেশনে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। মাকে সকলে আশ্রমে নিয়া গেলেন। আশ্রম হওয়ায়

পর মা আসেন নাই। তাই আজ ভক্তদের কত আনন্দ। দুপুরে মেয়েরা, সন্ধ্যায় ছেলেরা, মাকে কীর্ত্তন শুনাইল। মার শরীর অসুস্থ তাই রাত্রি ১০টায় সকলে মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য বিদায় নিলেন। তারপর বীরেন (দুর্গাদাস বাবুর ছেলে), আসিয়া উপস্থিত। সে মার উপর অভিমান করিয়া সারাদিন আসে নাই। এখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আসিয়াছে। সরলভাবে নিজের মনের কথা মাকে সব বলিতেছে। বলিতেছে,"মা, সারাদিন নিজের মনকে বুঝাইয়াছি, মার নিকট যাব না, যাব না; কিন্তু ভিতর হইতে শুধু বলিতেছে. 'যা যা।' সারাদিন এই সংগ্রাম শুধু চলিয়াছে। রাত্রিতে খাওয়ার সময় ভাইবোনেদের জিজ্ঞাসা করিতেছি, "তোদের মাকে কেমন দেখিয়া আসিলি ?" সবাই তোমাকে দেখিয়া গিয়াছে; আমি আসিব না ঠিক করিয়াছিলাম কিন্তু যতই রাত্রি হইতে লাগিল কেবলই মনে উঠিতেছে 'যাই যাই।' শেষে, কোথায় অভিমান চলিয়া গেল। কখন যে সাইকেলটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি আমিও যেন ঠিক বুঝতে পারলাম না! কি ভয়ানক মা তোমার আকর্ষণ কিছুতেই থাকতে দিলে না!" মা ও আমরা তাহার সরল প্রাণের কথা শুনিয়া বেশ আনন্দ পাইতেছিলাম, ঘণ্টাখানেক পর চলিয়া গেল।

১০ই চৈত্র শুক্রবার—

আজ ভোর বেলায়ই পঞ্চুদা আসিয়া মাকে নিয়া মোটরে বেড়াইতে গেলেন। বেলা প্রায় সাড়ে আটটায় মা ফিরিয়া আসিলেন। একটি ঘটনা পঞ্চুদার মুখে শুনিলাম; মাকে মোটরে খানিক ঘুরাইয়া পঞ্চুদাদা মাকে নিজের বাসায় নিয়া গেলেন। বাসায় যাইবার পূর্ব্বে মাকে নিয়া পাহাড়ের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন সেখানেই একটা স্থানে মা এবং,

অন্যান্য সকলে হাঁটিয়া বেড়াইবার জন্য নামিয়া পড়িলেন। একটা সাপ বিড়া পাকাইয়া রাস্তায় পড়িয়াছিল, আশ্চর্য্যের বিষয়, সকলেই সাপটাকে ডিঙ্গাইয়া যাইতেছিল, মা হাসিয়া বলিতেছিলেন, "দেখ ঘটনা, অন্য জায়গা কত আছে কিন্তু সকলে ঐ স্থানটিতেই যাইতেছে। সাপটা যেন মাথা নীচু করে মড়ার মত পড়িয়া আছে। সকলে মাথার উপর দিয়ে গেল, সে কিছুই বলল না।" পঞ্চুদাদা প্রভৃতি বলিতেছিলেন, "মা চলে যাচ্ছেন আর সাপটা মার দিকে মুখ করে মাথা তুলে আছে, আমরা যখন সাপ দেখলাম, সাপ সাপ—সকলে চেঁচিয়ে উঠলাম, কিন্তু সাপ নড়ে না।" আমার এই কথা শুনিয়া মনে হইল বিন্ধ্যাচল হইতেই মার সাপের খেয়াল হইতেছিল, আমাকে বলিয়াছিলেন।

১১ই চৈত্র শনিবার—

আজ ভোরে দেবেন্দ্রবাবু সস্ত্রীক আসিয়া মাকে বেড়াইতে নিয়া গেলেন। তিনি মাকে একা পাইয়া নানা কথা বলিতেছিলেন। দেবেন্দ্রবাবু মাকে বলিলেন, "মা, উপনয়নের পর হইতেই ত সন্ধ্যা করিতেছি। একটু একটু বসি কিন্তু কিছুই উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আফিসে যে পদ বৃদ্ধি হইতেছে তার অর্থ আফিসের চিন্তা বেশী করিতে হইতেছে। কি হইল মা!" মা বলিলেন, "দেখ, তোমরা ঔষধ খাও সত্য, কিন্তু কুপথ্য কর, তাই ঔষধে ফল দেখা যায় না। ঔষধ হইল নাম, পথ্য হইল সংযমাদি। কুপথ্য করিলে কি রোগ আরাম হয়। যতই ঔষধ খাও ফল দেখা যায় না। শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিয়া যাইবে। শরীরটি পাথরের মত স্থির করিতে চেষ্টা করিবে।" ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন। বেলা প্রায় ৮টায় আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

অনেকেই মাকে না পাইয়া অভিমান করিয়া মার জন্য বসিয়া আছেন। মা আসিয়া সকলের সঙ্গে শিশুর মত, 'বাবা, মা' ডাকিয়া ভুলাইয়া দিলেন। মা বসিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, খুব আনন্দ হইল। মীরাট হইতে সিধু বাবু, অনাদি বাবু, ৪।৫ জন আসিয়াছেন আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে অনাদি বাবুর স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত, সেই অবস্থায়ই তিনি চলিয়া আসিয়াছেন, সিধু বাবুর স্ত্রীর ফিট হইয়াছে, সেই অবস্থায় রাখিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছেন, এমনই মায়ের তীব্র আকর্ষণ! সংসারী লোকগুলিও এইভাবে সব পাগল হইয়া যাইত।

সকলে বসিয়াছেন, মা বলিতেছেন, "গুরুর নিকট গুহ্যতত্ত্ব শুনিয়া লও।"

১২ই চৈত্র রবিবার—

আজ সকালবেলা ৮॥ হইতে ১১ অবধি স্ত্রীলোকরা কীর্ত্তন করিল। দিন দিন ভীড় বাড়িতেছে। কীর্ত্তনও অনেকক্ষণ চলিতেছে। সন্ধ্যায় দাস্থ আরতি করে। অভয়, বীরেন প্রভৃতি সকলে সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেছে। আগামীকল্য বাসন্তী পূজার সপ্তমী, ভক্তদের প্রাণে সাধ জাগিয়াছে এই তিন দিন মার পূজা করিবেন। দুর্গাদাস বাবু বলিতেছেন, "মা এই তিনদিন পূজা; প্রথম দিন, বাসন্তীরূপে তোমার পূজা; দ্বিতীয় দিন অন্নপূর্ণা পূজা, তোমায় অন্নপূর্ণারূপে। তৃতীয়দিন রাম-নবমী, সেই দিন রামরূপে তোমার পূজা করিয়া ধন্য হইব।" মা হাসিয়া বলিতেছেন, "বাবা, এই পাগল মেয়েটার ত কিছুই ঠিক নাই, খেয়াল হইলে শরীরটা কোথায় যায় কোথায় থাকে ঠিক নাই।" ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইতেছেন মা যেন অন্ততঃ তিন দিন দিল্লীতে থাকেন। যে যে ভাবেই কথা বলিতেছেন মা তাহার

সঙ্গে ঠিক সেই ভাবেই উত্তর দিতেছেন, তাই মা সকলেরই প্রিয়। মার শরীর দুর্ব্বল তাই ভক্তরা যথাসাধ্য মায়ের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতেছেন।

বির্লা যে পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা খরচ করিয়া প্রকাণ্ড সনাতন ধর্ম্ম মন্দির করিয়াছেন মাকে সেখানে কীর্ত্তনে নিয়া যাইবার জন্য বির্লার লোক আসিল। ভক্তগণেরও আনন্দ যে মন্দিরে হিন্দুগণ জাতি নির্ব্বিশেষে যাইতে পারিবেন,—আমাদের মায়েরও যে এই ভাব। সেখানে সকলে মাকে নিয়া গিয়া কীর্ত্তন করিতে পারিবেন। কথা হইল আগামীকল্য প্রাতে মায়ের পূজাদি হইবে। তারপর সন্ধ্যায় আরতি কীর্ত্তনাদি করিয়া রাত্রি ৮টায় সকলে মাকে নিয়া সনাতন মন্দিরে যাইবেন। মা বলিলেন, "দেখ আমি ছেলে মানুষ, আমাকে তোমরা আটকাইয়া রাখিও না। আমি বাবা মার কাছে খা'-দা' ঘুরব-বেড়াব, তোমরা ঘট পট নিয়া পূজাদি কর। আমার ত কোথায় যাই, কোথায় থাকি, ঠিক নাই।" সুতরাং তাই হইবে স্থির হইল। রাত্রি ১০টায় সকলে মাকে বিশ্রাম দিবেন বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

১৩ই চৈত্র সোমবার :—

আজ সকালে পূজাদি হইয়া গেল, ভক্তরা অনেকেই প্রসাদ পাইলেন। চারুবাবু বৈকালে দু'দিন যাবৎ পাঠ করিতেছেন। আগামী কল্য ১০৮ পদের ভোগের ব্যবস্থা হইতেছে। মা বলিলেন, "তোমরা এই শরীরটার উপর পূজা করিতে চাহিয়াছিলে, সবই তাঁর শরীর, তোমরা যার যার ইচ্ছা কুমারী পূজা কর, বাল-গোপাল পূজা কর।" তাহারই ব্যবস্থা হইতেছে।

১৪ই চৈত্র মঙ্গলবার :—

আজ মহাষ্টমী। ভক্তরা ১০৮ পদ দিয়া মায়ের ভোগ দিল। কীর্ত্তন ও আরতি হইল। মা বলিয়াছিলেন, "তোমরা ত এই শরীরটার উপর পূজা করিতে চাহিয়াছিলে, সবই একেরই শরীর, তোমাদের ইচ্ছা হইলে কুমারীদের পূজা কর।" তা'ই হইল। আজ কয়েকজন ভক্ত কুমারী পূজা করিলেন, কুমারীদের ভোজনে বসাইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন হইল এবং কেহ চামর, কেহ ধূপ, কেহ শঙ্খ নিয়া প্রদক্ষিণ করিল ও আরতি করিল। তারপর সকলে প্রসাদ নিতে বসিলেন। কি আনন্দ দিন রাত চলিতেছে!

একটি ভদ্র মহিলা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা মা, তোমার জন্য যে আমাদের প্রাণে কি রকম অস্থির ভাব তাহা কি তুমি বোঝ না ?" ছলছল চোখে মহিলাটি এই কথা বলিয়া মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! কোন কোন স্ত্রীলোক কি ভাবে সংসারের সব কাজ ফেলিয়া মার জন্য চলিয়া আসিয়াছেন তাহাই বলিতেছেন, কেহ কেহ স্বামীকে বলিয়া দিয়াছেন, "তোমাদের সব কথা সারা বৎসরই শুনিতেছি, মা যে কয়দিন এখানে আছেন আমরা যাবই, কারুর বাধা শুনিব না।" এই রকম কত কথা হইতেছে। একজন বলিতেছেন, "মাগো, এ'যে দেখিতেছি গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা।"

কত আনন্দই হইতেছে! কখনও কখনও মা নাম ধরিতেছেন, সকলে নাম ধরিতেছেন। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। রায় বাহাদুর সতীশ বিশ্বাস মহাশয় মাকে কীর্ত্তন শুনাইবেন। সকলে মিলিয়া নাম ধরিলেন, মা ছোট বিছানাটীর উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চেহারার পরিবর্ত্তন দেখা গেল। মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তারপর

শরীরে একটু ক্রিয়া দেখা দিল। একটু হইতে না হইতেই সামলাইয়া উঠিয়া বসিলেন। মায়ের এই অবস্থা দেখিয়া শরীর খারাপ হইবার আশঙ্কায় সকলে নাম বন্ধ করিলেন। মায়ের শরীর কাঁপিতে লাগিল। খানিক পরে মা আড়ষ্ট স্বরে বলিতেছেন, "কি বাবা, তোমরা যে কীর্ত্তনের শেষে 'যাদবায় নমঃ', কি সব বল, তাহা না বলিয়াই কীর্ত্তন বন্ধ করিলে? শরীরটা একটু এলোমেলো হইল তাহাতে নাম বন্ধ করিবে কেন? পূজা করিতে বসিয়া কি কেহ অর্দ্ধেক পূজা করিয়া উঠিয়া আসে?" মায়ের কথায় আবার সকলে নাম উঠাইলেন এবং 'হরি হরায় নমঃ' ইত্যাদি বলিয়া নাম সমাপন করিলেন। রাত্রি ১০টা বাজে দেখিয়া সকলে মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বে বিদায় নিলেন।

১৫ই চৈত্র বুধবার :—

আজও ২৷১ জন কুমারী পূজা করিলেন। সাত আটজন স্ত্রীলোক গোপাল পূজা করিলেন। মা বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, বাল-গোপাল পূজা হয় না? তোদের শাস্ত্রে কিছু আছে নাকি?" পুরোহিতরা বই খুলিয়া গোপাল পূজা বাহির করিলেন। আজ গোপাল পূজায় সারি সারি গোপালদের বসান হইল, মা'ও একপাশে বসিলেন। পূজান্তে কীর্ত্তন হইল—

'গোপাল বল, গোবিন্দ বল,
রাধা রমন হরি, গোবিন্দ বল।'

ও'দিকে মন্মথ দাদা তিন দিন যাবৎ মায়ের পূজা ঘটে করিতেছেন। দুর্গাদাস বাবু বলিতেছেন, "মা আমাদের, সপ্তমীতে বাসন্তী, অষ্টমীতে

অন্নপূর্ণা, নবমীতে শ্রীরামচন্দ্র।" ভক্তরা সকলে একত্রিত হইয়া মার চরণে অঞ্জলী দিলেন। কেহ চণ্ডী পাঠ করিতেছেন। আশ্রমবাড়ী মুখরিত, আজ ভক্তরা সন্ধ্যায় মাকে কালীবাড়ীতে নিয়া যাইবেন। তথায় সকলে কীর্ত্তন করিবেন। সন্ধ্যায় মাকে কালীবাড়ী নিয়া গেলে তথায় কীর্ত্তনাদি হইল। বহুলোক একত্র হইলেন। রাত্রি প্রায় ১০টায় মাকে লইয়া আমরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

১৬ই চৈত্র বৃহস্পতিবার—

আজ ভোরে ডাক্তার জে, কে, সেন মহাশয় সস্ত্রীক আসিয়া মাকে বেড়াইতে নিয়া গেলেন। ফিরিয়া আশ্রমে আসিলে ডাক্তার বাবু আমাকে বলিলেন, "দিদি, কাল ভোরে আবার আমি আসিয়া মাকে বেড়াইতে নিয়া যাব। মা অমনি বলিলেন, "আচ্ছা, কাল ত হোক, কালের কথা কাল।" ডাক্তার বাবু বলিলেন, "তা'ত নিশ্চয়ই, আপনি থাকলে ত নিয়ে যাব, না হলে আর কি করা!" তাঁর স্ত্রী বলিলেন, 'কেন মা, কাল কি হবে না?' মা বলিলেন, **"কাল হবে না কেন? কাল ত সকলের জন্য হবেই।"** এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে মোটর হইতে নামিয়া গেলেন।

ঘরে আসিয়াই বলিতেছেন, "বৃন্দাবনের গাড়ী কয়টায় দেখত" কেহ বলিল ১২টায়, কেহ বলিল ১০টায়। মা বলিলেন, "এখন বুঝি পাওয়া যায় না?" তারপর টাইম টেবল্ দেখিয়া দেখা গেল ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই গাড়ী আছে। তখনই মা রওনা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই বৃন্দাবন চলিল। কেহ দেখা করিতে আসিয়াছেন, কেহ ষ্টেসনে আসিয়া মাকে ধরিয়াছেন, সেই অবস্থাতেই মার সঙ্গে রওনা হইয়া গেলেন। আবার

অনেকে ১২টার গাড়ীতে যাইবেন স্থির হইল। মা গিয়া বর্দ্ধমান রাজার মন্দিরে উঠিলেন বৈকালে অমল সেন সস্ত্রীক, মোটরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈকালে মা একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। কেন আসিলেন জানি না।

১৭ই চৈত্র শুক্রবার—

বৈকালে সাধুদের আশ্রমের দিকে যাওয়া হইল। সন্ধ্যায় মা মন্দিরে ফিরিতেই পাণ্ডা বলিতেছে, "মা মোটর হইতে নামিবেন না, আজ গোবিন্দের 'ফুলদোল' দেখিবেন চলুন।" মা বলিলেন, "এখন ত নামি, তারপর সকলে আসুক দেখা যাইবে।" মা বিছানায় শুইয়া আছেন রাত্রি প্রায় ৯॥০টায় আবার একটা লোক বলিল, 'মা আজ 'ফুলদোল।' মা হঠাৎ বলিলেন, "খুকনী চল্, বেড়াইয়া আসি।" তখনই সকলকে নিয়া গোবিন্দের মন্দিরে চলিলেন, খানিক সময় তথায় থাকিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আগামী কল্যই দিল্লী ফিরিবার কথা হইল।

১৮ই চৈত্র শনিবার—

আজ ভোরে মা অমল বাবুর মোটরে দিল্লী রওনা হইলেন। আমরা সব ট্রেনে আসিলাম। দিল্লীর ভক্তরা শ্রীশ্রীমায়ের আগমন উপলক্ষে আগামী কল্য নামযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। আজ সন্ধ্যায় অধিবাস। বৈকালে চারু দাদা পাঠ করিলেন। মা বলিয়াছেন, "যে কয়দিন শরীরটা এখানে থাকে, রোজ একটু পাঠ করিও। সকলে শুধু শুধু বসিয়া থাকে এ'টা ঠিক নয়। হয় কীর্ত্তন, না হয় পাঠ, না হয় জপ, একটা নিয়া থাকিতে হয়।" তাই হইতেছে।

দুপুরে মা কথায় কথায় বলিতেছেন, "গোবিন্দজী আসিয়া বলিল; "আপনি ফুলদোল দেখিতে যাইবেন চলুন, দুই তিন বার বলিল তাই 'ফুলদোল' দেখিতে গেলাম।" তখন অভয় প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিলে মা যা' বলিলেন তাহা এই যে, ২।৩জন লোক, (একবার পাণ্ডা মোটরের কাছে, আবার ঘরের ভিতরও দুইজন লোক), বলিল, 'মা আজ 'ফুলদোল' দেখিতে যাইবেন চলুন'; মা বলিতেছেন, "আমি পরিষ্কার দেখিতেছি, গোবিন্দজী উহাদের মুখে বলিতেছেন, আমি দেখিলে কি করিব বল?" মার চোখ দুটি ঈষৎ রক্তাভ, একটু ছলছল, এমন ভঙ্গিতে মা এই কথা বলিলেন যে আমরা মুগ্ধ হইলাম! এই কথার উপর অভয় বলিল, "মা পুরীতেও বলিয়াছিলেন, জগন্নাথদেব আমাকে পান খাওয়াইয়া দিয়া গেলেন।" সত্যই একদিন একটা লোক দৌড়াইয়া আসিয়া মার মুখে একটা পান গুঁজিয়া দিয়া গেল। কোনদিন কিন্তু কেহ দেয় না।

মার অদ্ভুত প্রভাবে সকলেই যেন কেমন হইয়া যাইতেছে। একটি স্ত্রীলোক গোপনে মাকে লইয়া বলিতেছেন, "মা আমি গোপালকে বড় ভালবাসি সেই মূর্ত্তিই আমি চিন্তা করি; যেইদিন হইতে তোমায় সিম্‌লায় দেখিয়াছি তার পর হইতে আমি জপে বসিলে ধ্যান আসিতেই তোমার ছোট্ট মুখখানি কেবল দেখিতে পাই। আর শরীর দেখি না মা, আমি ২২বৎসর যাবৎ গোপালের সেবা ধ্যান করিতেছি, এখন এরূপ হইয়া গেল কেন? মা তুমি কি আমার গোপাল? আমি যদি গোপালের দুধে চিনি না দিই ভিতর হইতে আসে 'চিনি দাও নাই, চিনি দাও।' এখন একি হইল মা।" মা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যা' বল মাগো আমি তাই।" অমনি সেই ভদ্র মহিলা মাকে জড়াইয়া মুখচুম্বন করিলেন। চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

আরও একটি ভদ্র মহিলা গোপনে বলিতেছে, "আমার মধ্যে মধ্যে ভগবানের জন্য একটা আকুলতা হয়। তুমি আসিবার পর সেটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তুমি বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছ খবর পাইয়া, আমার সে অবস্থাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" মা বলিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়া গেলে নাকি?" "কি করিব মা?" মা বলিলেন, "ভগবানের জন্য আকুলতা ত ভালই, তুমি দীক্ষা নিতে চেষ্টা কর।" সে বলিল, "আমার কিন্তু মনে হয় দীক্ষা নেওয়া হয় নাই বলিয়া কি একটা চাপা পড়িয়া আছে, আমার ও দীক্ষা নিতে ইচ্ছা হয়।" এইরূপে কত জনে, কত ভাবে, মার প্রভাব অনুভব করিতেছেন।

মা মোটরে বেড়াইতে গেলেন, একটা স্থানে মোড় ঘুরাইতে একটু অসুবিধা হইতেছে, মা বলিতেছেন, "দেখ, মোড় ঘোরানই একটু গোলমাল; কিন্তু যেমন সাবধান মত মোড় ঘুরাইরা নিয়া ঠিক পথ ধরিলে, সেই ভাবেই নিজেদের জীবনেরও মোড়টা ঘুরাইয়া ঠিক পথে চলিতে চেষ্টা কর।"

মা বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন খবর পাইয়া দলে দলে সকলে আবার আসিতেছেন। মা হঠাৎ চলিয়া গিয়াছিলেন, সকলে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। সেই সব কথা নিয়া মাকে সকলে অনুযোগ করিতেছেন। মা আজ বলিলেন ২।৩ দিন যাবৎই মৌনী-মা (কাশীর কৃষ্ণা মা), নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। এবারও যখন মা কাশীতে গিয়াছিলেন তিনি বিশেষ কি কথা বলিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি এখন কাশীর সিদ্ধি মার আশ্রয়ে আছেন। অনেক সময়ই দেখি, সকলেই মার কাছে যেমন প্রাণখোলা ভাবে কথা বলিতে পারে এমন আর কাহারও কাছে না, অনেকেই এ'কথা বলিয়াছেন।

বৈকালে মা নাম ধরিলেন, "জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীমধুসূদন রাম নারায়ণ হরে।"

সঙ্গে ভক্তগণও গাহিলেন।

সন্ধ্যা বেলা ভক্তেরা আগামীকল্যের জন্য নাম যজ্ঞের অধিবাস বিধিমত করিলেন। তারপর মাকে রায় বাহাদুর সতীশ বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী কীর্ত্তনে লইয়া গেলেন। ভক্তরা তথায় সকলে একত্র হইলেন। এই সতীশ বাবু শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুরের শিষ্য। তাঁহারা ঠাকুরের ছবি সাজাইয়া রাখিয়াছেন, প্রতি শনিবার তাঁহারা কীর্ত্তন করেন। রাত্রি প্রায় ১০টায় মা ফিরিলেন।

১৯শে চৈত্র, রবিবার—আজ ভোর ৬টা হইতে

'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ'

নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। চন্দন ফুলের মালায়, স্ত্রী পুরুষ সাজিয়া নাম করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে মাও ভক্তদের সঙ্গে মিলিয়া ঘুরিতেছেন। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে ভক্তগণ নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। এদিকে ভোগাদির ব্যবস্থাও হইতেছে। মহানন্দে নাম কীর্ত্তন চলিতেছে। আশ্রম বাড়ী মুখরিত করিয়া দশদিক ও বায়ুমণ্ডল পবিত্র করিয়া নামধ্বনি ছড়াইয়া পড়িতেছে। আজ সন্ধ্যায় মার আরও একটু ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। গড়াগড়ি দিলেন। অপূর্ব্ব চেহারা দেখিয়া অনেকে মুগ্ধ হইলেন। যদিও অল্প সময় মাত্র হইল, কিন্তু যাঁহারা নূতন দেখিলেন তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন এমন দৃশ্য জীবনে দেখেন নাই। কখনও ভুলিতে পারিবেন না। বৃন্দাবনের এক বৈষ্ণব কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছিলেন,

তিনি বলিলেন, "আমি বড় গোঁড়া কিন্তু আজ মার চরণে মাথা না লুটাইয়া পারিলাম না।"

একটা দেখিতেছি, আজ কাল শরীরের এইরূপ ক্রিয়া হইয়া গেল, পরক্ষণেই সামলাইয়া উঠিলেন, যেন বিদ্যুতের মত একটা হইয়া যায়। পূর্ব্বে এইরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন হইলে প্রকৃতিস্থ হইতে অনেক সময় যাইত।

ভক্তরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় মার আরতি করেন। আজও আরতি হইল। মার কথা জড়ানো, চোখ মুখ উজ্জ্বল, ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে বিশ্রাম করিলেন।

২০শে চৈত্র, সোমবার—

আজ বেবীদি'র পুত্র সুকুমারের বাৎসরিক উপলক্ষে বেবীদির ইচ্ছানুসারে মার কাছে উদয়াস্ত কীর্ত্তন হইল। দুপুরে মেয়েরা যেমন প্রতিবার নাম যজ্ঞের পর ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করেন, আজও তাই করিলেন। মাও সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যোগ দিতেছেন। কীর্ত্তনান্তে মেয়েরা মার উপদেশ শুনিবার জন্য মাকে ঘিরিয়া বসিল। মা বলিতেছেন "আমি ত কিছুই জানি না, তোমরা যেমন বাড়ি দিবে তেমনি শব্দ হইবে।" কথাচ্ছলে বলিলেন, "দেখ তোমরা অন্ততঃ মাসের মধ্যে একদিন সংযম-ব্রত নিতে চেষ্টা কর। অর্থাৎ সেইদিন আহার বিহার সব টিতেই সংযম ভাব। এমন কি ছেলে পিলেকে সেদিন বাল গোপাল ভাবে সেবা করিবে, পতিকে পরম পতিরূপে সেবা করিবে; মেয়েদের কুমারী ও শক্তিরূপে দেখিবে ও সেবা করিবে। অন্ততঃ সেই দিনটী কাহারও উপর রাগ করিবে না। তা "বলিয়া যে পরের দিন বলিব বলিয়া জমা রাখিরা দিবে, তা

করিও না। ঐ দিন যাহা কিছু হয় সব ক্ষমা জমা আর রাখিবে না।" আবার বলিতেছেন, "দেখ, যতক্ষণ জ্বালা, ততক্ষণই বুঝিবে ভিতরে ঘা আছে। ঘা থাকিলেই জ্বালা।"

সন্ধ্যার পর আরতি ও কীর্ত্তন হইল। তারপর ঘর ভরা লোক বসিয়া আছে, চারু বাবুর পাঠ হইল। মায়ের হু'একটি কথাও সকলে কত আগ্রহে শুনিতেছেন! সকলে মার মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন। একটি ভদ্রলোক মায়ের নিকট স্তোত্র পাঠ করিলেন।

রাত্রি ৯টার সময় মাকে মোটরে নিয়া বাহির হওয়া হইল। কুতব-মিনার যাওয়া হইল। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা হইল, রাত্রি ১০॥০ টায় ফিরিলাম।

২১শে চৈত্র, মঙ্গলবার—

আজ বেলা ৭টায় মাকে এক কবিরাজের বাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার জে, কে, সেন মহাশয় নিয়া গেলেন। সেখানে ডাক্তার বাবু কবিরাজ মহাশয়কে বলিলেন, "মাকে যা' হয় জিজ্ঞাসা করুন, মা কিন্তু নিজ হইতে কিছু বলেন না।" তিনি বলিলেন, 'আমার জিজ্ঞাসার কিছুই নাই।' মা বলিলেন, "বাবা পড়িলে ত জিজ্ঞাসা আসে, কি বল? কাজ করিতে করিতে বোঝা যায় কোথায় ঠেকিতেছি, তখন সেই বিষয় জিজ্ঞাসা আসে।" প্রশ্ন করিল, 'ঈশ্বর যে আছেন, তার প্রমাণ কি?' মা বলিলেন, "তুমি যে আছ, তার প্রমাণ কি?" "বাঃ আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।" মা বলিলেন, 'তুমি কে?' এই সব কথার মধ্যে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, 'এ সব ত কথা নয়, আসল কথা ঈশ্বর আছেন কি না?' মা বলিলেন, **"যেমন তুমি আমি আছি তেমনি ঈশ্বরও আছেন।"** বেলা প্রায় ৮ টায় আমরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

আজ সন্ধ্যার সময় মা বাল্মিকী মন্দিরে হরিজনদের নিয়া কীর্ত্তন করিবেন স্থির হইয়াছে। সন্ধ্যা ৭টায় আমরা মাকে নিয়া বাল্মিকী মন্দিরে গেলাম। মা যাওয়াতে ভক্তরা সকলেই তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রায় ২ঘণ্টা তথায় হরিজনদের নিয়া কীর্ত্তনাদি হইল। তারপর তাহাদের খাওয়ান হইল। খাওয়া আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে মাকে লইয়া আমরা আশ্রমে ফিরিলাম।

২২শে চৈত্র, বুধবার—

রাত্রি ৯টার গাড়ীতে দেরাদুন রওনা হইলাম। মা চলিয়া আসিবেন শুনিয়া ভক্তদের যে বিষাদ ভাব, ও পুনঃ পুনঃ থাকিবার জন্য কাতর প্রার্থনা, তাহাও দেখিবার বিষয়। মা হাসিয়া বলিতেছেন, "দেখ, আমি শরীরটাকে কত বলি, 'এরা এত থাকিতে বলিতেছে, থাক্' কিন্তু শরীরটা কিছুতেই কথা শুনিতেছে না। কি করি বল?" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। অনবরত কীর্ত্তন, সৎকথা পাঠ, পূজা ইত্যাদিতে কয়টা দিন সকলেই সংসার ভুলিয়াছিলেন। আজ সকলেরই চারিদিক অন্ধকার লাগিতেছে বলিতেছেন। জিনিষপত্র গুছাইতে দেখিলেই অনেকে বাধা দিতেছেন। মাকে তাঁহারা কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু মার খেয়াল হইলে যে রাখা যায় না, সকলেই জানেন।

২৩শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার—

আজ সকালে দেরাদুন আশ্রমে আসিয়া পৌছিলাম। রাত্রিতে মার ঘরে শুধু আমি শুইয়াছি। রাত্রি প্রায় ১১টায় আমি শুইতেই মা ডাকিলেন, "খুকুনী, উঠিয়া আয়।" মার মুখের কাছে যাইতেই মা বলিলেন, "শরীর ঠিক নাই, একজন বসিয়া থাকিস্।" আমি বসিয়া মার গায়ে-পায়ে হাত

বুলাইতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ২॥, মা বলিলেন, "শুইতে যা"। আমি বলিলাম, "তুমি না একজনকে বসিয়া থাকিতে বলিয়াছিলে?" মা চোখ বুজিয়াই বলিতেছেন, "এখন আর দরকার নাই, শুইয়া থাক। কাল আমি নিজে না উঠা পর্য্যন্ত তোরা আমায় ডাকিস্ না। কেহ যদি ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া ধ্যান জপ করিতে চায় তবে করিবে, নতুবা দরজা বন্ধ করিয়া রাখিস্।" আমি জানি, মা কত সময় এই কথা বলেন। মার আদেশমত শুইয়া পড়িলাম।

২৪শে চৈত্র, শুক্রবার—

আজ মা বেলা ১১টার পর উঠিলেন। কয়েকটি পাঞ্জাবী ভদ্রমহিলা আসিয়াছেন। মা উঠিয়া বসিয়াই হিন্দিতে বলিতেছেন, "তোমরা যেমন বসিয়া কথাবার্ত্তা বল তেমনি অন্যস্থানে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাই বলিয়া রাখিয়াছি আমাকে ডাকিও না। তোমাদের মধ্যেও অনেক সময় অনেকে আসে, তোমরা দেখিতে পাও না। যদি তেমন ধ্যান-ধারণা করিবার শক্তি কাহারও থাকে, সে কাছে বসিয়াই বুঝিতে পারে,—কোথায় যাওয়া হইতেছে, কি হইতেছে। কখনও আবার এইখানে বসিয়াও কথা বার্ত্তা হয়।" আমি বলিলাম, "কাল রাত্রিতে যে বলিয়াছিলে একজন বসিয়া থাক, তখন কি হইয়াছিল?" মা বলিলেন, "শরীরটা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল?" দেখিলাম, চেহারাও বেশ ভাল দেখাইতেছে। বলিতেছেন, "এখন আমার ভোর হইল। কখনও কখনও রাত্রিতে ভোর আবার ভোর বেলায় রাত্রি হয়।"

মুখ ধোয়াইয়া কিছু খাওয়াইয়া দিলাম। খাওয়া দাওয়ার পর হাঁটিতে-ছেন, এর মধ্যে হরিরাম ও আরও একটি ভদ্রলোক মার সঙ্গে দেখা করিতে

আসিয়াছেন। মা হাঁটিতে হাঁটিতে হঠাৎ মোটরে উঠিলেন বলিলেন, "একটু বেড়াইয়া আসি।"

মা ফিরিয়া আসিলে শুনিলাম সারদার বাসায় গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব হইতেই অনেকে আসিতেছে যাইতেছে। মা শিশু হইতে বৃদ্ধ সকলের সঙ্গেই আলাপ করিতেছেন। যে যেই কথায় আনন্দ পায় তাহার সহিত সেইরূপ আলাপ করিতেছেন। রাত্রি প্রায় ৮টা। মা, মৌন মন্দিরে গিয়া দরজা বন্ধ করিলেন, রাত্রি ১০টার পর বাহিরে আসিলেন। নীচে নামিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

সকাল বেলার কথায় মা বলিলেন, "তিনটি সূক্ষ্ম শরীরী আসিয়াছিল, তাহাদের সহিত অনেক কিছু কথা বার্ত্তা হইয়াছিল।"

২৫শে চৈত্র, শনিবার—

আজ সকালে মা উঠিয়াছেন, সকলের সহিত কথা বার্ত্তা হইতেছে। বেলা প্রায় ১১টায় মা খাওয়া দাওয়া করিয়া আবার মৌন মন্দিরে গেলেন, কখন বাহির হইবেন কিছুই ঠিক নাই। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মা বাহির হইয়া উপরের বারান্দায় বসিলেন। অনেকেই মাকে ঘিরিয়া বসিলেন। কেহ কেহ ১২টা হইতে আসিয়া মার দর্শনের আশায় বসিয়া আছেন। মা ঐ একস্থানেই বসিয়া রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা বলিলেন। তারপর নীচে নামিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

২৬শে চৈত্র, রবিবার—

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিতেছেন, "দেখ, সেই দিন (২৪শে চৈত্র শুক্রবার রাত্রির কথা) দেখিতেছিলাম, তিনজন আসিয়াছে, একজন যেন এই শরীর, (নিজ শরীর দেখাইয়া), স্পর্শ করিতেও সাহস

পাইতেছে না, যেমন ভিন্ন ছোট জাতিরা ব্রাহ্মণদের ঘরে ঢুকিতে সাহস পায় না, সসঙ্কোচে দরজায় দাঁড়ায় কতকটা সেই ভাব, দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে; আর একজন যেন এই শরীরটা পাহারা দেওয়ার মত দাঁড়াইয়া আছে, আর পূর্ব্বোক্তটিকে বলিতেছে, 'সাবধান ছুঁস্ না।' (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই শরীর ছুঁইতে দিবে না, সেও হাত নাড়িয়া বলিতেছে, "না না, আমি ত ঐ শরীর ছুঁইবার অধিকারী নই আমি ছুঁইব না।" আরও একজন আসিয়াছিল।" আমি বলিলাম, 'কেন আসিয়াছিল মা?" মা বলিলেন, "দেখা শুনা করিতে, কথাবার্ত্তা অনেক হইল।"

আজ বেলা দশটাতেই মার ভোগ দেওয়া হইল। তারপর কথায় কথায়, বেলা প্রায় ২টায় মা উপরে ধ্যান-মন্দিরে শুইয়া পড়িলেন। এর মধ্যেই সেবা একদল স্ত্রীলোক নিয়া মার নিকট কীর্ত্তন করিতে আসিল। মা'ও উঠিয়া আসিলেন। কীর্ত্তন, স্তোত্র পাঠ ও আরতির পরে মার নিকট ফলাদি ভোগ দিয়া ভোগের গান করিল। বেশ আনন্দ হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা বিদায় নিল।

একটি ভদ্রমহিলা একটি মেয়ে নিয়া আসিয়াছেন। মেয়েটির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ঘরে নাকি সে অনেক কিছু উৎপাত করে। কিন্তু মার কাছে আসিয়া অতি শান্ত ভাবে বসিয়া আছে। তাহার মা দেখাইল চুলগুলি টানিয়া টানিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে। মাথা প্রায় চুল-শূন্য করিয়া তুলিয়াছে। মুখের অনেক স্থানে নিজেই নখদ্বারা ঘা করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার মা ঐ সব দেখাইয়া চোখের জল ফেলিতেছে। মা উহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "দেখ কি অবস্থা, মাটির জিনিষ লইয়া তোমরা মজিয়া আছ। মা—টি ছাড়া কিছুই নাই ত? মাটির লতা, পাতা, ফল, মূল, খাইয়া থাক, আবার, ঘাস খাইয়া

গরুর যে শরীরের রস, দুধ, তাই খাও, এই ত শরীর ; আবার ইহা নষ্ট হইলে মাটির জিনিস, গাছ দিয়াই জ্বালাইয়া দিবে, তাহা-ও আবার মাটিই হইয়া যাইবে। তবেই দেখ, মা-টি ছাড়া আর কিছু নাই, মা—টি, ঐ মাটি, আবার বলিতেছেন, "দেখ কি অবস্থা, চুল টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িতেছে নখ দিয়া ঘা করিয়াছে শরীরের বেদনা বোধ নাই। এই রকমই হয়।" আবার হাসিয়া বলিতেছেন, "আমার মত আর কি? আগুন গায়ে দিয়া বসিয়াছিলাম। সত্যই এই রকম একটা অবস্থা সাধনা করিতে করিতে হয় ; তখন শরীরে বোধ থাকে না। আবার হয় কি, যুগপৎ দুইটাই খেলিতেছে। বোধও আছে আবার নাই ও। সাধনের স্তরে যাহারা আছে তাহারা একটা ধারার কথাই বলিয়া যাইবে। যেমন ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম একটাকে বড় বলিয়া যাইবে। কিন্তু যাঁহারা আরও উপরে আছেন তাঁহারা দেখিবেন, ইহার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, ছোট-বড় নাই, সব সমান।" এই সব নানা কথায় সন্ধ্যা হইল। মাকে নিয়া একটু হাঁটিতে বাহির হইলাম। হাঁটিয়া আসিয়াই মা শুইয়া পড়িলেন।

কি কথায় বলিতেছেন, "দেখ, যতক্ষণ ভিতরে ঘা থাকে ততক্ষণই জ্বালা। ঘা অর্থাৎ অভাব বোধ। আবার এমনও হয় ঘায়ে অনেক সময় জ্বালা থাকে না, কিন্তু ঘা বাড়িয়া যাইতেছে ; সেই গুলি আরও খারাপ অবস্থা। যতক্ষণ জ্বালা আছে, ততক্ষণ একটু ভাল অবস্থা। জ্বালা থাকিলেই তাহার নিবারণেরও চেষ্টা থাকিবে।" এই রকম কত কথাই বলিতেছেন সবটা লিপিবদ্ধ করা সাধ্যাতীত। প্রত্যেক কথাটিই যেন অমূল্য ও মধুর।

২৭শে চৈত্র, সোমবার—

পাঞ্জাব হইতে সাধু সিং আসিয়াছেন, মা খাওয়া দাওয়ার পর বেলা প্রায় ১১টায় বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন, সাধু সিং বলিলেন, "মা, হরিদ্বারে এক সাধু বলিলেন, 'পূজা পাঠ কিছু করিবার দরকার নাই। শুধু মনকে বিষয়-বিমুখ করিয়া রাখিলে জ্ঞান আপনি আসে।' এ'কথায় আমার ঠিক ঠিক বিশ্বাস হইল না, তাই আমি মনে করিয়াছিলাম মাতাজীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার মীমাংসা করিয়া নিব।"

মা বলিলেন, "দেখ, যে যেই সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে সবই ঠিক, কারণ যে যতটুকু দেখিতেছে ততটুকুই বলিবে ত। **সকলের পক্ষে এক কথা খাটে না। অধিকারী ভেদে কথা না বলিলে ক্ষতি হয়।** মনকে বিষয় বিমুখ করিবার জন্যই ত সাধন ভজন পূজা পাঠ ইত্যাদি সব করা। তবে কাহারও যদি এ সব করার দরকার না হয়, বলিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে করা আছে। লাফ দিয়া ত কেহ গাছে উঠিতে পারে না!"

সাধুসিং,—"হরিদ্বারের সাধুটি আরও বলিতেছেন, 'শুধু শাস্ত্র পাঠ করিলেও জ্ঞান হয়, গুরুর দরকার নাই। আর একথাও উঠিয়াছিল যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট যদি সাপ কি বাঘও আসে, তবে সে মারিবে কেন? তিনি বলিলেন, 'না মারা, ত মূর্খের কাজ। শরীর বাঁচান দরকার কাজেই সাপ-বাঘ মারাও দরকার।"

মা বলিলেন, "শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে জ্ঞান লাভ হয়, আমি ত বলিব ও' গুরুরই আশ্রয় নেওয়া হইল। শাস্ত্রও গুরু অর্থাৎ যিনি শাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন তিনিই গুরু হইলেন। আর, **ব্রহ্মজ্ঞানী যদি হয়, সে'ত**

শুধু তাহার শরীরটুকুর জ্ঞান নিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে না, সমস্ত নিয়াই একমাত্র সে, এই ত জ্ঞান হইবে। তবে আর মারা না মারার কি? কে কাহাকে মারে? আর মারিলেও কি রকম জান? যেমন নিজের নখ দ্বারা নিজের শরীর ক্ষত করা হইতেছে—এক ছাড়া তাঁহার নিকট দুই কোথায়? হিংসা বৃত্তিতে মারিতেছে তা' নয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর হিংসা বৃত্তির ত কথাই নাই। কে কাহাকে হিংসা করিবে? কাজেই ও কথা হইতেই পারে না।"

এই সব কথাবার্ত্তার পর অখণ্ডানন্দজীকে কোন কাজে হরিদ্বার পাঠাইয়া মা ধ্যান মন্দিরে যাইয়া শুইয়া পড়িলেন। আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজি রওনা হইলেন। মা বলিলেন, "তিনটার গাড়ীতে যাও।" মার সব কাজই প্রায় এই রকম, বিবেচনা বা এদিক ওদিক দেখিবার অবকাশ থাকে না। পূর্ব্বে ব্যবস্থাদি করিলেও হয় না, উপস্থিত মত সব ব্যবস্থা।

আজ দুপুরে মার শুইবার ভাব নাই। তাই ধ্যান মন্দির হইতে উঠিয়া আসিলেন। আমি আবার উপরের ঘরটাতে শুইতে দিলাম। কিন্তু শুইবার ভাব নাই, ডাকিতেই আমি ঘরে গিয়া বসিলাম। বলিলেন, "শুইবার ভাব নাই।" কথাবার্ত্তা হইতেছিল। হঠাৎ, শিশুদের গায়ে যেমন গন্ধ থাকে, সেই রকম গন্ধ পাইলাম। গন্ধে যেন ঘর ভরিয়া গেল। আমি বলিলাম, "একি, এ'যে শিশুর গায়ের গন্ধ!" মা তখন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এর একটা কারণ আছে।" আমি আগ্রহভরে কারণ জিজ্ঞাসা করায় মা বলিতে লাগিলেন, "সে দিন ২৪শে চৈত্র, যে কয়েক জন আসিয়াছিল, (সূক্ষ্ম শরীরী), বলা হইয়াছিল না? তারপর, সকাল

বেলায় অনেক বেলায় ওঠা হইল, অনেক সময় শোওয়ার ভাবে পড়িয়া থাকা হইল না? সেই দিন (অর্থাৎ ২৫শে চৈত্র সকাল বেলায়), দেখিতেছি অনেকে আসিয়াছে (সূক্ষ্ম শরীরীরা), তার মধ্যে দুইটি সদ্য প্রসূত শিশু একটু দূরেই শুইয়া আছে, আমিও শুইয়া আছি। যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজনের ভিতরের ভাবটা জাগিল, এই শরীর (নিজ শরীর দেখাইয়া) হইতেই ঐ শিশু দুটির প্রকাশ হইয়াছে, তাই বলিতেছে, 'দেখ (এই শরীরকে দেখাইয়া), তাঁর এই দুটি সন্তান।' আবার, তাদের মধ্যে একজন বলিতেছে, 'কি বলিতেছ, তাঁর কি এই দুইটাই সন্তান? জান না, তাই এইরূপ বলিতেছ, **তিনি যে সর্ব্বক্ষণই সৃষ্টি করিতেছেন, সবই যে বিশ্ব ব্যাপক তাঁরই সন্তান।** এই বলিয়া সে বিশেষ ভাবে এই শরীরটার কাছে প্রার্থনা করিতেছে, 'মা, কেন উহাদের এই ভুল বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দেও না?' প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া হন হন করিয়া কোথাও চলিলাম। আমার চলিবার ভঙ্গি দেখিয়াই, পূর্ব্বে যিনি সন্তান নিয়া কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিতেছে 'তাই ত! সাধারণ মানুষ কি এই ভাবে চলিতে পারে?' তাহার এই ভাবে ভুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দ্বিতীয়টি, যিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তিনি বলিতেছেন, 'মাকে আমরা যেরূপ বিশ্বাস করি, অভয় টভয় উহারা সকলে, এই ভাবে বিশ্বাস করিতে পারে না কেন!' আর একজন বলিতেছে, 'উহারা দ্বেষের মধ্যে আছে কিনা তাই, তাই'।"

শিশু দুইটি একটু দূরে শুইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে যেন হাত পা নাড়িতেছে, চাহিতেছে, তারপর একটি এই শরীর দেখাইয়া বলিতেছে, 'ঐখানে যাব।' উহাদের মধ্যেই একজন, শিশু দুইটিকে আমার কাছে

আনিয়া মাথা দুইটি এই শরীরের উপর দিয়া শোয়াইয়া দিল, এবং আমার হাতটি টানিয়া নিয়া তাহাদের মাথায় দিল। কিন্তু আমার হাত দিবার ভঙ্গি দেখিয়া তাহারা বলিতেছে, 'এ'কি রকম? শিশু দুইটির দিকে যেন লক্ষ্যই নাই!' দেখিতে দেখিতে শিশু দুইটি বড় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, হাঁটিতে লাগিল। যেমন দেবতাদের পিছনে একটা জ্যোতিঃ দেখিস না? সেই রকম তাহাদের পিছন দিকে জ্যোতিঃ পড়িয়াছে। একটি শিশুর চেহারা, রং, চতুর্ভুর্জ বিষ্ণু মূর্ত্তির ছবি যে রকম দেখিস, সেই রকমই প্রায়। আর একটির অত্যন্ত শুভ্রবর্ণ, মহাযোগীর মত চোখের ভাব। আরও অনেকে সেখানে আছে। এখানকার লোক যেমন স্তরে স্তরে থাকে, তাহাদের অবস্থা সেখানেও তাই। এই যে বলিলাম কথাবার্ত্তা হইল এ' কিন্তু মুখে কোন শব্দ নাই মুখ একেবারে বন্ধ, কিন্তু সাঙ্কেতিক ভাবে ভিতরে যে কথা হইতেছে, তাহাই এত স্পষ্টভাবে বোঝা যাইতেছে যেন কথা হইতেছে। আবার ২।১টি এত মিষ্ট স্বর ২।১ বার শোনা গেল তাহা বোঝান যাইবে কি করিয়া? অতি মিষ্ট সে স্বর। শোন্, শিশু দুইটি দেখিতে দেখিতে অতি বড় হইল বলিলাম না? কি রকম জানিস্! যেমন হাতে সাবান নিয়া ঘসিতে আরম্ভ করিলে ফেনায় হাত ভরিয়া উঠে, সেই ভাবে বাড়িয়া উঠিল।"

আমি অবাক হইয়া শুনিতেছি, বলিলাম, 'মা তোমার কথায় বুঝিলাম ঐ শিশু দু'টি শিব ও বিষ্ণু।' মা আপত্তি করিলেন না; বলিলাম, 'আমার গায়ে কাঁটা দিতেছে, তুমি কি মা!' মা হাসিয়া বলিলেন, "বাঃ, এ রকম ত কত দেখা হয়, আশ্চর্য্যের কথাটা কি হইল! এ' ত সাধারণ কথা, তুই শিশুর গায়ের গন্ধ বল্‌লি না, তাই এই কথা উঠিল, বলা হইয়া গেল। এক জনের ভাব হইয়াছিল না যে, ইহার এই শিশু দুটি, ঐ যে শিশুর

প্রকাশটা শুনলি না, তার জন্যই ঐ শিশুর গায়ে ঐ ভাবের গন্ধ বাহির হইল এবং তুই পেলি।"

২৮শে চৈত্র, মঙ্গলবার--

আজ খাওয়ার পর মা বলিলেন, "চল্, উপরের ঘরে অথবা যেখানেই হউক, তোর কি কথা আছে শুনি। শুইবার ভাব এখনও নাই শুইবার ভাব আসিলে শুইয়া পড়িব।" মার কথায় আমি উপরে বিছানা লইয়া গেলাম এবং মার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলাম। কাল রাত্রি হইতে কালাচাঁদ দাদার জল-বসন্ত হইয়াছে তাই আজ প্রাতেই মা ব্রহ্মচারীদের সকলকে অন্যান্য স্থানে গিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বলিলেন, "এই সব ব্যারামে, সেবা করিতে যাইতে সকলে ইচ্ছা করিয়া যায় না তাই কিছু দিন সকলে গিয়া দূরে থাক।" সব দিকেই মার সমান লক্ষ্য। দুপুর বেলায় আমার সঙ্গে কিছু কথা বার্ত্তা হইল, তারপর আমাকেও হরিদ্বার যাইয়া থাকিতে বলিলেন। বলিলেন, "যোগেশ ও কমলাকান্ত এখানে থাকুক।" তা'ই হইল, আমরা সব ত, মার আদেশে বাধ্য হইয়া চলিয়া আসিলাম, মা দেরাদুনে রহিলেন।

২৯শে, চৈত্র বুধবার—

আমরা কন্‌খলে মঙ্গলানন্দ গিরিমহারাজের আশ্রমে আছি। দিদিমাকে আনানো হইয়াছে, স্থির হইয়াছে আগামী কল্যই দিদিমা গিরিমহারাজের নিকট সন্ন্যাস লইবেন। এবং মনোরঞ্জন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য নিবে।

৩০শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার—

সকাল বেলার দিকেই মনোরঞ্জন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য নিল, নাম হইল মহানন্দ। মন্ত্রাদিতে আহুতি দেওয়া হইল, দারা-পুত্র, আশা-বাসনা,

কাম-ক্রোধাদি, সব স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দেওয়া হইল। শেষ রাত্রিতে দিদিমা সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন, মুণ্ডন করা হইয়া গিয়াছে। মাকে আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া লোক পাঠান হইয়াছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোটরে মা আসিয়াছেন, আর বাস ভর্ত্তি হইয়া ভক্তেরা আসিয়াছেন।

সোলনের রাজা এখানে আছেন। তিনি ও ডাক্তার পান্থ মার সঙ্গে আসিয়াছেন। মঙ্গলানন্দ গিরিমহারাজ মোটেই লোক সমাগম পছন্দ করেন না। আপন মনে থাকেন, বাহিরটা একটু রুক্ষ দেখায়, কিন্তু ভিতরটা সে রকম নয়, বেশ আনন্দের সহিত মাকে ভিতরে নিয়া বসাইলেন। এত লোক আশ্রমে রাখিতে গিরিমহারাজ আপত্তি করিবেন ভাবিয়া অনেকে ধর্ম্মশালায় চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু গিরিমহারাজ যাইতে দিলেন না, সকলেই আশ্রমে রহিয়া গেলেন। কথা হইল, আগামী কল্য মা সকলকে লইয়া দেরাদুন আশ্রমে ফিরিবেন। আশ্রমে কেহ থাকিবে না, গৃহস্থেরা নিজেদের বাড়ী চলিয়া যাইবেন। ব্রহ্মচারীরা রায়পুর থাকিবেন, আমরা কয়েকজন এখানে থাকিব মা আশ্রমে থাকিবেন।

লোকজন বিশেষ কাহাকেও গিরিমহারাজ থাকিতে দেন না, কাজেই, আশ্রমটি নীরব নিস্তব্ধ। আজ তাহা কোলাহল-মুখর হইয়া উঠিল যদিও মা সকলকে বলিয়া দিয়াছেন কেহ যেন গণ্ডগোল করিয়া গিরি-মহারাজের শান্তিভঙ্গ না করে। মা অনেকক্ষণ সকলকে লইয়া গিরি-মহারাজের ঘরে বসিলেন। কথা বার্ত্তা হইল। মা প্রায় চুপ করিয়া ছিলেন মহারাজই প্রায় কথা বার্ত্তা বলিতেছিলেন। সকলে তাঁহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। ভয়ে, বড় কেহ গিরিমহারাজের আশ্রমে

আসে না, মা'ও মধ্যে মধ্যে ভীড় নিয়া আশ্রমে আসেন। গিরিমহারাজ বলিতেছেন, আমি কাহাকেও আশ্রমে আসিতে দিই না, মুখে রাগ দেখাই ডাণ্ডা লাগাইতে যাই। ভয়ে আর এ'দিকে কেহ আসে না। আমি একান্তে পড়িয়া থাকি তাই আমার ভাল লাগে।" হরিরাম ভাই বলিতেছে, 'যখন আপনি প্রথম মাকে দেখিলেন ডাণ্ডা লাগাইতে গিয়াছিলেন নাকি ?' গিরিমহারাজ বলিতেছেন, 'ও' ত সব জানে, তাই ডাণ্ডায় ভয় করে না, ওকে কি ডাণ্ডা লাগাইব !' মা'ও বেশ মেয়ে সাজিয়া ২।১টি কথা বলিতেছেন। গিরিমহারাজ মাকে বসিতে গালিচার আসন, তাকিয়া ইত্যাদি দিয়াছেন। বেশ আনন্দে সময় কাটিয়া গেল, আজ রাত্রে গঙ্গা-স্নান-যোগ আছে, রাত্রি আটটা হইতে ১২টা অবধি—অনেকে গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলেন।

রাত্রি প্রায় ৩টায় বিরজা হোম আরম্ভ হইল একটা গাছতলায়, একটা ঝুপ্‌ড়ীর ভিতর যজ্ঞ আরম্ভ হইল, মাকে নিয়া গেলাম, আমরাও সকলে বসিলাম। গিরিমহারাজ সন্ন্যাসের মন্ত্রটি কিছু কিছু, বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। সুন্দর সময়, স্থান, কাল, পাত্র, সকলই সুন্দর ! গঙ্গার তীরে আশ্রমটিও বেশ, তার মধ্যে শেষ রাত্রিতে মা'ও উপস্থিত, গিরিমহারাজ সন্ন্যাস মন্ত্রে দিদিমাকে দীক্ষিত করিতেছেন। যজ্ঞাগ্নি ও মন্ত্রার্থগুলিতে সকলেরই একটা ভাবের গভীরতা আসিল। কার্য্যশেষ হইতে চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল। দিদিমা গেরুয়া বস্ত্রে সাজিলেন। মা বলিতেছেন, "সর্ব্বদাই আমাকে বলিয়াছ, 'তুই সকলকে সব বলিস্ আমাকে কিছু বলিস্ না কেন ?' এই ত' বলিলাম, যাহা ভাল তাহা বলা হইয়াছে। দিন দিন লোক সংসারে জড়াইয়া পড়ে, কয়জনের ভাগ্যে এ'রকম বাহির হওয়া হয় ? এখন শুধু সেই একের, আত্ম-চিন্তায় থাকিতেই

চেষ্টা কর। জ্ঞান ও স্বরূপ লাভ না হইলে কিছুই হইল না।"
দিদিমার নাম হইল মুক্তানন্দ গিরি।

৩১শে চৈত্র, শুক্রবার—

মাখনও সকাল বেলায় আসিয়া উপস্থিত। একমাত্র ছেলে, সবে বিবাহ করিয়াছে। একেবারে ছোট বৌ, বাপও মাত্র কিছুদিন হয় মারা গিয়াছেন, মায়ের এই অবস্থা দেখিয়া তাহার মনটা খুবই খারাপ হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু মা, ২।৪ কথায় সে ভাবটা অনেক কাটাইয়া দিলেন। আজ ভাণ্ডারা; সাধুরা কয়েকজন তুপুর বেলায় এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

হরিরাম একটি আমেরিকানকে লইয়া আসিয়াছে। আজ সে ৫ বৎসর যাবত যোগক্রিয়া করিতেছে। মার ঘরে একটু একান্তে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করায় তা'ই করিয়া দেওয়া হইল। খানিক পরে সে বাহির হইয়া বলিল, 'আমি এতদিন কত চেষ্টা করিয়াছি, মনটাকে একটু সময়ের জন্য একেবারে শূন্য করিতে পারি নাই, কিন্তু আজ মায়ের কাছে বসিতেই আমার মন একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছিল, এমন কি ঘর দরজা শরীর কিছুই আমার খেয়ালে ছিল না। এর পরে সে মা'র কাছে বসিয়া অনেক উপদেশ নিল। বৈকালে মা'র রওনা হইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই মা, গিরিমহারাজের কাছে গিয়া বসিলেন। সকলেই বসিয়াছে; মা অভয়ের কথা গিরিমহারাজকে বলিলেন, এবং অভয়কে বলিলেন কাছে যাইয়া বসিতে। অভয় তাহাই করিল। গিরিমহারাজ প্রথম অভয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কেন গৃহ ছাড়িল, ইত্যাদি; পরে ধীরে ধীরে সংসারের অনিত্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলেন, আরও বলিলেন,

'মার সঙ্গে আছ, বেশ ত ! মার সেবা কর, ধীরে ধীরে সব হইবে। রাস্তায় পড়িলে ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে পৌছান যায়।'

প্রায় ৫টায় সোলন-রাজ, দুর্গাসিং মাকে নিজের মোটরে লইয়া রওনা হইলেন। পথে 'নান্‌কী বাই'য়ের ধর্ম্মশালায় নান্‌কীবাইকে দর্শন দিয়া পীতকুঠি, ডাক্তার পান্থকে দর্শন দিলেন। রাজা যেখানে থাকেন সেখানেও মাকে নিয়া গেলেন। রাণী, রাজমাতা, সকলে মাকে দর্শন করিলেন। একটু সময় তথায় অপেক্ষা করিয়াই মা দেরাদুন রওনা হইয়া গেলেন আমাদের, কয়েক দিন পর যাইতে বলিয়া গেলেন।

১৩৪৬ সন, বৈশাখ

১লা বৈশাখ, শনিবার—

আমরা গিরি মহারাজের আশ্রমে আছি। মুক্তানন্দ গিরি (দিদিমা), আমাদের সঙ্গেই আছেন।

৬ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—

মার আদেশে আমরা আজই রায়পুর রওনা হইলাম।

৭ই বৈশাখ, শুক্রবার—

আজ প্রাতে কিষণপুর আশ্রমে মার দর্শনে গিয়াছিলাম। মা'ও সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রায়পুর আসিলেন।

৯ই বৈশাখ, রবিবার—

আজ বৈকালে মা আবার কিষণপুর আশ্রমে চলিয়া গেলেন। আমাদের এখানেই থাকিতে বলিয়া গেলেন। শরীর খুবই অসুস্থ, কিন্তু অনবরত এই ভাবেই যাওয়া আসার মধ্যে আছেন। সেবার সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্যই নাই বরং যাহাতে সে বিষয়ে বেশ অনিয়ম হয় তাহাই করিতেছেন, কিছু বলিলে বলেন, "এক ভাবে চলিয়া যাইবেই। আমি ত এক স্থানেই আছি।" কিষণপুর রওনা হইবার পূর্ব্বেই এই স্থানের, এবং দেরাদুন হইতে আরও অনেকে মার দর্শনে আসিয়াছেন। কথায় কথায় মা নিজেকে দেখাইয়া বলিতেছেন, "এই মেয়েটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখিও, দেখ না, ছেলে মেয়েকে বাপ মা কত ভাবে যত্ন করিয়া বড় করিয়া তোলে, বড় হইলে সন্তান দ্বারা কত কাজ হয়। তখন সন্তানই সব করে। পিতা মাতা আরাম করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। এই সন্তানটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাকে বড় করিয়া তোল। এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।"

সেবা আসিয়াছে; পুর্ব্বেই লিখা হইয়াছে, মাকে স্পর্শ করিলেই, কি মার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হইলেই অনেক সময় সে কেমন হইয়া পড়ে। কোন কোন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আজও মা তাহাকে বলিলেন, "আমার নাড়ী দেখ দেখি।" সে হাত দিতেই তাহার শরীর স্থির হইয়া, চক্ষু বন্ধ হইয়া গেল। খানিক পরে, সে কথা বলিতে পারিল, কিন্তু চোখ খুলিতে আরও খানিকক্ষণ গেল। এই অবস্থার কথা নিয়া অভয়ের সঙ্গে কথা হইতেছে। অভয় বলিতেছে, উঁহার একটা বিশ্বাস এইরূপ হইয়া গিয়াছে, যে মাকে স্পর্শ করিলে এইরূপ হইয়া যাইবে। তাই

এইরূপ হয়। আর, কথা যে বন্ধ হইয়া যায়, ইহা এইরূপ হয় কেন? অনেক মহা পুরুষের অনেক উচ্চ অবস্থার কথা শুনিয়াছি সেই অবস্থায়ও তাঁহাদের এইরূপ হইয়া যায় নাই।" মা বলিলেন, "তাঁহাদের প্রথম অবস্থার কথা কিরূপ হইয়াছিল, তা'ত সব তোর জানা নাই। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া একটু বন্ধ হইয়া যায়, একটু আড়ষ্ট ভাবও আসে, এই আর কি?" সেবাও বলিতেছে, 'শোন অভয়, আমি ইচ্ছা করিলে এইরূপ হয় না। কতবার আমি এইরূপ হইবার জন্য মাকে স্পর্শ করিয়াছি, কিন্তু কিছুই হয় নাই। কিন্তু এক একদিন আমার মনে হয়, হয়ত আমার পূর্ব্বের শুভ কর্ম্মফলের জন্যই মার এই ভাব জাগে, আমার এইরূপ হউক, মার ত নিজের কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই, আমার কর্ম্মফলেই মার এইরূপ ভাব জাগে; তখনই আমার এইরূপ হয়। স্পর্শ কি বল, কখনও মার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি দূর হইতে মিলিলেই এইরূপ হয়।' কিরূপ হয় জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, "এই যে মন কত চঞ্চল, কোথায় কোথায় চলিয়া যায়, কিন্তু হঠাৎ যেন মন একেবারে স্থির হইয়া গেল।' আনন্দ হয় কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলিল, 'আনন্দ কাহাকে বলে আমি ঠিক জানি না, তবে একটা শান্ত ভাব আসে। শরীরের ক্রিয়াদি সব বন্ধ হইয়া যায়।' মা বলিলেন, "কখনও ভয়ানক ভাবে হাসিতে কখনও ভয়ানক ভাবে কাঁদিতে আরম্ভ করে।" সেবা বলিতেছে, "আমি যে জপ করিতে করিতে এইরূপ হইয়া পড়ি তা নয়, এইরূপ হইবার পর জপ খুব চলিতে থাকে। আর আমি ত বেশী বসি না, কে যেন আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া দেয়। আর শ্বাসে শ্বাসে নাম চলিতে থাকে।" মা বলিলেন, "ও'র ভিতরে কতগুলি জিনিষ আছে, অনুকূল ক্রিয়া না করাতে তাহা কিছু কিছু নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সেবা জানেও না, কি আছে ও'র ভিতর। এই জিনিষ থাকার দরুণ এই স্পর্শ

বা দৃষ্টিতে ঐরূপ হইয়া যায়।" সেবাও বলিতেছিল, "আমি যেন বোধ করি মার ভিতর হইতে একটা কিছু আমার ভিতর আসিতেছে।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই মা কিষণপুর রওনা হইয়া গেলেন। মেজদি মহিলাশ্রমে থাকিবার জন্য আজ দিল্লী রওনা হইয়া গেলেন। রায়পুর জায়গাটিতে শান্ত ভাব আছে। মা ঢাকা হইতে বাহির হইয়া এখানেই প্রথমে চলিয়া আসেন। আমরা মার স্মৃতিটুকু লইয়া এখানেই রহিলাম।

১০ই বৈশাখ, সোমবার—

অভয় এইখানেই পাহাড়ের কিছু উপরে একটা কুঠিয়াতে আছে, বৈকালে তাহার কুঠিয়াতে গেলাম। তাহার সঙ্গে কথায় কথায় বৃন্দাবনের কথা উঠিল, মা বৃন্দাবনে বলিয়াছিলেন, "তোমার করণীয় কর্ম্ম করা হইলেই কৃপা স্বভাবতঃ প্রত্যক্ষ প্রকাশ হয়, একথা যেমন সত্য, আবার অহৈতুকী কৃপাও সেইরূপ সত্য; কেন হয়, একথা বলা চলে না। কোন হেতুর প্রশ্ন ওখানে দাঁড়ায় না,—তাঁহার স্বভাব, তাঁর লীলা, ঐ ভাবেও করিতেছেন, যখন যেমন প্রকাশ। তিনিই ত দ্রষ্টারূপেও, পক্ষ পাতিত্ব দোষ তাঁহাতে হইতে পারে না। সৃষ্টিও অনাদি, কর্ম্মও অনাদি, সৃষ্টির এই রকম তারতম্য কেন হইল? এই কথার জবাব কে দিবে? তাঁর লীলা এই মাত্র উত্তর।"

১৪ই বৈশাখ বাংলা ১৩৪৬ ইংরাজী ১৯৩৯ সন শুক্রবার—

মা আজ মুসুরী রওনা হইলেন। দুপুরে বসিয়া একটি সাধু ও অভয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। কৃপার কথায় বলিতেছেন, "এই শরীরের কৃপা

রূপেও যদি কিছু দেখ, জানিও তাহাও হইয়া যাইতেছে। আগুনের কাছে গেলে যেমন তাপ স্বাভাবিক, যদি কিছু এই শরীরের কৃপা ইত্যাদি দেখ, তবে তাহাই। নতুবা 'কৃপা করিব' এই ভাবের কোন কথাই এর মধ্যে নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনও দ্বন্দ্বই নাই।" মা অপর এক সময় কথায় কথায় বলিয়াছেন, "অহৈতুক কৃপাও হয়। তাহা কেন হয়, এই 'কেন'র কোনও উত্তর নাই। এই শরীর দিয়া সবই হইয়া গিয়াছে।" অভয় বলিল, "আচ্ছা, ছোট ছোট কাজেও কি আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছার কিছুই নাই?" মা বলিতেছেন, "একেবারে কিছুই না, এই যে যাওয়া আসা হইতেছে, কি রকম জানিস্, ? ইচ্ছা প্রকাশটা যদি দেখিস তাহাও স্বভাবতঃ হইয়া যাইতেছে। তোদের এই ইচ্ছা নয় জানিস্, যেমন বাতাসে কাগজ-খানা উড়াইয়া নিয়া যাইতেছে; যখন যাহা দরকার, হইয়া যাইতেছে।" কি কথায় কথায় অভয় বলিতেছে, "পূর্ণ-ব্রহ্ম-নারায়ণ এই কথা ত' বলিয়াছেন," এই বলিয়া হাসিতে লাগিল। মা অমনি সাধুটিকে বলিতেছেন "দেখ বাবা, আমি কি করিব? যেমন বমি আসিলে লোকে বমি করে, এও ঠিক সেই রকম, সর্ব্বাংশে উপমা হয় না। ইচ্ছা অনিচ্ছা বিচার বুদ্ধি বা লোকে কি বলিবে, কিছুই এই ভাবের কাছে দাঁড়ায় না, যাহা হইবার হইয়া যাইতেছে।" অভয় বলিতেছে, "আচ্ছা মার পূর্ব্ব জন্ম আছে কিনা?' মাও হাসিয়া সকলকে দেখাইয়া বলিতেছেন, "এই যে সব পূর্ব্ব জন্ম পূর্ব্ব জন্ম। যদি বলিস্ এই জগৎভরা স্থূল সূক্ষ্ম যা দেখিস্ সব ঐ। তারপর পূজাদির সময় যে দেবীদের মত আসন হইয়া যাইত, এমন কি বাহনাদিও দেখিতেন একটু একটু সেই সব কথা উঠিল। বেলা প্রায় ৪টায় মা মুসুরী রওনা হইলেন।

১৬ই বৈশাখ, রবিবার—

মা কাল মুস্সুরীতে অপেক্ষা করিয়া আজ উত্তর কাশী যাত্রা করিলেন। সঙ্গে অখণ্ডানন্দজী, রুমাদেবী, অভয়, কানু, শিশির, কমলাকান্ত, পূর্ব্বোক্ত পার্শী ভাই থেরেশ * ও আমি চলিলাম। মার শরীর এত দুর্ব্বল কিন্তু ঘোরা ফেরা বন্ধ করা যাইতেছে না। শরীরের অবস্থা এক এক সময় যেরূপ হয় তাহাতে সকলেই ভয়ানক চিন্তিত হইয়া পড়ি। সকলেই বলেন, বিশ্রাম দরকার, কিন্তু মা সে কথা শুনিতেছেন না। আপন ভাবেই সর্ব্বদাই ঘুরিতেছেন। কখনও আবার দেখা যাইতেছে এত পরিশ্রমেও শরীর একটু ভালই হইতেছে, আবার কখনও ভয়ানক খারাপ। মা বলিতেছেন, "ঘরে বসাইয়াও ত শরীর ভাল রাখিতে পারিতেছ না। আবার ঘোরাফেরাতেও শরীর বেশী কিছু খারাপ হইতেছে না। যাহা হইবার হইয়া যাইবেই। কেহ বাধা দিতেও সাহস পায় না, তাই এ ভাবেই চলিতেছে।

মা উত্তরকাশী চলিলেন তাই হরিরাম হংস, গোবিন্দভাইয়েরা মার সঙ্গে সঙ্গে মুস্সুরী আসিয়াছেন। রওনা হইবার সময় অনেক দুর অবধি ডাণ্ডির সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। সকলেই কাঁদিতেছে। মা কতদিন পর ফিরিবেন কে জানে! মা সকলকে হাসিমুখে প্রবোধ দিয়া চলিলেন।

১৭ই বৈশাখ, সোমবার—

আমরা চলিতেছি। শিশির পথ চলিতে অশক্ত হইয়া পড়ায়, মা অনেকটা হাঁটিয়া চলিলেন, শিশিরকে নিজের ডাণ্ডিতে বসাইলেন।

---

* এই ছেলেটি কয়েক বছর পূর্ব্বেই ভোলানাথের নিকট দীক্ষা নিয়া কিছুদিন মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। জামসেদপুরে কাজ করে।

সন্ধ্যায় 'বলডিয়ানা,' পৌছাইয়া মার জ্বর জ্বর হইল। আগামী কল্য এই চটিতেই বিশ্রাম নেওয়া স্থির হইল। সকলেই শ্রান্ত-ক্লান্ত।

রাত্রিতে অভয় নানাকথা মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। কথায় কথায় উঠল, যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অন্য শরীর ধারণ না করা পর্য্যন্ত এই জন্মের স্মৃতি থাকে কি না? মা বলিলেন, "সকলের এক রকম নয়। স্মৃতি থাকেও আবার স্মৃতির কোনও কথাই নাই। দুই রকমই হয়।" আর'ও অনেক কথা হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বের কয়েকটি কথা মনে হইতেছে, তাহা লিখিতেছি। একবার মাকে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কোন রূপ চিন্তা যদি না আসে তবে শূন্য চিন্তা করিব কি?" মা বলিলেন, শূন্যও ত একটা রূপই হইল। বেশ, যদি ভাল লাগে চুপ করিয়া বসিয়া শূন্য রূপেরই চিন্তা করিও। এর পর দেখিবে শূন্য চিন্তাও থাকিবে না।" মা অনেক সময় বলেন, "বেশী সময় স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে চেষ্টা করা ভাল। একেবারে গা ছাড়া ভাবে স্থির হইয়া মনটাকে শূন্য করিয়া বসা ভাল। অথবা মনটাকে শ্বাসের দিকে রাখ ও মন্ত্রটাকে শ্বাসের সঙ্গে মিলাইয়া দাও, দেখিবে কাজ হইবে। শুধু শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বসিয়া থাকিলেও মন স্থিরের সহায়তা হ'তে পারে।"

১৮ই বৈশাখ, মঙ্গলবার—

আজ বলডিয়ানাতেই রহিয়া গেলাম।

১৯শে বৈশাখ, বুধবার—

আজ 'ধরাসু' পৌছিলাম। আজ ১৯শে বৈশাখ, শ্রীশ্রীমার জন্ম

তারিখ। ভক্তদের ইচ্ছা হইল মার পূজা করে। গঙ্গার ধারেই এই চটি, অতি সুন্দর স্থান। ঘটনা চক্রে আমার খাওয়া হয় নাই, তাই অভয় ও কমলাকান্ত আমাকেই মার পূজা করিতে বলিল। তাহারা পাহাড়ে ঘুরিয়া বিল্বপত্র ও ফুল যোগাড় করিয়া নিয়া আসিল। আজ পূর্ণিমা এবং চন্দ্রগ্রহণ। কথা হইল, সন্ধ্যায় মার পূজা আরম্ভ হইবে। এ'দিকে রাস্তায় আসিতে অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর বহির্ব্বাসখানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। মা বলিলেন, "বেশ ত, কাপড় যখন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তখন এখানা গঙ্গায় ভাসাইয়া দেও। কাপড় আর পরিবার দরকার নাই, নেংটি ত আছেই, দরকার হইলে আলখাল্লা পরিবে।" তা'ই হইল। মা হাসিয়া বলিলেন, "উত্তর কাশীত সন্ন্যাসীদের স্থান, ও'খানে যাইবার রাস্তাতেই বাবারও বস্ত্রত্যাগ হইল।"

সন্ধ্যায় স্নান করিয়া মাকে পূজা করিতে বসিলাম, ছেলেরা কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। ১০॥ টায় গ্রহণ ছাড়িবে। গ্রহণ ছাড়িলে কোনও রূপে রান্না করিয়া মার ভোগ দেওয়া হইল। এত অসুবিধার মধ্যেও কোন প্রকারে মহানন্দে মার জন্মোৎসব করা হইল। রাত্রি প্রায় ২টায় আমরা শয্যা গ্রহণ করিলাম।

২০শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—

আর মাত্র ১৮ মাইল দূরে উত্তর কাশী। আমরা ভোরেই রওনা হইলাম। পথে একটা চটিতে খাওয়া দাওয়া করিয়া বেলা প্রায় ৫টায় আমরা উত্তরকাশীর মন্দিরে পৌছিলাম। তথায় সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূজাদির কার্য্যে এবং সাধন ভজনে নিযুক্ত আছেন। তিনি মাকে দেখিয়া মহানন্দে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। ২।৪ জন করিয়া

স্থানীয় লোক আসিয়া মাকে দর্শন ও প্রণাম করিতেছেন। মার শরীর এত অসুস্থ, হজমও প্রায় কিছু হয় না; এমতাবস্থায় এখানে নাকি শুকনা আলু ছাড়া অন্য কিছু তরকারি প্রায় পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। গরুর দুধও প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এই রকম স্থানে আসিলেন কেন, মা'ই জানেন, কতদিন থাকিবেন কিছুই ঠিক নেই। আমার উপর আদেশ হইয়াছে—মাস খানেক শরীরটা ঠিক ঠাক করিয়া রাখিয়া নামিয়া যাইতে হইবে। বিন্ধ্যাচল যাইয়া কিছুদিন থাকিতে হইবে। নিজের শরীরের দিকে কিছুই দেখিতেছেন না, যাহা করিবার করিয়াই যাইতেছেন, বাধা দিবার কাহারও ক্ষমতা নাই।

২১শে বৈশাখ, শুক্রবার—

আজ মা অনেক বেলায় উঠিলেন। দুপুরবেলা মাকে ভোগে বসাইয়াছি, অভয় ও আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। কথায় কথায় অভয় বলিল," আচ্ছা, মাকে কখনও ঝিমাইতে দেখিয়াছেন কিনা?" আমি বলিলাম, "আমি ত কখনও দেখি নাই, যখন দিনরাত লোকের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন তখনও দেখি নাই। এই কথায় ঝিমাইবার কথা উঠিল, আমি বলিলাম, "দেখ্ অভয়, একটা আশ্চ্যর্য দেখিয়াছি, আমি যদি কখনও কীর্ত্তন অথবা অন্য কোনও সময় বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়াছি, বহুলোকের মধ্যে হয়ত মা বসিয়া আছেন, আমি হয়ত অনেক দূরে বসিয়া ঝিমাইতেছি, চাহিয়াই দেখি, মা আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি যে কখনও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই জন্য আমার তন্দ্রা আসিলেই তখুনি ঐ চিন্তায়—মা বুঝি চাহিয়া আছেন, তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। আর অমনি আমার বুক ঢিপ ঢিপ্ করিতে থাকে।

আমি তখনই মার দিকে সভয়ে চাহিয়া দেখি, ঠিক মা চাহিয়া আছেন। কত লোক চারিদিকে বসিয়া আছে, গান বাজনা হইতেছে কিন্তু আমার ঝিমুনি আসিলেই হইল, তখনই মার দৃষ্টি পড়িবে। তারপর হয়ত আর ঘুম পাইল না, বেশ জাগিয়া আছি কিন্তু তখন মার দিকে পুনঃ চাহিয়া দেখি মা আর আমার দিকে চাহিতেছেন না। আমি ভাবি, এখন যে জাগিয়া আছি তা'ত মা দেখিলেন না।" অভয়ও এই কথা শুনিয়া বলিল, "বাঃ' এ'ত খুব আশ্চর্য্য।" মা হাসিয়া "বলিলেন, "সত্যিই তাই। কি রকম হয় জানিস্? আমার চোখটা যেন তখনই ঐ দিকে ঘুরিয়া যায়, আর ও' (আমাকে দেখয়াই) চম্‌কিয়া চাহিয়া আমার দিকে চায়। কেন ঐ রকম হয় তার কারণ, সর্ব্বদাই ওর একটা খেয়াল থাকে আমার দিকে, কথাবার্ত্তা বলুক কিন্তু খেয়ালটা থাকে এই দিকে (নিজেকে দেখাইয়া) কিন্তু যখন তন্দ্রা আসে তখন আর এই দিকে খেয়াল থাকে না তখনই আমার দৃষ্টিও ঐ দিকে যায়।" এই সব কথা নিয়া খুব আনন্দ চলিল।

দুপুরে মা কিছু সময় বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার সকলে মার কাছে গিয়া বসিল। রাত্রি ১০ টায় সকলে শয়ন করিতে গেল।

বৈকালে মাকে নিয়া আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া, পরে মাঠের মধ্যে গিয়া বসিলাম। সেখানে কয়েকজন সাধু আসিলেন, মাকে দর্শন করিতে। মা কথায় কথায় একটি সাধুকে বলিলেন "কতদিন এখানে আছ ?"

সাধুটী—'প্রায় তিন বৎসর।'

মা—"কি বোঝ? জমির মাপটা বাড়িতেছে ত? অর্থাৎ, অল্পেতেই সন্তুষ্ট থাক না ত ?" এই বলিয়া মার স্বাভাবিক মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন

ছেলে মেয়ের দল মার সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে। তাহাদের সঙ্গে কেহ কথাও বলিতেছে না। কিন্তু তাহারা মার সঙ্গেই চলিতেছে, খানিক পরে মা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, তোমারা আমার দোস্ত হইবে ?" এই কথায় কেহ কেহ লজ্জায় মুখ লুকাইল আবার ২।৪টি মার কথায় রাজি হইয়া মাথা নাড়িল। তাহাদের দেখিয়া ভরসা পাইয়া এবং মার পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসায় আরও কয়েকটি রাজি হইল। এইভাবে অনেক দোস্ত জুটিয়া গেল। মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার ত অনেক দোস্ত আছে দেখিতেছি। আচ্ছা দোস্ত, তোমরা সকলে আমার একটা কথা রাখিবে ত ?" তাহারা মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল। তখন মা বলিতে লাগিলেন, "পাঁচটি কথা—১। সকাল বেলা উঠিয়া ভগবানের নাম করিবে। তারপর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিবে, হে, ভগবান আমি যেন ভাল মেয়ে (ছেলেদের বলিতেছেন ভাল ছেলে)—হইতে পারি। ২। পিতামাতার কথা শুনিবে। ৩। সত্যকথা বলিবে। ৪। মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া করিবে। ৫। এই সব করিয়া তারপর একটু শয়তানি করিবে।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। শিশুর দলও হাসিয়া উঠিল। শিশুরা সকলেই এতদ্দেশীয়। আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'এই শিশুরা কেন মার সঙ্গ ছাড়িতেছে না! হয় ত, মার শিশু স্বভাব ইহাদের আকর্ষণ করিতেছে।' সন্ধ্যায় আমরা মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম, কীর্ত্তনাদি হইল।

২২শে বৈশাখ, শনিবার—

আজ জন্মতিথি। মার ভাবটা আজ যেন একেবারে চুপচাপ। সন্ধ্যা হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অস্ত হইতে উদয় পর্য্যন্ত কীর্ত্তন

হইবে। সারারাত নাম চলিল। শেষ রাত্রিতে কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী মায়ের পূজা করিল। এই স্থানেও কোন প্রকারে আমাদের উৎসব করা হইল।

২৩শে বৈশাখ, রবিবার—

আজ জন্মতিথি উপলক্ষে সকলকে মিঠাই দেওয়া হইল। এবং ১১ জন ব্রাহ্মণ দ্বারা 'রুদ্রি' পাঠ করান হইল।

আজ মা 'গঙ্গোত্রী' যাওয়ার কথা উঠাইলেন। এখানে ডাণ্ডি পাওয়া যায় না। তবে, মা যাইবেন শুনিয়া এখানকার অনেকেই সেই ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। যদি সব ব্যবস্থা হয়, হয় ত আগামী কল্য রওনা হওয়া যাইবে।

সাধুরা এবং যাঁহারা যাত্রায় বাহির হইয়াছেন, অনেকেই মাকে দর্শন করিয়া যাইতেছেন।

২৪শে বৈশাখ, সোমবার—

ঘটনাচক্রে আজ 'গঙ্গোত্রী' রওনা হওয়া গেল না। আগামীকল্য ভোরে রওনা হইব স্থির হইল।

২৫শে বৈশাখ, মঙ্গলবার—

আজ ভোরেই মার সহিত আমরা 'গঙ্গোত্রী' রওনা হইলাম। মার শরীর খুবই দুর্ব্বল, কিন্তু কেন যে এই ভাবে এই দুর্গম পথে চলিয়াছেন, মা'ই জানেন। তীর্থ করা তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেই পারে না। কি যে কারণ, কে জানে! একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে নীচে থাকিতে যাঁহার পেটে দুধ বা অন্য কিছু হজম হইত না, পটোল, কাঁচা-পেঁপে দিয়া

'জুসের' মত করিয়া খাওয়ান হইত, এখন পাহাড়ে-শাক-পাতা, পুরান আলু, ডাল যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহাই খাইতেছেন এবং হজম হইতেছে। আমি মাকে বলি, "মা, বরাবরই দেখি নিজের ভাবে যখন যাহা কর, তাহাতে তোমার কোন গোলমাল হয় না। এখন পাহাড়ে আসিয়াছ, এখন এই সব খাদ্যও হজম হইতেছে। এতদিন ত কিছুই হয় নাই।" মা'ও হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত, আমিও বলিতেছি কি করিয়া এ'সব হজম হইতেছে।"

দুপুরে একটা চটিতে আহারাদি করিয়া বেলা প্রায় ৪টায় আমরা আবার রওনা হইলাম। ৯ মাইল দূর ভাটিয়ালীতে রাত্রি যাপন করিবার ইচ্ছা। যাইতে যাইতে রাত্রি হইয়া গেল। কিছু পূর্ব্বেই মা ডাণ্ডি হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং হাঁটিয়া চলিলেন। প্রায় ৩ মাইল হাঁটিয়া ভাটিয়া-লিতে পৌছিলাম। সকলেই আমরা হাঁটিয়া চলিয়াছি। পথ ভয়ানক খারাপ। মা হাঁটিতেছেন, তাই আমরাও হাঁটিতেছি। সমান রাস্তায় একটু হাঁটিলেও যাঁহার হৃদকম্প হয়, কত সাবধানে সুস্থমত রাখা হয়, তবুও অসুস্থ হ'য়ে পড়েন, আজ তিনি এই দুর্গম পথে হাঁটিয়া চলিয়াছেন, খাওয়াও ঐ রকম!

২৬শে বৈশাখ, বুধবার—

কাল ভাটিয়ালীতে রাত্রি যাপন করিয়া আমরা আজ দুপুরে আবার রওনা হইলাম। সন্ধ্যায় আমরা গঙ্গানানী পৌছিলাম। রাস্তায় চলিতে চলিতে আমি দল ছাড়িয়া আগে চলিয়া আসিয়াছিলাম। একেবারে একা, জন-মানব শূন্য পথ, সন্ধ্যাও হইয়া আসিতেছে, পথও ভয়ানক খারাপ। আমি খুব তাড়াতাড়ি চলিলাম। কারণ সন্ধ্যার অন্ধকারে

আর পথ দেখা যাইবে না। সকলে কতটা পিছনে আছেন তা-ও বুঝিতেছি না, তা'ই চলিলাম। একটু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল তবে অতি সামান্য, কারণ ভরসা এই, মা পিছনে আছেন। একা একা এই দুর্গম পথ চলিতে আমার বেশ একটু আনন্দই হইতেছিল। একেবারে একা যেমন বিশ্বাস থাকে, ভগবান আছেন, তেমনই আমার মনে হইতেছিল মা, আছেন, ভয় কি? গঙ্গানানী চটির কিছু দূরেই দুইটা গরম জলের ঝরণা পাইয়া হাত মুখ ধুইয়া নিলাম। আরও একটু আসিতেই (তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে), তিনজন লোক পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "মাতাজী হৃষিকুণ্ডে স্নান করিবে না?" আমি বলিলাম, "এখন নয়, আমাদের দলে অনেক লোক আছে, তাহারা আসিলে দেখা যাইবে।" পাণ্ডারা আমার সঙ্গে সঙ্গে চটিতে আসিল।

আমি চটিতে আসিয়া একটা আলো দিয়া লোক পাঠাইয়া দিলাম। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে ডাণ্ডি ও অন্যান্য সকলের আসিতে কষ্ট হইবে। আর আমি একা চলিয়া আসিয়াছি, আমার জন্যও সকলের চিন্তা হইতে পারে, তাই আমি পৌছিয়াই খবর দিয়া লোক পাঠাইলাম। পাহাড়ী লোকেরা বেশ বিশ্বাসী। চুরি ডাকাতি ঐদিকে নাই বলিলেই চলে। সন্ধ্যার পরেই মা এবং অন্যান্য সকলে আসিয়া পৌছিলেন। গরম জলের ঝরণা হইতে শিশির ও অভয় স্নান করিয়া আসিয়াছে। কানু আমার একটু পরেই আসিয়া পৌছিয়াছিল। বিশাল পর্ব্বত চারিদিক ঘিরিয়া আছে, গঙ্গা সশব্দে চলিয়াছেন। ঝরণারও অভাব নাই, কোনটা বড় কোনটা ছোট! আমরা চলিয়াছি মার সঙ্গে—এ' আনন্দের তুলনা নাই!

রাত্রিতে মা শুইয়া আছেন। অন্যান্য সকলেই ঘুমাইয়াছে, ভোরে আবার রওনা হইতে হইবে, তাই জিনিস পত্র গুছাইয়া আমি ও

দেবীজি অনেক রাত্রিতে গিয়া মার কাছে খানিক বসিয়া যেই শুইয়াছি, এর মধ্যেই মা অস্পষ্ট স্বরে ডাকিলেন, "খুকুনী।" আমি তৎক্ষণাৎ ধড় মড় করিয়া উঠিয়া মার কাছে বসিয়া মার পায়ে ও গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। বলিলাম, "মা কি হইয়াছে? কেন ডাকিলে?" মা সেই রকমই অস্পষ্ট ভাবে বলিলেন, "শরীরটা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল।"

আমি নিঃশব্দে পায়ে ও গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। খানিক পরে মা বলিলেন, "তুই শুইতে যাবি না?" আমি বলিলাম, "শরীরটা এখন কেমন মা?" মা বলিলেন, "এখনও ঠিক হয় নাই।" আমি বলিলাম, 'আমি পরে শুইব, এখন বসি।' খানিক সময় বসিয়া যখন দেখিলাম মা আর শব্দ করিতেছেন না, তখন শুইয়া পড়িলাম।

২৭শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—

আজ ভোরেই আমরা রওনা হইলাম। আজ পথ ভয়ানক দুর্গম। অনেকটা পথ ডাণ্ডি চলিল না। হাঁটিয়া যাওয়াও প্রায় অসম্ভব। অতি কষ্টে ডাণ্ডি-ওয়ালাদের সাহায্যে ঐ পথ চলিয়া আসিলাম। ধারণা করা যায় না কি করিয়া ঐ পথ আসিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, কতকটা রাস্তা একেবারে ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কোনও প্রকারে লতা ধরিয়া পাহাড়ী কুলীদের সাহায্যে আমরা সেই সব স্থান পার হইয়া আসিলাম। সকলেই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা আবার রওনা হইলাম। চড়াইও ভয়ানক। আমরা 'শুকী' পৌছিয়া আজ এখানেই থাকা স্থির করিলাম। খাওয়া দাওয়া করিতে আজ আমাদের সন্ধ্যা হইয়া গেল।

মা একসময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কাল কতক্ষণ বসিয়া-

ছিলি।" এ'কথায় আমার কালিকার কথা কিছুই মনে হইল না। আমি বলিলাম, "কখন ?" মা বলিলেন, "কাল রাত্রিতে তুই বসিয়াছিলি না ?" তখন হঠাৎ আমার সব কথা মনে পড়িল। আমি বলিলাম, "হাঁ অনেকক্ষণ বসিয়াছিলাম, তুমি এই রকম করিয়াছিলে" ইত্যাদি বলিতে লাগিলাম। মা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "কাল তখন যদি আমার মুখের ছায়া দেখিতে, তবে হয় ত ভয় পাইতে।" তখন আমরা অনেকেই প্রশ্ন করিলাম, 'কেন মা ?' সে কথায় কোন জবাব না দিয়া বলিলেন, "আমার মনে হইতেছিল কেহ মুখ না দেখে। আমি মুখ ঢাকিয়া রাখিতেছিলাম।" আমি বলিলাম, "অন্ধকার ঘর কিছুই দেখা যাইতেছিল না।" মা আর ঐ বিষয়ের কোন কথারই জবাব দিলেন না। অগত্যা আমরাও চুপ করিয়া গেলাম। আজ সকলেই পরিশ্রান্ত তাই এখানেই থাকা স্থির হইল।

২৮শে বৈশাখ, শুক্রবার—

আজ বাহির হইতে কিছু বেলা হইয়া গেল। আমরা আজ ধরাসীর চটীতে পৌঁছিয়া খাওয়া দাওয়া করিলাম। ৬ মাইল পরেই একটা চটি আছে, তথায় বৈকালে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পথ দুর্গম এবং চড়াইও আছে, তাই আজ এখানেই রাত্রি কাটাইবার কথা স্থির হইল।

মার একটু জ্বর জ্বর ভাব হইয়াছে। এখানে একজন সাধু আছেন, তাঁর নাম কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। মা'র কথা শুনিয়া দেখা করিতে আসিলেন। ইনি প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় আছেন। শুধু ভূর্জ্জপত্রের ছোট্ট নেংটি পরিয়া আছেন। এখানকার এক শেঠের মুখে শুনিলাম, ইনি শীত-গ্রীষ্ম এই ভাবেই থাকেন। আর দৈনিক প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা, যেখানে ইচ্ছা গঙ্গার

ঠাণ্ডা জলে দাঁড়াইয়া থাকেন। এ'দিকে যখন বরফ পড়ে, তখনও ইঁহার এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। ইনি বঙ্গদেশীয়। আজও নিয়ম মত গিয়া গঙ্গায় প্রায় ঘন্টাখানেক দাঁড়াইলেন। পিছনে কোনও দণ্ডের মত একটা কাঠ দিয়া ঠেকা দিয়া রাখেন। তাহার উপর বসার মত কতকটা চিক্‌না দিয়া রাখেন, পরে একপায় দাঁড়াইয়া থাকেন, মধ্যে পা' বদল করেন। ঘণ্টাখানেক পরে তিনবার প্রদক্ষিণের ভাবে ঘুরিলেন, তারপর গঙ্গা প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসিলেন। মার সঙ্গে বিশেষ কোনও কথা হইল না। শুনিলাম প্রায় ১৮ বৎসর যাবৎ ইনি এখানে তপস্যা করিতেছেন। শরীরের চামড়া কতকটা মোটা হইয়া গিয়াছে। এই গরমের সময়ও এখানে বেশ শীত। শীতের সময়ও ইনি এই রকমই উলঙ্গ থাকেন। শুনিলাম, ইনি একবার গঙ্গোত্রী গিয়াছিলেন। ইঁহাকে দেখিয়া আরও ২।৩ জন সাধু এই ভাবে জলে দাঁড়াইয়া সাধনা করিবার চেষ্টা করিতেই পা ফুলিয়া উঠিয়াছিল। মা বলিলেন, "সাধনা করিবার ভাব থাকিলেই এই সব সহ্য হইয়া যায়, অভ্যাসে কি রকম হয় দেখ?" এই কথায় মা নিজের পুর্ব্ব-কথা বলিতে লাগিলেন, "যখন সংসারের মধ্যে কাজ-কর্ম্ম করিতাম কোন জামা-সেমিজ ব্যবহার করা হয় নাই। এর মধ্যে বর্ষাকালে হয়ত অনবরত বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া গায়ের চামড়া সাদা সাদা হইয়া গিয়াছে কিন্তু সেদিকে কোন লক্ষ্য হয় নাই। শীত-গ্রীষ্ম যেন প্রকাশই হয় নাই। তার পর দেখ, যখন গায় হয়ত কাঁথা কি কাপড় দিতে আরম্ভ করা হইল, দিতে দিতেই শীত আরম্ভ হইল, এমন চমৎকার!"

এই সব কথা-বার্ত্তার পর মা একটু শুইলেন। আমরাও সকলে বসিয়াছি। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা সেদিন রাত্রিতে

কি হইল কিছুই বলিলে না। তোমার চেহারা দেখিলে ভয় পাইতাম, কি কথা বল না?” ২।৩বার জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মা বলিলেন, “সে দিনের কথা ...” এই বলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন, “সেদিন কয়েকজন সাধু আসিয়াছিলেন।” নারায়ণ দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘সাধুদের কি রকম পোষাক ?’ মা একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন “হিমালয়ের সাধুরা সব ন্যাংটা ন্যাংটা।” তারপর আবার আমার কথার উত্তরে বলিতে লাগিলেন, “তাঁহাদের ভাবে শরীরটাও কি রকম হইয়া গিয়াছিল। বুঝলি না?” অভয় বলিল, “কি রকম ভাব তাঁহাদের মা?” মা কতকটা ঠেকা ঠেকা ভাবে বলিলেন, “সেই মহাদেব ভাব আর কি? তাহাদের ভাবে শরীরটাও যেন বদলাইয়া গেল। তাই বলিয়াছিলাম তখন দেখিলে ভয় পাইতে।” অভয় বলিল, “কি রকম? কপালে এক চক্ষু হইয়াছিল নাকি?” মা একটু হাসিয়া ঐ কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, “তারপর কি রকম হইল, যেমন শোনা যায় ঋষি-মুনিরা যাতায়াত করিতেন।” আমি বলিলাম, “কি রকম, শূন্য-পথে নাকি?” মা বলিলেন, “ঐ রকম আর কি, শরীরটা যেন সেই রকম কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। তারপর আবার খানিক পরেও ঐ রকম শরীরটা হাল্কা হইয়া যাইতেছিল। তখন তোকে ডাকিয়াছি।” অভয় বলিল, “শরীর চলিয়া যায় কি রকম? শুধু কাপড় পড়িয়াছিল নাকি? এই শরীরটা চলিয়া গিয়াছিল নাকি?”

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, “তোরা হয়ত দেখেছিস্ শরীরটা এখানে আছে, কিন্তু অন্য একটা ভাবে শরীরটা চলিয়াও যাইতে পারে।” আবার আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “দেখ্, কত সময় হয়ত একা ঘরে আছি, তখন অনেক সময়ই এই রকম হয় যেন, বন্ধ দরজা খুলিয়া

লোক দেখা করিয়া যায় না, সেই রকম আর কি?” এই বলিয়া চুপ করিলেন।

এখনও এখানে বেশ শীত। এখান হইতে গঙ্গোত্রী মাত্র ১৩ মাইল।

২৯শে বৈশাখ, শনিবার—

অতি প্রত্যুষেই আমরা রওনা হইলাম, ৬ মাইল দূরে ভৈরবঘা যাইয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া আবার রওনা হইলাম। বৈকালে আমরা গঙ্গোত্রী পৌছিলাম। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর, এখানে ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের শিষ্য পরমানন্দ স্বামী আছেন। ইনি মাকে পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। উত্তর কাশী কালী মন্দিরেও ইনি কিছুদিন ছিলেন। আমাদের সঙ্গেও ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের আশ্রম হইতে নারায়ণ আসিয়াছেন। ইনি মার আদেশে উত্তর কাশী কালী মন্দিরে কিছুদিন পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন, এখন মার সঙ্গে আসিয়াছেন।

এখানে কালীকম্বলী বাবাজীর ধর্ম্মশালা আছে। তাঁহারা যথেষ্ট যত্ন করেন। কম্বলাদিরও অভাব নাই, তাঁহারাই দেন। পরমানন্দস্বামী আমাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এখানে গৃহস্থ নাই। শুনিলাম, টিহরী রাজারই হুকুম আছে, স্ত্রীলোক নিয়া কেহ বাস করিতে পারিবে না।

এখানে কৃষ্ণাশ্রম নামে একজন বিখ্যাত সাধু আছেন। অনেকেই ইঁহার নাম জানেন। ইনি কয়েক বৎসর নাকি বরফের ভিতরই তপস্যা করিয়াছিলেন। এখন এক কুটীরে আছেন। সঙ্গে একটি শিষ্যা আছেন। শীতকালে যখন প্রায় কেহই এখানে থাকেন না, বরফ পড়ে তখনও কৃষ্ণাশ্রম এখানেই থাকেন। একেবারে উলঙ্গ অবস্থাতেই

থাকেন। আমরা আগামীকল্য তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইব স্থির হইয়াছে; গঙ্গায় ও'পারে তাঁহার ছোট্ট কুটীর। গঙ্গার ও'পারে আরও সাধুদের থাকিবার ছোট ছোট কুটীর আছে। এই স্থান ১০ হাজার ফিট উচ্চে, ঠাণ্ডা বেশ আছে। গঙ্গার ধারেই ধর্ম্মশালায় আমরা রহিলাম। এখানকার ডাকঘর উত্তরকাশী। মাসে দুইবার ডাক আসে।

৩০শে বৈশাখ, রবিবার—

আজ সংক্রান্তি। আমরা আজ সকালেই মার সঙ্গে কৃষ্ণাশ্রম স্বামিজীকে দেখিতে গেলাম। মহাত্মা উলঙ্গ অবস্থায় বসিয়া আছেন, ছোট্ট একটি চিরগাছের কাঠের ঘরে স্বামিজী থাকেন। এক কোনে কিছু ঘাস-পাতা বিছান আছে, তাহার উপরেই থাকেন। এতদ্দেশীয় একটী স্ত্রীলোক তাঁহার সেবিকা হইয়া আছেন। শুনিলাম এই মেয়েটি চার বৎসর যাবৎ ইঁহার আশ্রয়ে আছে। সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছেন। ইনিই দীক্ষা দিয়াছেন, গেরুয়া বসন পরেন, মাথায় পাগড়ী বাঁধেন। একটী অল্প বয়স্ক ব্রহ্মচারীর মত দেখায়। আরও দুইটী কাঠের ঘর আছে, একটিতে মেয়েটী থাকেন, আর একটিতে পাক হয়। শুনিলাম, এই মেয়েটী আসার পর এই সব ঘর করা হইয়াছে, এর পূর্ব্বে স্বামিজী বরফের মধ্যে কোথায় পড়িয়া থাকিতেন কেহ জানিত না। পাহাড়ীরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া কখনও কখনও কিছু খাওয়াইয়া আসিত। কেহ কিছু দিলে খাইতেন, নতুবা ঐ ভাবেই থাকিতেন, ইনি মৌনী। এখানে যখন বরফ পড়ে কোনও লোক এখানে থাকিতে পারে না। শুধু স্বামিজী ও তাঁহার শিষ্যা থাকেন। বরফে সব ঢাকিয়া যায়। গায়ের চামড়াও মোটা হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম স্বামিজী মধ্যে মধ্যে

জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনেন। এবং অন্যান্য কাজও মধ্যে মধ্যে করেন।

আরও শুনিলাম মেয়েলোক শিষ্যা আছে বলিয়া অনেকে একটু অনুযোগ করে সত্য, কিন্তু স্বামিজীকে দেখিলে আর কাহারও সেই অনুযোগের ভাব থাকে না। আমরা প্রায় ঘন্টাখানেক থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। বেশ লাগিল। স্থান, কাল পাত্র সবই সুন্দর, পবিত্র। গঙ্গার ধারেই তাঁহার ছোট্ট কুটীরটী। অনবরত গঙ্গার ধ্বনিতে এখানে একটা যেন পবিত্র ভাব বিরাজ করিতেছে। এই স্থানটা আমাদের খুবই ভাল লাগিতেছে।

১লা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—

লিখিবার মত আজ কিছু নাই। আমাদের আগামীকল্য রওনা হইবার কথা। পরমানন্দ স্বামিজীও এদিকে ৬।৭ বছর যাবত নাকি আছেন। শীতকালে উত্তর কাশী চলিয়া যান। বেশ কর্ম্মী লোক। আমাদের সব বন্দোবস্ত যথাসাধ্য তিনিই করিতেছেন। এখান হইতে 'গোমুখী' ১৪ কি, ১৮ মাইল। অভয় প্রভৃতির যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পথ অতি দুর্গম বলিয়া পরমানন্দ স্বামী প্রভৃতি মত দিলেন না, সেখান হইতেই গঙ্গা আসিতেছেন। শুনিলাম সেখানে একটা বরফের সুড়ঙ্গ প্রায় ৩০ মাইল ব্যাপী। অনেক সময় উপর হইতে পাথর পড়িয়া যাত্রী মারা যায়। এখানে দেখিলাম উপর হইতে প্রকাণ্ড এক পাথর পড়িয়া ঘর, দরজা এবং গঙ্গামায়ীর পাথরের মন্দিরের অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখানে চির কাঠের প্রায় ১৫।২০ খানি ঘর আছে। আর গঙ্গামায়ীর একটি মন্দির আছে। দেবদারু বন, অতি সুন্দর দৃশ্য!

২রা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—

আজ আমরা উত্তরকাশী রওনা হইলাম।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—

আজ সকালে আমরা উত্তরকাশী আসিয়া পৌঁছিলাম। পথ অতি দুর্গম, তাই সকলেই পরিশ্রান্ত।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার—

মা, আমাকে ও স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে নীচে যাইতে আদেশ দিয়াছেন। মা সঙ্গে যাইবেন কিনা এখনও ঠিক হয় নাই। আজ সকালে মার নিকট বসিয়াছি, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের একখানি চিঠি আসিয়াছে। তিনি আমার ডায়েরীর একস্থান পড়িয়া সেই প্রসঙ্গে চিঠিখানি লিখিতেছেন। চিঠিখানি আমাকে লিখিতেছেন। চিঠিখানির খানিকটা অংশ এইস্থানে দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম তাই দিতেছি।

"মার আবির্ভূত স্বরূপ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উপস্থিত হয় অথচ ঐ প্রশ্নের সুস্পষ্ট সমাধান ডায়েরীতে নাই। আমার মনে হয় ইহার একটা মীমাংসা থাকা উচিত। বলা বাহুল্য আমি সাধারণ পাঠকের মানসিক অবস্থার দিক হইতেই কথাটা বলিতেছি।"

"মার দেহ যে সাধারণ মনুষ্যের দেহ হইতে ভিন্ন প্রকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণ মনুষ্য এমন কি দেবতাবর্গও, গুণের অধীন। কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ঐ সকল দেহের বিকাশ হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের জন্যই সাধারণ মনুষ্য ভোগায়তন দেহ গ্রহণ

করিয়া থাকে। দেহ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কৃতকর্ম্মের ফল-ভোগ করিতে হয়। অথচ দেহাত্মবোধ ও কর্তৃত্বাভিমান নষ্ট না হওয়ার দরুন তাহাদিগকে ঐ দেহাশ্রয়ে অনেক অভিনব কার্য্যও সম্পাদন করিতে হয়। আর, যে সকল দেবতা অথবা সিদ্ধ পুরুষাদি জগতের কল্যান সাধনের জন্য করুণা-পরবশ হইয়া মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হন ও নরদেহ গ্রহণ করেন, দুঃখক্লীষ্ট জীবের দুঃখে তাঁহারা ব্যথিত হ'ন বলিয়াই স্বেচ্ছায় দুঃখময় নরদেহ গ্রহণ করেন ও তদ্দারা নরলোকের সেবা করেন। তাঁহারা আনন্দময় ভাবের পুরুষ—জীবকে দুঃখরাজ্য হইতে সেই আনন্দময় ভাবের মধ্যে নিয়া যাওয়াই তাঁহাদের অবতরণের লক্ষ্য। করুণার সার্থকতা এই পথেই উপলব্ধি হয়। বলা বাহুল্য এই সকল মহাপুরুষ শুদ্ধ ভাবময় হইলেও একান্তভাবে সর্ব্বভাবের অতীত নহেন। সাধারণ মনুষ্যে তিনটী গুণই সমধিক ভাবে কার্য্য করে, কিন্তু মহাপুরুষে বিশুদ্ধ সত্বগুণই মাত্র কার্য্য করে।"

"আর মা'র দেহ গুণের অতীত বলিয়া একদিকে তাহাতে কোন গুণই কার্য্য করে না, অথচ অপর দিকে তাহাতে জীবের ভাবনা অনুরূপ বা প্রকৃতি অনুসারে যে কোন গুণ বা ভাব কার্য্য করে বলিয়া মনে হয়। গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।" মার মুখেও এই ভাবের কথা অনেক শুনিয়াছি। ইহার তাৎপর্য্য কি? স্বচ্ছ দর্পণের সম্মুখে যে বর্ণ উপস্থিত হয় দর্পণও তদনুরূপ বর্ণেই অনুরঞ্জিত হয় বলিয়া মনে হয় (যদিও বস্তুতঃ দর্পণ সর্ব্বদাই আপন শুদ্ধ স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকে।) মা কোনও ভাবে আবদ্ধ নহেন বলিয়া তাঁহার মধ্যে দ্রষ্টা আপন ভাবই দেখিতে পায়। সেই জন্য মাকে, যে'ই যে ভাবে পাইতে বা দেখিতে

ইচ্ছা করে, সে তাঁহাকে সেই ভাবে পাইতে বা দেখিতে সমর্থ হয়। ভাবাতীত হইলেই যাবতীয় ভাবের সঙ্গেই অভিন্নতা স্থাপিত হয়। অথবা সর্ব্বভাবের পূর্ণতা লাভ না হইলে ভাবরাজ্য অতিক্রম করা যায় না।"

"কিন্তু মা যদি ভাব বিশেষে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে এই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বময় মুক্ত স্বভাব তাঁহাতে অপ্রকাশিত আছে বলিতে হয়। ঐরূপ ক্ষেত্রে যে ভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন ঐ ভাবই সর্ব্ববিজয়ী হইয়া তাঁহাতে বিরাজ করিবে। অন্যভাব তাঁহার সংস্পর্শে থাকিতে পারিবে না। আলোকের সীমার মধ্যে যেমন অন্ধকারের কোনই স্থান নাই, তেমনি একটি শুদ্ধ ভাবের ক্ষেত্রমধ্যে অন্য কোনও ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে না। মা যদি সত্যই বিশুদ্ধ মাতৃভাবে সর্ব্বদা বিরাজ করেন, তাহা হইলে কোন লোক তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে তাহাকে ও ঐ সর্ব্বাতিশায়ী মাতৃভাবের প্রভাব অনুভব করিতে হইবে। তাহার মনে যে কোন ভাবই থাকুক না কেন, তাহাই অভিভূত হইয়া যাইবে। সে মায়ের কাছে আসিবামাত্র বুঝিয়া হউক, অথবা না বুঝিয়া হউক, মাকে "মা" বলিয়া ধারণা করিতে বাধ্য হইবে, অন্যভাব তাহার মনে উঠিতেই পারিবে না। প্রত্যেকটি শুদ্ধ ভাবেরই এমনই অসীম প্রভাব।"

"আর, মা যদি ভাবাতীত হন, তাহা হইলে বলা যায় কোন ভাবেই তিনি প্রতিষ্ঠিত নহেন, অথচ সকল ভাবেই সমরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি অপ্রতিষ্ঠিত ও নিরালম্ব ব্রহ্মভাবে নিত্যমুক্ত স্বরূপে সর্ব্বদা বিরাজমানা। এই ক্ষেত্রে ভাবশুদ্ধির কোন প্রশ্ন নাই। যে তাঁহাকে যে ভাবে দেখিতে চাহিবে, তাহার দৃষ্টিতে তিনি সেইভাবেই প্রতিভাত হইবেন। তাঁহার আপন ভাব নাই বলিয়া ভাবুকের ভাবই তাঁহার ভাব। এই স্থলে ভাবুকের ভাব নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেহ তাঁহাকে মাতৃভাবে,

কেহ তাঁহাকে পিতৃভাবে, বা সুহৃদভাবেও দেখিতে পারে, আবার অন্যভাবেও পারে। তিনি কোনও ভাবের অধীন না হইলেও সকল ভাবেই দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন্। সাত্ত্বিক সত্তা ও গুণাতীত সত্তার পার্থক্য এইভাবে পরিস্ফুট হইবে বলিয়া মনে হয়।"

"এখন প্রশ্ন এই—ঘনিষ্ঠভাবে মার সংসর্গে থাকিয়াও ভোলানাথের মনে ক্ষুদ্র বৃত্তির উদয় হইয়াছিল কেন? যদি বলা যায়, মা গুণাতীত বলিয়া গুণের খেলায় বাধা দেওয়া তাঁহার স্বভাব নহে, কাজেই ভোলানাথ যাহা কিছু ভাবিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রাক্তন সংস্কারের প্রেরণাতেই করিয়াছেন। মা তাহার পোষণও করেন নাই, খণ্ডনও করেন নাই। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মা গুণাতীত, অথচ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মায়ের সংসর্গের ফলে ভোলানাথের জীবনে ও মনে অসাধারণ উৎকর্ষ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে মানিতে হয়, মা বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। যদি তাহা না স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সংসর্গের ফলে ভোলানাথের জীবনের পরিবর্ত্তন বোধগম্য হয় না। কারণ গুণাতীত বস্তুর সংস্পর্শে মনুষ্য আপন ভাবেরই পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। আপন ভাব পরিহার করিয়া ভাবান্তর গ্রহণ করিতে পারে না। যেমন, সূর্য্যের আলো গৃহে প্রবৃষ্ট হইয়া গৃহস্থ বিভিন্ন বস্তুকে প্রকাশিত করে মাত্র, কোনও নবীন বিশিষ্ট বস্তুর সৃষ্টি করে না; তেমনি, নিগুর্ন চৈতন্য সত্ত্বার প্রভাবে প্রত্যেক আধারের বীজগত বৈশিষ্টটাই অভিব্যক্ত হয়—যে আধারে যাহা নাই, তাহা অভিব্যক্ত হয় না।"

"ইহার প্রকৃত মীমাংসা সহজ। আমার মনে হয়, 'সাত্ত্বিক—সত্তা' ও গুণাতীত 'মুক্ত-সত্তার' পার্থক্য এই যে, 'সাত্ত্বিক সত্তার' প্রভাবে মলিন ভাব অভিভূত হইয়া সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়—মলিন ভাব একেবারে

নষ্ট হয় না। যখন, ঐ প্রভাবশালী 'সাত্ত্বিক সত্তা' নিষ্ক্রিয় হইবে, তখনই ঐ সকল অভিভূত মলিন ভাব আবার প্রবল হইয়া উঠিবার অবসর প্রাপ্ত হইবে। সত্ত্বগুণের প্রভাবে মলের সাময়িক তিরোভাব হয় মাত্র। কিন্তু নিগুর্ন সত্তার প্রভাবে মলিন ভাব ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সংস্কারগত মলিনতা সবই বৃত্তিরূপে ফুটিয়া উঠিতে থাকে এবং ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হইতে থাকে। চরমে, এমন অবস্থা আসে, যখন মলিনতার সংস্কার মাত্রও থাকে না। সুতরাং এই নির্ম্মলতা সাময়িক নহে, চিরস্থায়ী। পরে, সত্ত্বগুণেরও নিষ্ক্রিয়তা আসিলে, গুণমুক্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যের আবির্ভাব হয়, তাহার প্রভাবে জীব মুক্তিলাভ করে। সাত্ত্বিক মহাপুরুষগণের সত্ত্বগুণের প্রভাবে সত্ত্ববৃদ্ধি হয়, সাক্ষাদ্‌ভাবে চৈতন্যলাভ হয় না। কিন্তু গুণাতীত পুরুষের প্রভাবে সংস্কার কাটিয়া যায় ও ক্রমে জীব মুক্তিপদে আরূঢ় হয়।"

"ভোলানাথের প্রসঙ্গ উপলক্ষ্যে মার উপদেশবাণী ও ভোলানাথের জীবনের পরিবর্ত্তন হইতে এই গূঢ়রহস্যই বুঝিতে পারা যায়। আপনি এই তত্ত্ব সম্বন্ধে মার সঙ্গেও একটু আলোচনা করিবেন এবং আমাকে জানাইবেন।"

শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের চিঠির কথায় আরও কথা উঠিল। কথায় কথায় মা বলিলেন, "গোপীনাথ, 'নাথ' কিনা—তাই গুপ্ত কথা বাহির করিতে পারে। সত্যই দেখ্, প্রথম প্রথম যখন ক্রিয়াদি হইত, তখন ভোলানাথ কোনরূপ বাধা দিত না; এই কথা অনেক বারই তোদের নিকট বলিয়াছি। তখনকার একটা কথা খেয়াল হইল। সব কথা ত সব সময় খেয়াল হয় না, তোরা কথায় কথায় বাহির করিস্। তখন ভোলানাথ আশ্চর্য্য হইয়া মধ্যে মধ্যে বলিত, "আমিও যে ভাল হইয়া

গেলাম।" নিজের পরিবর্ত্তন দেখিয়া নিজেই সে অবাক হইয়া যাইত। এই রকমই হয়। সত্বগুণের প্রভাবে আসিলে লোকের অন্য সব ভাবগুলি কি ভাবে অভিভূত হইয়া যায়, বোধ হয় এই সময়তে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।"

মা খানিক সময় চুপ করিয়া রহিলেন, পরে আবার অপর কথা উঠিল। মা নিজের কথায় বলিতেছেন, "আসলে তোদের হিসাবে পূর্ব্বেও যেমন ভাব ছিল, এখনও তাই, মধ্যে যোগ-ক্রিয়াদি যাহা কিছু খেলাটা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নানা রকম পরিবর্ত্তন বাহিরে তোরা দেখিয়াছিস্। তোদের দরকার ছিল।" কবিরাজ মহাশয়ের বিচার অতি চমৎকার।

মা কবিরাজ মহাশয়ের চিঠি শুনিয়া বলিলেন। "এই শরীরের মুখ দিয়া এই সব জাতীয় কথা বিশেষ কিছুই ত বলে না, তোমরা দেখিতেছ, এই শরীরের অন্যের নিকট শিক্ষা দীক্ষা সম্পর্কীত কোন কথা নাই। আপনা হইতে সময়ানুযায়ী যখন যেটা স্বাভাবিকভাবে বাহির হইয়া যায়, যাইতেছে, তোমরা এই সব কর্ম্ম ও ভাব দেখিয়া যাহা হয়, বিচারে বুঝিয়া লও, কারণ ফলেই ত পরিচয়। সত্যের প্রকাশ স্বাভাবিক। নামে ও ভাব কর্ম্মাদিতে যোগাযোগও স্বাভাবিক। গোপী নাম ত, কাজেই গূঢ়তত্ত্বের খবরও তাহার কাছে ফোটাই স্বভাব। এই শরীরটার যেমন এলোমেলো ভাব, তেমনই কথা শুন্‌বি তোরা।"

মা বিশেষ বাহির হন না, প্রায় একটি ঘরেই থাকেন। আমরা সকলে সেখানেই বসি। বৈকালে অল্প সময়ের জন্য মধ্যে মধ্যে বাহিরে বা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসেন।

মার ঘরে ২।৩ দিন যাবৎ রাত্রিতে নারায়ণ দাদা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠ করেন, আমরা সকলেই বসি। পাঠ সমাপনান্তে সকলে চলিয়া

গেলে আমি বসিয়া আছি, এমন সময় মা বলিলেন, "খুকুনী, শরীরটা কেমন হইয়া যাইতেছে।" আমি উঠিয়া মার গায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। অল্প অল্প কথা হইতে লাগিল। কথায় কথায় মা বলিতেছেন, "দেখ্, যখন যে দিকে লক্ষ্যটা পড়িয়া যায়, যেমন বেলুর কথা হইল, ৪ বৎসরের মধ্যে মারা যাইবে। কেমন একটা খেয়াল হইল—তা' হইতে পারিবে না। সত্যিই কিছু হইল না। আরও ঐরকম আছে। আবার কুঞ্জমার (মনোরমা দিদির) কথা ছিল—৩ বৎসরের মধ্যে মারা যাইবে, সে বিষয়ও খেয়ালটা পড়িয়াছিল, কিছু হইল না। এই রকম খেয়ালটা পড়িলে ফলও হয়, কিন্তু আমার যে মুস্কিল—খেয়ালটা থাকে না। তাই হয়ত তোরা দেখিস্ কত বিপদ চোখের উপর হইয়া যাইতেছে। কখনও কেহ বলে, 'কেন হয়?' কিন্তু এ'সব বিষয় ত বাধা দিবার মত বলিয়া মনে হয় না। যা' হইবার হইয়া যাইবে, এই ভাবটাই থাকে।"

আমি বলিলাম, "তাইত মা, তোমার চোখের সামনে ভাল-মন্দ দুইই হইবে, কারণ তোমার কাছে ত এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই বা একটা বাধা হউক এই ভাবও নাই। ভগবানের কাছে সবই সমানভাবে হইয়া যাইতেছে, হইবেই। সাধকদের কাছে খারাপটা না হইতে পারে। কারণ তাঁ'রা একটা সংস্কারে আবদ্ধ; এ'টা ভাল এ'টা খারাপ, এই ভাব তাঁহাদের আছে তাই তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে তাঁহাদের নিকট খারাপ কাজটা হওয়া বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু তোমার কাছে ত সে কথা হইতে পারে না।" এই রকম কথাবার্ত্তা হইতে হইতে অনেক রাত হইয়া গেল। আমি ও মা চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—

আজ সকালে আমরা সকলে মার নিকট বসিয়া আছি। মা অন্যান্য

কথার মধ্যে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কাল রাত্রে দেখিতেছিলাম কি, ঠিক এত বড়। (হাত দিয়া উচ্চতা দেখাইয়া দিলেন ১০।১২ বছরের ছেলেদের উচ্চতা) কালো কালো হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল ছেলের দল আসিয়া ঢুকিতেছে। কৃষ্ণঠাকুরের মত যেন সাজানো সব ছেলেগুলি। হাতে নিশান, কি সব বলিয়া বলিয়া সকলে আসিতেছে। অনবরত ঐ রকম ছেলে আসিতেছে। এই শরীরটার দিকেই আসিতেছে। ছেলেদের ভাব,'চল আমাদের সঙ্গে'। এই শরীটার ভাব, এখন থাক, এখন যাইব না; এই ভাবেরও জোর নাই, কি হইবে ঠিক নাই। এমন কি শরীরটা যেন উহাদের দলে মিশিতে যাইতে চায়, এই অবস্থায় আমি উপরে একঘরে যাইয়া উঠিলাম, কিন্তু ছেলের দল পিছু ছাড়িল না। এই অবস্থা চলিতেছিল। সেই সময়ই শরীরটা উহাদের সঙ্গেই চলিয়া যাইবে। এই ভাবে কেমন যেন হইয়া যাইতেছিল। এই সময়েই খুকুনীকে ডাকিয়া বলিলাম, শরীটা যেন কেমন হইয়া যাইতেছে।"

বৈকালে মা উঠিয়া বসিয়াছেন। মার কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছি। মার পূর্ব্বের ভাবের কথা উঠিল। আমি বলিলাম, "মা, ঐ সময়তে কখনও কখনও তোমার মুখ দিয়া লালা পড়িত, কি কখনও চোখ দিয়া জল পড়িত।" মা বলিলেন, "এই সব হয়, যখন ভাবটা ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গিতেছে না, তখন।" আমিও তাই দেখিয়াছি যখন ভাবে গড়াগড়ি দিতেছেন কি কাঠের মত পড়িয়া আছেন তখন ও'সব দেখি নাই। যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ ভাবে চলিয়া গিয়াছে ভাবটা ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গিতেছে না, এক একবার চোখ খুলিতেছেন, আবার বন্ধ করিতেছেন, ঐ সময়টাতেই চোখের জল বা মুখের লালা দেখা গিয়াছে। শরীরের যখন সব ক্রিয়াই বন্ধ থাকে তখন চোখের জল বা মুখের লালা কোথা হইতে আসিবে। মা এই

কথায় বলিতেছেন, "দেখ্ ঐ যে, লালা বাহির হইত কেন, তা'ও বলিতেছি। যখন ঐ রকম ভাবটা ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গিতেছেনা তোরা দেখিতেছিস্, তার আগে ঐ অবস্থায় চোখের ও মুখের জল যখন যেখানে থাকে তাহা ভিতরে ও বাহিরে গড়াইতে পারে না। সেই অবস্থাতেই তোরা দেখিয়াছিস্ লালা পড়িতেছে। আবার কিন্তু, সর্ব্বাঙ্গের শিথিলতায় গ্রন্থি খোলা থাকার জন্যও বাহিরে গড়াইতে পারে।" কখনও এই রকমও দেখিয়াছি, মুখে হয়ত কিছু দিয়াছি, তখন হয়ত শরীরের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, মুখের জিনিষ মুখেই রহিয়া গিয়াছে। কখনও ২।১ দিন পরও সে জিনিষ মুখের ভিতর রহিয়াছে, দেখা গিয়াছে। তাহা, না বাহিরে ফেলিতে পারিয়াছেন, না ভিতরে নিতে পারিয়াছেন।

আবার কথায় কথায় যোগ ক্রিয়াদির কথা উঠিল। মা'র শরীরে যে যোগ ক্রিয়াদি হইয়া গিয়াছে সে কথা উঠিল। মা বলিতেছেন, "দেখ শরীরটার গতি তোদের দৃষ্টিতে শিশুকালেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। মধ্যে যোগক্রিয়াদি যখন শরীরের মধ্যে হইয়া গিয়াছে তখন নানা রকম পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। তাহারও কারণ, যোগক্রিয়ায় শরীরে কি রকম হয়, হয়ত তাহাই ফুটিবার দরকার ছিল তাই হইয়া গিয়াছে। এই সময়েতে কিছুটা সময় ভোলানাথের ভাবের খুব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এমন কি সে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইত বলিত, "দেখ, আমার কেমন পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমি ত বেশ ভাল ভাবে আছি।" ভোলানাথ আমাদের নিকটও এ' বিষয় অনেক সময় বলিয়াছেন, "আমি তাঁহার (মায়ের), কোন কাজে বাধা দেই নাই।" মা'ও বলিতেন, "সত্যই, উনি কোন

কাজে বাধা দেন নাই। একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, মহাপুরুষের মত। এখন তোমরা যে রাগ ইত্যাদি দেখিতেছ, এ' শরীরে যখন আপনা আপনি ক্রিয়াদি হইয়া গিয়াছে তখন এই ভাব মোটেই ছিল না।"

গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের পত্র পড়িয়া এখন বুঝিতেছি যোগক্রিয়ায় সাধকের সত্ত্বগুণের প্রভাবে যে নিকটবর্ত্তী অপর লোককেও সেই ভাবে ভাবান্বিত করিয়া দিতে পারে, ইহা হয়ত তাহাই। মা'র সেই সর্ব্ববিজয়ী সত্ত্বগুণের প্রভাবে ভোলানাথের অপর কোন ভাব মাথা তুলিতে পারে নাই। কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হয় না তাহাও দেখিলাম। আবার গুণাতীতের সঙ্গগুণে যে ভাবগুলি ক্রমে ক্রমে একেবারে চলিয়া যাইতে পারে তাহাও দেখিলাম।

পূর্ব্বেকার কথায় মা আজও আবার বলিতেছেন্, "দেখ্, যোগক্রিয়ায় যে কি রকম হয়, তাহা কতকটা সময় শরীরে ফুটিয়াছে। এই শরীরের প্রথম অবস্থায় কি রকম হইত জানিস্? যেমন, ছোট শিশুকে নিয়া কেহ আদর করিতে যাইতেছে, কোলে নিতেছে, কত কিছু করিতেছে; কিন্তু শিশুর সেদিকে লক্ষ্যই নাই। সে হয়ত আপন মনে, আপন ভাবেই খেলিয়া যাইতেছে। হয়ত, কোল হইতে আপন ভাবেই পিছলাইয়া ছুটিয়া যাইতেছে। যে আদর করিতেছে সে এর মধ্য হইতেই নিজে রস পাইতেছে। এই শরীরটাকে নিয়া কিছুদিন এই ভাবের খেলা চলিয়াছে। তারপর যখন যোগক্রিয়াদি বাহিরে ফুটিতে লাগিল তখন, কি রকম না, ভোলানাথ কোন রকম বাধাই দিত না। বরং সে নিজের ভাব দেখিয়া নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিত, 'আমিও কত ভাল হইয়া গিয়াছি, কোন রকম খারাপ ভাব ত' আমার জাগে না' তাই বাধাও কিছু দিত না, দিবার ভাবই উঠিত না। ইহা যোগক্রিয়াদির ফল। ভোলানাথও কতকটা সেই ভাবে ভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল।"

"তারপর, আর একটা অবস্থা, যেমন সাধকদের নিকট কোন কুভাবাপন্ন লোক গেলে, তাহা বুঝিতে পারে, নিজের শরীরেই সেই উত্তাপ অনুভব করে, তাহাই হইত। ভোলানাথের ভিতরে কোন রকম জাগতিক ভাব জাগিবামাত্র এই শরীরে জ্বালা অনুভব হইত, এমন কি কাছে বসিলে পর্য্যন্ত শরীর কেমন হইয়া যাইত। যেন অবশ অসাড় ভাবে এলাইয়া পড়িয়া যাইত।"

"আর একটা অবস্থা হইল—ভোলানাথ হয়ত কাছে শুইয়া আছে, ঐ ভাবের আভাস মাত্রই শরীর বাঁকাইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া, কত রকম আসন করিয়া বসা, আরম্ভ হইল। সেই সব অবস্থা দেখিয়া ভোলানাথ ভয় পাইয়া যাইত। তারপর একটা অবস্থা হইল, তখন ঐ ভাবের আভাষ মাত্রই শ্বাসের গতি অন্য রকম হইয়া গড়াগড়ি আরম্ভ হইত এবং চিৎ হইয়া শরীর গোল পিণ্ডাকার হইয়া মাথা নীচের দিকে যাইয়া পদ্মাসনের মত হইয়া একপ্রকার আসন হইয়া যাইত। দীর্ঘ সময়ের জন্য এই শরীর এলাইয়া পড়িয়া রহিল। কথা নাই, খাওয়া নাই, সব বন্ধ। এমন ভাবে শরীরের ক্রিয়া আরম্ভ হইত, যেন প্রাণ বায়ু এখনই শেষ হইবে। কোন সময় এ'পাশ ও'পাশ হইতে হইতে নখ ইত্যাদি পর্য্যন্ত নীল হইয়া যাইত। এই অবস্থা একদিন তোরাও দেখিয়াছিস্। এই অবস্থায় ভোলানাথ শরীর রক্ষার জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়িত, পূর্ব্বেকার ভাব কোথায় চলিয়া যাইত।"

এই সব বলিয়া আবার বলিতেছেন, "তবে তোদের বলি না, তোদের দৃষ্টিতে শিশুকালেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি ভাব চলিতেছে। কয়েক দিন ভিতরে অস্বাভাবিক কতগুলি ক্রিয়া হইয়া গিয়াছে, তারপর আবার স্বাভাবিক হইতেও স্বাভাবিক ভাবে শরীরটা চলিতেছে। এখন

দেখিতে পাইতেছিস্, আবার হয়ত যোগক্রিয়াদির ভাব এবং অন্যান্য অবস্থাগুলি যাহা তোরা বলিস, সাধনের অবস্থায় পার হইয়া যায়, সেগুলিও যদি তোদের আবশ্যক হয়, আবার এই শরীরে, কোন কোনটা প্রকাশ হইলেও হইতে পারে, আবার, নাও হইতে পারে। 'যে অবস্থা পার হইয়া গিয়াছে তাহা আবার আসিবে কেন?'—তোরা বলিতে পারিস, কিন্তু এ'কথা এ'শরীরের জন্য হইতে পারে না। কারণ এ' শরীরের ত' সাধন-ভজন করিয়া উন্নত হওয়ার বা এই ভাবের কোন কথা নাই, তাই তোদের আবশ্যকানুযায়ী যখন যাহা হইবার হইয়া যাইতেছে এবং হইবে।"

এই সব কথাবার্ত্তার পর ভোলানাথের দেহ রক্ষার কথা উঠিল। মা বলিতেছেন, "শরীরের বাবার সঙ্গেও মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন কলিকাতা দেখা হইল, আমি ত' বাহিরে বসিয়াছিলাম। ঘরের মধ্যে চৌকিতে শরীরের বাবা বসিয়াছিল। উঠিয়া আসিবার পূর্ব্বে—'মা, মা, মা,' বলিয়া তিনবার ডাক দিয়া, কেমন এক রকম ভিন্ন ভাব নিয়া এই শরীরটার দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি করিল। তারপর উঠিয়া আসিলাম। ৩।৪ দিন প'রেই দেহরক্ষা করিল। ভোলানাথও দেহরক্ষার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে 'মা, মা,' করিতেছিল, কিন্তু মৃত্যুর দিন সকাল বেলা হইতেই ভাবের আরও বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল। সকালবেলা চোখ খুলিল, তখন বলিল, কই তুমি, আমি ত দেখিতেছি না।" আমি বলিলাম, "এই ত, আমি," তখন দেখিল।" সেই দিনই,—'প্রসাদ খাইব, তুমি খাওয়াইয়া দাও, তোমাকে একবার ছুঁইব ইত্যাদি ভাবগুলি জাগিয়াছিল। তারপর বৈকালের দিকে, একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় ত শুইয়াছিল, বলিল—শীত করিতেছে। সব কাপড় ইত্যাদি ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু একখানি চাদর

নিকটে পড়িয়াছিল সেখানা নষ্ট হয় নাই, আমি উঠাইয়া গায় ফেলিয়া দিলাম। সেখানা গায় জড়াইয়া শুইল। তারপর আমি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না,—দেখিলাম, এই হাত গিয়া ভোলানাথের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত চালনা হইল। এবং ব্রহ্ম তালুতে হাত একটু স্থিরভাবে রহিল, তারপর জিজ্ঞাসা করা হইল, 'যন্ত্রণা হইতেছে কি ?' রোগী আনন্দ-পূর্ণ ভাবে বলিল, 'না, আনন্দ'। হাত চালনার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করায় বলিয়া-ছিল শরীরে কষ্ট আছে। মার এই কথা শুনিয়া আমরা বলিলাম, 'কৃপায় কি না হয় ? তুমি সমস্ত শরীরে হাত বুলাইয়া দিলে তারপর যন্ত্রণা থাকিবে কি করিয়া ? শেষ সময়ও মস্তকে হাত দিয়া উর্দ্ধগতি করিয়া দিলে।' মা বলিলেন, "আমি ত' তোদের মত ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না ; দেখিলাম, হাত গিয়া মাথায় লাগিতেছে।"

"এ'র পুর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করা হইল; তুমি ত নাম শুনিতে ভালবাস, নাম শুনাইবে ?

আমার এই কথায় সকলে মনে করিল, মা এমনিই সন্ধ্যাবেলায় নাম করিতে বলিতেছেন। কথাও দেখ্ ঠিক ঠিক ভাবে পরপর কি রকম হইয়া যায়। এই কথায় কাহারও সন্দেহ জাগিল না যে শেষ সময়েতে নাম শুনানো হইতেছে, কেহই মনে করে নাই যে এখনই দেহত্যাগ হইবে, কারণ অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন তখনও হয় নাই। আর, যদি বলা হইত, "তোমাকে নাম শুনাইবে ?" তবে সকলেরই হয়ত ভয় জাগিত যে, এখনই বুঝি তবে দেহত্যাগ হইবে তাই মা স্বাভাবিক ভাবে নাম শুনাইতে বলিতেছেন ! কথাও যেন সব ঠিক ঠিক ভাবে বাহির হয় নিজে, তোদের মত ইচ্ছা করিয়া কিছু হয় না ত ! যখন যেমন দরকার হইয়া যাইতেছে।"

"তারপর যখন দেহত্যাগ হইল, আমি শিবশঙ্কর কবিরাজকে বলিলাম, 'তোমাদের মতে ঠিক ঠিক হইয়া গিয়াছে ত?' সে আর জবাব কি দিবে, যেন থতমত খাইয়া ভোলানাথের দিকে তাকাইয়া বলিল, হ্যাঁ, মা।"

বৈকালের দিকে আবার আমরা মার নিকট বসিয়া। এখন কথা উঠিল, মার সঙ্গে আমার মিলনে ভোলানাথ পূর্ব্বে কি রকম বাধা দিতেন। আমি বলিলাম, 'কত যে কষ্ট গিয়াছে।" অভয়ের নিকট এ'সব গল্প করা হইতেছে। কমলাকান্ত, নারায়ণ সকলেই উপস্থিত। মা'ও বলিতেছেন। মা আবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি খুকুনীকে বলিতাম, "রাধার বাধার কথা। কি একটা গান আছে না, "ধূয়ার ছলনে আমি কাঁদি।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। এই বলিয়া কৃষ্ণও যে রাধার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে অতি মধুর সুরে একটি গান করিয়া বলিলেন, "তোরা রাধার কষ্টের কথাই বল্‌লি, আমি একটু কৃষ্ণের কষ্টের কথাও শুনাইলাম।" এই কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। মা'ও হাসিতে লাগিলেন। গান করিলে প্রায়ই মার চোখ দুটী লাল ও ছল্‌ছল্ হইয়া উঠিত। আজও তাহা হইয়াছে। তার মধ্যে হাসিটুকু মিলিয়া অতি অপরূপ দেখাইতেছিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা বাহির হইয়া ছোট আঙ্গিনাটুকুতেই একটু পায়চারী করিতেছেন। দূরে পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আগুন প্রবল হইয়া উঠিল। অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সকলে মিলিয়া অনেকক্ষণ সেই আগুনের শোভা দেখিতে লাগিলাম। যেন কোন মহাযজ্ঞে বৃক্ষ ইত্যাদি আহুতি হইতেছে। অনেক রাত্রিতে সেই আগুন আবার উজ্জ্বল চিত্রের মত দেখাইতে লাগিল। স্বামী অখণ্ডানন্দজী মাকে বলিলেন, "মা, কখনও এই পাহাড়ের চূড়া বরফে আচ্ছন্ন দেখা যায়, আবার

কথনও আগুনের খেলা চলিতে দেখা যায়। সবই সুন্দর।" অনেক রাত্রিতে আমরা শয়ন করিলাম।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—

আজ প্রাতে মা উঠিয়া মন্দিরের বারান্দায় বসিয়াছেন। কয়েকজন পাহাড়ী স্ত্রীলোক আসিয়ছে। ২টী বৃদ্ধার সহিত মা কৌতুক আরম্ভ করিলেন। তার মধ্যে একটি বৃদ্ধা 'কেদার ঘাটে' থাকিয়া সাধন ভজন করে। তাহার হাতে একটি তামার কমণ্ডলু, গলায় মালা। অপর বৃদ্ধাটির একটি ছোট ঘটী ছিল। মা তাহাদের বলিতেছেন, "এই ঘটীটীতে আমার ভাত পাক হইতে পারিবে, আর ঐ কমণ্ডলুটীতে আমি জল খাইতে পারিব। আমাকে দিবে?" বৃদ্ধাটি বলিল, "এই কমণ্ডলু দিয়া আমি মন্দিরে জল চড়াই।" মা নিজের মুখে জল ঢালিবার ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "আমিও ত' এই ভাবে জলই চড়াইব। দেখ, আমাকে দিবে?" তাহারা দুই জনেই বলিল, "আচ্ছা, তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে নাও। তোমাকে দিলে ভগবান আবার আমাকে দিবেন।" মা বলিলেন, "মালাটাও দাও না।" তাহাতেও রাজী হইয়া মালাটী মাকে দিয়া বলিল "ব্যাস্, তুমি মালা ও কমণ্ডলু নিলে,—এখন আমার চেলী হইলে।" মা বলিলেন, "বেশ"—'গুরুজী,' 'গুরুজী,' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ঐ স্ত্রীলোকটী হাসিয়া বলিল, 'মা আমি কিছু জানি না, আমি তোমার সঙ্গে তামাসা করিতেছিলাম।" মা বলিলেন, "এ কি রকম, তুমি যদি কিছু না জান তবে আমাকে চালাইবে কি করিয়া?" এই সব কথায় কথায় মা তাহার মালা কমণ্ডলু ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, "এই আমিও মালা কমণ্ডলু দিতেছি তবেই হইল। তুমিও আমার গুরু, আমিও তোমার গুরু। আচ্ছা বেশ

আমরা দোস্তই হইলাম।” স্ত্রীলোকটি বলিল, “মা আমি ভিক্ষুক, আমিই তোমার চেলী, তুমি আমাকে খাইতে দিবে, কাপড় দিবে।’ এই বলিয়া মার গায় আদর করিয়া এমন এক চাপড় দিল যে বেশ্ চোট লাগিল। মা হাসিয়া বলিলেন, “গুরুজী, এত জোরে মারিও না আমার হাতে ব্যাথা আছে।”

তারপর, কথায় কথায় মা বলিতেছেন, “দেখ, আমিও ভিক্ষুক। দেখ, যে আমাকে জানে, আমি ও সে, এক। যে আমাকে জানিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার ‘নজদিগ’ (নিকটে)। আর, যে আমাকে জানে না, আমি তাহার নিকট ভিক্ষুক।” এই বলিয়াই আমাদের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

বাঁকেবিহারী উকিল এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছেন, মার কাছে কয়েক-দিন থাকিবেন। তিনি বলিলেন, “মা, একজন সাহেব বলিতেছেন, সব মহাত্মাদেরই দেখি, এক একটী খাস কথা থাকে, মা’র খাস কথা ত আমি দেখিলাম, ‘হাসি,’ এর অর্থ কি? মা হাসিয়া বলিলেন, “দেখ, এই শরীরটাকে খারাপ-ভাল সকলেই ভালবাসে, তাহাদের আনন্দের ভাবে, ভালবাসার ভাবে এইখানে শুধু হাসি আনন্দই দেখিতে পাও। নিজের যদি কোন খাস কথা বা ভাব থাকে তবে তুমি হাসিলেও আমি হাসিতে পারি না। অভয় বলিল, “তবেই আপনি বলিলেন আপনার নিজের কোন খাস, ভাব নাই।” আমরাও বুঝিলাম মা’র নিজের ভিতর কোন ভাব নাই বলিয়াই সকলের আনন্দের ভাবেই যোগ দিতে পারেন। যেমন, জলের নিজের রং নাই বলিয়াই সব রংয়েই রঙ্গিয়া যায়।

মার আদেশমত আমরা আগামী কল্য কিংবা পরশু নীচে নামিব।

মুসৌরী হইতে ডাণ্ডি আসিয়াছে। সম্ভবতঃ, মার এখন যাওয়া হইবে না। কতদিন এদিকে থাকেন কিছুই ঠিক নাই।

বৈকালে আমরা-মা'র কাছে মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আছি। কথায় কথায় উঠিল, মা'র, ঠাকুরমার মা'র, দিদিশ্বাশুরী, যে সহমরণে গিয়াছিলেন সেই কথা। মা বলিলেন, "ঠাকুরমার খুড়ীমার নিকট আমরা এই গল্প শুনিয়াছি। স্বামীর শেষ-অবস্থা, সকলে বলিতেছে, আর বেশী দেরী নাই। এদিকে স্ত্রী বেশ করিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া লালপেড়ে সাড়ী পরিল, পান খাইল, সিন্দুর কপালে দিল, তারপর, হাতের একটা আঙ্গুলে ঘি মাখিয়া ঘিয়ের প্রদীপে তাহা জ্বালাইতে লাগিল। আঙ্গুল জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সে নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া আছে। পূর্ব্বে আঙ্গুল জ্বালাইয়া দেখিয়া লইল। মৃত-দেহ শ্মশানে নিলে সে সহমরণে যাইবে তারপর স্বামীর মৃত-দেহ প্রদক্ষীণ করিল। নিজের কপালের সিন্দুর পাতায় করিয়া বধূদের জন্য রাখিয়া গেল। আরও বলিল, "আমার বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি কাঁপিবে। কারণ, একদিন উনি শুইয়াছিলেন, অসাবধানে চলিতে ঐ অঙ্গুলী তাঁর বালিশে লাগিয়াছিল। তাই ঐ অঙ্গুলীটা জ্বলিবার সময় কাঁপিবে।" এই বলিয়া মহানন্দে সহমরণে গিয়াছিল। আমি ছোট বেলায় এই সব কথা শুনিয়াছি।" অভয় বলিল, "মা, এসব কথা কি সত্য?"

মা বলিলেন, "সত্য না হইলে এ ভাবে বলিতে পারিত না। যে বলিয়াছে সে ত' দেখিয়াছে।"

সন্ধ্যাবেলায় দু'তিন জনে মিলিয়া মার নিকট স্তোত্রাদি পাঠ ও কীর্ত্তন করিল।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—

আজ বৈকালে মা উঠিয়া বলিলেন, "জ্ঞানস্থ দেখিতে যাবি, ত' চল্।" 'জ্ঞানস্থ' প্রায় মাইল খানেক দূর। সেখানে গঙ্গার ধারে ধারে সাধুদের কুটীর আছে। আমরা সেই স্থানটি দেখি নাই। মুসৌরী হইতে আমাদের নীচে যাইবার জন্য ডাণ্ডি আসিয়াছে। সেই ডাণ্ডিতেই মার সঙ্গে 'জ্ঞানস্থ' দেখিতে চলিলাম। একটী পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক নাম বলবন্ত মাই। মার সঙ্গে ইহার হৃষিকেশেই পরিচয় হয়, তিনি এখানে আসিয়া 'জ্ঞানস্থ'তে আছেন। মাকে একবার তথায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা জ্ঞানস্থতে যাইয়া গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ বসিয়া সাধুদের কুটীরগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। বেশ নির্জ্জন স্থান। চারিদিকের দৃশ্য অতি চমৎকার। কয়েকজন সাধু আছেন। অনেকগুলি তালা বন্ধ। বলবন্ত মাইদের ওখানে যাওয়া হইল। মা'কে তাঁহারা রাখিতে চাহিলেন। মা বলিলেন, "দেখা যা'ক্, কি হয়।" সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা ফিরিয়া আসিলাম। আজও বাঁকেবিহারী মার নিকট রামায়ণ পাঠ করিলেন, কীর্ত্তনাদি হইল। আগামীকল্য আমাদের মুসৌরী রওনা হইবার কথা।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—

আজ সকালেই আমরা রওনা হইলাম। মায়ের পায়ের ধুলা নিতেই মা, মাথার হাত দিয়া বলিলেন, "ভাল মত সাধন-ভজন কর গিয়া।" স্বামিজী প্রণাম করিতে মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "নারায়ণ স্পর্শ করিলাম।" আমাদের নানা কথায় সান্ত্বনা ও সময়োপযোগী উপদেশাদি দিয়া রওনা করিয়া দিলেন। আমাকে বলিলেন, "তুই এখানে থাকিলে ত'

সব দিকে সুবিধা হইত, কিন্তু তবুও অন্যস্থানে পাঠাইতেছি। উপস্থিত কতকট সময়, ইহারই প্রয়োজন হইয়াছে। এই কাজ হইতেও বড় কাজে পাঠাইতেছি। **"ভগবানের সাধনা কর্‌লে এই শরীরের সেবা হয় জানিস্‌।"** আপন ভাবে সাধন ভগবানের উপদেশ দিয়া দিলেন। সম্প্রতি কয়েক দিন কলিকাতা যাইয়া থাকিব, স্থির হইয়াছে। চোখের জলে মা'র নিকট বিদায় নিয়া রওনা হইলাম। মা দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা মাকে দেখিতে দেখিতে ডাণ্ডিতে উঠিলাম।

সন্ধ্যায় আমরা ২৩ মাইল দূরে 'নগুণা' চটিতে পৌঁছিয়া এক পুরাতন শিব-মন্দিরের বারান্দায় রাত্রি যাপনের জন্য কম্বল বিছাইলাম। যতই রাস্তা পার হইতেছি, প্রাণের মধ্যে একটা হাহাকার করিয়া ক্রন্দন আসিতেছে। মাকে কোথায় রাখিয়া চলিলাম! কতদূর মা রহিলেন! কত অসুবিধার এই সব স্থানে থাকিতে হয়! কত কি চিন্তা আসিতে লাগিল। মা'র উপদেশ মত এর মধ্যে নামের উপর জোর দিয়াই চলিলাম। মনে হইল নামের সঙ্গেই, মা সঙ্গে আছেন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

আজ দুপুরে 'বলডিয়ানা' খাওয়া দাওয়া করিয়া সন্ধ্যায় 'বাণ্ডেল গাঁও' যাইয়া রাত্রি যাপন করিলাম।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

আজ দুপুরে 'কানিতাল' খাওয়া দাওয়া করিয়া বৈকালে ধনৌটী রওনা হইলাম। সন্ধ্যায় 'ধনৌটী' পৌঁছিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। এখানে হইতে মুসৌরী ১৫ মাইল।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

আজ ভোরেই রওনা হইয়া দুপুরে মুসৌরী পৌছিয়াছি।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

আজ বৈকালে হঠাৎ অভয় আসিয়া উপস্থিত। বলিল, 'মা তাহাকে কলিকাতা যাইতে আদেশ দিয়াছেন।" মা ধীরে ধীরে সকলকে সরাইতেছেন। মা'র এই ভাব আমাদের দুশ্চিন্তাই বাড়াইয়া দেয় যদিও উপায় কিছুই নাই। ভাঙ্গিতে বা গড়িতে মা'র দেরী হয় না। এই ভাবেই চলিতেছে।

অভয় বেশ বলিতেছিল, "আমি ত মা'র অনেক কথাই শুনি না, এ কথাও না শুনিলে পারিতাম। কিন্তু আমারই কেমন উল্টা ভাব হইল বলিলাম, "বেশ ত, দেখুন না, আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি কিনা ?" আর আমার কেমন আসিবারই ইচ্ছা হইতে লাগিল। কলিকাতা যাইব ভাবিয়া আনন্দ হইতে লাগিল। পথে আসিয়া প্রথম দিন মনে হইল, কেন আসিলাম, আমি না আসিলে ত' মা আমাকে জোর করিয়া পাঠাইতেন না। মনটা খুব খারাপ হইল। মনে হইল এখনও ফিরিয়া যাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য আবার খানিক পরেই মনের ভাব ফিরিয়া গেল। ফিরিয়া যাইবার ভাব রহিল না।' আরও বিশেষ কথা এই যে, অভয়ের মুখ দিয়েই নাকি প্রথম বাহির হইল কলিকাতা গেলে হয়।" অমনি মা নাকি আসিবার ব্যবস্থা এত তাড়াতাড়ি করিতে বলিলেন যে, আর কোন কথা বলিতে দিলেন না।

আমরা ইহা অনেকবার দেখিয়াছি, মা যাহা করিবেন তাহা এই রকম কত ভাবেই করিয়া লইতেন। অভয়ের ভাবের যে অবস্থা তাহাতে মা

তাহাকে এ পর্য্যন্ত জোর করিয়া কোথাও সরাইয়া দেন নাই। আর অভয় ও মাকে ছাড়িয়া কোথায়ও থাকিতে পারে নাই। মা ২।৪ বার উহাকে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ২।৪ দিনের বেশীও' কোথাও থাকিতে পারে নাই। অভয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিতেছে, "আমার এই ভাব আসিল কেন, আমি ত অবাক হইয়া যাইতেছি। আমি ত' এখন বেশ জানি মার সঙ্গ সব চেয়ে ভাল। কিন্তু তবুও, এই রকম ভাব জাগিল। আর মা'ও অমনি ব্যস্তহইয়া সমস্ত ভাবে আসিবার ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।" মার এই কাণ্ড অনেকবার দেখিয়াছি। এবারও তাই আশ্চর্য্য হইলাম না। কিন্তু মার জন্য চিন্তা হইতেছে। মার ভাবের, কখন কিভাবে পরিবর্ত্তন হয়, কিছুই বোঝা যায় না। তাই সর্ব্বদাই একটা আশঙ্কা থাকে।

মার নিকট লোক পাঠান হইয়াছে। সেই লোক ৪।৫ দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবার কথা। তাহার নিকট মার একটা খবর পাইবার আশায় আমরা এখানে অপেক্ষা করিতেছি। বেরিলী হইতে আজ এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক আসিয়াছেন। তিনি মাকে কখনও দেখেন নাই। মার নাম শুনিয়াছেন মাত্র। তিনি আজই সস্ত্রীক মার নিকট রওনা হইয়া গেলেন। ভদ্রলোক সঙ্গে একটি কুলী পর্য্যন্ত নেন নাই। স্বামীস্ত্রী আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র নিজেরাই বহিয়া নিতেছেন। মাকে দেখিবেন এই আশায় এই দুর্গম পথে চলিতেছেন। মা কাহাকে কি ভাবে আকর্ষণ করিতেছেন, কে কি ভাবে মার কৃপা পাইয়া ধন্য হইতেছেন, আমরা তাহা ধারণাও করিতে অক্ষম।

৫ই আষাঢ়, মঙ্গলবার।

আজ কলিকাতা পৌছিয়া কমলাকান্তের চিঠিতে জানিলাম, মা রায়পুর আসিয়া পৌছিয়াছেন। তারপর সব খবর পাইলাম, মা রায়পুর

হইতে কিষণপুর আশ্রমে গিয়াছেন। শরীর খুবই খারাপ হইয়া যাইতেছে।

২৭শে আষাঢ়, বুধবার

কয়েকদিনের জন্য পুরী গিয়াছিলাম। মা, কখনও রায়পুর, কখনও কিষণপুর, এইভাবে যাতায়াত করিতেছেন খবর পাইতেছিলাম। কাল কমলাকান্তের চিঠিতে জানিলাম, মা দল-বল নিয়া সিমলার ভক্তদের আহ্বানে 'নাম-যজ্ঞে' সিমলা গিয়াছেন। ৯ই জুলাই নাম-যজ্ঞ হইয়াছে। তারপর দিন পঙ্কজবাবুর বাসায় কীর্ত্তন। এই দুই দিন তথায় থাকিয়া সোলন হইয়া মার কিষণপুর চলিয়া আসিবার কথা হইয়াছে।

৩১শে আষাঢ়, রবিবার

মা কিষণপুর আসিয়া পরে রায়পুর গিয়াছেন খবর পাইলাম।

১৪ই শ্রাবণ, রবিবার—

আজ খবর পাইলাম মা গত ১০ই শ্রাবণ বুধবার, অভয় ও দেবীজীকে নিয়া দেরাদুন ছাড়িয়া হরিদ্বার, নানকীবাইয়ের ধর্ম্মশালায় নামিয়াছিলেন। খানিক পরেই হরিদ্বার হইতে রওনা হইয়া যান এবং মোরাদাবাদ নামিয়া পড়েন। তথা হইতে কোথায় যাইবেন, কেহ জানে না।

১৮ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার—

আজ ৮।৯ দিন যাবৎ এখানে ভয়ানক বৃষ্টি চলিতেছে। বেলা প্রায় ৩টায় রান্না করিতে গিয়াছি, হঠাৎ মা আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে অভয় ও রুমাদেবী। দিনের অবস্থা বড়ই খারাপ। শুনিলাম,

মা মোরাদাবাদ, বেরেলী, লক্ষ্ণৌ, ফরাক্কাবাদ, বর্দ্ধমান হইয়া আসিলেন। এ'কদিন যদিও মার জন্য মনটা খারাপ ছিল, কিন্তু আজই বিশেষ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ, রান্না করিতে বসিয়া মনটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। ঐ অবস্থায় প্রার্থনা জাগিল, "মা আর কতদিন, এবার সেবার জন্য কাছে নেও মা।" প্রার্থনার আধঘণ্টার মধ্যেই মা আসিয়া উপস্থিত। আরও কয়েকবার আমি এইরূপ দেখিয়াছি যখনই প্রাণে একটা ব্যাকুলতা তীব্র ভাবে জাগিয়াছে, অমনি মা শ্রীচরণে টানিয়া নিয়াছেন। আজও তাই। এ'কয়দিন মা পুনঃ পুনঃ সরাইয়া দিতেছেন বলিয়া অভিমানে মনটা ভরিয়া ছিল। আজ সেই অভিমানের ভাব যাইয়া শরণাগতের ভাব জাগিয়াছে, অমনি মা উপস্থিত। এত করুণা তবু আমারা বুঝি না। রান্না করিয়া ভোগ দিতে দিতে প্রায় সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার পর মা মোটরে ঘুরিতে বাহির হইলেন। প্রথমে রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী গিয়া দরজা হইতে গান ধরিলেন,

"কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্,
রাম রাঘব, রাম রঘব, রাম রাঘব রক্ষ মাম্॥"

সকলে উপর হইতে দৌড়াইয়া নামিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে মাকে পাইয়া অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। মা তখনি অন্যান্য বাসায় যাইবেন। রায় বাহাদুর ও ননী, সঙ্গে চলিল। মা নৃপেন্দ্র পাল, যতীশ গুহ, রেবতী সেন, প্রিয়নাথ মুখার্জ্জি, গঙ্গাচরণ বাবু ইত্যাদির বাসায় ঐ ভাবে লীলা করিয়া বিরলা মন্দিরে ফিরিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সব বাসা হইতেই ভক্তেরা বিরলা মন্দিরে আসিলেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অনেক রাত্রিতে মা বিশ্রাম করিতে গেলেন।

১৯শে শ্রাবণ, শুক্রবার—

খবর পাইয়া অনেকেই আসিলেন। বিরলা মন্দিরে মহা আনন্দোৎসব চলিতেছে। কথাবার্ত্তা হইতেছে। কথা উঠিল, মার সঙ্গ করিয়াও লোকের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না কেন?

মা বলিলেন, "সঙ্গ করা হয় কই? কাছে আসিলেই কি বিশেষ সঙ্গ করা হয় বা ২।৪টি কথা শুনিলেই কি সঙ্গ করা হয়? সেই রকম ত' মশা মাছিও করিতেছে।'

সকলেই বলিতেছেন, 'মা, আমাদের কিছু বলুন।' মা বলিতেছেন, "আমি ত তোমাদের মেয়ে, আমি কি বলিব? তবে তোমরা যেমন ঘণ্টা বাজাইবে তেমনই ঘণ্টা বাজিবে। ইহা অতি সত্য কথা। তোমরা যেমন বলাইবে তাই এই মুখ দিয়া বাহির হইবে। দেখ, আমি ত' তোমাদের মত ইচ্ছা করিয়া কিছু বলি না। একটা কথা আজকাল প্রায়ই হইতেছে, কথাটা হইল—'সংযম ব্রত'। মাসের মধ্যে ১৫ দিন কি ৭ দিন এই সংযম ব্রত করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া সেই দিন শুদ্ধভাবে সত্যের আশ্রয়ে থাকা। ছেলেদের 'বাল গোপাল' ভাবে, মেয়েদের 'কুমারী' ভাবে, পতিকে পরম পতি ভাবে' স্ত্রীকে 'দেবী' ভাবে সেই দিন সেবা করা। এমন কি, ছেলে পেলে কি যে কেহ, দোষ করিলেও সেই দিন রাগ করা নাই। সমস্ত পরিবারের মধ্যেই একটা পবিত্র ভাব জাগান হয়। দেখিবে, এইরূপ করিতে করিতে শেষে আর খারাপ ভাব জাগিতেই সুবিধা

পাইবে না। নিত্যই সংযম ভাব ভাল লাগিবে আর নিত্য ঐ ভাবের জন্যই তো চেষ্টা অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ থাকবার জন্যই এই সব কিছুর আশ্রয় নেওয়া। সমস্ত পরিবার নিয়াই সংযম ব্রত। আবার, যদি লিখিয়া রাখ যে এই সব দিনে কি কি ত্রুটী হইল এবং সেই জন্য অনুতাপ করিয়া আর যেন সেই ত্রুটি না হয়, সেই জন্য সাবধান হও, তবে ধীরে ধীরে ভিতর অনেক পরিষ্কার হইয়া যাইবে।"

আবার কেহ বলিতেছে, "মা, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি। মা অমনি হাসিয়া জবাব দিতেছেন, "তাইত বাবা, আপনাকে দর্শন করাই ত চাই। আপনাকে জানার জন্যই ত' যত সাধন ভজন।" মা কথাটা এই ভাবে ঘুরাইয়া দিলেন দেখিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

আবার কথায় কথায় বলিতেছেন, "এই যে শ্বাসে শ্বাসে নাম করার কথা বলা হয়, শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলা হয়, কথা কি জান? শ্বাস হইল বায়ু, বায়ুত সর্ব্বব্যাপক, ঐ দিকে লক্ষ্য থাকিলে ঐ রকম, ভাবটাও সর্ব্বব্যাপী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"

"এই সব সহায়ক কর্ম্ম নিতে হয়, তাহাতেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। বায়ুর গতি তো নানা ভাবের তরঙ্গ ; এইগুলি কি জান, বাসনা কামনা— সেই গতিকে স্থির করিতে হইবে। যে কোন আশ্রয়েই হোক, নানা অগ্র হইতে এক অগ্র না হইলে যে সমগ্র—সেই এক জনের সন্ধান পাইবে না।

এই রকম কত জনের সঙ্গেই কত কথা হইতেছে। দিন রাত প্রায় এক ভাবেই চলিতেছে।

দিলীপ রায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আচ্ছা মা, কেহ কেহ যে বলেন

—'সাধন ভজন, অর্থাৎ চেষ্টা করিতে হয় তবেই কাজ হয়,' আবার কেহ কেহ বলেন, 'সময় না হইলে কিছুই হয় না'—এর কোনটা সত্য ?" মা বলিলেন, "দুইটাই সত্য বাবা, কথাটা হইল, যখন চেষ্টার মধ্যে আছো তখন চেষ্টা করাই দরকার। কখন যে সেই সময় আসিবে কেহ ত' জানে না। বন্যার জলের মত আর কি! ভাসাইয়া নেওয়া। তোমার কর্ত্তব্য, চেষ্টা, বুদ্ধি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ চেষ্টা করাই করণীয়। সব সময়ই যে সেই সময় হইতে পারে। সময়ের অপেক্ষা করা ও তাঁহার ধ্যানে থাকা, সবই ঠিক।" একজন বলিতেছেন, "কৃপা টৃপা কিছুই নাই। নিজের কাজ নিজে না করিলে উপায় নাই। অপর একজন বলিতেছেন, "এই যে কাজ করিতে পারিতেছেন, ইহাও ত' তাঁহারই কৃপা।" মা হাসিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিতেছেন, "বাবা, কথা কি জান? একটা অবস্থা আছে, যখন কৃপা বোধ হয়। যতক্ষণ সেই অবস্থাটা না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনে করে, 'আমিই সব করিব করিতেছি' এই আর কি? আসলে ত ইহা ঠিক কথা, তাঁহার কৃপা ছাড়া তাঁহাকে কেহ ভাবিতেই পারে না। এইরূপ কত কথাই হইল।

২০শে শ্রাবণ, শনিবার—

আজ দুপুরে ও, এন্, মুখার্জ্জির বাড়ীতে তাহার ছেলে যামিনী বাবুর বিশেষ আগ্রহে মার ভোগ হইল। তাঁহাদের মন্দিরেই ভোগ হইল। ভোগের পর মা বিরলা মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। রামতারন বাবু মাকে "শ্রীমন্তের মশান" শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার ভাই এই গানের দলের মধ্যে আছেন। কথা হইয়াছে, সন্ধ্যার

পর যামিনীবাবুর বাসাতেই এই গান হইবে। তাই মাকে তথায় নিয়া যাওয়া হইল। মাকে একটু বিশ্রাম দিবার জন্য যতীশ দাদা গান সঙ্ক্ষেপ করিবার জন্য একটু বলায় গায়কের দল দুঃখিত হইয়া মার নিকট বলিলেন, "মা, বড় আশা করিয়া তোমাকে গান শুনাইতে আসিয়াছিলাম, এইরূপ বাধা পাইয়া মনটা বড়ই খারাপ লাগিতেছে।" মা বলিলেন, "তোমাদের ইচ্ছামত গান কর, দুঃখ করিও না। ও'রা এই শরীরটার একটু বিশ্রামের জন্য এইরূপ বলিতেছেন।" ঘটনাচক্রে একটু গোলমালের সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মা এমন ভাবে কয়েকটী কথা বলিলেন, যাহাতে সকলের প্রাণেই শান্তি আসিল। মায়ের কথায় সকলেই শান্ত হইলেন এবং আবার গান চলিল। রাত্রি প্রায় ৩টায় আমরা মন্দিরে ফিরিলাম। আসিয়া দেখি এখানেও ভক্তেরা মার অপেক্ষা করিতেছেন। ভোর ৫ টায় মা একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন।

২১শে শ্রাবণ, রবিবার—

মা উঠিবার পূর্ব্ব হইতেই লোক সমাগম হইতে লাগিল। মা উঠিলেন। আজ মা ত্রিগুণাদাদার আহ্বানে শ্রীরামপুর যাইতেছেন। তথা হইতে যেখানে হয় যাইবেন। মাকে অল্প সময় পাইয়া কাহারও তৃপ্তি হইল না। তবুও অপ্রত্যাশিতভাবে মাকে পাইয়া সকলেই যেন আনন্দ সাগরে ভাসিতেছেন। বেলা প্রায় ১০॥ টার সময় মা বিরলা মন্দির হইতে রওনা হইয়া গেলেন। বহুভক্ত সঙ্গে চলিল। শ্রীরামপুর মহাপ্রভূর মন্দিরে মা রহিলেন। ত্রিগুণাদাদার বাসাতেই মার ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। ত্রিগুণাদাদার পরিবারটাও অতি চমৎকার। বাপ, মা, ছেলে, বউ, এমনকি ছেলেমেয়েগুলি পর্য্যন্ত সবই সেই, একভাবে ভাবান্বিত। মায়ের প্রতি

এই পরিবারের বড় সুন্দর ভক্তির ভাব। তাহা ছাড়া, ইহাদের স্বভাবে সকলেই মুগ্ধ হয়। অতি যত্নের সহিত ইঁহারা মার ও ভক্তদের সেবা করিলেন।

সন্ধ্যার গাড়ীতে মা, অভয় ও রুমাদেবীকে নিয়া নলহাটী রওনা হইলেন। আমাদের সম্প্রতি বিন্ধ্যাচল যাইতে বলিয়া গেলেন। ষ্টেশনে বহু ভক্ত একত্রিত হইলেন, মার মুখের দিকে সকলেই চাহিয়া আছেন। গাড়ী আসিবার একটু বিলম্ব আছে। মাকে একটা বেঞ্চির উপরে বসান হইয়াছে। কলিকাতা হইতে অনেকেই গিয়াছেন। যামিনী মুখার্জ্জি মহাশয় মা'র গায়ে সুগন্ধি ঢালিয়া দিতেছেন। মায়ের কিছুতেই আগ্রহও নাই নিগ্রহও নাই। সর্ব্বদা দেখা যাইতেছে, কেহ পূজা করিতেছে, কেহ গালি দিতেছে, কেহ মাটিতে বসাইতেছে, কেহ ঘাটে বসাইতেছে, কেহ জড়াইয়া ধরিতেছে, কেহ দুর হইতে প্রণাম করিতেছে। কেহ মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছে, কাহারও ঘায়ের পুঁজ হয়ত মা'র পায় লাগিয়া যাইতেছে—কারণ সারিবার জন্যই তাহারা ঐরূপ করিতেছে—এ'সব বিপরীত ব্যবহারের কোনটাতেই মার অচল অটল ভাবের এতটুকুও পরিবর্ত্তন হইতেছে না। সবই সমভাবে গ্রহণ করিতেছেন। ষ্টেশনে পরিষ্কার ভাবে সকলকে আশ্বাস-বাণী দিতেছেন, **"তোমরা কাজ ক'রে যাও নিশ্চয় হ'বে।"** একজন বলিলেন, "আমাদের সকলেরই কি হ'বে, মা?" মা বলিলেন, **"নিশ্চয় হ'তে হ'বে। তোমরা 'হ'বেনা হ'বেনা' এ'ভাব মনে এনো না। দেখনা, ভগবানকে ভাবতে ভাবতে তৎভাবাপন্ন হয়ে যায়, তাই 'হ'বে না হ'বে না' ভাবতে নেই 'হ'বে হ'বে' ভাব্‌তে ভাব্‌তে হ'য়েই যায়। সংশয় আনা পাপ। তোমরা চিন্তা করছ কেন।**

সকলেরই হ'তে—হ'বে।—"ভক্তেরা এইরূপ আশ্বাস-বাণী পাইয়া বড়ই শান্তি পাইলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া পড়িল। ভক্তদের বিষাদ ভাবের মধ্যে মা রওনা হইয়া গেলেন। সকলেই কি যেন অল্প সময়ের জন্য পাইয়াছিলেন, তাহা হারাইয়া খানিক সময়ের জন্য কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে সকলে ষ্টেশন হইতেই, কেহ মোটরে, কেহ ট্রেণে কলিকাতা ফিরিলেন।

২৫শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।

আজ প্রাতে অভয় আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম, কাল রাত্রেই সে কলিকাতা আসিয়াছে। মা নলহাটী হইতে আজীমগঞ্জ গিয়াছিলেন। তথায় ভাল একটী ধর্মশালা পাওয়া গিয়াছে। সেখানে আগামী রবিবার যাইবেন। এই খবর দিতে অভয় আসিয়াছে। আমাদেরও যাইতে বলিয়াছেন। আমরা অভয়ের সঙ্গেই ৩ টার গাড়ীতে মার নিকট চলিলাম। অপরাপর সকলেই ক্রমে ক্রমে যাইবেন। বহরমপুর ষ্টেশনে মা লোক রাখিয়াছেন। আমরা তথায় নামিলাম। শুনিলাম, মা নসীপুর হইয়া 'বিষ্ণুপুর' কালীবাড়ীতে (বহরমপুর) আসিয়াছেন। আমরা যথা সময়ে কালী বাড়ীতে আসিয়া মার চরণ দর্শন পাইলাম। কীর্ত্তন হইতেছিল। রাত্রি প্রায় ১২টা অবধি লোক সমাগম রহিল। তারপর বিশ্রাম করিবার জন্য মাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল।

২৬শে শ্রাবণ, শুক্রবার।

মা সকালে উঠিয়া বসিয়াছেন। একটি ভদ্রলোক মা'র নিকট গীতা-পাঠ করিলেন। পরে মাকে হাতমুখ ধোয়াইয়া একটু ফলের ভোগ দেওয়া

হইল। পরে মা গিয়া মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। একটী ভদ্রলোক বলিতেছেন, "মা বাসায় যাই?" মা হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, **বাসায় যাইবার ব্যবস্থা কর। এই ত শ্বাসের বাসা।**" এই বলিয়া বলিতেছেন, "দেখ কি চমৎকার, সকলেই বাসায় যাইতে চাহিতেছে, সেই জন্যই ব্যস্ত, শুধু কোন্‌টা তার বাড়ী এই খবরই নাই।" এই বলিয়া উপরোক্ত ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, "বাবা, ওটা ধর্ম্মশালা বানাইয়া দাও, পারবে ত?"

ভদ্রলোকটী—"তা আপনার যদি কৃপা হয়, পারব বই কি মা।"

উপস্থিত সকলের সঙ্গে নানা কথা হইতেছে। একটি ভদ্রলোক বলিলেন, "মা অহঙ্কার ইত্যাদি তিনি আমাদের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছেন কেন?"

মা হাসিয়া বলিতেছেন "কে পুরিয়া দিয়াছে। **সেও যে তাঁহারই একরূপ। তুমিও যে তিনিই। বেশ মজা কিন্তু, তুমি মনে করিতেছ তুমি তাঁহা হইতে ভিন্ন।**" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। অভয় বলিল, "আপনি জীব হইলে ভাল হইত। জীবের দুঃখ বুঝিতেন। এখন আমাদের দেখে হাসছেন? আপনার চেয়ে চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ-দেব অনেক ভাল ছিলেন। তাঁহারা জীবের দুঃখে কেঁদেছেন।" মা হাসিয়া বলিলেন, "সব কি আর ভাল হয়? অনন্ত রকমের প্রকাশ, সব কি এক রকম হয়!" অভয় বলিল, "আপনার কাছ থেকে আমরা কিছু পেলাম না যদি, তবে আপনি আমাদের চেয়ে উঁচু কিসে?" মা হাসিয়া বলিলেন, "কে বল্‌লে উঁচু? আমিও ত' তোদের মতনই একজন। দেখতে পারছিস্ তো? বিছানার মধ্যে বসে আছি বলে উঁচু নাকি? বাতে টাতে ধরবে বলে ও'রা বিছানায় বসায়। আর আমি ত আবোল তাবোল বলি, কি করব যা' বের হয়ে যায়।"

আবার, কথায় কথায় মা বলিতেছেন, "তোমাদের ভয়ের কিছুনাই। চেষ্টা ও শক্তি আছে বলিয়াই বলা হয়, চেষ্টা কর; নতুবা তিনি না করালে কিছু হয় না।" অনেকে ঐ কথার সমর্থন করিতেই মা আবার বলিতেছেন, "তবে কথা এই, সব কাজ যেমন এইভাবে ফেলিয়া রাখ না, শক্তিমত চেষ্টা করিয়া যাইতেছ, ইহাও তেমনি ফেলিয়া রাখিতে নাই, করিয়া যাও। তারপর তিনি যাহা হয় করাইবেন। যেমন চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিয়া বসিয়া থাক, কাহার ভাগ্যে যে চাকুরী মিলিবে তাহাও জানা নাই। তবে দরখাস্ত করিলেই চাকুরী হয় ইহাও দেখা যায়। মনুষ্য-জন্ম পাইয়া কিছু না করাটা কি ভাল? তবে সকলেই পশু পক্ষীর মতই খাইয়া দাইয়া চলিয়া গেল। আজ হয়ত বেশ আছ, কিন্তু কাল যে তোমরা শত দুঃখ দৈন্যের মধ্যে পড়িবে না তা'র নিশ্চয়তা কি? এর জন্যই বলি, পেন্সনের যোগাড় কর। এই পেন্সন ত যতদিন শ্বাস আছে ততদিন থাকিবে, আর সেই পেন্সন নষ্ট হইবে না।"

একজন ভদ্রলোক বলিলেন, "দেহরক্ষা ত দরকার। দেহরক্ষা না হইলে সাধন ভজন করি কিসে?"

মা বলিলেন, "শরীর-রক্ষা কেন করিবে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। যদি ইহা মনে থাকে—তাঁকে ডাক্‌ব, এই জন্য শরীর-রক্ষা দরকার—ততটুকুই করিবে, ভোগের জন্য নয়। ভোগ ত পশু পাখীও করিয়া যায়। ডিউটী পূরণ করিয়া যাও তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখ।"

একজন ভদ্রলোক, "স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন এ'আবার কি রকম ডিউটী? কার স্ত্রী, কার পুত্র, কে প্রতিপালন করে?"

মা বলিলেন, "যদি ঐ বুদ্ধি ঠিক ঠিক ভাবে আসে তবে ত কথাই নাই। চৈতন্যদেব ত স্ত্রী, মাতা সব ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু সকলেই ত' আর চৈতন্যদেব নয়। ঐ জন্য যাহারা স্ত্রী পুত্রাদি করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের দরকার সেবা-বুদ্ধিতে, অর্থাৎ 'এই সবই তাঁরই সেবা করিতেছি' এই ভাবে সংসারের সব কাজ করিয়া যাওয়া। আর বলা হয়, যত দিন সংযম-ব্রত নেওয়া যায়, মাসের মধ্যে ২।৪ দিন অথবা যাহাদের শক্তি আছে এক মাস, "এই একমাস শুদ্ধ ভাবে থাকিব"—এই সংকল্প করা ভাল। খাওয়া, যতটুকু না হইলে শরীর রক্ষা হয় না, ভোগের জন্য খাওয়া নয় ; আর শোওয়া, যতক্ষণ নিদ্রা না আসে, শুইব না। সৎগ্রন্থাদি পাঠ বা নাম বা অন্য কোনও সৎ চিন্তায় সময় কাটাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। তোমাদের আফিস্-কাছারী আছে। মেয়েদের ত সেই কাজ নাই। তাহারা হাতে কাজ করিতেছে, কিন্তু সেই দিন বিশেষ করিয়া লক্ষ্যটা তাঁর দিকে রাখিতে চেষ্টা করিবে। সত্য কথা, সত্য ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিবে। একদিন হয়ত ঠিক ঠিক হইল না। কিন্তু অভ্যাস করিতে করিতে পরে কঠিন বোধ হইবে না, আনন্দ পাইবে। ছেলে-পেলেরা দেখ না প্রথম প্রথম পড়াশুনা করিতেই চায় না, খেলার দিকে মন ; পরে কিন্তু তাহারাই আবার বুঝিতে পারে, না পড়িলে পরীক্ষায় ফেল হইবে, তাই নিজেরাই পড়াশুনা করে। তখন আর কাহারও বলিতে হয় না। এই রকম প্রথম প্রথম হয়ত ভাল লাগিবে না, কারণ, আমাদের বৃত্তিগুলি বহির্মুখী হইয়া গিয়াছে কিনা! পরে অভ্যাস হইয়া গেলে তাহাতেই আনন্দ পাইবে। এই জন্যই বলা হয় তাপ সহা কি না,

'তপস্যা'। ভগবানের জন্য তপস্যা কর। অর্থাৎ তাপ সহন কর।"

আবার বলিতেছেন, "গুরু কে? না, পিতা, মাতা এবং যাঁহার নিকট হইতেই আমরা গূঢ় বিষয় একটুও জানিতে পারি তিনিই গুরু। যিনি রাস্তার খবর একটুও দেন তিনিই গুরু। সকলে সং সাজিয়া বসিয়া আছি, সং সাজিলে শান্তি কোথায়?"

কথাবার্ত্তার পর অবনীবাবু মাকে পূজা করিলেন। মায়ের নিকট সকলে মিলিয়া আদ্যাস্তব পাঠ করিবেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত' আদ্যাস্তব পাঠ কর। তোমরাও শুন, আমিও শুনি।" মা বসিয়া আছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নিন্দা, স্তুতি, পূজা ও অপমান মা এক ভাবেই গ্রহণ করেন; এ' সব বিষয় এতটুকুও চাঞ্চল্য দেখা যায় না।

মা বারান্দায় বসিয়া আছেন, কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কথা হইয়াছে বৈকালে মা এক আশ্রমে যাইবেন, তথায় কীর্ত্তনাদি হইবে।

মাকে বৈকালে গঙ্গার ধারে ৺মোহবাবুর আশ্রমে নিয়া যাওয়া হইল। প্রথমে ভাগবত পাঠ ও পরে অনেকে মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিলেন। একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "মা আমি ২।১টি প্রশ্ন করিতে চাই, জবাব পাইব কি?"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা বাজাইয়া নিতে পারিলে বাজিবে।" খানিক সময় কথাবার্ত্তা হইল। কথায় কথায় মা বলিলেন, "কথা হল বাবা, যো বন্ধ্ হ্যায়, উহি জীব হ্যায়। দেখ না বন্ধ জলেই গন্ধ হয়, স্রোতের জলে গন্ধ হয় না।" সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হইল। লোকে লোকারণ্য। মাকে বিশ্রামের জন্য একটু শুইতে দেওয়া হইল। কিন্তু লোকের আকুল আগ্রহে দরজা বন্ধ করিয়া রাখা সম্ভব হইল না। রাত্রি

১১টায় নিমাই-সন্ন্যাস কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রায় ৩টায় কীর্ত্তনান্তে সকলে শুইয়া পড়িলাম।

২৭শে শ্রাবণ, শনিবার।

আজ এখানকার রাজবাড়ীতে শ্রীযুক্ত কমলারঞ্জন রায় মাকে নিয়া গেলেন। অতি সুন্দর, ভক্ত পরিবার। রাজ-রাণীর বেশ ভক্তপ্রাণ। খানিক সময় তথায় থাকিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় রাণী বলিতেছেন, "একি হইল? দেখা না হওয়াই যে ছিল ভাল। এ যেন কেমন হইয়া গেলাম। মা যেন কেমন একটা ভাব করিয়া দিয়া গেলেন।"

বেলা প্রায় ১২টায় আহারাদি করিয়া মার সঙ্গে আজিমগঞ্জ রওনা হইলাম। চারিদিক হইতে ভক্তেরা আসিতেছেন। স্থানীয় লোকেরাও বহু আসিতেছেন। রাত্রিতে নাম আরম্ভ করিয়া রাখা হইল। আগামীকল্য কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে।

২৮শে শ্রাবণ, রবিবার।

আজ ভোর বেলা কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নাম আরম্ভ হইল—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।"

স্থান মুখরিত হইয়া উঠিল। ধূম-কীর্ত্তন চলিতেছে। নামে সকলে মাতিয়া উঠিয়াছেন। মা মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তনের মধ্যে গিয়া ঘুরিতেছেন। কখনও সেখানে গিয়া সকলের মধ্যে বসিতেছেন। সারাদিন এইভাবে কাটিয়া গেল। ২৪ ঘন্টা নাম চলিল।

২৯শে শ্রাবণ, সোমবার।

আজ মেয়েদের কীর্ত্তন ১২টা হইতে ৬টা অবধি হইবে। কীর্ত্তন বন্ধ হইতেছে না। অনবরত চলিতেছে। মাকে নলক্ষের জমিদার স্থরপৎসিংহের বাড়ী নিয়া গেল। বৈকালে ৫টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলিল। ৫টার পর আজীমগঞ্জের রাজবাড়ী নিয়া গেল। তথা হইতে গঙ্গার ওপার রায় বাহাদুরের বাড়ী জিয়াগঞ্জ নিয়া গেল। নৌকা লাগিতেই সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে মাকে উঠাইয়া নিয়া গেল। প্রায় ৮টা অবধি তথায় কীর্ত্তন চলিল। পরে ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রি ১টার গাড়ীতে মার সঙ্গে আমরা রওনা হইলাম।

৩০শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার।

আজ ভোরে মা ব্যাণ্ডেলে নামিয়া গেলেন। কোথায় যাইবেন কিছু ঠিক নাই। আমরা মার আদেশে আবার কলিকাতায় চলিলাম।

আজ সকালে নৈহাটী হইতে অভয়ের চিঠি পাইলাম মা ঢাকা যাইতেছেন। আমাদের ঢাকা যাইতে লিখিয়াছেন। আমরা রাত্রির ট্রেনে ঢাকা চলিলাম।

৩১শে শ্রাবণ, বুধবার।

আজীমগঞ্জে নানা কথা হইয়াছে,—বদ্ধ জলে গন্ধ হয়, স্রোতের জলে গন্ধ হয় না; এই বদ্ধ জল অথবা ভাবই হইল জীব। গুরুর বাক্যে অবিচলিত নিষ্ঠাই এই পথের সহায়ক।

৩২শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।

আমরা ঢাকা আসিয়া শুনিলাম, মা কাহাকেও খবর না দিয়া হঠাৎ

ঢাকা উপস্থিত হইয়াছেন। ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে প্রথমে যান। তারপর রমনা আশ্রমে আসেন। রাত্রি প্রায় ১০টার আবার সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে চলিয়া যান। পরদিন আবার রমনা আশ্রমে আসেন। আমরা মাকে রমনা আশ্রমে গিয়াই দেখিলাম। অনেকেই খবর পায় নাই, তাই ভীড় কম। সারারাত ছেলেরা কীর্ত্তন করিয়া কাটাইল।

১লা ভাদ্র, শুক্রবার।

ধীরে ধীরে খবর পাইয়া লোক সমাগম বাড়িতেছে। আজ মেয়েরা সারারাত কীর্ত্তনে জাগিল। মাও মধ্যে মধ্যে যোগ দিলেন।

২রা ভাদ্র, শনিবার।

আজ ভোরে মা সকলকে নিয়া সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে গেলেন। সেখানে স্নানাদি হইল। তথা হইতে বেলা ১০টায় মা নারায়ণগঞ্জ গেলেন। দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের আহ্বানে মা তথায় গেলেন। সেখানে ৺গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতেও মা গেলেন। তথায় কিরণ দিদি মেয়েদের মধ্যে কীর্ত্তনাদি প্রচার করিতেছেন।

কিরণদিদির উদ্যোগেই মাকে তথায় নেওয়া হইল এবং মেয়েরা কীর্ত্তনাদি করিলেন। তথা হইতে মা আরও অন্যান্য বাসায় গেলেন। পরে বেলা প্রায় ২॥টায় মা ঢাকা ফিরিলেন। আজ নাম-যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। সব ব্যবস্থা হইয়াছে। রাত্রিতে অধিবাসাদি করিয়া নাম-যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

৩রা ভাদ্র, রবিবার।

আজ অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হইল।

৪ঠা ভাদ্র, সোমবার।

আজ বেলা ৮টায় মুন্সীগঞ্জ রওনা হইলাম। তথায় দুই দিন থাকা হইল। জগদ্ধাত্রীর মন্দিরে কীর্ত্তনাদি হইল। মা এক রাত্রি জগদ্ধাত্রী মন্দিরে ও এক রাত্রি নৌকায় কাটাইলেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতেও কীর্ত্তন হইল। এই ভাবে মুন্সীগঞ্জে আনন্দ উৎসব করিয়া ৬ই ভাদ্র, বুধবার মা 'খেওড়া' রওনা হইলেন।

৬ই ভাদ্র, বুধবার।

আজ রাত্রি ১০টায় আমরা কমলা-সাগর পৌঁছিয়া তখনই খেওড়া রওনা হইলাম। খেওড়ার কয়েকজন ভদ্রলোক মাকে আনিবার জন্য 'কমলা-সাগর' গিয়াছিলেন। আমরা রাত্রি প্রায় ১॥টায় খেওড়া পৌঁছিলাম। বেশ বৃষ্টি হইতেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও সকলে আশ্রমে একত্র হইয়াছে। সকলে মাকে উলুধ্বনি দিয়া ঘরে বসাইলেন। মার সমবয়সী, মার নামের একটী স্ত্রীলোক, শুনিলাম, সে মার বাল্য-বন্ধু; সে আসিয়া কাছে বসিয়া পুরানো ২।১টী কথা বলে, আর তাহা বলিয়া আপশোষ করে। আমি বলিলাম, "আপনাদের দুঃখের কারণ কি? বরং কত গৌরবের বিষয়।" তাঁহারা বলিলেন, "নিজের জন যদি অপর দেশী হইয়া যায় তবে দুঃখের কারণই হয়।" মা এখানে আসিয়াই মধ্যে মধ্যে এই দেশীয় লোকদের সহিত এই দেশীয় ভাষায় ২।১টী কথা বলেন আর হাসেন। সকলের ইহাতে কত আনন্দ। এই ভাবে রাত্রি প্রায় ৩॥টায় আমরা শুইয়া পড়িলাম।

৭ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।

খবর পাইয়া কুমিল্লা এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে অনেক লোক

আসিতেছে। একটী পরিচিতা মহিলা আসিয়া মাকে বলিতেছে, "আমরা, তোমাকে দেখিবার আগে মনে করিতেছিলাম যে, দেখি গিয়া কি রকম আছ? মনে করিয়াছিলাম, হয়ত তুমি দিনরাত চোখ বুজিয়া শুইয়া থাক, কাহারও সহিত কথাই হয়ত বল না। কি রকম হইয়াছ দেখিতে আমাদের বড়ই বাসনা জাগিয়াছিল। এখন দেখি, আমাদের সহিত কথাও বল, হাসি আনন্দও কর। ইহা দেখিয়া আমাদের বড়ই আনন্দ হইয়াছে।" সত্যিই মা এখানে আবার এমন ব্যবহার করিতেছেন যে সকলে ভাবিতেছে, "মা আমাদেরই আছেন।" একজন বলিতেছে, "ঐ আমাদের, আমাদের, আমাদের রাজা।" আমিও হাসিয়া বলিলাম, "তা'ত ঠিকই।" এই রকম নানা কথায় ও আনন্দ উৎসবে সকলে ডুবিয়া আছে।

কি করিয়া মন শুদ্ধ করা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে, মা এখন অনেক সময়েতেই সংযম-ব্রতের কথা বলিতেছেন। "মাসের মধ্যে যে কয়দিন পার সংকল্প করিয়া নিও, সেই দিন পতিকে পরমপতি ভাবে, স্ত্রীকে দেবী ভাবে, ছেলেদের বালগোপাল ভাবে, মেয়েদের কুমারী ভাবে দেখিবে। সেই দিন কেহ অন্যায় করিলেও তোমরা রাগ করিবে না। মনে করিবে, ভগবান আমাদের এই ভাবে ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতেছেন। খাওয়া, শোয়া ইত্যাদি সব বিষয় সংযম। তোমাদের এই ভাবের মধ্যে থাকিলে ছেলেমেয়েদেরও সৎভাব জাগিবে। আহার ততটুকুই করিবে যতটুকু না হইলে নয়। কথা যাহা না বলিলে নয়। সবই এই রকম। মনস্থির করিবার উপায় সম্বন্ধে দেখনা, দুধে সর বসাইতে হইলে কত যত্নে স্থিরভাবে দুধটা রাখিতে হয়, বাতাস লাগিলেও

সরটা ভাল হয় না, ভাঙ্গিয়া যায়। সেই রকম স্থিরভাবে বসিয়া নাম করিতে করিতে মন স্থির হইয়া আসে। আবার দেখ, এক রকম জিনিষ দিয়া খাইতে আমাদের অরুচি হয়, তাই নানা রকম জিনিষ দিয়া খাওয়ার বাবস্থা করা হয়। সেই রকম নানাভাবে মনটাকে সেই দিকে লাগাইয়া রাখা দরকার। তাহাতে মন পুষ্ট হয়। বাহিরের খাওয়ায় শরীর, আর এই খাওয়ায় মন পুষ্ট হয়।"

৮ই ভাদ্র, শুক্রবার—

মাকে পুকুরের মধ্যে নৌকায় নিয়া বেড়ানো হইতেছিল। পূর্ব্বপরিচিতা এক বৃদ্ধা আসিয়া পূর্ব্বের কথা সব বলিয়া বলিয়া আপশোষ করিতেছেন। এর মধ্যে একজন বলিলেন, "মাকে কলসীভরা তেল টেল দিয়া বেশ করিয়া স্নান করাইলে হয় না ?" মা হাসিয়া বলিলেন, "বিবাহের সময়ই ত ঐ ভাবে স্নান করায়, তবে কি তোমাদের সঙ্গে বিবাহ হইবে নাকি ?" বোধ হয় বৃদ্ধাটী সম্পর্কে ঠাকুরমা হইবেন। বৃদ্ধাটি বিধবা, মা হাসিয়া এই দেশীয় ভাষায় বলিতেছেন, "যাহাদের পতি এই রকম ভাবে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সকলকেই আমি বিবাহ করিব, কি বল ?" এই বলিয়া হাসিতেছেন। সন্ধ্যার সময় এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী মাকে বলিতেছেন, "আজ তবে বর-শয্যা হইবে না ?" মা আবার হাসিয়া এই দেশীয় ভাষায় বলিতেছেন, "দেখ যাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সঙ্গে যেভাবে বর শয্যা হইয়াছে এই শরীরের সঙ্গে সেই ভাবে বর-শয্যা হয় না। কেন না সেই ভাবে বিবাহ তো এই শরীরের সঙ্গে না—এই স্বামীর সঙ্গে মনে মনে বরশয্যা, আর তাহার ফলে, একেবারে মিলিয়া যাওয়া—লয় আর কি ? তফাৎ থাকিবেই না। এক

ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। একাত্মা আর কি?" এই বলিয়া ছেলে মানুষের মত হাসিতে লাগিলেন।

আবার কি কথায়—মা বলিয়াছেন, "বাবা।" আমরা বলিলাম, "কোন্ বাবা? তোমার ত অনেক বাবা।" স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, "এখানকার (অর্থাৎ জন্মদাতা পিতা) বাপের মত কেহ নয়।" মা হাসিয়া বলিতেছেন, "বাপ কে? সেই হিসাবে যদি ধর, তবে ত আমিই আমার বাপ, আমিই আমার মা। সৃষ্টি যে করে, সেই ত বাপ। আমিই ত আমার সৃষ্টি করি। ব্রহ্মের ভিতর হইতে স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইয়া যাইতেছে। কাজেই আমিই আমার বাপ।" এই বলিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "আর কি বল্‌বি বল্ দেখি?"

৯ই ভাদ্র, শনিবার—

অনেক লোক আসিয়াছে, কথা হইতেছে। একটী ভদ্রলোক বলিতেছেন, "মা আমরা কিছু করিতে পারিব না, তুমি আমাদের করিতে বল কেন? তুমিই ত' যাহা হয় করিয়া দিবে। আমাদের উপর ভার দিও না। আমাদের উপর কাজের ভার দাও কেন?" মা হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, করিতে বলা হয় কেন জান? তোমরা যে মনে কর—'আমরা করি, আমরা পারি,' এই জন্য।"

ভগবানের 'নামে' ও 'বীজে' কি পার্থক্য? এই কথা উঠিলে মা বুঝাইয়া দিলেন, "বীজমন্ত্রে গুরু-শক্তিতে শরীরে ঝঙ্কার হয়। এবং মন্ত্র-চৈতন্য হইয়া সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। সাধারণ নামেও ভাব জাগে, আবার ভাবের সহিত করিলে নাম-শক্তিতে

ভাগ্যানুযায়ী গুরু প্রকাশিত হইলে সবই হইতে পারে। নাম ও বীজে গুরুশক্তি থাকিলে সবটাতেই কাজ হইতে পারে।”

১০ই ভাদ্র, রবিবার—

আজ মাকে 'পাতাই সারে'র মুকুন্দ চৌধুরী তাঁহাদের বাড়ী নিয়া গেলেন। গ্রামের বহুলোক প্রত্যহ মায়ের পূজা করিতেছেন। অনেকেই পূজার পর ফল মিষ্টি দিয়া মায়ের ভোগ দিয়া প্রসাদ নিয়া যাইতেছেন। আরতি হইতেছে, যেন বৃহৎ দুর্গোৎসব চলিয়াছে। পাতাইসারে ভোগাদির পর আবার মা যখন বাবুর আহ্বানে 'কুঠী'তে চলিলেন। তিন চার খানা নৌকা ভর্ত্তি সকলে উঠিল। ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া নৌকা চলিয়াছে। কীর্ত্তনও চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক এক ঘাটে অনেক লোক একত্র হইয়াছে। মা'ও পূর্ব্ব পরিচিতাদের দেখিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিয়াছেন। তাহাদের কত আনন্দ! রাত্রি প্রায় ৩টায় আমরা আশ্রমে ফিরিলাম।

১১ই ভাদ্র, সোমবার—

আজও সকালেই মা নৌকায় চলিয়া গেলেন। খানিক বিশ্রামের পর আশ্রমে ফিরিলেন। একটী মেয়ের এই পথে চলিবার ইচ্ছা, অথচ বাহিরের দিক হইতে সেই ভাব চলিতেছে না। মা এই কথায় বলিতে-ছেন, “বৃত্তির খোরাক না যোগাইয়া নিবৃত্তির খোরাক দেওয়ার দরকার, কি বলিস্? তোরা যে সব বৃত্তির খোরাক দিতেছিস্, তারপর এক সময় এমন হইবে যে, এই বৃত্তি এত পুষ্ট হইয়া উঠিবে যে আর তুই বৃত্তির সঙ্গে পারিয়া উঠিবি না, সে'ই তোকে

অবশ্য করিয়া ফেলিবে। তাই বলি, বৃত্তির খোরাক না জোগাইয়া নিবৃত্তির খোরাক দে।"

আজ রাত্রিতে অধিবাস করিয়া আগামীকল্য অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের জন্য সবাই প্রস্তুত হইল। গ্রামবাসীরা মায়ের পূজা ও আরতি করিয়া নাম আরম্ভ করিল। রাত্রি প্রায় ১৷৷টায় ঢাকা হইতে ভক্ত, স্ত্রী পুরুষ, প্রায় ৩০ জন আসিয়া উপস্থিত। অধিবাসের পর মেয়েরা কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। ফুল পাওয়া যায় না। মা মেয়েদের পাতা দিয়া ও পাটকাঠী দিয়া মালা করিতে দেখাইয়া দিলেন। তাহা দিয়া বেশ সুন্দর মালা তৈয়ার হইয়া গেল। মার সবই উপস্থিত মত ব্যবস্থা। সেই মালায় ও চন্দনে সাজিয়া মেয়েরা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। সারারাত কীর্ত্তন চলিল। গ্রামবাসীরা মাকে পাইয়া যেন কি রকম একটা উন্মাদনায় বিভোর। পূজা, আরতি, কীর্ত্তনাদিতে সকলেই প্রায় সব সময় আশ্রমে উপস্থিত। খবর পাইয়া কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতেও অনেকে আসিতেছেন। মা কখনও সংযম-ব্রতের, কখনও নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন।

ভীড়ের জন্য দিনের বেলা অনেক সময়ই মাকে নৌকায় নিয়া যাওয়া হয়। নৌকা খানিকটা দূরে একটা বটগাছের তলায় নিয়া রাখা হয়। মায়ের কাছে শুনিলাম এই বটগাছের তলায় এক সময় মেলা হইত। মা সেই মেলায় আসিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যখন কোথাও বাতাস নাই তখনও এই গাছতলায় সুন্দর বাতাস। মা পূর্ব্বেই এই কথা বলিয়াছিলেন। এখন আমরাও দেখিতেছি। দিনের অনেকক্ষণই এই বটগাছ তলায় নৌকা রাখা হয়। গ্রামের পূর্ব্ব পরিচিতাদের দেখিয়া মা এমন সুন্দর ভাবে তাহাদের ভাষায় নানাকথা জিজ্ঞাসা করেন, সে'ও এক সুন্দর লীলা। সকলেই এই ব্যবহারে আনন্দিত হইতেছেন। নানাভাবে লীলা চলিতেছে!

১২ই ভাদ্র, মঙ্গলবার—

আজ ভোরে মেয়েদের কীর্ত্তন শেষের সঙ্গে সঙ্গে, আরতি করিয়া ও চন্দনে সাজিয়া ছেলের দল কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। মা মেয়েদের নিয়া পুকুরে স্নান করিয়া বাল্যভোগের পর নৌকা করিয়া সকলকে জন্মস্থান দেখাইতে চলিলেন। পথে খালের ধারে ধারে, মুসলমান স্ত্রী-পুরুষেরা মাকে দেখিবার জন্য কত আগ্রহে দাঁড়াইয়া অছে। মা সকলের সঙ্গেই কথাবর্ত্তা বলিতে বলিতে চলিয়াছেন। একজন দেখিয়া আবার দৌড়াইয়া গিয়া আর একজনকে ডাকিয়া আনিতেছে। জন্মস্থানের মুসলমানেরা মার ছোট বেলার কথা বলিয়া সকলকে আনন্দ দিতেছে। মা'ও তাহাদের সঙ্গে কত পুরাতন কথা বলিয়া আনন্দ করিতেছেন।

ভক্তেরা জন্মস্থানে গিয়া লুটাইয়া প্রণাম করিল। তথা হইতে বৈকুণ্ঠ দাস মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার বাড়ী গেলেন। যাইতে যাইতে পথে, "এই পুকুরে জল নিতে আসিতাম, এই গাছের জাম কত খাইয়াছি, এই একটা কাঁচামিঠা আম গাছ," এই সব নানা স্থান ও জিনিষ দেখাইতে দেখাইতে চলিয়াছেন। বৈকুণ্ঠ দাসের বাড়ী গিয়া মহিম দাসের স্ত্রীকে দেখাইয়া বলিতেছেন, "এই মানুষটী আমাকে কার্পেটের কাজ শিখাইয়াছিল।" আরও এক একজনের সঙ্গে এক একটা স্মৃতির কথা বলিয়া তাঁহাদের প্রাণে কত আনন্দ দিতেছেন। সেখানেও অনেকে মার পায় পুষ্পাঞ্জলী দিল।

বৈকুণ্ঠ দাস মহাশয়ের বাড়ী হইতে মা আশ্রমে ফিরিয়াই নৌকার চলিলেন। মাকে বিশ্রাম দেওয়া হইল। দুপুরে ভোগের জন্য খানিক ক্ষণ আশ্রমে নিয়া আসা হইল। মায়ের পূজা ও ভোগ আরতি হওয়ার পর, মা খানিকক্ষণ বসিয়া পরে নৌকায় চলিয়া গেলেন। মা নামে বেশী

সময় দিবার জন্য বলিতেছেন। শ্বাস প্রশ্বাসের ঘর বাড়ী সেকথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

আজ অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় হাজার লোক প্রসাদ পাইল। মা যেখানেই যাইতেছেন সেখানেই খুব লোক সমাগম হইয়া পড়িতেছে। পুনঃ পুনঃ চেষ্টাতেও লোকের ভীড় হইতে মাকে একটুও দূরে রাখা যাইতেছে না। আজ ঝুলন-পূর্ণিমা। অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন চলিল।

১৩ই ভাদ্র, বুধবার—

আজ ভোরে কীর্ত্তনের দল গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়া আশ্রমের নিকট জমা হইয়া উদ্দাম নৃত্যে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। দেশের প্রথানুসারে মঙ্গল কলসী মাথায় নিয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তারপর, একে অন্যের গায়ে জল ঢালিয়া দিয়া আনন্দ করিতেছে। পরে, পঙ্কোৎসব আরম্ভ হইল। মা বলিলেন, "কীর্ত্তনের স্থান, এখানে, এখানকার ধূলায়, গড়াগড়ি দেওয়া ভাল।" অমনি ভক্তের দল ঐ স্থানে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। উদ্দাম নৃত্যের সহিত কীর্ত্তন চলিতেছে। মার ত' সবই একটু বেশী রকম, গড়াগড়ির নমুনা দেখিয়াও সকলে ভয় পাইয়া গেল। যাক, খানিক পর মা উঠিয়াই পুকুরে গিয়া নামিলেন, মা নামিতেই দলে দলে স্ত্রী পুরুষ জলে নামিয়া পড়িল। বহুক্ষণ ভক্তদের সঙ্গে মার স্নানের খেলা চলিল।

আহারাদির পর মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য নৌকায় লইয়া যাওয়া হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আশ্রমে ফিরিলেন। কীর্ত্তন ও আরতির পর রাত্রি প্রায় ১২টায় মার সঙ্গে আমরা সুলতানপুর রওনা হইলাম। নৌকা ছাড়িয়া

১৬

দিয়া মাঠের মাঝে রাখা হইল। জ্যোৎস্না রাত্রি, মার সঙ্গে ঐ স্থান বড়ই মনোরম লাগিতেছিল। শেষরাত্রিতে নৌকা ছাড়িয়া সুলতানপুর চলিলাম। পথে মেহারী হইয়া যাওয়ার কথা।

১৪ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—

আমরা অতি প্রত্যুষে মেহারী পৌঁছিলাম। যাঁহারা মাকে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সঙ্গেই ছিলেন। মাকে তাঁহাদের বাড়ী নিয়া গেলেন। মা খেওড়াতে বলিতেছিলেন, "মেহারী যাইয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া সুলতানপুর রওনা হইলে কেমন হয়?" আমরা দেখিলাম, যাঁহারা মেহারীতে আনিবার জন্য গিয়াছিলেন তাঁহারা ঐ বিষয় কিছু বলিলেন না, তাই আমরা সে বিষয় কিছু না বলিয়া, সুলতানপুর যাইয়া ভোগের ব্যবস্থা হইবে ঠিক হইল। যাঁহারা মেহারী নিয়া গেলেন, তাঁহারা অনুরোধ করিয়া নৌকা তাঁহাদের পুরোহিত বাড়ী—৺মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ী নিয়া গেল; বলিল, তথায় গেলে সকলেই মার দর্শন পাইবে, সেখানে সকলকে খবর দেওয়া হইয়াছে।

তথায় যাওয়া হইল। সেখানে একটি শিবমন্দির আছে, সকলের অনুরোধে মা তথায় চলিলেন। সুন্দর মন্দিরটি। বাড়ীর মালিক বেশ সাধক লোক। তিনি বলিলেন, "মা আমি নিজে যাই নাই, কিন্তু মনে মনে প্রার্থনা জানাইতেছিলাম, তুমি আসিয়াছ, ভোগ গ্রহণ না করিয়া যাইতে পারিবে না।" দেখিলাম, মা রাজী হইলেন। বিশেষতঃ আমরা গতকল্য খেওড়া হইতে রওনা হইবার সময় যে মা বলিয়াছিলেন, "মেহারীতে খাওয়া দাওয়া করিয়া গেলে কেমন হয়"—সেই কথা মনে পড়িল। কত লোক কত অনুরোধ করিয়া সব সময় এ'বিষয় রাজী করাইতে পারেন না,

আর এ'বার কেহ বলে নাই, মা, নিজে হইতেই এই ব্যবস্থা করিতেছেন।

মেহারীতে মায়ের ভোগ ও কীর্ত্তনাদি হইল। মা ঐ বাড়ীতে বেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া খানিকটা বেড়াইলেন। বেলা প্রায় ২॥টায় আমরা মেহারী হইতে রওনা হইলাম। যিনি মাকে রাখিলেন, মা নৌকায় উঠিতেই তিনি ছেলে মানুষের মত এক কোনে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকেই অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল। সন্ধ্যার একটু পরেই সুলতানপুর পৌঁছিলাম।

এ' গ্রামে মার মাতুলালয়। বৃষ্টি হইতেছিল, তার উপর গ্রাম্য পথ। গ্রামবাসীরা মাকে নিতে কীর্ত্তন করিতে করিতে ঘাটে আসিয়াছেন। মার মামাবাড়ীর অবস্থা এখন ভাল নয়। এক সময় ইঁহাদের অবস্থা ভাল ছিল। টিনের একটি ছোট ছাপরা করিয়া রাখিয়াছে। যথাশক্তি সকলের যত্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। খানিকক্ষণ কীর্ত্তন হইল। তারপর পুরাতন লোকেরা একে একে মার নিকট আসিয়া আলাপ আরম্ভ করিলেন; 'আমার কথা মনে আছে ?' জিজ্ঞাসা করিতেই মা হাসিয়া তাঁহার বাড়ীর অন্যান্য সকলের নাম করিয়া তাঁহাদের খবর জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাঁহাদের মহা আনন্দ যে মা এই অবস্থাতেও তাঁহাদের কথা মনে রাখিয়াছেন। কেহ কেহ আবার বলিতেছেন, "ছোটবেলার কথা মনে পড়িতেছে ?"—এই ভাবে কত কথা হইল। রাত্রি অনেক হইয়া গেল দেখিয়া মা'র শুইবার ব্যবস্থা করা হইল।

১৫ই ভাদ্র, শুক্রবার—

আমরা মার মাতুলালয়ে উঠিয়াছি। মাতুল ভ্রাতা নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য

ও শশীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় যথাশক্তি সকলকে আদর অভ্যর্থনাদি করিলেন। গ্রামের সকলেই মার দর্শনে উপস্থিত হইয়াছেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতেও অনেকে আসিয়াছেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাওয়া দাওয়া চলিল; অনেকেই প্রসাদ পাইলেন। তারপর গ্রামবাসীরা অন্যান্য বাড়ীতেও মাকে নিয়া গেলেন। কীর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাস্তা হইতে গ্রামবাসীরা একখানা চৌকিতে মাকে বসাইয়া নিজেরা কাঁধে করিয়া নিয়া চলিল। প্রায় রাত্রি দশটা অবধি এইরূপে আনন্দ-কীর্ত্তন চলিল। রাত্রি প্রায় দুইটায় আমরা কুমিল্লা রওনা হইলাম।

১৬ই ভাদ্র, শনিবার—

কুমিল্লা হইতে ৺মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কর্ম্মচারী রোহিনী-বাবু, শ্রীশবাবু ও পরেশ বাবু মাকে বিশেষ আগ্রহ করিয়া কুমিল্লা আনিয়া ৺মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর মণ্ডপে উঠাইলেন।

১৭ই ভাদ্র, রবিবার—

আজ চারি প্রহর কীর্ত্তন হইল। জটু আরতি করিল। ঢাকা হইতে ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছে। এত লোক সমাগম হইল যে মার শরীর-রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিল। যেখানেই মা বসেন বা দাঁড়ান, মৌমাছির মত দর্শনপিপাসুগণ মাকে ঘিরিয়া ধরেন। অনেক চেষ্টায় মার শরীর-রক্ষা করা হইতে লাগিল। মার চরণ দর্শন করিবার জন্য, লোকেরা যেন মরিয়া হইয়া উঠিল। অনেক কষ্টে সকলকে থামাইয়া রাখার চেষ্টা করা হইতেছে। বিশ্রামের জন্য মাকে নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিংএ নিয়া যাওয়া হইত।

১৮ই ভাদ্র, সোমবার—

নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিংবাসীনীদের আগ্রহে ঢাকার মেয়েরা সেখানে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। মা'ও তথায় উপস্থিত রহিলেন। মেয়েদের স্কুলেও মাকে নিয়া গেল। মেয়েরা মায়ের বন্দনা-গান করিল। পরে স্কুল ছুটি দিয়া মার উপদেশ শুনিবার জন্য শিক্ষকেরা সব মেয়েদের নিয়া আসিলেন। মা, 'সকলেই ভগবানের নাম করিও এবং সংযম-ব্রত করিতে চেষ্টা করিও'—বলিতেছেন। শোভামা মার সঙ্গে দেখা করিতে 'বরকন্তা' হইতে আসিয়াছেন। সকলকে নিয়া আনন্দ চলিতেছে। আজ আমাদের চট্টগ্রাম রওনা হইবার কথা।

সন্ধ্যার পর এত লোক সমাগম হইল যে, লোকের নিশ্বাসেও স্থানটা গরম হইয়া উঠিল। মা আনন্দে সকলের সহিত কথা বলিতেছেন। কিন্তু অবস্থা দেখিয়া কিছু পূর্ব্বেই মাকে নিয়া ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। পথে দুই এক স্থান হইয়া যাওয়া হইল।

একজন হাসিয়া বলিতেছেন, "মা একটু আশীর্ব্বাদ দিন"

মা হাসিয়া বলিতেছেন, "আমাকে নিয়া যাও, যদি পূজার আশীর্ব্বাদী ফুল, বেলপাতা হইতে পারিয়া থাকি তবে নিয়া যাও।" শ্বাসবায়ুর কথায় আবার বলিতেছেন, "শ্বাসের সঙ্গে নামের যোগ রাখিয়া নাম করিয়া যাও; এই অভ্যাসে মনস্থিরের সহায়তা করিবে। তা'ছাড়া আমাদের যে প্রাণবায়ু তাহাই ত বিশ্ব জুড়িয়া আছে। সেই মহান ভাবের ভিতর একবার পড়িতে পারিলে শেষে সেই স্রোতেই তাঁহার দিকে নিয়া যাইবে। একবার ফেলিতে পারিলে হয়।" এই ভাবের কত কথাই বলিতেছেন।

১৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবার—

আজ সকালবেলা চট্টগ্রাম পৌছিয়া রাজেশ্বরের বাড়ীতে আসা হইল। যখন কুমিল্লাতে বহুলোক একত্র হইয়া মাকে বলিতেছে, "মা এত লোক সব তোমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।" মা অমনি বলিতেছেন, "তোমরা এত দূরে রাখ কেন? আমি ত' বলি দর্শন দিতে আসিয়াছ। তা'ছাড়া, আমরা ত সকলেই একই বাড়ীর, তাই এই শরীরটাকে তোমরা একটু স্নেহ কর, তাই সকলে আসিয়াছ এই মেয়েটাকে দেখিতে।" মা এমন ভাবে এই কথা কয়টী বলিলেন যাহাতে সকলের প্রাণ গলিয়া গেল।

২০শে ভাদ্র, বুধবার—

চট্টগ্রামে আনন্দ উৎসব চলিতেছে। সন্ধ্যাবেলায় কীর্ত্তনাদি হয়, লোকসমাগম তখনই খুব বেশী হয়। মধ্যে মধ্যে কেহ প্রশ্ন করিলে অনেক অমূল্য বাণীও বাহির হয়। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে মা বলেন, "বেশ ত, তোমরা যদি বাজাইতে পার তবে, তোমারাও শুনিবে আমিও শুনিব।"

২১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার——

আজ সন্ধ্যাবেলায় মাকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ঘোষাল, দিগেন্দ্র ঘোষাল মহাশয়দের বাসায় নিয়া গেলেন। তথায় কীর্ত্তনাদি হইল। মাকে জল খাওয়াইতে আনিয়াছে। এর মধ্যে মা সকলের অজ্ঞাতসারে থালা হইতে আমসত্ব উঠাইয়া চাদরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। পরে যখন খাওয়াইতে বসিয়া খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হইল, মা আমাকে বলিলেন, 'চাদরটা ঐ মার (সুরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী) কোলে দে।" তিনি ত রহস্য কিছুই জানেন না। তিনি

কোলে নিয়া বসিয়া রহিলেন। মা বলিলেন, "বেশ সকলে উঠিয়া কাপড় ঝাড়" এই বলিয়া হাসিয়া মা নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সুরেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর কোল হইতে আমসত্ত্ব বাহির হওয়ায় মা হাসিয়া উঠিলেন। এই নিয়া অনেকক্ষণ রহস্য চলিল। মায়ের কৌতুক দেখিয়া সকলে আনন্দ করিতে লাগিল। মা হাসিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা কি নিয়া আছ? সাধু সন্ন্যাসীরা বেশ গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকে, কত উপদেশ দেয়, আর এই মেয়েটা আছে, শুধু খায়-দায়, ঘুমায়। তোমরা কি দেখিয়া ভুলিয়া আছ। তবে মেয়েটাকে স্নেহ করা বাপ মার স্বভাব।"

২২শে ভাদ্র, শুক্রবার—

আজও ২।১ বাসায় মাকে নিয়া যাওয়া হইল এবং কীর্ত্তন হইল।

২৩শে ভাদ্র, শনিবার—

কক্সবাজার যাওয়ার জন্য কাল রাত্রি ১২টা অবধি সব গুছাইয়াছিলাম। মা বলিতেছেন. "তোমরা যাহা হয় স্থির কর" তারপর কক্সবাজার যাওয়া হইল না। বিদ্যাকূট নিবার জন্য লোক আসিয়া বসিয়াছিল। মা আজ বিদ্যাকুট চলিলেন। সন্ধ্যায় আমরা বিদ্যাকূট পৌছিলাম। অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা সকলের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। কাহাকেও হয়ত পূর্ব্বকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অনেকে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছে ও বলিতেছে, 'ও মা, সব মনে আছে!' গ্রামের কালী বড় জাগ্রত দেবতা। অনেকেই বলিতেছে, "নির্ম্মলা ত এখন মানুষ কালী হইয়াছে।" মা হাসিয়া বলিতেছেন, "ও মা, কালী কেমন করিয়া হইলাম। রংটা কালো হইলেও কথা ছিল? কি বল?" দিদি, পিসি

দাদা,কাকা সব আসিয়া ঘিরিয়া বসিল। রাত্রি অনেক হইয়া গেল। অনেক বলিয়া কহিয়া সকলকে উঠাইয়া দেওয়া হইল। রাত্রি প্রায় ১২টায় মাকে বিশ্রাম দেওয়া হইল।

২৪শে ভাদ্র, রবিবার—

মা সকালে উঠিয়া উঠানে গাছ তলায় একখানা চৌকীতে বসিয়াছেন। ৺ বিহারী ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে মার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এক বৃদ্ধা পিসি আসিয়া বলিতেছেন, "আমাকে চিন কি ?" মা হাসিয়া চিনিয়াছেন বলিলেন। পিসি বলিলেন, "মা, আমার গর্ভধারিণী মারা গিয়াছে।" মা হাসিয়া বলিলেন, "বাঃ! যাইবে না, গাছের ফল পাকিলেই পড়িয়া যায়।"

মাকে চৌকীতে বসিতে বলায় মা বলিতেছেন, "কেন ? আমি মাটীতে বসিতে পারি না বুঝি ? এই না বলিলে—আমাদের 'নিম্মলা', তবে এত দূরে রাখ কেন ? দাদাদের কোলে, পিসিমার কোলে বসিতে পারিব না বুঝি ?" এক বৃদ্ধ বলিলেন; "না তুমি উপরে বস, আমরা সকলে দেখিতে পারিব। আর দেখ, তুমি 'মা', এ'কথা ত আমরা বলিতে পারি না, এখনও বলি, তুমি নাতিন।" আর একজন বলিলেন, "যে যা' বলেন তাতেই রাজী।" মা হাসিয়া বলিলেন, "যে যা' বলিয়া আনন্দ পায় তাই বলিতে পারে, কিছুই আপত্তি নাই।" কেহ তুই বলিতেছে, আবার আমরা কি মনে করি ভাবিয়া বলিতেছে, "আমরা এই রকমই বলি। আমাদের জিনিষ তোমরা নিয়া গিয়াছ।" আমরা হাসিয়া বলিলাম, "বেশ ত, আপনারা যাহা বলেন তাহাই বলিবেন। আমাদের তাতেই আনন্দ।" মেয়েরা সঙ্গে আসিয়াছে, কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

২৬শে ভাদ্র, সোমবার—

মাকে বাড়ী বাড়ী নিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক। চওড়া লালপেড়ে সাড়ী পরাইয়া দিয়াছে। সিন্দুরে সিন্দুরে মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে লোকেরা দোটানাতে পড়িয়াছে। পূর্ব্বের সম্বন্ধটা একেবারে ভুলিয়া, মা বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। আবার পূর্ব্বের সম্বন্ধ নিয়াও তৃপ্তি হইতেছে না। মা'ও দাদাদের কখনও 'বাবা' কখনও 'দাদা' বলিয়া বলিতেছেন। এই নিয়াও এক মহা আনন্দ চলিতেছে। মা বলিতেছেন, "তোমরা চাও পূর্ব্বের সম্বন্ধ, তাই কখনও কখনও সম্পর্কানুযায়ী ডাকটা বাহির হইতেছে।"

তাঁহারা বলিতেছেন, "তোমার কাছে ত দাদাও বাবা হইয়া গিয়াছে। আমরা যে পারি না।" তবে ইহাও লক্ষ্য করিতেছি গত দুই দিন হইতে আজ অনেক পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বের সম্পর্কটা আঁকড়াইয়া তাঁহারা রাখিতে পারিতেছেন না, মার ভাবে ভাবিত হইয়া উঠিতেছেন। মার মুখ হইতেও তখন নানাকথা বাহির হইতেছে।"

এ' দুই দিন কিন্তু তা' ছিল না। গ্রামের লোকেরাও যেমন মাকে নিজেদের আত্মীয় মনে করিতেছিল, মা'ও পূর্ব্বকথা বলিয়া তাঁহাদের ভাব রক্ষা করিতেছিলেন। আজ তাহাদের ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মারও ধর্ম্মভাবের নানাকথা বাহির হইতেছে। প্রত্যেকেই মাকে নিজের নিজের বাড়ী নিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে। এই ভাবে আনন্দ-লীলা চলিতেছে। আজ ডাক্তার হেমবাবুর বাড়ীতে মার ভোগ হইল। ইনি একখানা ৺কালী-মন্দির করিয়াছেন। সেই মন্দিরে নিয়া মাকে বসাইলেন। ইঁহার স্ত্রী, সাধন ভজন করেন, অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ

রাত্রিতেই এখানে কীর্ত্তন হইবার কথা হইয়াছে। কীর্ত্তনাদির পর মার শুইতে শুইতে প্রায় রাত্রি ২॥টা বাজিয়া গেল।

২৬শে ভাদ্র, মঙ্গলবার—

আজ প্রাতেই মাকে 'মেরকুটী' গ্রামে নিয়া গেল। সেখানে বাড়ী বাড়ী পত্র, পুষ্প, চন্দন ও বস্ত্রাদি দ্বারা মায়ের পূজা করিল। হুলুধ্বনি ও কীর্ত্তনের ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত। গয়ালবাড়ীও মাকে নিয়া গেল। সেখানে স্ত্রীলোকেরা মাকে দুধ খাওয়াইয়া দিল। মা হাসিয়া বলিলেন, "মাগো, গোপাল একদিন গোয়ালার ঘরে এইভাবেই খাইয়াছিলেন, আজ আমার সৌভাগ্য আমিও সেই রকম খাইয়া গেলাম।" গরীব, ধনী, যে ডাকিয়া নিয়া যাইতেছে, মা সেখানেই যাইতেছেন। আবার কাহারও কাহারও নিজের বাড়ীর সীমানার বিশেষ সংস্কার দেখিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "এই গণ্ডীবদ্ধ ভাবেই ত সব গণ্ডগোল। বদ্ধজলেই গন্ধ হয়—আর ত কিছুই না। জীব ত তাই—বদ্ধজলে গন্ধ হইয়াছে।"

নানাভাবে আনন্দ করিয়া বৈকালে প্রায় ৫টায় মা সঙ্গের সকলকে নিয়া রওনা হইলেন। গ্রামবাসীরা চোখের জলে মাকে বিদায় দিলেন। যতক্ষণ নৌকা দেখা গেল সকলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। আমরা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আসিয়া ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইলাম।

২৭শে ভাদ্র, বুধবার—

ভোরে আমরা ঢাকা রওনা হইলাম। বেলা প্রায় ৯॥টায় আমরা ঢাকা পৌঁছিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে মাকে পাইয়া সকলেরই মহা

আনন্দ। কথা হইল, আগামীকল্যই আবার কলিকাতা রওনা হইয়া যাইবেন।

২৮শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—

আজ আমরা কলিকাতা রওনা হইলাম। আশ্রম সম্বন্ধে একটা ভয়ানক গোলমাল চলিতেছিল। আজ সেই গণ্ডগোল বাড়িয়া উঠিল। মা বলিলেন, "তোমরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া যাহা হয় কর।" কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয়, রওনা হইবার সময় মা ২।৪টী কথা উঠাইলেন, তাহাতে সাময়িক ভাবে গোলমাল মিটিয়া গেল। যে বিষয় মা ধরিলেন তাহা জাগতিক ব্যাপার হইলেও আর কাহারও মাথায় আসে নাই। যখন মা ধরাইয়া দিলেন, তখন সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। অথচ প্রথমে মা এ বিষয়ে একেবারে চুপ। সকলের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, কিছুই বলেন নাই। যখন গোলমাল শেষ সীমানায় গড়াইয়া গেল, তখন মা ঐ কথা কয়টি বলিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "মা বেশ আছ, এতক্ষণ এত গণ্ডগোল আমরা করিতেছি, তুমি বেশ শান্তভাবে দেখিয়া যাইতেছিলে। প্রথমে এই কথাগুলি বলিলেই ত হইত—তবে ত' এত গণ্ডগোল হইত না। তুমি যখন দেখ, সন্তান আর পারে না, তখন একটু ঠেলিয়া দাও, আবার চলিতে থাকে।" মা হাসিয়া বলিলেন, "খেয়ালে আসিতেছিল না, কি করি? যখন যা হইবার তখনই ত' হইবে।"

ষ্টীমারেও অনেকে মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। একটী ভদ্রলোক আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, "আমি জেলে কাজ করি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমরা যে জেলের কয়েদীদের উপর অত্যাচার করি তাহাতে কি আমাদের পাপ হয়?"

মা বলিলেন, "তোমায় যখন ঐ কাজে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে তখন যতটুকু 'ডিউটী' পূরণ করিয়া যাও, বেশী করিতে যাইও না। যদি ডিউটীর উপরও অত্যাচার হিসাবে কিছু কর, পাপ হয় বৈকি? এই হইল এক দিকের কথা। আবার কথা হইল, যাহাদের সঙ্গ করিতেছ তাহাদের ভাব তোমার মধ্যে কিছু কিছু সংক্রামিত হইবেই। ইহা হইল সঙ্গগুণ। আবার প্রত্যেক কর্ম্মেরই আলাদা আলাদা ফল থাকিয়া যায় জানিও। এই জন্য প্রত্যহ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও।"

কি কথা উঠিয়াছে, 'জানা যায় না'; মা আপনমনেই বলিতেছেন, "অবোধ্য"। তারপর, আমার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, 'দেখ, জানা যদি হয়, তবে ত তৎ-স্বরূপই হইয়া যায়। আর যাহাকে জানা যায়, সে ত সীমার মধ্যে। সেই জন্যই বলা হয় "অবোধ্য।"

আমার মনে হইল, অনেকেই বলেন, "মা কে, কিছুই ধরিতে পারিলাম না।" সত্যিই ত, যদি সম্পূর্ণভাবে ধরিতেই পারিতাম তবে ত আমরা তাহাই হইয়া যাইতাম। আর, অসীমকে ধরার উপায়ই বা কি?

২৯শে ভাদ্র, শুক্রবার—

আজ প্রাতে কলিকাতা পৌছিলাম। মা এবার সিদ্ধবাবার আশ্রমে উঠিলেন। রাত্রির গাড়ীতেই আমরা মার সঙ্গে জামসেদপুর রওনা হইলাম। মোটরে অভয় মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা আপনি যে নিজেকে ছিন্নমস্তার মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, দুইটা যোগিনী দুইধারে দেখিয়াছিলেন, তাহা কি আপনার এই শরীর হইতে ভিন্ন দেখিয়াছিলেন?" মা বলিলেন, "হ্যাঁ।"

কথাটা হইল, মা বিন্ধ্যাকূটে এক বাড়ীতে গিয়া তাহাদের পূজার

ঘরে বসিয়াছেন। সেই ঘরে একটী ছিন্নমস্তার ছবি ছিল। তাহা দেখিয়া মা বলিতে লাগিলেন, "ঠিক এই রকমই এই শরীরটার ভিতর হইয়া গিয়াছে। বাহিরের দৃষ্টিতে যদিও মাথাটা কাটা নয়, কিন্তু ভাবটা এবং দেখা হইতেছে প্রত্যক্ষ মাথা কাটা—ঠিক এই রকম হাতে মাথা, রক্তের শিরাগুলি ঠিক এই রকম। যেমন ব্লাডপ্রেসার হইলে হয়—সেই রকম সজোরে যেন রক্তের ধারা উঠিতেছে। আর এই রকম দু'ধারে দুইজন অর্থাৎ নিজেই যেন এই রকম ভাবে আবার রক্তপান করা হইতেছে। ঐ ভাবে ভাবান্বিত কেহ থাকিলে ঐ মূর্ত্তি পরিষ্কার দেখিতে পায়।" আমি বলিলাম, "প্রমথ বাবু সেই দিনই দেখিয়াছিলেন বুঝি?" মা বলিলেন, "হ্যাঁ, আরও হইয়াছিল।" আমি বলিলাম, "তাহার চাপরাশী দশমূর্ত্তি দেখিয়াছিল।" মা তাহাও সমর্থন করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, কি কি সব অনেক রকম হইয়াছিল।" অভয় বলিল, "চাপরাশীটার সংস্কার ভাল ছিল বুঝি?" মা মাথা নাড়িয়া সমর্থন করিলেন। বলিলেন, "**এক একটা মূর্ত্তিরই কিন্তু অনন্ত রকম জানিও।**" আজও মোটরে এই সব কথারই কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি করিলেন। এই ভাবের কথা বলিতে বলিতে মা যেন একটু চটপটে হইয়া উঠিলেন।

অনেক দিন যাবতই মার ভাবটা ও শরীরটা কেমন যেন চুপ হইয়া আসিতেছে বলিতেছেন। কিছুদিন মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল, "বন্ কর"। এখন ঐ শব্দটা বিশেষ বাহির হয় না। নিজেও বলেন, কেমন যেন, শরীরটা চুপ হইয়া যাইতেছে। কথাবার্ত্তা, চলাফেরা হইতেছে, হঠাৎ এর মধ্যেই শরীর যেন একেবারে চুপ হইয়া যাইতেছে। বাহিরেও এখন এই ভাবটা লক্ষ্য করিতেছি। খাওয়া-দাওয়া কেমন যেন হইয়া যাইতেছে। খাওয়ার ভাবই নাই। জোর করিয়া যেন খাওয়া-

দাওয়া, কথাবার্ত্তা, চলিতেছে। কি হইবে মা'ই জানেন। আমাদের খুবই চিন্তা হইতেছে।

৩০শে ভাদ্র, শনিবার—

আজ ভোরবেলা আমরা জামসেদপুর আসিয়া পৌঁছিলাম। ভক্তেরা অনেকেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মাকে প্রথমে কালীবাড়ী পরে একটা নূতন বাড়ীতে আনা হইল। ভক্তেরা মাকে এতদিন পরে পাইয়া কত আনন্দিত হইয়াছেন। মার সঙ্গে কলিকাতা হইতে অনেকে আসিয়াছেন। এখানকার ভক্তরা সকলেরই বিশেষ ভাবে যত্ন করিতেছেন। মার সেবার জন্য তাঁহারা অতি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। সঙ্গীয় লোকদেরও সেবা যত্নের এতটুকু ত্রুটী নাই, বেশ সুন্দর ভাব।

৩১শে ভাদ্র, রবিবার—

আজ উদয়াস্ত কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। নাম হইতেছে—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥' বৈকালে মাকে মাঠের মধ্যে নিয়া যাওয়া হইল। তারপর মোটরে একটু ঘুরাইয়া আনা হইল। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন বন্ধ করা হইল। কিন্তু আবার সকলে কীর্ত্তন করিতে বসিয়া গেলেন। কীর্ত্তনের নেশা যেন কাহারও কাটিতেছে না।

কীর্ত্তনের পর মাকে খোলা যায়গায় সামিয়ানার নীচে নিয়া বসানো হইল, সকলে মার কথা শুনিবেন এই আকাঙ্ক্ষা। প্রায় ৩ ঘণ্টা কথা হইল। মা সংযম-ব্রতের কথা এবং আরও অনেক কথা ভক্তদের বলিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টায় বিশ্রাম করিবার জন্য মাকে নিয়া আসা হইল।

১লা আশ্বিন, সোমবার—

আজ রাত্রিতেই আমাদের কলিকাতা রওনা হইবার কথা। ভক্তেরা অনেক আপত্তি করিলেন। শেষে মার কথায় রাজী হইলেন। যিনি বলিতেছেন, "আবার কবে দর্শন দিবে?" মা অমনি বলিতেছেন, "বাবা মা, এই মেয়েটাকে যখন আনিবে, তখনই আসিবে। যদি না আসা হয় তবেই বুঝিব, বাপ মা এই মেয়েটাকে আনিল না।" এই ভাবের নানা কথা হইতেছে। ডাক্তার যতীন বাবুর স্ত্রীত কাল হইতেই কান্না আরম্ভ করিয়াছেন। চোখে জল ভরিয়া আসে আবার সকলের চোখ এড়াইবার জন্য মুছিয়া ফেলিয়া মার সেবাকার্য্যে লাগিয়া যান। ভক্তদের সকলের প্রাণেই ব্যথা। মা আসিয়াছিলেন, কতদিন পর! কত আশা করিয়া এতদিন সকলে বসিয়াছিলেন—আবার কতদিন পরে মার শ্রীচরণ দর্শন পাইবেন কে জানে!

তবুও তাঁহারা মার কাছেই বসিয়া নাই। মার সঙ্গীয় সকলের সেবায় তৎপর। বৈকালে তাহারা মাকে নিয়া এক ঘরে বসিলেন। আশা, মার উপদেশ কিছু হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবেন। এই ত তাঁহাদের সম্বল। সকলেই প্রায় চাকুরীতে আবদ্ধ। ছুটী বড় পান না, তাই অন্যত্র যাইয়া মার সঙ্গ করা তাঁহাদের ভাগ্যে হইয়া উঠে না। তাই মা আসিলেই ইঁহারা চান প্রাণটা ভরিয়া লইতে, যেন মার শরীরের সঙ্গ না পাইলেও ভাবের দিক দিয়া মার সঙ্গ না হারান। মা'ও উঠিয়া, বসিয়া, নানা কথা বলিয়া ইঁহাদের প্রাণে আনন্দ দিতে লাগিলেন। সংযম-ব্রতের কথা বলিলেন, "আজ কাল এই কথা অনেক স্থানে তোমরাই বলাইয়া লইতেছ। তোমরা যত্নের সহিত এই ব্রতটা করিতে চেষ্টা করিও।

তাহাতে কি হইবে ? না, 'চিত্ত-দর্পণ' বলে না ; সেই দর্পণ পরিষ্কার হইবে। দর্পণ পরিষ্কার না হইলে তাহাতে নিজের স্বরূপ দেখিবে কি করিয়া ? আবার বলা হয়, শ্বাসে শ্বাসে নাম করা।" একজন বলিলেন, "মা, শ্বাসে শ্বাসে কি ভাবে নাম করিব। ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।" মা বলিতেছেন, "কখনও কখনও প্রতি শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্বাসের তালে তালে নাম করা। একবার ফেলিতে, একবার টানিতে হয়ত কাহারও কাহারও আবার মাথা গরম হইয়া যায়। বেশীক্ষণ এই ভাবে নাম করিতে পারে না। তার কারণ কি জান ? ব্রহ্মচর্য্যাদির অভাব। ঐ একটা আশ্রম নষ্ট হওয়াতেই বাকীগুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহাদের মাথা গরম বোধ হইবে তাহারা ঐ ভাবে নাম করিবে না। তাহার শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গা ছাড়িয়া বসিয়া নাম ভিতরে রাখিবে। শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে করিবার দরকার নাই। সকলে সবটা সহ্য করিতে পারে না। এইভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলেও কাজ হইবে।''

"আবার দেখ, এই যে বলা হয় মন, মন্ত্র, শ্বাস এক করিয়া লও। এই শ্বাসবায়ু যে আমি নিতেছি, খেয়াল করিয়া দেখিলেই দেখিতে পারিবে এই শ্বাস বায়ুর সঙ্গেই সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ আছে। সকলেই ত আমরা একস্থান হইতেই শ্বাস বায়ু নিতেছি ফেলিতেছি। সেই হিসাবে সকলের সঙ্গেই সকলের কিন্তু যোগাযোগ আছে। সাধু মহাত্মা যাহাই বল, সকলের সহিতই সকলে প্রাণবায়ুরূপে যুক্ত। এই চিন্তায়ও একটা মহান্ ভাব জাগে। এই যে শ্বাস ইহা মহান্ ভাবের মধ্যে তরঙ্গ মাত্র। আমাদের লক্ষ্য হইল তরঙ্গ ছাড়াইয়া নিস্তরঙ্গে যাওয়া। তরঙ্গও

জলই। সেই নিস্তরঙ্গে যাইতে হইলে প্রথমে এই পথ। তরঙ্গের ভিতর দিয়াই রাস্তা করিতে হইবে। যেমন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ তার মধ্যেই ডুব দিয়া উঠা। তোমাদের যতটুকু শক্তি, করিয়া যাও। তারপর তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হয় না এ'ত অতি সত্য কথা।"

কথাবার্ত্তার পর মাকে একটু বেড়াইতে নিয়া যাওয়া হইল। মায়ের চরণ-স্পর্শে বাড়ী পবিত্র হইবে, এই ভাবের আবেগে অনেকেই মাকে বাড়ীর উঠানে, ঠাকুরের মন্দিরে নিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলে কীর্ত্তনাদি হইল। যথাসময়ে মাকে নিয়া সকলে ষ্টেশনে চলিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় গাড়ী ছাড়িলে সকলে ব্যথিত প্রাণে বাড়ী ফিরিলেন।

২রা আশ্বিন, মঙ্গলবার—

আজ প্রাতে আমরা কলিকাতা পৌছিতেই ভক্তবৃন্দ মাকে বিরলা মন্দিরে নিয়া গেলেন। আজই মা দেরাদুন রওনা হইয়া যাইবেন স্থির হইয়াছে। ভক্তেরা ইহাতে বড়ই দুঃখিত, কিন্তু মার যাওয়া স্থির। রাত্রি ১০টায় মার সঙ্গে দেরাদুন চলিলাম। মা স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে কিছুদিন ঢাকা আশ্রমে থাকিতে আদেশ দিয়া আসিলেন।

৩রা আশ্বিন, বুধবার—

বেলা প্রায় ২॥টার সময় কাশীতে নামিলাম। মা হরির ধর্ম্মশালায় উঠিলেন। পরে, ধীরে ধীরে খবর পাইয়া একে একে অনেকেই আসিতে লাগিলেন। আগামী কল্যই মা দেরাদুনের গাড়ী ধরিবেন জানিয়া সকলেই বিমর্ষ হইলেন। তবুও মাকে যতটুকু পাইলেন ইহাতেই সকলের অসীম আনন্দ।

৪ঠা আশ্বিন বৃহস্পতিবার—

বেলা ১০॥টায় মার সঙ্গে আমরা রওনা হইলাম। রাত্রিতে সেকেণ্ড-ক্লাসে মার সঙ্গে বসিয়া আছি। নানা কথা উঠিয়াছে। দুর্ব্বাসামুনি ভোজন করিয়াও বলিয়াছেন, ভোজন করি নাই। এ'কথায় একজন বলিয়াছিল, 'মুনি কেন মিথ্যা বলিলেন ?'

মা সেই কথার সূত্রে বলিতেছেন, "মিথ্যা ত নয়। তাহাদের যে অবস্থা তাহাতে কে কি খাইবে ? নিজের মুখের থুথু অনবরত খাওয়া হইতেছে, কিন্তু তাহাতে খাইয়াছি বলিয়া কেহ ত' বলে না। তোদের খাওয়া শোওয়ার মত হিসাব ত তাঁহাদের নয়। তাই তাঁহাদের ভাবার বিচার তোরা করিতে পারিস্ না। সত্যই অনেক সময় তোরা যাহা দেখিস্, তাহা দেখিয়া তাঁহাদের বিচার করা চলে না।"

আবার কথা হইল, শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তির প্রকাশ হইয়াছিল। তাঁহার সন্তান হইয়াছিল। এ'কথায়ও মা পূর্ব্ববৎ জবাব দিলেন, "কে কাকে ভোগ করে, নিজেই যদি সর্ব্বময়, তোদের মত দুই হইলে ত ভোগ হইবে। নিজেতেই নিজে যদি বলা হয়। এই যে দ্রষ্টা বলা হয়—কে কাকে দেখিবে আর কি'ই বা দেখিবে ? যতক্ষণ দৃষ্টি ততক্ষণ সৃষ্টি। দুই থাকিলে তবে ত দ্রষ্টা।"

এই সব কথার পর কথায় কথায় মা হাসিয়া বলিতেছেন, "কেহ কেহ বলে, এই শরীরটার কথা—মা, মা বলিতে বলিতে, ভগবান ভগবান করিতে করিতে, অবতার অবতার বলিতে বলিতে মাথায় তুলিতে তুলিতে ইহার মাথাটা খারাপ করিয়া দিয়াছে।" এই বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া কুটিপাটি। আবার বলিতেছেন, "সত্যই ত আমার মাথা খারাপ। কারণ, যে যাহাই বলে আমি তাহাই।" মার এই ভাবটা

অতি সুন্দর। সর্ব্বদাই ভাবে ভাষায় মার এই ভাবটা প্রকাশ পায়, "যে যাহা বলে তাহার কাছে আমি তাহাই।"

কাশীতে কৃষ্ণা মা, (মৌনী মা বা মনোরমা দত্ত) মার সঙ্গে দেখা করিয়া অনেকক্ষণ নিভৃতে নিজ সাধনার বিষয় বলিয়াছেন। ইঁহার বেশ উন্নত অবস্থা। এখন কাশীতে সিদ্ধিমার নিকট আছেন। সেখানে উনি বেশ কৃপা পাইতেছেন। এই কৃষ্ণমা বলিয়াছেন, "মা আবার কবে দর্শন দিবেন?" মা সেই কথার উত্তরে শশাঙ্ক ব্রহ্মচারীকে রওনা হইবার সময় বলিতেছেন, "কৃষ্ণমাকে বলিও যে, **যখন যে দর্শন** পায় (ইহার অনেক রকম দর্শনাদি হয়) **সবই এই**"—বলিয়া নিজের **বক্ষস্থল দেখাইয়া দিতেছেন।** আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি এই কথা সকলকে বলিয়া দিব।" মা'ও হাসিয়া বলিলেন, "দে, আমি কি করিব? আমার মুখ দিয়া যাহা বাহির হইয়া যায়, আমি কি করিব?" বলিয়া ছেলে মানুষের মত হাসিতে লাগিলেন।

৫ই আশ্বিন, শুক্রবার—

আজ প্রাতে দেরাদুন পৌঁছিলাম। দুপুরে মা শুইয়া আছেন। অনেকক্ষণ পর চোখ বুজিয়াই এই কয়টি শব্দ করিলেন।

১। পদ্মাবতী বুদ্ধি,

২। বিরোগানন্দ,

৩। বীরগতিয়ানন্দ;

৪। বিরজানন্দ।

আরও ২।১টি কি বাহির হইয়াছিল, ধরা যায় নাই। আমরা এই

কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিলাম। আর বলিলাম, "কেহ আসিয়াছিল বুঝি? তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেছিলে?"

মা চোখ বুজিয়াই বলিলেন, "হাঁ। একজনকে বলিতেছিলাম এ'টা হইল পদ্মাবতীবুদ্ধি। ঐ যে পদ্মা ছিল না। তা'র এই রকম বুদ্ধি ছিল। আর এ'টা হইল বিরোগানন্দ, মানে রোগ শূন্য আনন্দ। রোগ শূন্য মানে ভব রোগ মুক্ত। গতিয়ানন্দ মানে, বীর গতির আনন্দ আর কি; বিরজানন্দ মানে রজঃশূন্য আর কি?" আমি বলিলাম, "কাহার সঙ্গে কথা হইতেছিল। মা বলিলেন, "বলিব না।" চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মার শরীরটা, ভাবটা, কেমন চুপচাপ হইয়া যাইতেছে বলিতেছেন। কথাও সেইজন্য অনেক সময় জড়াইয়া যাইতেছে, অনেক সময় জিহ্বায় দাঁত লাগিয়া যায়। বৈকালে উঠিয়া মা হাঁটিতে লাগিলেন। মা রাত্রিতে মৌন-মন্দিরে শয়ন করিলেন।

৬ই আশ্বিন, শনিবার—

আজ দুপুরে আমি মাকে শোয়াইয়া দিয়াছি। কয়েক দিন যাবতই মাকে খাওয়াইয়া দিবার সময় আমরা মৌন ভাবে থাকি। আজও তাই আছি, হঠাৎ মা আমার দিকে চাহিয়া "নির্ব্বাক" এই শব্দ করিয়া খানিক পরেই বলিলেন, "আমিও মৌন হইয়া যাই," এই বলিয়া চুপ করিলেন। উপস্থিত সকলেই ভয় পাইয়া গেলাম। কারণ মার মৌন ত সাধারণ নয়, কি কারণ, কে জানে। মুখ ধুইবার সময় আমি ও বুনি মাকে অনুনয় করিতে মা সামান্য কি একটা শব্দ করিলেন। আমরা আশান্বিত হইলাম যে, মা মৌন হন নাই। বারান্দায় আসিয়া আবার চুপ। মুখের চেহারা ও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চোখ বুজিয়া

খানিকক্ষণ রহিলেন। আমরা আবার ভাল করিয়া কথা বলিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলাম। মা হাসিতে লাগিলেন। ২।১টী কথাও বলিলেন ; কিন্তু হাসি বা কথার ভঙ্গি, ও মার মুখের চেহারা দেখিয়া আমরা আরও ভীত হইলাম। বুনি কাঁদিতেই আরম্ভ করিল। ভয়, মা বুঝি মৌন হইবেন। কিছু পরে কথা বলিলেন, "শুইতে যাই ?" আমি ঐ ভাবটা ভাঙ্গিবার জন্য বলিলাম, "বেড়াইতে যাইবে ?"

মা ঐ ভাবেই বলিলেন, "কোথায় ?" আমি দেখিলাম, যাইবার কোন ব্যবস্থা নাই, তা'ছাড়া মার শরীর যেন ছাড়া। আবার "শুইতে যাই" বলিতেই আমি ঘরে নিয়া গেলাম। একটু হাঁটিতে বলিলাম। মা ঘরের মধ্যেই হাঁটিতে লাগিলেন। কথা বলিতেছেন না। হাসির ভঙ্গিটুকুও যেন কেমন, দৃষ্টিও অন্য রকম। মার এই দৃষ্টি ও ভাবটাকেই আমি ভয় করি। মুখে হাসিলেও, ভাবটা যেন কাহাকেও চিনেন না। যদি এখন মরিয়াও যাই মা'র যেন তাহা ভ্রূক্ষেপই হইবে না। কতকটা এই ভাব। কিছু পর এমন গাঝাড়া দিয়া দাঁড়াইলেন যে আমার দেখিয়া ভয় হইল বুঝি বা পড়িয়া যাইবেন। তা'ই আমি গিয়া ধরিয়া বিছানায় নিয়া আসিলাম। মা যেন কতকটা আবেশ জড়িত ভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া বলিলেন, "এখন শুই ?"—এই বলিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। আমি ও অভয় অনেক ডাকাডাকি করিলাম। কিন্তু মা উত্তর দিতেই পারিতেছেন না। যেন কোথায় কি ভাবে ডুবিয়া আছেন। ঘণ্টা খানেক পরে মার ভাবের একটু পরিবর্তন দেখা গেল। কিন্তু চোখ বুজিয়াই শুইয়া রহিলেন।

বেলা প্রায় ৫টায় মা উঠিয়া বসিলেন। অনেকে আসিয়াছেন, কথাবার্ত্তা হইতেছে। কৌতুকও করিতেছেন। তবুও আবিষ্ট ভাবটা

অনেকক্ষণ স্থায়ী হইল। সন্ধ্যায় এক ভদ্রলোক বেড়াইতে বেড়াইতে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। ভাল লাগিয়াছে, তাই ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া খবরাখবর নিলেন। মা'র সঙ্গেও দেখা করিলেন। পরে জানিলাম, ইনি একজন ডাক্তার। মা'কে আর কখনও দেখেন নাই। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গে আর কে আছে? কোথায় থাক?" তিনি বলিলেন, "দেরাদুনে আছি। আমার সঙ্গে আর কেহ নাই।"

মা বলিলেন, "একেবারে একা?" তিনি বলিলেন "হাঁ।" মা বলিলেন, "কাহারও সাহায্য নেও নাই?" তিনি বলিলেন, "না।" হিন্দিতেই কথাবার্ত্তা হইতেছে। মা বলিলেন, "আমি ত দেখিতেছি সাহায্য নিয়াছ এবং তুমি একাও নও।" তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "হ্যাঁ মা, সেও ঠিক কথা, তাঁর সাহায্য ছাড়া আমরা চলি কি করিয়া? আর তিনি ত সঙ্গে সঙ্গেই আছেন।" কথায় কথায় মা বলিলেন, **"এই জাগতিক ব্যাপারেই আমরা সাহায্য ছাড়া পারিনা, গুরু ছাড়া চলেনা, আর ঐ পথ ত কঠিন পথ, ঐ পথে ত গুরু চাই-ই।"** ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আমি এ'কথা বুঝিলাম না। ছেলের মাকে পাওয়া, এ'বিষয় আর কঠিন কি?" মা বলিলেন, "পিতাজীর কথা খুব ঠিক, কিন্তু কথা হইল মাকে পাওয়া চাই এবং আমি ছেলে এ' বিশ্বাস দৃঢ় থাকা চাই। তাহা যে সকলের নাই। তাই তাহারা কঠিন বলিয়া মনে করে। আমি তাহাদের কথাই বলিতেছি।" কথায় কথায় দেখা গেল ভদ্রলোকটির ঐদিকে বেশ বিশ্বাস আছে। নিজের জীবনের ঘটনা ২।১টী বলিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ভগবান তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। মা হাসিয়া বলিলেন "এই

জন্যই ত প্রথমেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "সঙ্গে কে আছে ?" তিনি বলিলেন, "আমি বুঝিতে পারি নাই। আমি মনে করিয়াছি স্ত্রী পুত্রাদির কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।"

সন্ধ্যার পর সকলে মিলিয়া মোটরে একটু বেড়াইয়া আসা হইল। রাত্রি প্রায় ১১৷৷টার সময় মা বিশ্রাম করিতে উপরে গেলেন। আজও মা মৌন মন্দিরে শয়ন করিলেন।

৭ই আশ্বিন, রবিবার—

দুপুরে হরিদাস মুখার্জ্জি আসিয়াছেন। কথায় কথায় এক সাধুর কথা তিনি বলিতেছেন, "রাগ থাকিলে কি হয় ? মাটী হয়ে যাওয়া চাই।" মা তখনই বলিলেন, **"তাইত মাটি না হইলে 'মা'টিকে পাওয়া যায় না।"**

আজ হরিরামের ভাই মদনের খুব খারাপ অবস্থা। জানাইয়া গিয়াছে ১৫ দিন যাবৎ ঘুম নাই। মা আজ নীচেই পূর্ব্বদিকের বারান্দায় শয়ন করিয়াছেন। রাত্রিতে অনেকবার মদনের কথা বলিলেন। সারারাত ঘুমের ভাব নাই। হঠাৎ শরীরও অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল।

৮ই আশ্বিন, সোমবার—

আজ দুপুরে হরিরাম আসিয়া খবর দিল। কাল রাত্রিতে মদনের ঘুম হইয়াছিল, একটু ভাল আছে।

আজও বৈকালের দিক দিয়া মার শরীর বড়ই খারাপ দেখাইতে লাগিল। সেবা আসিয়া নাড়ী দেখিয়া অবাক হইয়া কেবলই বলিতে লাগিল, "এ' নাড়ীতেত এই ভাবে থাকা অসম্ভব। নাড়ীর গতি এত মৃত্ত যে ধরাই যায় না।" যতীশ দাদাও দেখিলেন তাই।

মা, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হঁ্যা, শরীরের অবস্থা এই রকমই।" তারপর একটু মোটরে নিয়া ঘুরাইয়া আসা হইল। বলিতেছেন, "এমন অবস্থা হঠাৎ হইয়া পড়িল, সমস্ত শরীর যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। মাথা যেন একেবারে হাল্কা।" দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন না। বারান্দায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। রাত্রি প্রায় ৮টায় মা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু শরীরের গতি ভাল নয়। বলিলেন, শ্বাসের গতি অন্য রকম হইয়া গিয়াছে, তাই পায়খানাও হয় না। শরীরের কোন যন্ত্রই বিশেষ ক্রিয়া করিতেছে না।

৯ই আশ্বিন, মঙ্গলবার।

মা আজও প্রাতে বলিলেন, "শরীর যেন উঠিতেছে না।" আমি খানিক ক্ষণ শরীর ঘসিয়া দিলাম। একটু পরে উঠিলেন; কিন্তু আবার আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। অনেকে একান্তে কথা বলিবেন, মা তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।

মা আজই সোলন যাওয়ার কথা বলিলেন। সন্ধ্যার সময় আমরা সোলন রওনা হইলাম। সিমলায় কীর্ত্তন হইতেছে ভক্তেরা মাকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইয়া টেলীগ্রাফ করিয়াছে। মা বলিলেন, "কোন খবর দিও না। যদি খেয়াল হয় চট্ করিয়া গিয়া ঘুরিয়া আসিব।"

১০ই আশ্বিন, বুধবার।

আজ প্রাতে সোলন আসিয়া পৌছিলাম। মা সিমলায় এমন ভাবে ফোন করাইলেন যেন মা আসিয়াছেন কেহ জানিতে না পায়, অথচ সিমলায় কখন কীর্ত্তনাদি হইবে সব খবর নেওয়াইলেন।

বৈকালে প্রায় ৬টায়, রাজা সাহেবের মোটরে আমরা মার সঙ্গে সিমলা রওনা হইলাম। সন্ধ্যার পরই গিয়া সিমলার কালীবাড়ীর দরজায় পৌছিয়া শুনিলাম, উপরের হলে কীর্ত্তন হইতেছে। রহস্যময়ী মা, মাথায় চাদর দিয়া ঘোমটা দিয়া যাইবেন, সকলে মিলিয়া ইহাই ঠিক হইল। আমরা সকলে বাহিরে থাকিব, মা একাই ভিতরে যাইবেন। ভিতরে যাইতেই মার খেয়াল হইল কেহ দেখিবে না। মাথার কাপড় সামান্যই রহিল। মা সকলের ভিতর দিয়াই উপরে গিয়া মেয়েদের ভিতর উপস্থিত হইয়া দেখেন, এক খানা মাত্র চেয়ার খালি পড়িয়া আছে। মা তাহাতেই বসিয়া পড়িলেন। মার মুখ খুব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। ভূপেন বসুর কীর্ত্তন হইতেছে।

মাকে দেখিয়া মেয়ে মহলে ফুস্‌ফাস্‌ কথা আরম্ভ হইল, "এ'কি বেটা ছেলে ঘোমটা দিয়া আসিয়া বসিল নাকি?" পাশের এক স্ত্রীলোকের দিকে মা একটু হেলিয়া পড়িতেই সে হাত দিয়া আস্তে ঠেলিয়া দিল। খানিক পরেই মার চুল উড়িতে দেখিয়া এবং আরও কি কি দেখিয়া পরিচিতাদের মধ্যে, একটু সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা উঠিয়া আসিয়া মাকে দেখিয়াই আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। মা রেলিং দিয়া নীচের দিকে চাহিতেই পুরুষেরাও মাকে দেখিয়া আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কীর্ত্তন ভঙ্গ হইবে ভাবিয়া মা সকলকে স্থিরভাবে বসিতে বলিয়া নিজে নীচে নামিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে বসিলেন। "কলঙ্ক-ভঞ্জন" পালা হইতেছিল। আমরাও ধীরে ধীরে ভিতরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। হঠাৎ কোন খবর নাই এ'ভাবে মাকে পাইয়া সকলেরই খুব আনন্দ। কীর্ত্তনিয়া ভূপেন বাবুও খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমার মাকে আরও একবার কীর্ত্তন শুনাইবার বড়ই আকাঙ্খা ছিল। আমার বহু সৌভাগ্য যে আজ মা আসিয়াছেন।"

কীর্ত্তনান্তে অনেকেই বাড়ী চলিয়া গেলেন। অনেকে মার শয্যা পার্শ্বেই স্থান নিলেন। কথা উঠিল, 'মা, প্রথম মনে হইত, একটা রাত্রি মার শয্যাপার্শ্বে শুইতে পারিলেই নূতন মানুষ হইয়া যাইব।' মা হাসিয়া বলিলেন, "শোওয়া হয় কই?" চারুবাবুকে বলিতেছেন, "সৎপ্রসঙ্গ করা ভাল, ভাল কথা বলা ভাল, বলিতে বলিতে যদি কখনও লাগিয়া যায়। শোওয়া ভাল, শুইতে শুইতে যদি বাস্তবিক শোওয়া হইয়া যায়, অর্থাৎ যে সুফলের কথা বলিলে।" মাকে নিয়া আমরা হলেই রহিলাম। আগামীকল্য রাস-পূর্ণিমা। কালও কীর্ত্তন হইবে। কীর্ত্তনের পর মা সোলন রওনা হইয়া যাইবেন, স্থির হইয়াছে। এখানে সকলে আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু মার যাইবার ভাব দেখিয়া আর কেহ বাধা দিতে সাহস করিলেন না। রাত্রি প্রায় ১২টা কি ১টায় শয়ন করা হইল।

১১ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।

আজ সকাল বেলাতেই হঠাৎ মার শরীর খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। যদিও দেরাদুন পৌঁছিবার পর হইতেই শরীর খারাপ চলিতেছে, আর কোনও অসুখ নাই। ভয়ানক দুর্ব্বলতা, নাড়ীর গতি খারাপ, হৃদ্‌কম্প হয় এই অবস্থা। এই অবস্থাতেই সোলন, সিমলা আসা হইয়াছিল। কিন্তু আজ খুবই খারাপ অবস্থা হইল। মা হাসিয়া বলিলেন, "কোনও কষ্ট নাই ত, বেশ! সব শরীর যেন চুপ হইয়া যাইতেছে। সব সময়েতেই প্রস্তুত। শুনিয়া আমাদের ভয়ানক দুশ্চিন্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, কথাও ভাল বলিতে পারিতেছেন না। মাকে একলা চুপ করিয়া শোওয়াইয়া রাখা হইল।

মা অল্প সময়ের জন্য আসিয়াছেন, কাজেই লোকজনের আসা যাওয়া একেবারে বন্ধ করা গেল না। এই অবস্থাতেও মা হাসি মুখে সকলকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমরা অনবরতই মনে করাইয়া দিতেছি, "মা শরীর দুর্ব্বল, বেশী কথা বলিও না।" তখন মা উপস্থিত সকলের দিকে হাসিমুখে চাহিয়া বলিতেছেন, "তাইত, এ'রা আমাকে চুপ করিতে বলিয়াছিল, আমার ত' সব সময় মনে থাকে না। আচ্ছা এখন চুপ করি।" এই বলিয়া ছেলেমানুষি ভাবের সঙ্গে হাসিটুকু মিলাইয়া কথা বন্ধ করিলেন। আবার কখন যে কাহার আগ্রহে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন হয়ত আর খেয়াল নাই। মা হাসিয়া বলেন, "কোন গোলমাল নাই ত'। যাহা হইবার হইবে। তোমাদের দরকার থাকে দেখিয়া রাখ।"

বৈকালের দিকে শরীরটা একটু ভাল দেখা গেল। বৈকালেই বাহির হইলেন। সঙ্গে বহুলোক। অনেক ফটো তোলা হইল। সন্ধ্যার পরই কালীবাড়ী ফিরিয়া আসা হইল। রাত্রি প্রায় ৭॥টায় রাসলীলা আরম্ভ হইল। মা চলিয়া আসিবার কথা, তাই ৯॥টায় কীর্ত্তন সমাপ্ত করা হইল। মা উঠিয়া দাঁড়াইতেই সকলে প্রণাম করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মা হাসি হাসি মুখে হাত যোড় করিয়া, "আসি গিয়া" —বলিয়া সকলের নিকট হইতে বিদায় নিলেন।

রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা সোলন পৌছিলাম। মোটর দাঁড়াইতেই রাজা সাহেব মার চরণধূলি নিলেন। মা বলিলেন, "এত রাত্রি অবধি বসিয়া আছ?" মা ঘরে গিয়া বসিতেই রাণী সাহেবাও চরণ-বন্দনা করিলেন। মা'র শরীর একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল এই খবর পাইয়া তাঁহারা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন—জানাইলেন। খানিক পরে মার আদেশ নিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। একটা নূতন বাড়ী তৈরী হইয়াছে।

মাকে একান্তে রাখিবার জন্য কাল তথায় নিয়া যাইবার আবেদন জানাইয়া গেলেন।

১২ই আশ্বিন, শুক্রবার।

আজ সকালেই মাকে নূতন বাড়ীতে নিয়া আসা হইল। এই বাড়ীতে এখনও কেহ বাস করে নাই। মার শরীর আজ প্রায় ঐ রূপই। একেবারে একান্তে রাখিবার ব্যবস্থা হইল।

আজ প্রাতেই দিল্লী হইতে অমল বাবুর স্ত্রী, মেজদি ও শান্তি আসিয়া উপস্থিত। মাকে দেখিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল। তাই মা এখানে আসিয়াছেন খবর পাইয়া সকলে আসিয়া উপস্থিত! মার শরীর আজ একটু ভাল। সিমলার ভক্তগণ একে একে দিল্লী নামিতেছেন। পথে মার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতেছেন।

১৩ই আশ্বিন, শনিবার।

জীতেন সপরিবারে দিল্লী যাওয়ার পথে ঘণ্টাখানেকের জন্য আসিয়াছে। মাকে ৺শারদীয়া পূজায় দিল্লী যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছে। বলিতেছে, "এ'বার কৃপা কর, তুমি উপস্থিত না থাকিলে পূজা হইবে না" মা অমনি বলিতেছেন, **"তু-মি উপস্থিত ত সব সময়ই আছেন। না হইলে কি তোমরা পূজা করিতে পার?"** জীতেন বলিতেছে "ও'সব আমরা বুঝি না তুমি উপস্থিত থাকিও।" মা'ও হাসিয়া বলিলেন, "তুমি উপস্থিত থাকিবে।" জীতেন এ'কথার অর্থ ঠিক না বুঝিয়া বলিল, "আমি থাকিলে কি হইবে?" মা হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "দেখ, দিল্লী যাওয়ার সম্ভাবনা পূজার সময় নাই। তবে যদি মাথার বিকৃত

অবস্থা হইয়া যায়, তবে ত' আমার কোন ঠিকই থাকে না। তা' ছাড়া যাওয়ার কথা নাই। ঢাকাতেও আশ্রমে প্রথম পূজা করিবে, তাহারা যাইতে বলিতেছিল, হয়ত তথায়ও যাওয়া হইবে না। কোথায় বৈজনাথ, সুকেত-টুকেতে নাকি, ওরা শরীরটা ভাল থাকিলে, নিয়া যাইবে।"

সুকেতের রাজা আজ ৩।৪ বৎসর যাবত মাকে নিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু যাওয়া আর হইয়া উঠে নাই। এবার মা বলিতেছেন, "যদি যোগাযোগ হইয়া যায়, তোমরা চেষ্টা কর।" সুকেতের রাজাকে খবর দেওয়া হইয়াছে। তিনি নিতে লোক পাঠাইয়াছেন। অমৃতসর, বৈজনাথ হইয়া সুকেত যাইতে হয়। তারানন্দ স্বামী মাকে নব-রাত্রিতে বৈজনাথ যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া পত্র দিয়াছেন। কারণ তিনি মার নিকট একখানা তারা মুর্ত্তি চাহিয়াছিলেন। ৺জ্যোতিষ দাদা তাহা কাশী হইতে তৈয়ার করাইয়া দেন। ভোলানাথ তাহা বৈজনাথে প্রতিষ্ঠা করিবেন কথা ছিল। কিন্তু মন্দির তৈয়ার হইতে হইতে ভোলানাথ দেহরক্ষা করিলেন। এখন সেই মন্দিরে মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে, মাকে সেই সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছেন। এখানকার রাজাও উক্ত স্বামিজীর বিশেষ ভক্ত; মা গেলে তিনিও রাণীকে নিয়া যাইবেন বলিয়াছেন। যদি মার খেয়াল হয়, শরীর ঠিক থাকে তবে ঐ সময়তে বৈজনাথ উপস্থিত থাকারও কথা হইয়াছে। মার শরীরটা বিশেষ খারাপ হইয়া পড়ায় যাইতে বিলম্ব হইতেছে।

আজ দুপুরে মা শুইয়া আছেন, প্রায় ৫টার সময় উঠিয়াছেন। আমি, মা উঠিবার মাত্র মিনিট দশেক পূর্ব্বেই যাইয়া মার পায়ের কাছে কম্বল বিছাইয়া শুইয়া আছি, এ'র মধ্যেই মা উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই ঘুমাইয়াছিলি নাকি?" আমি বলিলাম, "এই ত' শুইয়াছি, ঘুমাই

নাই।” মা বলিলেন, “তন্দ্রাও আসে নাই?” আমি বলিলাম, “কি জানি, ঠিক বুঝি নাই।” তখন আর কিছু কথা হইল না। একটু পরেই আমি মাকে একান্তে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “মা তুমি একথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন?” মা হাসিয়া বলিলেন, “দেখিতে ছিলাম কি জানিস? তুই যেন জলে ডুব দিলি আর উঠ্‌লি না। আমি বলিতেছি—সাঁতার জানে না জল বেশী নাই ত? গর্ত্ত টর্ত্ত ঐ দিকে আছে নাকি? এই বলিয়া ঐ স্থানে পা দিলাম। পা দিতেই দেখি তুই আধা চোখ বুজিয়া বুজিয়া, (অঙ্গুল নাড়িয়া দেখাইতেছেন) আঙ্গুল এই ভাবে নাড়িয়া নাড়িয়া যেমন জপ করিতে করিতে ঝিমানো আসে, অর্থাৎ তন্দ্রা আসিয়াছে, কিন্তু স্মৃতিটা তখনও জাগিতেছে। খেয়ালটা আছে আর কি? এই রকম করিতেছিস।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম মোহ সাগরে ডুবিয়াছিলাম মা চরণ দ্বারা তুলিয়া আনিলেন।

দিল্লীর অমল বাবুর স্ত্রী মাকে একখানা গরদের কাপড় দিয়াছেন। বিশেষ ইচ্ছা, মা একবার ব্যবহার করেন। রাত্রিতে সকলে চলিয়া গেলে মা আমাকে বলিলেন, “দে দেখি, কাপড় পরি।” কাপড় পরিয়া ছেলে মানুষের মত কত কি ঢং করিতে লাগিলেন। কখনও মাথায় কাপড় দিয়া গান ধরিলেন, ঘরে বিশেষ কেহ ছিলেন না। একজন কৃষ্ণের কি কথা উঠাইতেই মা মাথায় কাপড় দেওয়া অবস্থায় চলিতে চলিতে গান ধরিলেন।—

“কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ পায়
ত্বরিতে গোপীনী ধায়”—

এই রকমেরই সব গান করিতে লাগিলেন আর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ঘরখানাও যেন মায়ের ঐ রূপের প্রভায় ও গানের সুরে, ভাবে, নাচিয়া

উঠিল। চারিদিক যেন হাসিতে লাগিল। এই বাড়ীটী বেশ নির্জ্জন স্থানে। চারিদিকে পাহাড়ের অতি সুন্দর দৃশ্য। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা শুইতে গেলেন।

১৪ই আশ্বিন, রবিবার।

আজ রাত্রিতে শুইয়া কত কি শব্দ করিতেছেন; তার মধ্যে হঠাৎ বলিতেছেন, "আল্লা হাস্তীফাল্" কতবার ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া হাসি হাসি মুখে ঐ রকম করিতেছেন। কিন্তু এমন জড়ানো অথচ স্পষ্টভাবে তাড়াতাড়ি উচ্চারণ, আমি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছি কিনা কে জানে? যাহা বুঝিয়াছি লিখিলাম। তারপর হাসিয়া বলিতেছেন, "এই সব শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিবে মুসলমান আত্মা আসিয়া ভর হইয়াছে। যাহারা জানে না তাহারাই বলিবে।" একটু পরে বলিতেছেন 'আর বলিব না, না করিতেছে। নিজের শরীরকেই ত' বলি 'না', করে—হঁ্যা।" একটু পরে আবার বলিতেছেন, "স্বরূপ মণ্ডিত অর্থ কি?" সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

তারপর, "বন্ কর" আরও কত কি শব্দ উচ্চারিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গেও কথাবার্ত্তার উত্তর দিতেছেন। খানিক পরে, হাত তালি দিয়া আরম্ভ করিলেন—"হায় গৌরাঙ্গ, হায় নিতাই, হায় গৌরাঙ্গ, হায় নিতাই।" এই গানের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে ঐ তালই চলিতে লাগিল। তারপর হইল—"জয় গৌরাঙ্গ, জয় নিতাই; তারপর। "জয় রাধে গোবিন্দ"—এই ভাবের খেলাই খানিকক্ষণ চলিল। পরে আবার শুইয়া পড়িলেন।

১৫ই আশ্বিন, সোমবার।

সকালে অমল বাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, মালারও জীবন আছে নাকি? লোকে যে বলে মালা উপবাসী রাখিতে নাই।" মা বলিলেন, "নিশ্চয়ই, সকলেরই একটা জাগ্রত চৈতন্য আছে বই কি।"

রাত্রিতে বিছানায় বসিয়াছেন, বলিতেছেন, "দেখ, তোমরা সকলেই ত' কথা বল, আমিও তোমাদের একটা কথা বলি। আমার কেমন যেন কথাগুলি বন্ধ হইয়া আসিতেছে।" শুনিয়া সকলেরই ভয়ে প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কারণ মায়ের মুখের বাণী বন্ধ হইবে। ইহা ভাবিতেও সকলের প্রাণে আঘাত লাগে। মা বলিতেছেন, "যখন পারি বলিব। যখন না পারি বলিব না। কখন বন্ধ হইবে, তাও বলিতে পারি না, যাহা হইয়া যায়। কেমন?"

আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শোন্, সবটা আবার খেয়াল থাকে না, তুই কাল প্রাতে আমাকে এই কথাগুলি খেয়াল করাইয়া দিস্ কিন্তু বুঝলি।" আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "বেশ।"

১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার।

আজ বৈজনাথ ও সুকেতের দিকে যাওয়ার কথা উঠিল। রাজা সাহেব আসিয়া বসিয়া আছেন, আপত্তি করিতেছেন। মা বলিতেছেন, "কি হইবে। আমার জন্য ত সব স্থানই সমান। এই বিছানায় বসিয়া থাকিব, না হয় ট্রেনে বসিয়া থাকিব। আর শরীর খারাপ, তা' যখন যা' হইবার হইবে। আমি ত সব সময়ই প্রস্তুত। মা'র শরীর এখন ভাল নয়; কিন্তু মা যাইবার চেষ্টা করিতে বলিলেন। রাজা রাণী প্রভৃতি সকলেই জানেন, মার ইচ্ছা হইলে কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

মা আসিয়া বেশীদিন থাকেন না এই জন্য সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বাধা দিতে সাহস পাইতেছেন না। আজ এই ভাবেই কাটিয়া গেল।

১৮ই আশ্বিন বুধবার।

আজ সকালেই মা বলিলেন, "আজই যাওয়ার ব্যবস্থা কর, তারপর যাহা হইয়া যায়।" রাত্রির গাড়ীতে মার সঙ্গে আমি বুনি, দেবীজী, অভয়, যতীশদা ও হরিরাম রওনা হইলাম। ১৯শে ভোরে অমৃতসর পৌছিলাম। তথা হইতে ৪ ঘণ্টার মধ্যে পাঠানকোট পৌছিলাম। সুকেত হইতে মার জন্য একটী মোটর ও বাস পাঠাইয়াছে। আমরা বেলা প্রায় ১২টায় মোটরে রওনা হইলাম। পাঠানকোট হইতে সুকেত ১৫০ মাইল।

পথে বৈজনাথ (৮৪ মাইল), মা তথায় নামিলেন। তারানন্দ স্বামীজী মাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁরা মায়ের মন্দির তৈরী হইতেছে দেখাইলেন। মায়ের থাকিবার জন্যও একটা ঘর তুলিতেছেন। তাহাও দেখাইলেন, নবরাত্রির মধ্যে তারামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে। মাকে উপস্থিত থাকিতেই হইবে, স্বামীজী এইরূপ ভাবে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "দেখ, যাহা হইয়া যায়।" মা যে ঘরটিতে থাকিবেন, দেখিলাম বেশ নিরিবিলি স্থান। খানিক সময় তথায় বসিয়া স্বামীজীর নিকট হইতে বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরেই আমরা সুকেত পৌছিলাম। পথে নূরপুর ধর্ম্মশালা মুণ্ডি প্রভৃতি কয়েকটি সুন্দর সুন্দর স্থান দেখিলাম। পূর্ব্বেই রাজার লোকেরা ফোন করিয়া দিয়াছিলেন। মাকে রাজার মন্দিরে নিয়া আসিল। মন্দিরের দরজা তখন বন্ধ ছিল। মন্দির সংলগ্ন একটি

বাড়ী, তাহা রাজগুরু হরদত্ত শাস্ত্রী অথবা যে কোন মহাপুরুষের থাকিবার জন্য করিয়া রাখিয়াছেন; সেই স্থানেই মাকে রাখিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অতি সুন্দর বন্দোবস্ত।

এইটি বেশ বড় ষ্টেট্। রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ সব মার সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। খানিক পরেই রাজা আসিয়া মাকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলেন। রূপার থালায় ধূপ, দীপ, ভোগ ইত্যাদি সব সাজাইয়া নিয়া আসিয়াছেন। সেবার এত ব্যবস্থা—খাটে বিছানা, মশারী পর্য্যন্ত তৈয়ার রাখা হইয়াছে। রূপার সব বাসন মার ব্যবহারের জন্য সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। স্নানের ঘরে সব সাজানো। অনেকক্ষণ রাজা মার কাছে বসিয়া থাকিয়া, কথাবার্ত্তা বলিয়া বিদায় নিয়া গেলেন।

২০শে আশ্বিন, শুক্রবার।

আজ প্রাতে মাকে মন্দির দেখাইতে নিয়া যাওয়া হইল। মন্দির দেখিয়া আমরা সকলেই খুব আনন্দিত হইলাম। যেখানে যাহা প্রয়োজন, সব যেন সাজানো। একান্তে সাধন ভজনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘর রাখা হইয়াছে। সকলেই রাজার সুরুচি ও সেবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে অনন্ত-শয্যায় নারায়ন শুইয়া আছেন, লক্ষ্মীদেবী পদসেবা করিতেছেন। সেই দরজায় গরুড় হাতযোড় করিয়া বসিয়া আছেন। আর একটি ঘরে দশভূজা দুর্গামূর্ত্তি, সেই ঘরের দরজায় সিংহ দাঁড়াইয়া আছে। আর এক স্থানে বেশ বড় শিবলিঙ্গ, পাশে পার্ব্বতী, —দরজায় বৃষ দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বশেষ একধারের একটী মন্দিরে দেবীর শয্যা এবং সাজসজ্জার সব জিনিষই সাজান। সাজসজ্জার টেবিলে রূপার সিঁদুরের কৌটা, চিরুণী, মাজন, রূপার পানদান প্রভৃতি সমস্তই সাজানো।

পাশে স্নানের ঘর, পায়খানা। সেখানেও সব আবশ্যকীয় জিনিষ সাজানো। নিখুঁতভাবে যেখানে যে জিনিষ দরকার, সকলই সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই শয্যাগৃহে অখণ্ড-দীপ জ্বলিতেছে—তাহাও দেওয়ালের মধ্যে একটি স্থানে করিয়া রাখা হইয়াছে। কাঁচের দরজা দিয়া বন্ধ এক মন্দিরে, অখণ্ড-ধূনী রক্ষাও হইতেছে। প্রায় ৮।৯ বৎসর যাবৎ এই মন্দির হওয়ার পর হইতেই অখণ্ড-দীপ ও ধূনী রক্ষা করা হইতেছে।

অপর পার্শ্বে আরও কয়েকটী ঘর। শুনিলাম, রাজা আসিয়া কখনও কখনও থাকেন। সম্মুখে মস্ত বড় আঙ্গিনা। উপরে একটী ঘর। তাহাতে রাজার পূর্ব্ব-পুরুষ লক্ষ্মণ সেনের সময়ের একটী শিব-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি। বৃক্ষের উপর শিব-পার্ব্বতী বসিয়া আছেন। শুনিলাম, এই মূর্ত্তি এক পাহাড়ের উপর ছিল। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই মূর্ত্তি আনিয়াছেন পূজারও বেশ সুন্দর ব্যবস্থা।

বেলা ৯টায় রাজার ছেলেমেয়েরা মাকে প্রণাম করিতে আসিল। তিনটী ছেলে ও দুইটী মেয়ে। ইহারা ইংরাজী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। তাহারা চলিয়া গেলে রাজা আসিলেন। খানিক পরে রাণী ও রাজার ভ্রাতৃবধূ আসিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত ফুলের মালার মালায় মার বুক ঢাকিয়া গেল। তাহারা নানারকমের সিল্কের কাপড় ও ফুলফল পায়ের কাছে রাখিয়া মা'র পূজা ও প্রদক্ষিণ করিলেন। খাবার তৈয়ারী করিয়া নিয়া আসিয়াছিলেন। রাণী নিজ হাতে মাকে একটু খাওয়াইয়া দিলেন। প্রায় ঘন্টা খানেক তাঁহারা রহিলেন। নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। (শুনিলাম, ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ, বাঙ্গালার লক্ষ্মণ সেন।)

মন্দিরের নীচেই একটী ঘরে একটী প্রকাণ্ড সিংহ আছে। রাজা

সেই সম্বন্ধে যাহা বলিলেন শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এই সিংহটিকে লাহোর হইতে ইনি আনিয়াছেন, আফ্রিকাদেশের সিংহ। মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই সিংহটীকে আনা হইয়াছে। একবার নাকি এই সিংহটি কোন প্রকারে ছুটিয়া যায়। সকলে ত ভয়ে অস্থির। কিন্তু সিংহটী ছুটিয়া একেবারে দুর্গামন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তারপর প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। পরে এক লাফ দিয়া গিয়া তাহার ঘরের কাছে দাঁড়ায়।

সিংহের রক্ষকটি ভাবিল আমার দোষেই সিংহ বাহির হইয়াছে। তাই আমার ত' মৃত্যুদণ্ড হইবেই, এখন সিংহটিকে ধরিতে গেলেও মরিব —অতএব আমার মৃত্যু ত দুইদিক দিয়াই অনিবার্য্য। এই ভাবিয়া সে গিয়া সিংহের নিকট দাঁড়াইল। সিংহ নাকি থাবা দুটি তাহার হাতের উপর তুলিয়া দিয়া তাহার অঙ্গ শুঁকিতে লাগিল। সেই লোকটী তখন ধীরে ধীরে সিংহের কান ধরিয়া ঘরে নিয়া গেল। সিংহ কিছুই বলিল না, ধীরে ধীরে ঘরে গিয়া ঢুকিল। লোকটা কেমন বেহুঁসের মত হইয়া পড়িল। দরজা বন্ধ করিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

আরও শুনিলাম, সিংহটি সপ্তাহে একদিন (বুধবার) ব্রত করে। অর্থাৎ সেই দিন দুধ ছাড়া সে আর কিছুই খায় না। আরও একটি ঘটনা; একবার নাকি একটি লোক সিংহটী দেখিতে আসিয়া সিংহটীর উদ্দেশে কি গালি দিয়াছিল, তাহাতে সে ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়ে। পরে সেই লোকটী আবার আসিয়া সিংহটীকে প্রণাম করে ও ক্ষমা চায় তাহাতে বিনা ঔষধেই রোগমুক্ত হয়।

এই স্থানের কথা শুনিলাম, শুকদেব এখানে বহু বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের নাম সুকেত হইয়াছে।

শুকদেবের তপস্যার গুহা এখনও সযত্নে রক্ষা করা হইতেছে, সেই গুহায় এক সময়ে পঞ্চ-পাণ্ডব আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। সেই সময় কুন্তী দেবীর উপর একদিন পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িতেছিল ইহা দেখিয়া ভীম হাত দিয়া পাহাড় ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। এখনও নাকি সেই হস্তের চিহ্ন আছে।

অন্যান্য লোকের মুখে শুনিলাম, রাজার নাকি প্রথমে একটী কন্যা-সন্তান হইয়া মারা যায়। এই কন্যা মারা যাওয়ার পরেই রাজার রাজ্যে শিকার এবং বলি বন্ধ হইয়া যায়। তারপর আর কোনও সন্তান সন্ততি হইতেছিল না। একদিন রাণীকে ভগবতী দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, "তুই আমার সেবা কর।" সেই হইতেই এই দেবী-প্রতিষ্ঠা হইল এবং বিশেষ ভাবে দেবীর সেবা আরম্ভ হইল। তার পরই প্রথম পুত্র-সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

বৈকালে মোটরে, মাকে সেই গুহা দেখাইতে নিয়া যাওয়া হইল রাণীরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। অতি সুন্দর স্থান। গঙ্গা-যমুনার কুণ্ড আছে। শুনিলাম গুহার মধ্য দিয়া এক রাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়া শুকদেব প্রত্যহ হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। এই স্থানে আসিয়া একদিন ধুতি নিংড়াইয়াছিলেন ও সেই হইতেই এই স্থানে গঙ্গা। কয়েক-জন সাধুর সমাধিও রাখা হইয়াছে। শুনিলাম, এই সাধুদের মধ্যে একজন ঐ গুহা পথে ৬।৭ মাইল গিয়াছিলেন। তারপর আর যাইতে পারেন নাই। অনেক সাপ রাস্তা বন্ধ করিয়া আছে দেখিলেন। রাস্তায় কোথাও কোথাও শুইয়া শুইয়া যাইতে হয়, আবার দাঁড়াইয়াও যাওয়া যায়।

রাজা এখানেও লোক থাকিবার সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ফল ফুলে, তরকারী ও শস্যাদিতে রাজধানী যেন সাজানো। লক্ষ্মীদেবী যেন বাঁধা আছেন। রাজার ভ্রাতৃবধূ হাতযোড় করিয়া মাকে নিবেদন

জানাইলেন যে, সরকার বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন যে মা যেন তাঁহার বাড়ীতে একবার চরণধূলী দেন, এবং রাজ্যের চারিদিকে মাকে ঘুরাইয়া আনিতে বলিয়াছেন; তবেই রাজ্যে মঙ্গল হইবে ইহাই রাজার বিশ্বাস।

একটু ঘুরিয়া রাজবাড়ীতে ফিরিলাম। রাজা এবং পরিবারবর্গ সকলেই ফুল-বাগান হইতে ফুল তুলিয়া মার চরণে দিলেন এবং রাজা নিজেই চেয়ার আনিয়া মাকে বসাইলেন। মা ঘরে যাইবেন না, বাহিরেই মা বসিলেন। নানা রকম ফুল ও ফলের গাছ। একটী ফল ছিঁড়িয়া রাজা মার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এই ফল জাপান হইতে আনাইয়া আমি নিজ হাতে লাগাইয়াছি।'

রাজার এক বাঙ্গালী বন্ধুও রাজার আতিথ্যে আছেন। তিনিও মাকে দর্শন করিতে আসিলেন, এক বৃদ্ধ পণ্ডিত। মার নিকট আনিয়া বলিলেন, "মা, ইনি একজন পণ্ডিত, ৮৫ বৎসর বয়স।" পণ্ডিত মার চরণে প্রণাম করিয়া হাতযোড় করিয়া ভগবতীর স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। আরতির পূর্ব্বে আমরা মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার সময় মা মন্দিরে বেড়াইতেছেন। শিবলিঙ্গের পাশে পার্ব্বতী হাত যোড় করিয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া হরিরাম বলিল, "মা, দেবী আবার কাহাকে হাতযোড় করিতেছেন?"

মা বলিলেন, "বাঃ, দেবী নিজেই নিজেকে হাতযোড় করিতেছেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে, 'শিব আবার হরিনাম করে কেন?' তোমাদের কাছে ভিন্ন ভাব কিনা, তাই তোমরা ঐরূপ ভাব।

আমি ত' বলি নিজেই নিজের নাম করিতেছে।" রাত্রি প্রায় ৯টায় মা ঘরে আসিলেন।

২১শে আশ্বিন, শনিবার—

আজ প্রাতে রাজা আসিয়াছেন। মার কাছে প্রায় ১১টা অবধি থাকিয়া গেলেন। রাজা 'চতুর্ম্মাসী'র মধ্যে কাহাকেও সাজা দেন না, কিন্তু প্রজারা সেই সুযোগ পাইয়া সেই সময়েতেই নানা অন্যায় কার্য্য করে, জানে, রাজা সাজা দিবেন না। রাজা মাকে একান্তে বলিতে ছিলেন, "মা, আমি সেই সময়েতে বড়ই বিপদে পড়িয়া যাই। কেন মা আমাকে এই বন্ধনে রাখিয়াছেন?" এই বলিয়া মার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

মা'র মুখে শুনিলাম, রাজা প্রতিদিন ৩।৪ ঘণ্টা ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত থাকেন। রানীও এই ভাবে সাধন ভজন করেন। বেশ ভক্তি বিশ্বাস! শুনিলাম, হিন্দু রাজাদের আদর্শোচিত সব নিয়মই ইঁহারা পালন করেন। সাধু-অতিথি প্রভৃতির সেবায় রাজা সর্ব্বদাই তৎপর। আরও শুনিলাম নবরাত্রির সময় এখানে প্রকাণ্ড মেলা হয়। প্রায় ১০ হাজার লোক নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে নিজ নিজ দেবী নিয়া এই মন্দিরে একত্র হয় এবং এখান হইতে বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়।

রাজা ও রানী মাকে বলিলেন, "মা আপনি এখানে আসিয়াছেন, আমাদের উপর আপনার অসীম কৃপা। আজ কতদিন যাবত আশা করিয়া বসিয়া আছি।"

মা হাসিয়া বলিলেন, তোমরা পর ভাব কেন, একটু আপন করিয়া নেও। কৃপা টৃপা ত' পর ভাবিলে বলা হয় মেয়েটা

বাপ মার নিকট আসিয়াছে। বাপ-মা ও আমি, কি ভিন্ন? এক ছাড়া যে কিছুই নেই। যুদ্ধ বিগ্রহ যাহা হয়, দুই ভাব হইতে। একভাব হইলে আর কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে? নিজের শরীরের সঙ্গে কি যুদ্ধ চলে?" রাজা রানী হাতযোড় করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছেন মা।"

আজও বৈকালে শুকদেব—আশ্রম দেখিতে যাওয়া হইল। কারণ কাল রানী সঙ্গে ছিলেন বলিয়া আমাদের সঙ্গীয় পুরুষেরা যাইতে পারেন নাই, আজ মার সঙ্গে তাহারাও চলিলেন। শুকদেব আশ্রম হইতে, রাজা গুরুদেবকে যে স্থানটি অর্পণ করিয়াছেন, তথায়ও যাওয়া হইল। সেই স্থানটিও বড়ই মনোরম। প্রকৃতিরানী যেন সর্ব্বদাই হাস্যময়ী মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। ফল ফুলে চারিদিক যেন হাসিতেছে। একটী কুণ্ড আছে, তাহাতে ছোট ছোট মাছ খেলা করিতেছে। এত পরিষ্কার যে, নীচের বালুকণাও দেখা যায়। একটী নাগাসাধু তথায় থাকেন। মা গিয়া তথায় "পিতাজী কিছু ভাল কথা শুনাও, তোমার কাছে আসিয়াছি" এই বলিয়া বসিয়া পড়িলেন। সাধু তখন গাঁজা খাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, মার কথায় তাহা ছাড়িয়া শাস্ত্রকথা বলিতে লাগিলেন। মা'ও শিশুর মত গালে হাত দিয়া বসিয়া নীরবে সব শুনিতে লাগিলেন। আমরা সব দাঁড়াইয়া আছি। খানিক বলিয়া সাধু বলিলেন, "তুমি কে তাহা জানি না, আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছ কিনা কে জানে! যাক্ মা, কোথা হইতে আসিয়াছ? বাড়ী কোথায়?" মা হাসিয়া বলিলেন, "এই যে বাবার বাড়ীই আমার বাড়ী।" এই রকম ২।৪ কথার পর মা বিদায় নিবার সময় সাধুটী রাজার লোকদের সঙ্গে দেখিয়া বলিলেন,

"মহারাজার মহামায়ার মন্দিরে যে মাতাজী আসিয়াছেন শুনিয়াছি, ইনিই কি তিনি?" ইনিই তিনি, শুনিয়া সাধুটি বলিলেন, "মা আবার একদিন অবশ্য আসিয়া সন্তানকে জ্ঞান দান করিয়া যাইও।" মা তখন খানিকটা চলিয়া আসিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া বলিলেন, "বাবা, এই রকম কথা মেয়েকে বলিতে নাই। বাবা যখন আনবে তখনই মেয়েটা আসবে।" হিন্দিতে সব কথাবার্ত্তা হইতেছিল। এই স্থানটা মন্দির হইতে অনেক দূর। মা'র মোটর যখন রাস্তা দিয়া চলিতে ছিল, দুই পাশ হইতেই দোকানী এবং স্থানীয় অন্যান্য লোকেরা হাত-যোড় করিয়া মার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করিতেছিল।

আজও সন্ধ্যার পর আমরা ফিরিলাম। মন্দিরের আঙ্গিনায় মা অনেকক্ষণ পায়চারী করিলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে আছি। নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। রাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া, মার কোন অসুবিধা হইতেছে নাকি জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং রাজ্যের অন্যান্য খবরাদি দিলেন।

আজও রাত্রি প্রায় ১০টায় মা ঘরে আসিলেন। অভয় কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে শয়ন করিলেন।

২২শে আশ্বিন, রবিবার।

আজ প্রাতে রাজা ও রাণীরা সকলে আসিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজার রাণী ও ভ্রাতৃবধূ আসিয়াই মাকে পূজার্চ্চনা করিলেন। পূজার সমস্ত বন্দোবস্ত সঙ্গেই নিয়া আসেন। আজও প্রায় ১১টার সকলে মার নিকট হইতে বিদায় নিলেন।

বৈকালে মাকে রাজার বাড়ী নিয়া গেল। তথায় বাগানে মাকে

বসাইলেন। রাণীদের বাগানে নিয়া যাওয়া হইল, তথায় দাসীগণ সুন্দর সুন্দর পোষাক পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মা যাওয়া মাত্রই ফল-ফুল দ্বারা মায়ের পূজা করিল। ভগবতীর স্তোত্রপাঠ করিয়া মার চরণে ফুল দিতেছে এবং প্রণাম করিতেছে। মা যাইয়া এক স্থানে বসিলেন। দাসীরা দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। ২৩।২৪ জন দাসী উপস্থিত ছিল। মা সকলকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেছেন। আবার বলিতেছেন, "তুনিয়া ভরা আমার একটাই মা ; আমার মাও আমি ; একটাই তুনিয়াতে ; এক্ আমিই।" রাণীরা মার এই অদ্বৈত ভাবটা ধরিয়া খুব আনন্দ পাইলেন।

আবার মা কত ভাবের কথা বলিয়া কত আনন্দ করিতেছেন। তাঁহারা হাতযোড় করিয়া বার বার প্রণাম করিতেছেন। চারিদিকের দৃশ্যও অতি সুন্দর। রাজ্যটী, বিশেষতঃ রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা এমনভাবে বেষ্টন করিয়া আছে, যেন দুর্গ-পরিবেষ্টিত। বাস্তবিকই রাজধানীটির প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন সুন্দর, রাজাও সাজাইয়া রাখিয়াছেন তেমনই সুন্দর করিয়া। যতই দেখাশোনা হইতেছে রাজার সৎভাবের, সৌন্দর্য্য ও জ্ঞানের প্রশংসা, না করিয়া থাকা যাইতেছে।

শিক্ষাদি বিষয়েও সুন্দর নিয়ম। হাইস্কুল আছে। রাজ্য মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার নিয়ম করিয়াছেন, অর্থাৎ সকলকেই লেখাপড়া শিখিতে হইবে। প্রার্থনাদিও প্রত্যেক স্কুলে করান হয়। রাজার ৮ বৎসরের বড় ছেলেটীকে রোজ পূজা, পাঠ ইত্যাদি করিতে হয়। বাপ মার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদেরও পূজাদি শিক্ষা দিতেছেন।

সন্ধ্যার পর আমরা ফিরিলাম। রাজা প্রতিদিন রাত্রি প্রায় ১০টার সময় তুধের কিছু মিষ্টি মার সেবার জন্য পাঠাইয়া দেন। এবং মার কুশল

বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। রাত্রি প্রায় ১২টায় রাজা শয়ন করেন। প্রায় সর্ব্বদাই রাজ বাড়ী হইতে লোক আসিতেছে। রাজা ফোন করিতেছেন, মার শরীর কেমন আছে? কিছু প্রয়োজন থাকিলে, আদেশ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। সেবার ভাব অতি চমৎকার।

২৩শে আশ্বিন, সোমবার।

আজ একাদশী, তাই রাজা পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করিবেন বলিয়া প্রাতে আসিতে পারিবেন না। সন্ধ্যায় আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন। বেলা প্রায় ১১টায় রাজবাড়ীর তিন রাণীর, মহল হইতে মায়ের জন্য থালায় থালায় সব খাবার এবং তৎসহ ধূপ মালাদি আসিল। শুনিলাম, রাজার পূজার স্থানে মায়ের ছবি প্রত্যহ পূজা করেন। কাল হইতে সন্ধ্যায় মন্দিরের আরতির পর মায়ের আরতি হইতেছে। এখানে আরতির পর বেশ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা আছে। সব নিয়া মার ঘরে আসিয়া পূজাদি ও দুই বেলা মার আরতি করিয়া যাইতেছেন। এই রাজা মাত্র দুইবার (একবার হরিদ্বারে, দ্বিতীয়বার দেরাদুনে) মাকে দেখিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় রাজা এবং অন্যান্য সকলেই সাক্ষাৎ ভগবতী ভাবে মাকে পূজা করিতেছেন।

আজ বৈকালে, ৪টায় মাকে নিয়া রাণীরা বেড়াইতে বাহির হইবেন, রাজা খবর পাঠাইয়াছেন।

আমরা বৈকালে রাণীদের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলাম। রাণীদের ভিন্ন বাগানে শিবমন্দির আছে। বেশ সুন্দর স্থান। বাগানের তরকারী মার চরণে সাজাইয়া দিলেন। এখানেও পূজারী আছেন। নিত্য-পূজা হয়।

বর্ত্তমান রাজার নাম লক্ষ্মণ সেন। ইঁহার বড় ভাই ছিলেন ভীমসেন, তাঁর দুই স্ত্রী বিদ্যমান। বড় ভাই রাজা হইয়াছিলেন। ২০ বৎসর হইল তিনি মারা গিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ভীমসেনের দুই রাণী ও বর্ত্তমান রাজার রাণী এই তিন রাণীই মার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাণী বলিতেছেন, 'চোখ বুজিলেই তিনি মাকে দেখেন।' কাল রাত্রিতে মার নামে তিনি এক গান রচনা করিয়াছেন। তাহা গাহিয়া মাকে শুনাইলেন। রাণী মার চরণসেবা করিতে লাগিলেন, বলিলেন, 'এমন সৌভাগ্য আমাদের আর কবে হইবে?'

মা বলিতেছেন, "না, আর দরকার নাই। মেয়েকে এই রকম করে না।" সকলেই এই কথা নিয়া আনন্দ করিতেছেন। আজও সন্ধ্যার পর আমরা ফিরিলাম।

২৪শে আশ্বিন, মঙ্গলবার।

রাজাসাহেব মাকে দুর্গাপূজার সময়টা এখানে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, মাকে পূজা করিবেন এই সাধ, কিন্তু মা বলিতেছেন, "আমার ত কিছুই ঠিক নাই, কখন যাইবার খেয়াল হইবে, চলিয়া যাইব, তোমরা এই শরীরটা উপলক্ষ্য করিয়া কিছু ব্যবস্থা করিও না।" ও'দিকে বৈজনাথে স্বামিজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা অষ্টমী তিথিতে হইবে, পঞ্চমী হইতে কার্য্য আরম্ভ; মাকে পঞ্চমী দিন হইতে নিজ আশ্রমে রাখিবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ করিতেছেন। মার ত কিছুই স্থির নাই, সর্ব্বদাই এক কথা, "যাহা হইয়া যায়।" পূজার তিন দিন মা যদি নাই থাকেন, এই আশঙ্কায় রাজাসাহেব তৃতীয়া তিথিতেই মার পূজার ব্যবস্থা করিতেছেন, মাকে কিছুই বলিতে সাহস পাইতেছেন না। কিন্তু নিজের ভাবেই

আয়োজন করিতেছেন, বলিতেছেন, "যদি আমার ভাগ্যে থাকে, মা কৃপা করিবেনই।" মার শরীরটা আজ একটু ভালই দেখাইতেছে। এখানকার উচ্চতা ৩৫০০ ফিট, তাই খুব বেশী ঠাণ্ডা নয়, স্থানও নিরিবিলি।

২৫শে আশ্বিন, বুধবার।

আজও বৈকালে আমরা মার সঙ্গে শুকদেব আশ্রম হইয়া রাজবাড়ীতে গেলাম। রাজাসাহেব ও রাণীরা মাকে নিয়া বাগানে বসিলেন। ৪টায় রাজাসাহেব গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রাজাসাহেব আজ নিজে মার অনেক ফটো তুলিলেন। মার চল-চিত্রও তুলিতেছেন। রাণীরা মাকে পূজা করিতে লাগিলেন, কেহ পা টিপিতেছেন, মার আপত্তি কেহ শুনিতেছেন না। রাজাসাহেবও ছেলে মানুষের মত, মহানন্দে কেবল ফটোই তুলিতেছেন, আনন্দ যেন তাঁহার ধরিতেছে না। মা'ত আমার, নির্ব্বিকার, সবটাতেই আনন্দ। আবার, আনন্দও নাই নিরানন্দও নাই। রাজার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আসিল, তিনি তাহাদের মার নিকট দাঁড় করাইয়া প্রণাম করিতে বলিলেন। বড় রাজকুমারকে বলিলেন, "তুমি প্রাতে কি কি কর মাকে শোনাও। ছেলেটী স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া মাকে শুনাইল এবং শিবমন্ত্র জপ করে বলিল। মা, সব ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতান, ইহাদের সঙ্গেও তাহাই করিলেন। বলিলেন, "দুনিয়াভরা সব ছেলে মেয়েরাই আমার বন্ধু, তবেই বন্ধুর বাপ মা'ই আমার বাপ মা।" এই বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। রাণীও মার সম্বন্ধে আরও কবিতা রচনা করিয়াছেন, দাঁড়াইয়া হাত যোড় করিয়া সুমিষ্ট স্বরে তাহা মাকে শুনাইতেছেন। মা বলিতেছেন, "তোমার মেয়ের

নাম ভবানী রাখিয়াছ, কেহ গৌরী রাখে, বাপ মা আদর করিয়া কত কি নামে ছেলে মেয়েদের ডাকে তেমনই এই শরীরটার নাম "আনন্দময়ী" রাখিয়াছে। আমি ত কিছু জানি না, খাই, দাই, ঘুরি বেড়াই!" সকলে এই কথা নিয়া আনন্দ করিতেছেন। রাজাসাহেব বলিলেন, "মা, আমার পদ্মপত্রে জলের মত আছেন সবটার ভিতরেই, কিন্তু কিছুই তাঁর গায় লাগিতেছে না।" নানা কথাবার্ত্তার পর আজ সন্ধ্যায় আমরা মন্দিরে ফিরিলাম।

২৬শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।

আজ মহালয়া। মায়ের আজ স্নান করিবার খেয়াল হইল। বেশ করিয়া স্নান করিলেন! প্রায় বেলা ১টায় আজ ভোগ হইল। মা প্রায়ই বৈকালে ৪টায় ওঠেন। উঠিবার পূর্ব্বেই স্থানীয় লোকেরা দর্শনের জন্য আসিয়া বসিয়া থাকেন। মা উঠিলেই ফল, ফুল নিয়া মার চরণে উপস্থিত হন। মা কখনও কখনও স্ত্রীলোকদের বলেন, শুধু শুধু বসিয়া থাকিতে নাই, ভজন কর।" তাহারা ভজন করিতে থাকে। আজ গ্রাম হইতে কয়েকটি স্ত্রীলোক আসিয়াছে। মাথায় তাহাদের কাপড় সকলের মুখও ভাল দেখা যায় না। তাহারা ভজন আরম্ভ করিতেই, মা মাথার কাপড় দিয়া তাহাদের মধ্যে গিয়া বসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "আমিও গ্রাম হইতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু গান ধরিলেন। মার রঙ্গ দেখিয়া উপস্থিত সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। সেই স্ত্রীলোকদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইতেছেন। কত কথা বলিয়া সকলকে আনন্দ দিতেছেন। আবার এই সব 'দুষ্টামীর সময় মধ্যে মধ্যে স্থিরভাবে বসিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলেন, "আচ্ছা

তোমরা কার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছ? সাধু হয়, বেশ গম্ভীর-টম্ভীর হইয়া আসনে বসে; ভাল ভাল কথা কবে, আর এটা (নিজ শরীর দেখাইয়া) আছে সকলের সঙ্গে দুষ্টামী করে, খায় দায় ঘোরে বেড়ায়। না আছে জপ, না আছে তপ, এ কি রকম সাধুরে বাবা।" এই বলিয়া মুখের যে রকম ভঙ্গি করেন তাহাতেও কত রস ঝরিয়া পড়ে। ভক্তেরা তাহা দেখিয়াও মুগ্ধ হন এবং আনন্দ করেন।

দুই তিন দিন হয় দুপুরে শুইয়া শুইয়া মা একটী গান রচনা করিতেছেন আমি কাগজ পেন্সিল নিয়া গানটী লিখিয়া রাখিলাম। গানটী এই :—

"ওরে জীবের জীবন-ধন,
তুমি বুদ্ধ, তুমি শুদ্ধ,
তুমি নিত্য-নিরঞ্জন।
তুমি মুক্ত, তুমি শান্ত,
তুমি সত্য নারায়ণ ॥
(আবার), করছ কত মায়া খেলা, দেখাও যত ভবজ্বালা,
ভাঙ্গ এবার বেড়া ঘেরা, ওরে পাগল প্রাণধন ॥"

আজ মা সন্ধ্যার পর মন্দিরের আঙ্গিনায় ঘুরিতেছেন, সঙ্গে আমরা কয়েকজন মাত্র আছি। ঘুরিতে ঘুরিতে মা নাম ধরিলেন—"হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ। "হরি বোল, হরি বোল হরি বোল—!" প্রায় আধ ঘন্টা ধরিয়া নাম চলিল। আরতির সময় হইল, আমরা ঘরে চলিয়া আসিলাম। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এখানে আরতির সময় শিঙ্গা, কাঁসর, প্রভৃতি নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজান হয়; সেই ভাবেই রোজ দুইবেলা মারও আরতি করে। আজও আরতি হইবে,

আরতি হইয়া গেলে হরিরাম মার নিকট দাঁড়াইয়া স্তোত্রাদি পাঠ করে, তার পর অভয় কীর্ত্তন করে। রাত্রি প্রায় ১১।১২ টায় শয়ন করা হয়।

২৭শে আশ্বিন শুক্রবার—

আজও সকালে রাজাসাহেব আসিয়াছেন। গতকল্য তাঁহার কতগুলি ঘটনা মাকে ও হরিরামকে বলিয়াছেন শুনিলাম। ঘটনাগুলি বেশ সুন্দর কিন্তু সকলের কাছে প্রকাশ করিতে চাহেন না, তাই মা'ও হরিরাম আমাদের কাছে বলিলেন না। রাজাসাহেব আজ আসিলে আমি সে সব কথা বলিতে বলিলাম। তিনি মৃদু মৃদু হাসিয়া হরিরামকে সেই সব কথা বলিতে বলিলেন।

আমরা সন্ধ্যার পর সকলে বসিলে মা'ও হরিরাম যাহা বলিলেন তাহা এই :—নবরাত্রিতে রাজা একবার সাত দিন উপবাসী থাকিয়া পূজা করিতেছেন। বেশী রাত্রিতে পূজা—হঠাৎ একটু অস্বাভাবিক ভাবে দেখিলেন, তাঁহার মৃতা প্রথমা কন্যা কিছু খাবার নিয়া উপস্থিত। পিতাকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রাজা কিছুতেই খাইবেন না, পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিতেছেন, কিন্তু কন্যাও ছাড়িল না, রাজা রাগ করিয়া বলিলেন, "যে এইরূপে পিতার সঙ্কল্প ভঙ্গ করে, সে পিশাচ।" কিন্তু তবুও সে শুনিবে না। রাজা ইহাও বলিতেছেন, "তুমি ত অনেক দিন মরিয়া গিয়াছ এখন আসিলে কি করিয়া ?" সে বলিতেছে, "আমি তোমাকে খাওয়াইতে আসিয়াছি তোমাকে খাইতেই হইবে।" রাজা বাধ্য হইয়া কিছু খাইলেন। খানিক পর রাজা যখন স্বাভাবিক ভাবে ফিরিলেন, দেখিলেন সত্যিই তাঁহার মুখে তখনও বাদাম রহিয়াছে।

আহমেদাবাদে, শ্রীশ্রীমা

সেই নবরাত্রির মধ্যেই এক দিন পেট বড় খারাপ হইয়াছে, জ্বরও হইতেছে। তবুও রাজা পূজাদি ছাড়িতেছেন না। পুনঃ পুনঃ পায়খানা হইতে আসিয়া পূজার আসনে বসিতেছেন। একবার রাজা পায়খানায় যাইতে গিয়া দেখেন গরম জল ফুরাইয়া গিয়াছে, তখন চাকরদের ডাকিয়া আনিলেন না শুধু ভগবানের চরণে বলিতে লাগিলেন, "মা, তুমি এইরূপে আমার কাজে বাধা দিতেছ কেন? এখন কি করি?" এইরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখেন, কলে গরম জল পড়িতেছে। তিনি ত আশ্চর্য্য! এত রাত্রিতে কি করিয়া এই জল আসিতেছে। সেই জলে স্নানাদি করিয়া আবার পূজায় বসিলেন। একটু পরেই ঘুম পাইতে, আসনেই শুইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরেই ঘুম হইতে উঠিয়া দেখেন, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। আর, পায়খানায় গেলেন না, শরীর বেশ ভাল বোধ করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনা শুনিয়া আমাদের মধ্যেও একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। মা দুই এক দিন পূর্ব্বে এখানে যে স্নান করিয়াছেন সেই দিনও এক ঘটনা হইয়াছিল। মার বাথ্‌রুমে কখনও গরম জল আসিতে দেখি নাই। মা যেই স্নান করিতে গিয়াছেন কলে গরম জল আসিয়া স্নানের পাত্রটি ভরিয়া গেল। পরেই, আবার গরম জল বন্ধ হইয়া গেল—আর গরম জল আসিল না। মা হাসিয়া বলিলেন, "কতজন থাকে ত! ব্যাসে পায়খানা দেখিস্ নাই, একজনে পায়খানা পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইত।" ব্যাসে পায়খানা পরিষ্কারের কথা পূর্ব্বেই হয়ত লিখা হইয়াছে। তিন চার দিন পর্য্যন্ত ধরিতে পারি নাই, দেখিতাম পায়খানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শেষে একদিন মা'ই ধরাইয়া দিলেন, তখন আমাদের খেয়াল হইল, তা'ইত, কে পরিষ্কার করে? যেই ধরা পড়িল, আর ঐরূপ দেখা গেল না।

আর একটী ঘটনা শুনিলাম ঃ—প্রথম সন্তান মারা যাওয়ার পর, বহুদিন সন্তানাদি হয় না। তার পর, একবার রাণীর গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছে ; রাজা রাণীকে নিয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন, তথায় প্রসব হইবে। তিন মাস তথায় থাকিবার পর রাণীর প্রসব কাল উপস্থিত হইল। ডাক্তার, লেডি ডাক্তার সব বসা, বড় বড় লোকেরা সব ফোন করিতেছেন, কি হইল জানিবার জন্য। ডাক্তাররা পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন, "আর দেরী নাই, এখনই প্রসব হইবে।" এমন সময় রাণী রাজাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং কি কথা বলিলেন। রাণী খানিক পরে বলিলেন, "পেট ব্যথা করিতেছে পায়খানায় যাইব।" পায়খানায় গেলেন ; প্রায় ৫০ বার পায়খানা হইল। অনবরত পায়খানা হইতেছে। খানিক পরে দেখা গেল গর্ভ-লক্ষণ সব কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একেবারে স্বাভাবিক শরীর, গর্ভের কোন লক্ষণই নাই।

রাজাকে সকলে ফোন করিতেছেন, রাজা অবস্থা দেখিয়া আর কি বলিবেন, "রাণীর শরীর অসুস্থ"—এই জবাব দিয়া সেই রাত্রিতেই রাণীকে বলিলেন, "রাজধানীতে বিশেষ কাজ আছে আমি এখনই যাইতেছি, তোমরা প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে যাইও।" এই বলিয়া লজ্জায় তখনই দিল্লী ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। মা হাসিয়া বলিতেছেন, "রাজা এই ঘটনা বলিয়া বেশ দেখাইতেছিল, বলিতেছিল, "মাতাজী, লোকের নাক কাটে এই ভাবে (নাক কাটিবার ভঙ্গি করিতেছেন), আর আমার কাটা গেল এই ভাবে (উল্টা ভাবে নাক কাটিবার ভঙ্গি করিয়া দেখাইলেন।"

আর একটী ঘটনা—একবার নবরাত্রিতে রাজা 'কুমারী-পূজা' করিয়াছেন, হঠাৎ কুমারীটী তখনই মারা যায়। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন

হার্টফেল করিয়াছে। রাজা ত এই ঘটনায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কুমারীর মা বাবা আসিয়া ভয়ানক কান্নাকাটি করিয়া রাজাকে অনুযোগ করিতে লাগিল ; রাজ্য মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। রাজা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাবে বসিয়া আছেন, হঠাৎ দরজায় কে আঘাত করায় রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?" উত্তর হইল, "আমি, রাণী দরজা খোল।" দরজা খুলিতেই দেখেন রাণী আলুথালু বেশে উপস্থিত।

রাজার পূজার ঘরে রাণীও বড় যাইতে পারেন না। রাজার মহল ভিন্ন, সেখানে রাণীরা বড় যায় না, কারণ পর্দ্দা আছে। রাণীকে হঠাৎ এইভাবে আসিতে দেখিয়া রাজা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তুমি যে এখানে আসিয়াছ ?" রাণী একটু ভীতভাবে বলিলেন, "শীঘ্র ঐ কুমারীকে আমার কোলে দাও।" রাণী পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলাতে রাজা কুমারীকে রাণীর কোলে দিলেন। রাণীর নাকি সেই সময়েতে অসুস্থ শরীর ছিল, কিন্তু অনায়াসে সেই দুর্ব্বল শরীরেই মেয়েটিকে কোলে নিয়া বেলা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবার পর মেয়েটী হাত পা অল্প অল্প নাড়িতে লাগিল, শ্বাস বহিতে লাগিল। রাজা রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?" বলিলেন, "তারিণী দেবী"। আরো কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই রাণীর এইরূপ আবেশের ভাব মাঝে মাঝে দেখা দিয়াছিল ; কিন্তু রাজা তাহা মোটেই বিশ্বাস করিতেন না। এইবার কিছুকিছু বিশ্বাস করিতে লাগিলেন।

রাণীকে দেখিতেছি অতি শান্ত, বিনয়ী, অমায়িক ও ধর্ম্মপ্রাণা। মার উদ্দেশ্যে কত গান ও স্তোত্রাদি তাঁহার ভিতর হইতে বাহির হইতেছে, আর মাকে তাহা শুনাইতেছেন। হাতযোড় করিয়া মার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্তোত্রাদি ও গান করেন। তখন তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী ভক্তি বলিয়াই মনে হয়।

২৮শে আশ্বিন, শনিবার।

আজ রাজা বৈকালে প্রতিদিনের মত মন্দিরে পূজা করিতে আসিয়াছেন, (নবরাত্রির কয়দিন রাজা প্রতিদিনই মন্দিরে আসিয়া পূজাদি করেন), মার চরণে প্রণাম করিতে আসিলেন এবং মাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া গেলেন। তথায় আমাদের সঙ্গীয় সকলে একটু কীর্ত্তন করিলেন, এবং রাজা মাকে সাজাইয়া নিজ হাতে আরতি করিলেন। ঠাণ্ডা লাগিবে বলিয়া প্রকাণ্ড ছাতা ধরিলেন। রাণীরা আসিয়াও ঐ ছত্র ধরিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর মাকে মোটরে, মন্দিরে রওনা করাইয়া দিয়া রাজা খাইতে গেলেন। সারাদিনে রাজা শুধু এক পেয়ালা চা, কি একটু দুধ, ফল খাইয়া থাকেন, সন্ধ্যার পর রুটী খান।

মন্দিরে ফিরিয়া মা বিছানায় শুইলেন, আমরা কাছে বসিয়া আছি। কথায় কথায় মা বলিলেন, **"দেখ, এই যে শিবপূজা করে—শিব কি? না, পরমশিবই হইল লক্ষ্য; শক্তিপূজা করে, শক্তিসঞ্চার না হইলে ত কিছু হইবে না, তাই শক্তিপূজা অর্থাৎ শক্তিসঞ্চার। গুরু-পূজা, গুরুর আশ্রয় না পাইলে শক্তি-সঞ্চার হয় না। গুরুর আশ্রয় চাই, তবেই উপরের দুইটিও হয়। স্তরে স্তরে সব আছে।"**

তারপর কথা উঠিল এই রাজ্যে নাকি একটী গণের (দেবতাদের গণ বলে না) উপদ্রব আছে, মধ্যে মধ্যে কেহ তাহাকে দেখিতে পায়, কথাবার্ত্তা বলে। স্ত্রীলোকের উপর বড়ই অত্যাচার করে। একবার একটী সিপাহীকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। গণের নাম নরসিং। সেই গণ নাকি নানা রকম রূপ-ধারণ করে। কখনও বাঘ, কখনও সিংহ, এমন কি একবার নাকি রাজার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাণীর নিকট গিয়াছিল, রাণী

হঠাৎ বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। এই রকম কত কি ঘটনা শুনিতে লাগিলাম। পাহাড়ের ধারে একটা স্থান আছে, ছোট ছোট ছেলেরা দুপুরে সেই স্থানে গেলেই নাকি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে। রাজা নিজেও মাকে আজ এই বিষয়ে বলিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "কি করিব মা"? সকলেরই প্রার্থনা এই উপদ্রব যেন রাজ্য হইতে দূর হয়। মা বলিলেন, "যে দিন এখানে আসিয়াছি সেই দিনই ইহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে। একজন আছে, সত্যিই।"

কথা হইতেছে, এর মধ্যে যতীশদাদার অবস্থা দেখিয়া মা বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কিছু দেখিতেছ নাকি?" তিনি বলিলেন, "হঁা মা, এই জানালার কাছে আমি একটা মূর্ত্তি দাঁড়ানো দেখিলাম। প্রথম ভাবিলাম চোখ ঠিক নাই পরে বারে বারে চোখ মুছিয়াও দেখিলাম দাঁড়াইয়া আছে। প্রকাণ্ড মূর্ত্তি মার পায়ের দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া ছিল।"

কেহ কেহ রাজাকে বলিয়াছিলেন ইহার পূজা দিতে, কিন্তু রাজা বলেন, "আমি কখনও উহার পূজা করিব না, আমি জগন্মাতার পূজা করি, আমার ভয় কি? আমি আর কাহারও পূজা করিব না।" রাজা রাত্রিতে এ' বিষয়ে চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহিলেন—মার কি আদেশ।

মা হরিরামকে দিয়া লিখাইলেন; "প্রথম হইল, তুমি এই ভাব নিতে পার যে, আমার লক্ষ্য ঠিক রাখিতেই হইবে—লক্ষ্যে পৌছিবার ইহা এক বাধা-স্বরূপ, ইহা আমাকে বাধা দিতেছে, ইহা মনে রাখিবে। দ্বিতীয় হইল, ইচ্ছা করিলে ও মনে সংশয় জাগিলে, এই ভাবও নিতে পার, যাহাকে পূজা করি তিনিই এই মূর্ত্তিতে আসিতেছেন, এই ভাবিয়া পূজা করিলেও করিতে পার, ক্ষতি নাই। সবই ত সেই একেরই রূপ। তোমার পূর্ব্বপুরুষ যখন পূজা করিয়া গিয়াছেন, তাই এই কথা। তৃতীয়তঃ

এই ভাব নিতে পার—আমি আমার ইষ্ট দেবীকেই পূজা করিয়া যাইব, তার ফলে খারাপ ভাল যাহাই হয়, আমি গ্রাহ্য করিব না।"

"এই তিন ভাবের যে ভাব ইচ্ছা তুমি নিতে পার। তবে, ইহার পূজার জন্য ভিন্ন মূর্ত্তি বা মন্দিরের আবশ্যকতা নাই, ইহা শক্তি ও শিবের অনুচরগণের মধ্যেই একজন।" আরও বলিলেন, "ইহা একটা ভাব।" আমরা ঠিক ঠিক ধরিতে পারিলাম না। "সুতরাং দেবীর ও শিবের পূজা ত মন্দিরে হইতেছেই কাজেই তাঁহাদের সঙ্গে অনুচর ত আছেই, ভিন্ন মন্দির বা পূজার আবশ্যকতা কিছুই নাই।"

রাজা এই তিনের মধ্যে শেষ ভাবটাই নিলেন। মা বলিলেন, "আমি বুঝিয়াছিলাম রাজা শেষ ভাবটাই নিবে, কারণ রাজার ভাবটা বেশ ভাল। তবে রাজার প্রশ্ন এই হইল, ইহা যদি শক্তি অথবা শিবের অনুচর হয় তবে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার, এই সব খারাপ কাজ, করে কেন?" মা বলিলেন, "সকলের মধ্যেই স্তর-ভেদ আছে, খারাপ, ভাল আছে।"

মা আরও বলিলেন, "এইটা কখনও কখনও মৃত ব্যাক্তির অতৃপ্ত আত্মার সহিত মিলিত হইয়াও কাজ করে। অতৃপ্ত আত্মাদের তো নানা রকম প্রকাশ হয়।"

মার নিকট ভক্তেরা যে সব চিঠি পত্রাদি দেন, মধ্যে মধ্যে অতি অল্প কথায়, মা তাহার যে সব উত্তর বলেন, তাহাও অতি অমূল্য জিনিস। একজন প্রশ্ন করিয়াছেন "গুরু কে? দীক্ষা কি?" মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা বলিলেন, "গুরু অর্থাৎ গুরুতত্ত্ব অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে যে যুক্ত আছে, তাহা যিনি জানাইয়া দেন। তিনিই গুরু। একমাত্র তিনিই তাঁকে জানান ত? দীক্ষা অর্থাৎ গুরু বা ইষ্টই দীক্ষারূপে প্রকাশিত হন। কারণ ইষ্ট, মন্ত্র ও

গুরু ত একই।" আবার একজনকে লিখিতে বলিলেন, "সেই একেরই ধ্যানে থাকিতে চেষ্টা কর। সময় ত চলিয়া যাইতেছে। মূলে না গেলে ত ফল পাওয়া যাইবে না।"

২৯শে আশ্বিন, রবিবার।

আজ বেলা ৯টায় রাজাসাহেব মোটর পাঠাইয়া মাকে তাঁহার বাড়ীতে পূজামন্দিরে নিয়া গেলেন। পূর্ব্বেই কথা ছিল, আজ তৃতীয়া তিথিতে, রাজাসাহেব মাকে পূজা করিবেন। মার ত থাকার ঠিক ছিল না, যদি থাকেন এই ভরসায় পূজার আয়োজন চলিতেছিল। রাজার সানুনয় অনুরোধ ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অনুরোধ ছিল; মা কৃপা করিলেন, তৃতীয়া পর্য্যন্ত রহিলেন।

রাজার ইচ্ছা মাকে একান্তে পূজা করেন, অপর কেহ থাকিলে ভাব নষ্ট হইবার আশঙ্কা। আমরা নীচে রহিলাম। রাজাসাহেব এক পণ্ডিতকে কাছে রাখিয়া পূজা করিবেন। আমরা পূজার ঘরে মাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলাম। দেখিলাম কত রকমের কত ঐশ্বর্য্যে সেই ঘর সাজানো হইয়াছে। সর্ব্বোপরি রাজার ভক্তিভাব পূজার ঘরখানি যেন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তিনি শুদ্ধ বস্ত্র পরিয়া বসিয়াছিলেন, মা যাইতেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুষ্পাঞ্জলী দিতে লাগিলেন। রাজার ছল ছল চক্ষুতে ভিতরের শুদ্ধ ভাব যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

আমরা নীচে আসিয়া বসিলাম। রাজার মন্ত্র-ধ্বনি একটু একটু

শুনা যাইতেছিল। তিনি পূজা আরম্ভ করিলেন সঙ্গে সঙ্গে বিউগল্ ও ব্যাণ্ড্ বাজিতে লাগিল। মহা আড়ম্বরের সহিত রাজাসাহেব পূজা শেষ করিয়া আমাকে উপরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উপরে, পূজার ঘরে গিয়া দেখি মা রাজপ্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কারে ও পুষ্পচন্দনে যেন রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিয়া আছেন। নানা রকম জরীর-কাজ-করা মখমলের গদিতে মাকে বসান হইয়াছে। ঘরখানির চারিদিকেই প্রায় পূজার জিনিষে ভরা। সিল্কের শয্যা, বস্ত্রাদি, গরম কাপড়, থালা ভরা টাকা, অলঙ্কারাদি, কিছুরই ত্রুটী নাই। আরতির গন্ধে ঘরখানি ভরপুর। একখানি সোনার দেবীমূর্ত্তিও রাখা হইয়াছে; ঘটও একপাশে বসানো আছে, তাহার মধ্যে তরবারি। আবার একটী রৌপ্য নির্ম্মিত সুন্দর পদ্মের মধ্যে হীরার শিব-লিঙ্গ; 'ত্রিপুরা-ভৈরবী' এবং আরও দুই একটী মূর্ত্তি মহামূল্য রত্ন-নির্ম্মিত দেখিলাম। উপরে রূপার কলসীতে গঙ্গাজল দেওয়া আছে, শিবলিঙ্গের উপর পড়িতেছে; আবার সেই জল নীচে গোমুখের মত করা আছে, তাহা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। রাজা নিজেই এই সব দেখাইয়া বলিলেন, "আমি যেখানেই যাই এই সব আমার নিত্য পূজার জন্য সঙ্গেই থাকে।" দেয়ালে দেখিলাম, একটী খোপের মধ্যে কালীমূর্ত্তি ও মার ফটো একখানা, অপর দিকে রাজার গুরুদেবের ছবি টাঙানো রহিয়াছে।

রাজাসাহেব মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, আমিও তথায় বসিলাম। নানা কথা হইতে লাগিল। রাজা বলিতে লাগিলেন, "একদিন রাত্রিতে দেখিতেছি শয্যাগৃহে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা, প্রথমে ভয়ানক ভয় হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, মনে করিলাম চাকরদের ডাকিব, কিন্তু আবার ভাবিলাম, না, তাহা করিব না, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে সেই মূর্ত্তি বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই

শুনিতেছি, বাহিরে যেন কে খড়ম পায়ে দিয়া পায়চারি করিতেছে, চারি দিকেই পাহারা, আমার শয্যাগৃহের নিকট কোনও লোক আসিবার সম্ভাবনা নাই, আমি বুঝিলাম ইহাও অলৌকিক ব্যাপার, কিন্তু ভয় পাইলাম না, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতেই সব থামিয়া গেল।

তারপর নরসিং গণের কথা উঠিল। মা কাল রাত্রিতে যে তিনটি ভাবের কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, রাজা শেষোক্ত ভাবটিই নিয়াছেন জানিয়া মা বলিলেন, "আমি জানিতাম তুমি এই ভাবটিই নিবে। তোমার যদি ইচ্ছা হয় কোন স্থানে ইহার খাওয়ার কিছু দিলে কেমন হয়?" রাজা কথায় কথায় বলিলেন, "মা, এইটা বড় ভয়ানক, আমার ঠাকুরদাদা নিজে ইহার সব সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এমন কি এক ছিলিম তামাক খাইলে পর্য্যন্ত উপরে নরসিংহের সেবার জন্য এক ছিলিম পাঠাইয়া দিতেন। সেই ঘর হইতে তামাক খাওয়ার শব্দ পর্য্যন্ত আসিত। কিন্তু এত সেবা সত্ত্বেও মহলের স্ত্রীলোকদের উপর উহার অত্যাচার চলিত, তাই আমি সে সব উঠাইয়া দিয়াছি। আমি উহার সেবার জন্য কোন স্থানে ব্যবস্থা করিলেও মহলে ধাওয়া করিবে, আমি তা' চাহি না।"

"ইহার পূর্ব্বে আরও একবার আমি পূজা করিয়া যেই উচ্ছিষ্ট 'চণ্ডালিন্যৈ নমঃ' বলিয়া নৈবেদ্য পিছন দিকে নিয়াছি অমনি হাতের আঙ্গুল টানিয়া কে তাহা নিয়া গেল। তাহাতেও আমার শরীর ভয়ে কাঁপিতেছিল, কিন্তু আমি তবুও বসিয়াছিলাম। এক কথা মা, এই নরসিং এই রাজ্যমধ্যে আমার পিতামহের আমল হইতেই নানারূপ উপদ্রব করিতেছে, আমি তাহার সেবার কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই না।" মা বলিলেন, "বেশ, তবে তোমার কোনরূপ সেবার ব্যবস্থা করিয়া কাজ

নাই। তুমি এমন একটা আদেশ দিয়া যাইও, যাহাতে তোমার বংশের কেহই ঐ মূর্ত্তির কোনরূপ পূজা না করে।' আর তোমার কিছুই ভয় নাই। তুমি যখনই ভয় পাইবে, শুধু চুপ করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তুমি কোন রকম ভয় করিও না।"

রাজা ছল ছল চোখে হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, "মা, সর্ব্বদা কৃপা রাখিও, আর আমার প্রার্থনা—আমি রাজ ঐশ্বর্য্য কিছুই চাহি না। ২৭ বছর এর মধ্যে কাটাইলাম আমার যেন বন্ধন-স্বরূপ লাগিতেছে। আমায় জ্ঞান ও বৈরাগ্য দেও।" শুনিলাম, রাজা সংসার ত্যাগ করিয়া সাধন ভজন করিবার জন্য একটি গুহা প্রস্তুত করাইয়াছেন। রাজার প্রার্থনা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। খানিক পরে মা উঠিবেন, বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি মার গায়ের রত্নালঙ্কারগুলি ও বস্ত্রাদি ধীরে ধীরে খুলিয়া রাখিলাম। মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রাজা মার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন।

ঐশ্বর্য্য অনেকের আছে কিন্তু এক দিকে ঐশ্বর্য্য এবং অপর দিকে শুদ্ধ ভক্তি এই দুইয়ের মিলনে রাজার পূজা আমাদের বড়ই মনোরম লাগিয়াছিল। এই দুইয়ের মিলন বড় দেখা যায় না!

রাত্রে রাজার জিনিষ পত্র কোথায় রাখা সেই সব কথা হইল। মার ভাবানুযায়ী আমরা বলিলাম, মা ত অনেক সময়ই যাহারা জিনিষ পত্রাদি দেয় তাহাদের ঘরেহ রাখিয়া আসেন। তাহাদের মনে কোন রকম আঘাত না লাগে সেই জন্য বলেন, "আমার ত ভিন্ন একটা বাক্স, বাড়ী নাই, বাবা মার বাড়ী এবং বাক্স পেঁটরাই আমারও বাড়ী এবং বাক্স পেঁটরা। আমি আমার বাবা মার কাছেই রাখিয়া দিলাম। ছেলে মানুষ আর কোথায় রাখিব, ছেলে পেলেরা ত একটা জিনিষ পাইলে বাপ

মার কাছেই রাখিতে দেয় আমি তাহাই রাখিয়া দিলাম।” এই সব কথায় এবং মার ভাব দেখিয়া, “ফিরাইয়া দিল” এই ভাব কাহারও জাগে না। মার ঐ ভাবের কথায় যতীশদা ও আমি বলিলাম, “এই বহুমূল্য জিনিষ আমরা সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিয়া যাইব, রাজার বাড়ীতেই এক ঘরে সাজানো থাক।” কিন্তু রাজা তাহাতে রাজী হইলেন না, বলিলেন, “যদি মার ঘর আমি করিতে পারি জিনিষ পত্রে সাজাইবার শক্তিও মা আমায় দিয়াছেন, এই সব রাখা হইবে না।”

মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, “তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর, সবই ত তোমরা করিতেছ।” একবার বলিয়াছিলেন রাজার যে সব চাকরেরা জিনিষ পত্রাদি নিয়া আসিয়াছে, তাহাদের এক একটা করিয়া দিয়া দিতে। কিন্তু হরিরাম বলিল, “এইরূপ করিলে, ‘সব ফিরাইয়া দিল’-বলিয়া রাজার মনে ব্যথা লাগিবে।” মা আর কিছু বলিলেন না। ঐ রকমই সব সাজানো রহিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাজা ও রাণীরা আসিয়াছেন। বুনির ইচ্ছা হইল মাকে ঐ সব বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া দেয়, রাণীরা দেখিবে, কারণ তাহারা ত দেখে নাই। এই প্রস্তাব রাণীদের নিকট করিতেই তাঁহারা মহানন্দে এই কথার সমর্থন করিয়া নিজেরাই মাকে সাজাইতে লাগিলেন। বুনিও সঙ্গে সঙ্গে মাকে সাজাইয়া দিল। বিদ্যুতের আলোতে মার বস্ত্রালঙ্কার ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। সকলে মাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

মা হঠাৎ বালিকা ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রাজাকে বলিতেছেন, “পিতাজী, পূজার পর খুকুনি যখন ফুলের মালা তোমার গলায় দিয়া দিতেছিল তখন আমার একটা খেয়াল জাগিয়াছিল তুমি যদি দুঃখিত না হও তবে বলিব।” রাজা হাতযোড় করিয়া বলিলেন, “না মা আপনার যাহা

খেয়াল হইবে, তাহাই আমার মঙ্গলের জন্য জানিব, আপনার খেয়ালে বাধা দেবার শক্তি আমার নাই, আমি তাহা ইচ্ছাও করি না। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন।" মা তখন বালিকা ভাবে যেন খল খল করিতেছেন ; সেই ভাবেই হাসিতে হাসিতে রাজার কাছে গিয়া গলার বহুমূল্য রত্নহার পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমার গলার ফুলের মালা ত খুলিয়া তোমাদের দেওয়া হয়, **আমার নিকট ত ফুলের হার ও এই হারে কোনই পার্থক্য নাই।"** রাজা হাতযোড় করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মা উপস্থিত সকলের মধ্যে গহনা ও বস্ত্রাদি প্রায় সবই বিলাইয়া দিলেন। এমন ভাবে দিতেছেন ও কথা বলিতেছেন যে, কাহারও কিছু বলিবার নাই। আমিও রাজা এবং রানীদের বলিতে লাগিলাম, "আপনাদের ত কিছুই বলিবার নাই, মার জিনিষ মা যাহাকে যে ভাবে ইচ্ছা দিবেন, এর মধ্যে আপনাদের কিছু বলিবার ভাব জাগিলেও বুঝিতে হইবে মার চরণে দিতে পারেন নাই। জিনিষের মধ্যে নিজস্ব ভাব রহিয়া গিয়াছে। এই কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া আর কিছু বলিলেন না, শুধু ছল ছল চোখে মার দিকে চাহিয়া হাতযোড় করিয়া রহিলেন। আমি রাণীর অনুরোধে মার একজোড়া পাদুকা রাজাকে দিলাম। রাজা তাহা মাথায় রাখিলেন।

আগামীকল্য প্রাতে মা বৈদ্যনাথ রওনা হইয়া যাইবেন। রাজা একপাশে যাইয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন, রাণীরাও কাঁদিতেছেন। সকলের অসাক্ষাতে বর্ত্তমান রাণী কি একটা জিনিষ মার মুখে দিয়া প্রসাদ পাইলেন। বোধ হয় ঐ জিনিষটা তিনি ভালবাসেন, তাই আজ মাকে দিতেছেন। ইঁহাদের ভাব দেখিয়া আমরাও মুগ্ধ। রাণী মাকে অনুরোধ

করিলেন, "মা রাজসাহেবকে একটু সান্ত্বনা দিন। মা উঠিয়া রাজার কাছে আসিয়া "নারায়ণ স্পর্শ করিতেছি"—বলিয়া রাজার মাথায় হাত দিতেই রাজার ক্রন্দন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল, মার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। রাত্রি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া ধীরে ধীরে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৩০শে আশ্বিন, সোমবার।

আজ প্রাতেই আমরা রওনা হইলাম। গতকল্য মা গহনা এবং সিল্কের সাড়ী ইত্যাদি বিলাইয়া দিয়াছেন। নগদ টাকাও (প্রণামী) থালায় সাজাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু যখন মাকে সাড়ী ও গহনা ইত্যাদি পরান হয় টাকার থালা তখন নিকটে ছিল না, থাকিলে সাড়ী ও গহনার মতই বিলাইয়া দিতেন। রওনা হইবার সময় খেয়াল হইল যে নিকটের ফল ফুল যেমন বিলাইয়া দেওয়া হয় তেমনি টাকাও বিলাইয়া দেও।

রওনা হইবার সময় রাজাসাহেব আসিলেন। তাঁহার চোখের জল পড়িতেছে। মা'র পিছে পিছে যাইয়া মোটরে মাকে তুলিয়া দিয়া মোটর যেই ছাড়িবে ঐ সময় রাজা হাতের নবরত্নটী হরিরামের হাতে দিয়া বলিলেন, "মা ত সবই বিলাইয়া দিয়া গেলেন, এই জিনিষটা অনেক দিন আমার নিকট আছে, আমি হাতে দিয়া পূজা করি, এই জিনিষটা যেন আর আমার রাজ্যে বিলাইয়া না দেন, এই আমার অনুরোধ।" নিজে দিতে সাহস পাইলেন না। হরিরামভাই মাকে এই সব কথা বলিয়া ঐ নবরত্ন মার হাতে পরাইয়া দিলেন মা তখনও বলিলেন, "আমার জিনিষটা বাবার নিকট ত রাখতে পারে?" কিন্তু রাজাসাহেবের কাতর ভাব ও বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন দেখিয়া আমরা মাকে ঐ জিনিষটা খুলিতে দিলাম না। মা বলিলেন, "আমার ত হাতে কিছু থাকিবে না

কোথায় যায় ঠিক কি ?” এই সব কথা হইতেই মোটর চলিতে লাগিল, রাজা বলিলেন, “তা’ যাহা ইচ্ছা করিবেন।”

উপস্থিত তাহা মার হাতেই রহিল। আমাকে বলিলেন, “তোরা দেখ্‌বি, রাখ্‌বি, যতটুকু সময় থাকে থাকবে।” আমরা মার সঙ্গে রওনা হইলাম। সকলেই মার গায়ে ফুল ছিটাইয়া দিতে লাগিল। রাজার মোটরেই আমরা চলিলাম। মাকে পাঠানকোটে ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া মোটর ফিরিবে, এই রাজার আদেশ।

রাজ্যের সীমান্তে গিয়া দেখি রাজাসাহেব। কিছু পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়া মার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মা পৌঁছিতেই তিনি বারংবার অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। বলিলেন, “মা, ইহাই রাজ্যের শেষ সীমানা, কৃপা রাখিবেন, আবার দয়া করিয়া আসিবেন।” মা হাসিয়া সকলকে যেমন বলেন, তেমনই বলিলেন, “যখন মেয়েটাকে নিয়ে আস্‌বে তখনই আস্‌ব। আর আমি যাইব কোথায় ? আমি ত তোমাদের কাছেই আছি। আমি কোথাও যাই না।”

আমাদের পিছনের বাসে হরিরাম প্রভৃতি ছিল। রাজাকে দেখিয়া তাহারা গাড়ী থামাইতেই, তিনি একটি গান লিখিয়া হরিরামের হাতে দিলেন, মাকে দিবার জন্য। হরিরামভাই পরে তাহা মাকে দিয়াছিলেন। গানটী এই—মেরা বাঁধে ন ধীরজ মা তুমে ছোড়কে ম্যায় ক্যায়সে রহুঁ ইঁহা মা॥

আমরা এর মধ্যে একদিন সকালবেলা শুকদেব আশ্রমে গিয়া সারাদিন তথায় থাকিয়া বৈকালে চলিয়া আসিয়াছিলাম। যতীশদাদা, দেবীজী হরিরাম প্রভৃতি গুহায় কিছু সময় বসিয়াছিলেন।

আজ মোটারে শুকদেবের কথা উঠিল, অভয় বলিল, "মা, আপনি কি ওখানে শুকদেবকে দেখিয়াছিলেন?" মা বলিলেন, "হঁ্যা।"

অভয়—"আচ্ছা, ওখানেই তিনি ছিলেন? কি অপর স্থান হইতে আসিয়াছিলেন?"

মা—"না, ওখানেই প্রকাশ হইয়াছিল।"

তারপর কথা উঠিল হিমালয়ে নাকি ঘোড়ার মুখের মানুষ আছে, মা বলিলেন, "হাঁ, যখন যোগক্রিয়াগুলি শরীরে হইয়া গিয়াছে তখন ঐ সকলের সঙ্গেও দেখা হইয়াছে। আরও কত কি দেখা যাইত, এক তামাসা! খেলা আর কি, সবই ত খেলা।"

দেখিতে দেখিতে আমরা মুণ্ডি, যোগেন্দ্রনগর ছাড়াইয়া চলিলাম। সুকেত হইতে মুণ্ডি ষ্টেট বড়। এ'দিকে প্রকৃতরাণী যেন নিজের রূপ ছড়াইয়া দাঁড়াইয়াছেন; কোথাও সমতল ভূমিতে নানা রকম শস্যের ক্ষেত, আবার তাহার পিছনেই পর্ব্বতশ্রেণী, কোথাও তুষার মণ্ডিত পর্ব্বত চূড়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

চারি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আমরা বৈজনাথ আসিয়া পৌছিলাম। স্বামিজী মহা আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া মাকে নিয়া গেলেন। মন্দিরে ৺তারামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে, আগামীকল্য কাজ আরম্ভ হইবে। কথা হইল আগামীকল্য মোটরে আমরা জ্বালামুখী হইয়া আসিব। কিন্তু রাত্রিতে মার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। মা কিছু বলেন না, চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। যতীশদাদা নাড়ীর গতি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন। আমরা প্রায় সারারাত বসিয়া রহিলাম। মার সাড়া শব্দ বিশেষ নাই। চুপ করিয়াই আছেন। জিজ্ঞাসা করিলে

মৃদুভাবে বলেন, 'কোন কষ্ট বা অসুবিধা নাই ত। তবে শরীরটা চুপ হইয়া যাইতেছে।'

৩১শে আশ্বিন, মঙ্গলবার :—

মা অতি প্রত্যুষেই ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "সব ঠিক কর, চল যাই। আমার জন্য ভাবিও না আমি ভালই আছি। গাড়ীতেও বসিয়া থাকিব এখানেও বসিয়া থাকিব।" আমাদের কাহারও ইচ্ছা নয়, মা এই অবস্থায় যান। যতীশদাদা মার পায়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, এখন যাওয়ার দরকার নাই। আমাদের জন্যই ত তুমি যাইতে চাহিতেছ, আমরা দেখিতে চাই না। পরে যাহা হয় হইবে। আজ বন্ধ কর।" অগত্যা মা বলিলেন, "বেশ, তোমাদের যাহা ইচ্ছা।" যাওয়া বন্ধ রহিল।

বেলা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মা উঠিয়া বসিলেন। কার্য্যারম্ভের সময় স্বামিজী মাকে মন্দিরে ডাকিয়া নিয়া বসাইলেন। মার সম্মুখে কার্য্যারম্ভ হয়, এই তাঁর ইচ্ছা। ব্রাহ্মণগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। যথা নিয়মে পূজা আরম্ভ হইল। অষ্টমীতিথিতে ৺তারামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে।

বৈকালে মাকে দর্শন করিতে গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক আসিয়াছেন, মা উহাদিগের মধ্যে তুই এক জনকে দেখাইয়া বলিতেছেন, "যখন আমি জ্যোতিষকে নিয়া এখানে তুই মাস ছিলাম এ আমাকে রুটি করিয়া খাওয়াইয়াছে। এ আমার চুল আঁচড়াইয়া দিয়াছে।" স্ত্রীলোকেরাও অতি পরিচিতের মত মার গায়ে হাত দিয়া কত কথা বলিতে লাগিল। কথা সব বোঝা যায় না। তবুও তাহারা মার নিকট প্রাণের কথা বলিয়াই যাইতেছে। মা এত দিন পর

আসিয়াছে, সেই সব কথাও বলিতেছে! মা'ও ঠিক সেই রকম হাত মুখ নাড়িয়া হাসিয়া তাহাদের গায়ে হাত দিয়া অবিকল ঐ রকম করিতেছেন। যেন তাহাদেরই দলের একজন। আমরা মার এই রসঙ্গ দেখিয়া হাসিতে লাগিলাম।

মা কথাচ্ছলে সকলকেই প্রায় বলেন, **"এক চিন্তায় এক লক্ষ্যে যত বেশী সময় দিতে পার। দিনগুলি বৃথা কাটাইও না।"**

১লা কার্ত্তিক, বুধবার :—

আজ মাকে দুই এক জায়গায় নিয়া গেল। ষ্টেশন-মাষ্টারের বাড়ীতেও মাকে নিল। মা ষ্টেশন-মাষ্টারকে কথায় কথায় বলিলেন, **"বাবা, তোমার বাড়ী কোথায়? এটা ত শ্বাসের বাড়ী। অনেক সময় বলা হয়, এই বাড়ীকে ধর্ম্মশালা বানাও। যেমন তোমরা কোথায়ও যাওয়ার সময় জিনিষ পত্র গুছাও না? এ'ও ঐ বাড়ীতে যাওয়ার জন্য পাথেয় সম্বল কর।"**

২রা কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার :—

আজ সপ্তমী পূজা। হংসভাইকে দিয়া মার পূজা করান হইল। আমরা সকলে অঞ্জলি দিলাম, স্তোত্রাদি পাঠ হইল। আজ তারানন্দ স্বামিজীকে আমাদের এখানে ভিক্ষা দেওয়া হইল। মা তাঁর নিকটেই ভোগে বসিলেন। স্বামিজীকে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সব দিতে ও হাতে জল ঢালিয়া দিতে বলিলেন। সব দিকেই মার পূর্ণ দৃষ্টি। মা বলেন, **"যখন যাহা করা মন প্রাণ দিয়া করিতে হয়।"**

আজ সকালে উঠিয়া বলিতেছেন, "দেখিলাম প্রকাণ্ড এক হলে কীর্ত্তন

২০

হইতেছে, ছোট ছোট দেববালারা আছে ; কালী দুর্গা সব পূজা হইতেছে। তোরাও আছিস সারারাত কীর্ত্তন হইল।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কীর্ত্তনান্তে তোমাকে সকলে প্রণাম করিল নাকি ?" মা হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সেই যে সিমলাতে ভূপেনবাবুরা সব কীর্ত্তনাতে প্রণাম করিল না, তারাও করিল। **কে কাকে প্রণাম করে বল দেখি ? নিজেই নিজেকে প্রণাম করে। এই শরীরটা উপলক্ষ্য মাত্র।"**

তারপর বলিতেছেন, 'ভোরে প্রায় সকলেই বিদায় নিল। আমাকে যেমন নানা স্থানে নিয়া যায় না, সেই রকম কোথায় যেন কে নিতে আসিয়াছে, তুই যেন কি একটা জিনিস আনিতে গিয়া সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিস্। আমি ভাবিতেছি, খুকুনি কোথায় গেল, আমার ত যাইতে হইবে, কে তোকে ডাকিয়া আনিবে। দেবীজী কাছে আছে, সে এত দূরে যাইয়া ডাকিয়া আনিতে দেরী হইবে। অগত্যা যেন দেবীজীকে নিয়াই রওনা হইলাম, সঙ্গে আরও একটী শিশু।" অভয়ের জিজ্ঞাসায় মা বলিলেন, 'ঐ শিশুটি হইল মরণীর ভাই দাশু।'

মা বলিতেছেন, 'দাশু ও দেবীজীকে নিয়া রওনা হইলাম। একটা সিঁড়ির উপর অভয় বসিয়া যেন কি করিতেছে, আমি তাহাকে ইসারা করিয়া সঙ্গে যাইতে বলিলাম, সে যেমন মধ্যে মধ্যে গা-ছাড়া ভাবে বলে না, 'কোথায় যাইব'—তেমনিই বলিল 'কোথায় যাইব'। আমি আর না দাঁড়াইয়া চলিলাম। গাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছি দেখি অভয় ধীরে ধীরে আসিতেছে। আমি অপেক্ষা করিলাম না, যাহারা নিতে আসিয়াছিল তাহারা দূরে অভয়কে আসিতে দেখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই দেখিলাম।"

আমি বলিলাম, "বা! বেশ ত তুমি, আমার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই

চলিলে?" মা বলিলেন, "আমি ত অনেকবার ভাবিলাম খুকুনীকে কি করিয়া খবর দেই? কোথায় গেল? যাওয়ার সময় সঙ্গেই বা কে যায়? কিন্তু পাঠাইব কাহাকে? এর অর্থ বুঝলি তুই যে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে থাকিস্ সেটা ভাল নয়।" আমি বলিলাম, "শুইবার সময় যাহার বেশী হয় না, সে ঝিমাইবে না কি করিবে? সব সময় সঙ্গে থাকিতে চাই তাইত শুই না, আর ঝিমান দোষ হইল?" মা সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, "তাত ঠিকই এই যেমন নানাস্থানে নিয়া যায় না, এই শরীরটাকে সেই রকম নিয়া যাইতেছে। তবে সঙ্গে থাকিস্ সর্ব্বদা তাই ভাবিলাম খুকুনী কোথায় গেল এখন ত দেরী করা যায় না এই আর কি?" আমি কিন্তু তেমন সান্ত্বনা পাইলাম না।

আজ ৺তারা মার পরিক্রমা। কাল প্রতিষ্ঠা হইবে। অনেক লোক একত্রিত হইয়াছে। পরিক্রমায় বাহির হওয়া হইল। রাজার মোটর ত মার জন্য ছিলই সেই মোটরে মা, তারানন্দ স্বামিজী ও আমরা কয়েকজন পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। রাস্তায় এক স্থানে দাঁড় করাইয়া একটী পণ্ডিত তারানন্দ স্বামিজী ও শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে কিছু কিছু বক্তৃতা দিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। এখানকার একজন ধনী, কানাই লাল বাবু, মার দর্শনে আসিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বেও একবার মাকে নিজ বাড়ীতে নিয়া গিয়াছিলেন। সেই-খানে তাঁহার গুরুদেবের জন্য এক কুটিয়া করিয়াছেন। আজও মাকে নিবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আগামীকল্য প্রতিষ্ঠার পরই আমাদের রওনা হইবার কথা। স্থির হইল, যাইবার পথে অল্প সময়ের জন্য তাঁহার ওখানে হইয়া যাওয়া হইবে। তিনি হাতযোড় করিয়া বলিতেছেন, "মাকে কষ্ট দিতেছি।" মা অমনি বলিয়া উঠিলেন,

"মেয়েটার বাপের কাছে যাইতে কি কষ্ট হয়? তোমরা এই শরীরটাকে এত দূর ভাব কেন? তোমরা দূর করিলেও আমি কিন্তু বলিব আমরা সকলেই এক।" কথায় কথায় বলিতেছেন, "দুনিয়া কিনা, তাই কষ্ট। দুনিয়ার দিকে গেলে ব্যথা পাওয়া অনিবার্য্য; দুনিয়ার দিকে যাওয়া কি রকম জান, যেন আঘাত করিয়া ঘা বাড়ান। আর ভগবানের দিকে যাওয়া অর্থাৎ কিনা মলম লাগান। জগতের সম্বন্ধই কষ্টদায়ক। যেমন, কোন ভাল জিনিষ খাইলে তার পিতাকে বা পুত্রকে বা আত্মীয় স্বজনকে বলে, তোমরাও এই জিনিষ খাইয়া দেখ কেমন মিষ্টি। তেমনই বলা হয়, তোমরা তাঁর নাম কর, তাঁর নাম ছাড়া শান্তি নাই।"

রাত্রিতে বহুলোক সমবেত হইয়া কীর্ত্তনাদি করিল। স্বামিজী এবং অন্যান্য সকলেই ভগবতী ভাবে মার সহিত ব্যবহার করিতেছেন। নানা স্থান হইতে মার দর্শনে লোক আসিতেছে।

৩রা কার্ত্তিক, শুক্রবার ঃ—

আজ মহাষ্টমী। আজ ৺তারামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইল। স্বামিজীই করিলেন। আজও ব্রাহ্মণগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। মাকে নিয়া মন্দিরে বসাইয়া মার সম্মুখে স্বামিজী কার্য্যারম্ভ করিলেন। আজ অভয় মাকে পূজা করিল এবং যজ্ঞাদি করিল। তারপর বেলা প্রায় ২টার আমরা রওনা হইলাম। ক্যাংড়া বৈকালে পৌছিয়া তখনই বাসে জ্বালা-মুখী রওনা হইয়া সন্ধ্যার পর তথায় পৌছিয়া দর্শনাদি করিলাম। মন্দিরের মধ্যে স্থানে স্থানে পাথরের ভিতর দিয়া সর্ব্বদাই অগ্নি বাহির হইতেছে। এক ঘটি জল তাহার মধ্যে ধরিলে আগুনটা একটু সময়ের জন্য জলের

মধ্যে আসে। দেখিলাম মন্দিরে স্থানে স্থানে কীর্ত্তন, পূজা ও পাঠ ইত্যাদি হইতেছে। আমরা রাত্রিটা বাসেই কাটাইলাম।

৪ঠা কার্ত্তিক, শনিবার ঃ—

আজ ভোরে আবার ক্যাংড়া রওনা হইলাম এবং সেই দিনই ক্যাংড়া হইতে পাঠানকোট আসিয়া ট্রেন ধরিলাম এবং অমৃতসর পৌঁছিয়া আজ তথায়ই থাকা স্থির করিলাম। ষ্টেশনমাষ্টার নিজে আসিয়া ধর্ম্মশালার সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন। আগামীকল্য শিখদের বিখ্যাত ধর্ম্ম-মন্দির দেখিতে যাইব স্থির হইল।

রাত্রিতে মা ভোগের পরে শুইয়াছেন, আমি বসিয়া মার গায়ে হাত বুলাইতেছি, কেহ কেহ ঘুমাইয়াছেন। বুনিও বসিয়াছিল। মা বলিতে-ছেন, "খুকুনী! অভয় না সে দিন বলিতেছিল, 'মা স্বপ্ন দেখিয়া এ'সব বলেন নাকি ?" কথা হইল, সে দিন বৈজনাথে যে ঘটনা মা প্রাতে বলিলেন, তাহা শুনিয়া অভয় বলিয়াছিল,—মা স্বপ্ন দেখিয়াছেন হয়ত। নতুবা ও সব স্থানে আমরা গিয়াছি এ'সব মা কি দেখিলেন ? আমাদের কি আর ও সব যায়গায় যাওয়া সম্ভব ? "এখন ত তোদের সঙ্গে কথা বলিতেছি, এই ত দেখিতেছি উত্তরকাশীর মত এক স্থানে গঙ্গার মধ্যে একটা পাথর আছে। পাথরের চারিদ্দিকে জল। সেই পাথরের উপর কয়েকজন সাধু সাধন করিতে করিতে শিশুর মতই তাহাদের ভাব হইয়া গিয়াছে। তাই তাহাদের সাত আট বছরের শিশুর মতই দেখাইতেছে। এই শরীরটাও সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। যেমন তোদের নিকট আছে ঠিক এই ভাবেই শরীরটার প্রকাশ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, কয় জন সাধু ?" শুনিয়া শুনিয়া যেমন বলে সেই ভাবে বলিতেছেন

"এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়। নয়জন সাধু।" আবার তখনই বলিতেছেন, "আরও দেখিতেছি গঙ্গোত্রীর রাস্তায় এক সাধু, তাঁহার বাহিরের আহারের দরকার নাই। তাঁহার কাছেও এই শরীরটা এই ভাবেই প্রকাশ হইয়া আছে একটুও পার্থক্য নাই। তোরা ত ভাবিতেছিস্ তোদের নিকট আছে। সেখানেও কিন্তু ঠিক এই রকমই। এ'যদি স্বপ্ন হয় তবে সবই স্বপ্ন। এই যে তোরা আছিস্ এও স্বপ্ন।"

৫ই কার্ত্তিক, রবিবার ঃ—

আজ সকালে সুকেতের নরসিং গণের কথা উঠিল। মার কথায় বুঝিলাম গণেরও পার্থক্য আছে, যেমন ভাল-মন্দ মানুষ আছে, তেমন গণও ভাল মন্দ আছে। পাঞ্জাবী সাধু সিংকে বলিতেছেন, "যেমন পাঞ্জাবী, আবার বাঙ্গালী, মানুষ ত দুই জনই কিন্তু তোমার এই দেশীয় সংস্কার তাই এই দেশেই তোমার শরীরটার প্রকাশ হইয়াছে।"

আজ "গুরুদ্বারা" অর্থাৎ শিখ্‌দের স্বর্ণমন্দির দেখিতে যাওয়া হইল। অতি সুন্দর মন্দির, প্রায় সর্ব্বদাই কীর্ত্তন চলিতেছে, শুধু রাত্রি ১২টা হইতে ৩টা বন্ধ থাকে। অনবরত হালুয়া প্রসাদ, আশীর্ব্বাদী মালা, বিতরণ হইতেছে। উপরে গিয়া দেখিলাম প্রকাণ্ড একখানা বই। শুনিলাম, তাহা মধ্যে মধ্যে পাঠ হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে অথবা কাহারো কাহারো মঙ্গল কামনায় পাঠ হয়। মা ও আমরা খানিকক্ষণ বসিয়া পাঠ শুনিতে লাগিলাম। মা হাসিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, "তোরা যে, আমি সর্ব্বদা ঘুরিতেছি বলিয়া বকিস্, আমি ঘুরিয়া তোদের কি ক্ষতিটা করিলাম? দেখত, সপ্তমীতে বৈজনাথ দর্শন, অষ্টমীতে জ্বালামুখী দর্শন, নবমীতে ক্যাংড়া মন্দির দর্শন, (ক্যাংড়া পীঠস্থান) দশমীতে গুরু-

দোয়ারা দর্শন করলি, তবুও আমাকে বকিস্।" আমরা মার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম, মা'ও হাসিতে লাগিলেন।

আজ সন্ধ্যা ৭টার গাড়ীতে আলমোড়া যাওয়ার পথে রাত্রি ১০টায় বেরিলী পৌছিলাম।

৬ই কার্ত্তিক, সোমবার :—

মাকে এবার মিষ্টার দীক্ষিতের বাড়ীতে, বাগানের ভিতর, তাঁবুতে রাখিয়াছেন। আমাদের বেরিলী নামিবার কথা ছিল না, কিন্তু মিসেস্ দীক্ষিত ও অন্যান্য ভক্তগণের আগ্রহে বেরিলিতে নামিতে হইয়াছে। আজই মা আলমোড়া রওনা হইলেন। মার আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে একটী কথা লিখিতেছি। পাঞ্জাবী ভক্ত (শিখ) সাধুসিং এবারও বৈজনাথ আসিয়া মিলিয়াছিলেন, তিনি বলিতেছিলেন, "আমি একটা বিশেষ লক্ষ্য করি—মা যেন তাঁর দিকে টানিয়া নেন, অন্যদিকে যাইতেই দেন না। বিষয়ের কথাও কিছু সময়ের জন্য যেন ভুল হইয়া যায়। মা যেন সেই সব দিক হইতে সজোরে টানিয়া, নিজের দিকে নিয়া যান। আর একটা কথা, সকলের ইষ্টই মার মধ্যে দেখা যায়। ইহার প্রমাণ আমি পাইয়াছি।"

মিসেস্ দীক্ষিত মাকে বলিতেছেন, "মাতাজী, আপনিই বলিয়াছিলেন বাসন বেশী দিন পরিষ্কার না করিলে কালি উঠান দায়, তাই বলিতেছি আপনি শীঘ্র শীঘ্র দর্শন না দিলে কালি উঠিবে কেন? এ'তে আমাদের মজা হয়। আপনারই বদনাম হইবে যে আমাদের কিছু হইল না।" তাঁহার এই কথায় উপস্থিত সকলেই আনন্দের সহিত সমর্থন করিতেই, মা হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, **"তাই ত, সর্ব্বদা বাসন মাজিও, আমাকে**

লজ্জা দিও না। আমাকে কাঁদাইও না।" মিসেস্ দীক্ষিত মার কথার উত্তরে বলিলেন, "আপনিও আমাদের কাঁদাইবেন না।" মা হাসিয়া উঠিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "মা হয়ত বলিবেন, যে নিন্দা করিবে সেও আমি, যাহাকে নিন্দা করিবে সেও আমি আবার নিন্দাটাও ত আমিই।" সকলে এ'কথায় হাসিয়া উঠিলেন। একটী ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার উন্নতির আর আশা নাই কি? মা বলিলেন, "বেশী আশা করিতে নাই, তাঁকে চিন্তা কর।" ছেলেটী বলিতেছে, "আমার, এ'কে ত কত কাজ, তার উপর আপনার চিন্তাই আসিয়া যায়। আর কাহারও চিন্তা করিবার সময় কই? মা হাসিয়া বলিতেছেন, আপনার চিন্তা করিতে পারিলে ত হইতই, সকলেই আপনার চিন্তা কর।"

মিসেস্ অম্বরপ্রসাদ আসিয়াছেন, ইনি খুব পূজা-পাঠাদি করেন, অনেকেই ইঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। ইনি আসিয়া মাকে বলিতেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম, মা নিজে বলিতেছেন, "আমার রান্না আমি নিজেই করিব।" তারপর বলিলেন, 'তোমার ঠাকুর আন আমি পূজা করিব।' ঠাকুর আনিতে গিয়া লাগান পাইলাম না।' একজন বলিল, 'আমার দেবী আছে, তাহাই নিয়া যাও, মা তাহাই পূজা করিবেন।' দেবী নিয়া আসিলাম, মা বলিলেন, "দেবী পূজা করিব না, ঠাকুর নিয়া আস।" ফিরিয়া গিয়া ঠাকুর নিয়া আসিলাম, মা, ঠাকুরকে একটা জ্বলন্ত আগুনে দিয়া দিতেই আমি উঠাইয়া নিলাম এবং পরিষ্কার করিয়া নিয়া বলিলাম, 'আমি পূজা করিব।' মা কেন আগুনে দিলেন? ইহার অর্থ কি?"

আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেই আমি বলিলাম, 'মা জানেন, মাকে জিজ্ঞাসা করুন। আমার যাহা মনে হয় বলিতেছি, "মা ত সর্ব্বদাই

বলেন, এক ছাড়া দুই নাই ; মা কখনও কখনও বলেন, 'আমার হাতেই আমি খাই ।' এই ভাবেই বলিয়াছেন—'আমার পাক আমিই করি ।"

"তারপর দেবী অর্থ প্রকৃতি বলা চলে, প্রকৃতির পূজা করিব না, পুরুষ কি, না পরম পুরুষ, অর্থাৎ কি ? না আত্মা। তাঁহার পূজাই জ্ঞানীরা করেন। সেই হিসাবে বলিতে পারেন—'ঠাকুরের পূজা করিব' । তারপর হইল কি না, সেই ঠাকুরকেও অগ্নিতে দেওয়া হইল, অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিতে সব ভস্মসাৎ করা হইল। আবার আপনার পূজার সংস্কার আছে তা'ই উঠাইয়া লইলেন। জ্ঞানাগ্নিতে সব ভস্মসাৎ করিতে পারিলেন না ।" মাও হাসিয়া হাসিয়া মধ্যে মধ্যে আমার এই সব কথার সমর্থন করিয়া মিসেস্ অম্বর প্রসাদকে বুঝাইতেছেন।

আরও একটি স্ত্রীলোক (মিসেস্ দ্বারকা প্রসাদ) বলিতেছেন, "মা আমাকে দর্শন দেন, মন্ত্রাদি ঠিক করিতে বলিয়াছেন। প্রথমে অর্দ্ধেক দিয়াছিলেন, পরে সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।" স্বপ্নে এই সব মার নিকট হইতে পাইতেছেন। প্রফেসার দাসগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা যাহার কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি নাই' তাহার উপায় কি ?" মা বলিলেন, "তাহার দিকেই "মা'র বেশী লক্ষ্য থাকে ।"

আমরা আলমোড়া রওনা হইলাম, অনেকেই ষ্টেশনে আসিয়াছেন। মা মিসেস দীক্ষিতকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা সকলে যাও, অনেক রাত হইয়া গেল, রাত্রি ১টা বাজে।" মিসেস্ দীক্ষিত একটু অভিমান ও ব্যথার স্বরে বলিলেন, "মা আপনি শুধু আমাদের বিদায় করিতে চান। আমি সেইজন্যই মুখ লুকাইয়া একপাশে বসিয়া আছি ।" তাহার চোখ জলে ভরা। ইনি বেশ বুদ্ধিমতী ও চোখে জল বড় দেখা যায় না। মা তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া তাঁহার কোলে শুইয়া পড়িলেন।

আবার উঠিয়া উপস্থিত মেয়েদের সকলেরই কোলে একটু একটু মাথা দিলেন। সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত মার মুখখানা বুকে জড়াইয়া ধরিতেছেন। কত রকমেই যে আনন্দ ছড়াইতেছেন, কে তাহা বর্ণনা করিবে। রাত্রি প্রায় ১টায় গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

৮ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার—

আজ ভোরে কাঠগুদাম পৌছিলাম। এখান হইতে মোটরে ৮০ মাইল যাইতে হইবে। প্রায় ৫ঘন্টা লাগিবে। আমরা প্রায় ১টায় আলমোড়া পৌছিলাম। হরিরাম যোশীর ভাই গিরিজাবাবু এবং আরও ২।১ জন ভদ্রলোক নন্দদেবীর মন্দিরে, মা'র জন্য তাঁবু ফেলিয়া রাখিয়াছেন। আমরা তথায়ই স্থান নিলাম। রাত্রিতে মা'র অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হইয়া পড়ে। হাত পা ঠাণ্ডা, নাড়ীর গতিও খুব খারাপ, আমরা বড়ই ভয় পাইয়া গেলাম। এখানে ঠাণ্ডাও বেশ।

৯ই কার্ত্তিক, বুধবার—

আজও মার শরীর খুব খারাপ ; গারবিয়াংএর পথে দেবীজী একটা আশ্রম তৈয়ার করিয়াছিলেন, সেইখান হইতেই তিনি মা'র সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন, মা'র তথায় যাওয়ার কথা হইতেছিল। কিন্তু শরীর এত খারাপ হইয়া পড়ায় সকলেই আপত্তি করিতে লাগিল। মা বলিতেছেন, "আমার পক্ষে ত ডাণ্ডিতে বসিয়া থাকাও যে কথা, এখানে তাঁবুতে বসিয়া থাকাও সেই কথা।" কিন্তু কেহই রাজি হইতেছেন না। মা বলিতেছেন, "আমার এখনও খেয়াল হইতেছে না। খেয়াল হইলে কাহারও বাধায় কিছু হইত না। তোমরা যাহা বলিবার বল, যাহা হইবার হইয়াই যাইবে।"

মা এই শরীর নিয়া কি করেন ভাবিয়া আমাদের বড়ই চিন্তা হইল, কারণ শরীরের অবস্থা কখনও কখনও এমন হইয়া পড়ে যে, কখন কি হয়, বলা যায় না। আবার হয়ত ২।১ ঘণ্টা কি আধঘণ্টার মধ্যেই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! উঠিয়া বসিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দেন। তখন কে বলিবে একটু পূর্ব্বেই অবস্থা এত খারাপ হইয়াছিল। অবস্থা এত খারাপ হইয়া পড়ে যে কথা জড়াইয়া আসে, মাথা একেবারে শূন্য বোধ করেন। এই অবস্থায়ও যাহা করিবার করিয়া যাইতেছেন। বাধা দিবার সাধ্য কাহারও নাই।

মা আসিয়াছেন, দলে দলে লোক দর্শন করিতে আসিতেছে। দুপুরে মা বিশ্রাম করিবেন, আহার প্রায় কিছুই নাই। এর মধ্যে একদল স্ত্রীলোক আসিয়া মাকে ঘিরিয়া বসিল। ২।১টি বেশ আমোদপ্রিয়া। তাহারা সকলকে নিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিল। মাও সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়া তাহাদের সঙ্গে গান গাহিতে লাগিলেন। তাহারা যে ভাবে মাথা ও শরীর দোলাইতেছিল, মা'ও ঠিক্ ঠিক্ তাহাই করিতে লাগিলেন। একটি স্ত্রীলোক মহানন্দে নাচিয়া নাচিয়া গান আরম্ভ করিয়াছেন। গান হইল,—সুদাম গিয়াছেন প্রভুর দ্বারে, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, আর প্রভু তাহাকে আসিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছেন। রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এ, কে ?" প্রভু বলিতেছেন, "ইনি আমার বন্ধু।"

তাঁবুর ভিতর মহা আনন্দ চলিয়াছে, মার বিশ্রামের জন্য কাহাকেও উঠাইতে পারা যাইতেছে না। কেহই মাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজি নয়। পাহাড়ী স্ত্রীলোকদের ব্যবহারে মনে হইতেছে, মা তাহাদেরই একজন কত কালের পরিচিতা, কত আপনার প্রিয়জন। কোন প্রকারে তাহাদের উঠাইয়া দিয়া মাকে শোয়াইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মা নিজেই নানা

রকম দুষ্টামি আরম্ভ করিলেন, শুইবার ভাবই নাই। ৪॥টায় অনেক বলিয়া কহিয়া মাকে একটু চুপ করান হইল।

আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই উঠিয়া বসিয়াছেন, সন্ধ্যায় মন্দিরে কীর্ত্তন হইল। তারপর তাঁবুতে আসিয়া বসিলেন। কয়েকজন ভদ্রলোক মার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুতে আসিয়া বসিলেন। হরিরাম পরিচয় করাইয়া দিতেছে। একজন উকিল, একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। মা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,"ঐ দিকের ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া চাই।" হিন্দিতেই সব কথা হইতেছে। বলিতেছেন, "ওদিকে পেন্সন আছে ?" সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, "ঐ দিক্‌কার পেন্সনই খাইতেছি, মা। খানিক পরে মা বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, ঐ দিক্‌কার পেন্সনই খাইতেছ বলিল না। ঐ দিক্‌টা কিরূপ ?" ভদ্রলোকটি মাথা নামাইয়া বলিলেন, "তা'ত জানি না। জানিবার জন্যইত আসিয়াছি। আমার ত জ্ঞান নাই।" মা বলিলেন, "জানিবার জন্য চেষ্টা করা চাই। যেমন, খাওয়ার জিনিষ কম থাকিলে কোন প্রকারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া যোগাড় করিয়া লও। সেই রকম খোঁজ করিলেই পাওয়া যায়।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "কি রকম জিনিষ যোগাড় করা দরকার ? কি জিনিষ ? ব্যবস্থাই বা কি ? আপনি বলিয়া দিন।" মা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আমি যাহা বলিব তাহা শুনিবে ত ?" ভদ্রলোকটিও বলিলেন, "শুনিব ঠিক্, কিন্তু করিতে পারিব কিনা জানি না।" একজন, "আচ্ছা আপনি বলুন কি করিব।" মা হাসিয়া বলিলেন, "বাচ্চার মরজি কি মনে রাখিবে ? আচ্ছা, ২৪ ঘন্টার মধ্যে কতটুকু সময় দিতে পার ?" কেহ বলিলেন, ১॥ ঘণ্টা, কেহ বলিলেন ২ ঘণ্টা। মা বলিলেন, "বেশ ঐ সময়ই দিও।" প্রথম যিনি কথা বলিতেছিলেন তিনি বলিলেন, "কাজ করিতে

ত মন লাগে না।" মা বলিলেন, "যেমন, আগুন নিয়া নাড়াচাড়া করিলেও তাপ লাগে, তেমনি এই সব জিনিষ নিয়া নাড়াচাড়া করিলেও একটু কাজ হইবেই। তোমরা করিয়া যাও।"

একটি ভদ্রলোক বলিলেন, "মা ক্ষুধাই নাই, তা রান্নার জিনিষ ঠিক্ করিব কি?" মা হাসিয়া বলিলেন, "এতক্ষণে ঠিক্ কথা বলিয়াছ। বেশ, ক্ষুধা না থাকে, ঔষধ খাও, আর সুপথ্য কর।" ভদ্রলোকটি—"কি ঔষধ?" মা—"ঔষধ হইল, তাঁর নাম। কতকটা সময় অন্ততঃ স্থির ভাবে বসিয়া তাঁর নাম কর। আর পথ্য হইল সংযম-ব্রত। ঔষধ আর সুপথ্য করিলে ধীরে ধীরে ক্ষুধা বাড়িবে।" ভদ্রলোকটি বলিলেন—"সুপথ্য কি মা?" মা বলিলেন, "সংযম-ব্রত কর।" সংযম-ব্রত কি! এই বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সংযম-ব্রতের কথা বলিলেন। ভদ্র-লোকটি বলিতেছেন, "দেখ মা যে দিন মনে করি, আজ মিথ্যা কথা বলিব না, সেই দিনই আরও বেশী মিথ্যা বলা হইয়া যায়।" মা বলিলেন, "আচ্ছা, এক কাজ কর, সংযম ব্রতের দিন খেয়াল রাখিও মিথ্যা কথা কয়টা হইল; তাহা লিখিয়া রাখিও। আগামীবার আবার চেষ্টা করিবে যেন আর মিথ্যা কথা না হয়। এইরূপ করিতে করিতে অভ্যাস হইয়া যায়।"

তারপর কীর্ত্তনাদি হইল। কীর্ত্তনাদির পর এক ভদ্রলোক বলিলেন, "আচ্ছা মা, সকাম-নিষ্কাম কর্ম্ম বলে, মুক্তিও ত কামনা, দর্শনের ইচ্ছাটাও ত কামনা, তাহাকে কি নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যায়?" মা বলিলেন, "ভগবানের জন্য যাহা করা তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্মই বলা হয়। বিষয় কর্ম্মই কাম, ভগবৎ কর্ম্ম হইল প্রেম।" আবার জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ইত্যাদির কথায় বলিতেছেন, "আসলে জ্ঞান-

যোগ ও ভক্তিযোগ, এই তুয়ের মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান একই, দেখনা যেমন, 'আমি স্বরূপ দেখিব"—ইহা হইল জ্ঞান; ভক্তি হইল স্বরূপ দেখিবার আকর্ষণ; তারপর কি! না সাবান লাগাও, আবার জ্ঞান-গঙ্গায় ধুইয়া ফেল, এই সব হইল কর্ম্ম। সবই একের মধ্যেই আছে।"

মার শরীর খুব অসুস্থ হইয়াছে। আমাদের আলমোড়া হইতে নামিয়া যাইবার কথা হইতেছে। নানা কথা উঠিল, তার মধ্যে কথা হইল কখনও কখনও অমুকে পাশ হইবে কিনা, ব্যারাম ভাল হইবে কিনা, এই সব প্রশ্ন হয়, কখনও কখনও দেখা যায়, যাহা বলা হইল তাহা ফলিল না। ইহার কারণ, কখনও কখনও দেখা যায়, স্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার উত্তর আসিতেছে। যেমন জিজ্ঞাসা করিল, "পাশ হইব কিনা?" যদি এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে নিজের ইচ্ছা একটুও থাকে, হয়ত বাহির হইবে—"হইবে"। 'না' শব্দটা আর বাহির হইল না, বন্ধ হইয়া গেল। এই অবস্থার প্রেরণাতেই সব সময় কথা ঠিক্ ঠিক্ হয় না। আর যদি ইচ্ছা শক্তি একটুও না থাকে তবে পূর্ণভাবেই শব্দগুলি বাহির হয়। কোন রকমে বাধা না পাইয়া যাহা' বাহির হয় সেইগুলি ঠিক ঠিক হইতে বাধ্য।

১০ কার্ত্তিক, শুক্রবার—

মা আজ তুপুরে শুইয়া শুইয়া বলিতেছেন, "দেখিলাম একটা ডেড্ বডি (Dead body) আর একটা শিশু তাহাকে ঔষধ খাওয়াইতেছে। ত্যহারও শেষ সময়। ঔষধ খাওয়াইতে গিয়া সকলে মুখ বাঁকাইয়া বলিতেছে, 'আর কাহাকে ঔষধ দিব'—অর্থাৎ শেষ অবস্থা। মা,

আবার বলিতেছেন, কাল সন্ধ্যায় দেখিলাম একটি পরমা সুন্দরী ত্রিনয়না মূর্ত্তি, দেবীমূর্ত্তি। কিছু পরেই দেখিতেছি, খল্ খল্ করিতেছে শ্যামল বর্ণের একটি শিশু মূর্ত্তি, টিকি আছে।" আমি বলিলাম, "ইহারা কে?" মা বলিলেন, "তা বলা আসিতেছে না।" আমি বলিলাম, "তোমার সাথে কিছু কথা হইল নাকি? কেন আসিয়াছিল?" মা বলিলেন, "বাঃ, তোরা সব যেমন আসিস্ সেই রকমই ওরাও আসিয়াছিল।" আর কিছুই বলিলেন না।

রাত্রিতে শুইয়া আছেন; আমরা সকলে বসিয়া আছি। মা বলিতেছেন, "দেখিতেছি একটি সাধক জলের ভিতর ডুবিয়া সাধন করিতেছে। একটি ছোট্ট মেয়ে আমার সঙ্গে আছে, ন্যাংটা মেয়েটাকে আমি সঙ্গে রাখিতে চাহিতেছি। কিন্তু মেয়েটা ছুটিয়া গিয়াছে ঐ সাধুটীকে ছুঁইবে। ঐটী হইল বিঘ্নকারিণী, কিন্তু সম্মুখে গিয়া সাধকের ইষ্টমূর্ত্তিতে দেখা দিবে। আমার কেমন হইল, আমিও সাধুটীকে ছুঁইবার পূর্ব্বেই মেয়েটাকে টানিয়া নিয়া আসিলাম।" অভয় বলিল, "সাধুটীকে ত ভাগ্যবান বলিতে হইবে।" মা বলিলেন, "হ্যাঁ, ভালই সাধক।"

মা পুনরায় বলিতেছেন, "একবার ভোলানাথের বাড়ীর ৺কালী-পূজা বিদ্যাকূটে হইয়াছিল। পূজা হইয়া গিয়াছে, মাখন সে সময়েতে ৬।৭ বছরের হইবে। শরীরের মা, তাহাকে কোলে নিয়া পূজার ঘরে কি কাজে গিয়াছে; ফিরিয়া আসিতেই মাখন বলিতেছে, যেমন ছেলে মানুষে বলে, 'কালীমা জিহ্বাটা এত বড় বাহির করিয়াছিল আবার এখন ছোট করিয়া ফেলিল।' মা এই কথা শুনিয়া ছেলে পাছে ভয় পাইয়া যায় এই জন্যে ঐ কথা উঠাইতে না দিয়া অন্য কথা উঠাইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। মানুষের কি দুর্ব্বলতা।" এই বলিয়া হাসিতে

লাগিলেন। আমি বলিলাম, "সত্যই কি মাখন ঐরূপ দেখিয়াছিল?" মা, "ছেলে মানুষ ওর ত মিথ্যা কথা বলা সম্ভব নয়। সত্যই ও এরূপ দেখিয়াছিল।"

১১ই কার্ত্তিক, শনিবার—

আগামী কাল বিন্ধ্যাচল রওনা হইবার কথা হইতেছে। এখানে ঠাণ্ডায় মার শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে। কিছুই হজম হইতেছে না। নাড়ির গতিও বড় খারাপ হইয়া যাইতেছে।

১২ই কার্ত্তিক, রবিবার—

আজ বেলা ৯ টায় আমরা মোটরে রওনা হইয়া প্রায় ৮০ মাইল দূরে হলদিয়ানিতে ট্রেণ ধরিলাম। রাত্রি ১১॥ টায় বেরিলি পৌছিলাম। তথায় ভক্তেরা মাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নামাইয়া লইলেন। মিসেস্ দীক্ষিত এখনও নিজের বাড়ীর তাঁবু উঠান নাই। তাঁর প্রাণের আকুল আগ্রহে মা আবার সেই খানেই চলিলেন। মার শরীর বড়ই খারাপ। ইঁহারা মাকে কিছুদিন এখানে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিতেছেন। মা'র নিজের যখন খেয়াল হয়, তখন কাহারও বাধা মানেন না সত্য, কিন্তু তেমন খেয়াল না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের মতের উপরও কখনও কখনও যাওয়া আসা ছাড়িয়া দেন। এখানকার ভক্তদের কথায়ও এখন বিশেষ কিছুই বলিলেন না। মা রাত্রি প্রায় ১২ টায় শুইলেন। মিসেস্ দীক্ষিতের সঙ্গী সকলেই বড় আনন্দ অনুভব করিলেন। বাসে আসিতে আসিতে মা বলিতেছিলেন, "আজ মনসা দেবী আসিয়া আলাপ করিয়া গেলেন।"

১৩ই কার্ত্তিক, সোমবার—

আজ বৈকালে অনেক স্ত্রীলোক আসিয়াছে। তাহার মধ্যে একজনের সন্তান হইয়া বাঁচে না। মার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। মা তাহাকে 'মা, মা', বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "আমিই ত তোমার মেয়ে"। কিন্তু এ কথা তাহার মনঃপুত হইল না। বলিল, "আপনি ত মা, 'দেবী'।" খানিক পরে তাহারা প্রণাম করিয়া উঠিতেছে তখন মা সেই স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন, "রোজ দুই বেলা ভগবানের নাম করিও বাচ্চা হইবার জন্য।" সেই স্ত্রীলোকটী মহা আগ্রহভরে বসিয়া বলিতেছেন, "কোন দেবতার নাম কতবার করিব? মা বলিলেন, "কোন্ দেবতা তোমার ভাল লাগে?" সে বলিল, "সবই ভাল লাগে।" মা বলিলেন, "তবুও কোনটা?" সে বলিল, "কৃষ্ণ"। মা বলিলেন, "তবে ঐ নামই সকালে দুই মালা, বৈকালে একমালা, আর সব সময়ের জন্যই মনে মনে রাখিতে চেষ্টা করিও। তবেই সুন্দর সুন্দর।" এই বলিয়া হাত দিয়া একটু ভঙ্গি করিলেন। আমি কাছে গিয়া বলিলাম, "সুন্দর কি?" মা বলিলেন, "বাঃ, বাল্-গোপাল আর কি?" সেই স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিন করিব?" মা বলিলেন, "যতদিন তিনি বালক মূর্ত্তিতে দর্শন না দেন।" চট্‌পট্ করিয়া এ'সব কথা বলিয়া বাহিরে যেখানে সকলের বসিবার যায়গা করা হইয়াছিল সেইখানে চলিয়া গেলেন। সব সময় এই রকম হয় না।

আমি এ'র মধ্যেই এক সময়ে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, সাপ রূপেতে আত্মানন্দ নামে এক সাধু তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন বলিয়াছিলে, যখনই সাপের সহিত দেখা হয় তখনই কি

সেই সাধুই আসেন, না মনসাদেবী বা অপরাপর কেহ আসেন?" মা বলিলেন, "হ্যাঁ মনসাদেবীও সর্পরূপে আসেন।"

পাহাড়ী একটী মেয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাকে নাচ দেখাইতে আসিয়াছে। আরও অনেকে মার দর্শনে আসিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, "মা, কি যে তোমার চোখে আছে। আমাদের ঐ চোখ তুইটি মনে পড়িলে আর ঘরে থাকিতে পারি না।" এইরূপ কতজনে কত ভাবের কথা জানাইতেছেন। মা হাসিয়া বলিতেছেন, "কেন আমার কি তোমাদের মত রক্ত মাংসের শরীর নয়! আর আমার বুঝি পটল-চেরা চোখ তাই তোমরা এত সব বলিতেছ। আচ্ছা আন্‌ত আয়নাটা।" আমি আয়না নিয়া মুখের কাছে ধরিলাম। আয়নাটা নিজের হাতে নিয়া ছেলে মানুষের মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মুখ দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন "কই তোমাদের পটলচেরা চোখের ত কোন লক্ষণই দেখিতেছি না।" এই কথার সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। এই রকম কত ভাবের আনন্দ চলিতেছে।

রাত্রিতে গারবিয়াংয়ের একটি মেয়ে মাকে নাচ দেখাইল। নিজে প্রজাপতি সাজিয়া নাচিল। আরও ছোট ছোট ২।৩টী মেয়ে মাকে পূজা ও আরতি করিতেছে এই ভাবে নাচিল। তাহা দেখিয়া মা বলিলেন "দেখ আমি ত এ'সব কিছু পূর্ব্বে দেখি নাই কিন্তু এই সব কলাবিদ্যা না তোরা কি সব বলিস্, যখন পূজাদির ক্রিয়াগুলি এই শরীরের মধ্য দিয়া হইয়া গিয়াছে তখন এইগুলি শরীরের মধ্যে খেলিয়া গিয়াছে।" আমিও একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। মেয়েটি যে রকমে নৃত্যের ভঙ্গীতে প্রণাম করিল সেই রকম ক্রিয়া মার শরীরে হইতে দেখিয়াছি।

আমাদের বিশেষ আগ্রহে মিসেস্ দিক্ষীত মীরার ভাবে নাচিলেন।

মা'ই যেন তাঁহার প্রাণের ঠাকুর। তিনি মীরার ভাব নিয়া নাচিতেছেন। আমার এই ভাবটি বেশ ভাল লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গানও করিলেন। অতি সুন্দর গম্ভীর ভাবের নৃত্য! মিসেস্ দিক্ষীতের চেহারাখানাও বেশ লাবণ্যযুক্ত। বেশ মানাইতেছিল।

নাচের ভাবই চলিতেছে। রাত্রিতে অভয় চন্দ্রমাল্য পরিয়া ঘুঙ্গুর পরিয়া মার নিকট আপন ভাবে নাচিল। সে কখনও নাচে নাই, নাচিতে জানে না। আজ সকলের নাচ দেখিয়া দেখিয়া তাহারও নাচিবার খেয়াল হইয়াছে। তাহার আপন ভাবের নাচটুকুও আমার নিকট বেশ মিষ্টি লাগিতেছিল। উপস্থিত সকলেই আনন্দ পাইলেন। নাচের পরে মাকে প্রণাম করিল।

মার শরীর খারাপ বেশী কথা বলেন না; তবুও মার কথা শুনিবার জন্য তাঁবুতে অনেকেই বসিয়া আছেন। কথা উঠিল। সকলের অনুরোধে পূর্ব্বেকার ২।১টি কথা মা বলিতে আরম্ভ করিতেই সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া মার কথা শুনিতে লাগিলেন। মার শরীর অসুস্থ তাই শীঘ্র বিশ্রাম দেওয়ার কথা, কিন্তু রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল কাহারও খেয়াল নাই। কথা বলিতে বলিতে মার দুর্ব্বলতার চেহারার পরিবর্ত্তে ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল যেন ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল। আমি তাহা দেখিয়া হাসিয়া উপস্থিত সকলকে বলিলাম, "দেখিতেছেন ত আপনারা, মার কত অসুখ। মুহূর্ত্তে রোগী হন আবার মুহূর্ত্তেই বদলাইয়া যান।" মা এই শুনিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, আমার অসুখ তবে মিথ্যা নাকি। আর দেখ তোমরা, খুকুনি আমাকে খাওয়াইবে জল মিশাইয়া একটু দুধ, (সম্প্রতি মার এই খাদ্যই চলিতেছিল) আর কথা বলাইবে রাত্রি ১২টা ১টা অবধি। আবার বলিবে অসুখ নাই।" সকলেই এই কথায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

মাকে বাংলা ভাষায় কেহ কথা বলিতে দিবে না, কারণ সকলেই প্রায়, এতদ্দেশীয়। হাসি ও আনন্দের যেন ফোয়ারা চলিয়াছে। মা বলিলেন, "আচ্ছা, এ'কি রকম সাধুর নিকট তোমরা আস! তোমাদের এই রকম পাগলামি দেখিয়া লোকে মনে করিতে পারে, ইহারা নেশাখোর, নেশা করিয়াছে। তাহারা এইরূপ ভাবিলেও তাহাদের কোন দোষ নাই।" তারপর তাঁবুর ভিতরের জিনিষ পত্র দেখাইয়া বলিতেছেন, "সাধুর এই রকম সব জিনিষ পত্র থাকে নাকি? জিনিষ পত্র দেখ না কত। তবলা ডুগি ১জোড়ায় হয় না ২জোড়া। হারমোনিয়াম ১টীতে হয় না ২টি। দিব্যি খাটে বসিয়া আছে।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "হয় ত কাহারও মনে এই কথা উঠিয়াছে—তাই মা ইহা বলিতেছেন।" মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, আমার মুখ হইতেই বাহির হইতেছে।" এই বলিয়া পাছে কাহারও উপর দোষ দেওয়া হয়, তাই এই কথা বন্ধ করিয়া দিলেন। একজন বলিল, "আচ্ছা কেন এই রকম ভাবিবে?" মা বলিলেন, "বাঃ যে যতটুকু বুঝিবে, সে ততটুকুই ত বলিবে! তাহার দোষ কি?"

এই সব কথার পর, মার শাহবাগে মরিচের গুঁড়া খাওয়ার কথা উঠিল। মা বলিলেন, "প্রাণগোপাল বাবু এই কথা শুনিয়া লিখিয়াছিলেন, 'এমন গুরুমারা বিদ্যা কোথায় শিখিলে।' উত্তর দেওয়া হইয়াছিল, "গুরুর নিকটই গুরুমারা বিদ্যা শিখিয়াছি।"

রাত্রিতে মা সকলের কাছেই বলিতেছেন, "আজ যখন দুপুরে শুইয়া আছি, দেখিতেছিলাম, এই ছোট ছোট ছেলেরা, খুব ফর্সা রং নয়, কিন্তু খুব উজ্জল মূর্ত্তি। আবার নেংটী পরা; তাহারা অনেকে আসিয়াছিল। তোরা ত দুপুরে একা রাখিয়া শুইতে দিয়া গেলি, দেখি এরা সব আসি-

য়াছে।” কতটুকু কতটুকু ছেলের দল, কি কি করিল সব বলিতেছেন।

এই সব কথা বলিবার সময় মার দুর্ব্বল মূর্ত্তির লেশও ছিল না, বেশ উজ্জল মূর্ত্তি, অথচ ৮।১০ দিন যাবত শরীরের অবস্থা বড়ই খারাপ যাইতেছে। কিছুই প্রায় খাওয়ানো যাইতেছে না, একটু ফলের রস খাইলেও পেটে একটা ব্যথা হয়। এক কবিরাজ আলমোড়াতে নাড়ী দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “শরীরে অগ্নি মোটে নাই, মা কি ভাবে চলিতেছেন, শুধু বায়ুতে ভরিয়া আছে।” এই অবস্থায়ও আনন্দের কম্‌তি নাই।

মার মুখে এ'রকম শিশু মূর্ত্তির সাধুদের কথা শুনিয়া অভয় বলিল, “মা দেরাদুনে যে ৩টি সাধু আপনার নিকট আসিয়াছিল তাহাদের কথা ইহাদের কাছে বলুন না।” মা বলিলেন, “হাঁ, সে সময়ও আমাকে দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দেখিতেছি ৩টী সাধু (বলা বাহুল্য এ'সবই সুক্ষ্ম-শরীর ধারী) রং অনেকটা লাল লাল, অতি সুন্দর উজ্জল মূর্ত্তি। একটি এই স্থানে (মাথার পাশে) একটি এই স্থানে (শরীরের মধ্যস্থানের বরাবর) আর একটি এই স্থানে পায়ের দিক দেখাইয়া দিলেন। একটি হাত জোড় করিয়া আছে, আপন ভাবে বিভোর। আর একটি আসন করিয়া প্রণামের ভাবে আছে। কিন্তু আসনের দিকে লক্ষ্য নাই। আর একটির হাতযোড় বা প্রণাম এসবের কিছুই না, সে একেবারে ভাবে বিভোর।

হাতযোড় বা প্রণাম, এই যে বাহিরের ভাবের জ্ঞানও তাহার নাই। একেবারে কোন জ্ঞান নাই, তা' বলিতেছি না তবে সাধারণ ভাবগুলির অনেক উপরে। কথাবার্ত্তা কিছু বলে নাই। বয়স তিন জনেরই প্রায় সমান সমান। রাত্রি প্রায় ১টায় শোওয়া হইল।

১৪ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার—

আজ প্রাতেও অনেকে আসিয়াছেন, আলাপ হইতেছে। খানিক পরে মাকে 'রমেশ ভবনে' নিয়া গেল। ঠিক হইয়াছে, আজ দুপুরে কুমারী মেয়েরা মার নিকট পূজার ভাবে নৃত্য করিবে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি ঐ বিষয়ে এখানকার মেয়েরা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। দুপুরে মা নিজের বিছানায় বসিলেন। মেয়েদের নৃত্য আরম্ভ হইল। কুমারী মেয়েরা সকলেই বাসন্তী রঙ্গের সাড়ী পরিয়াছে। প্রথমে মধ্যবয়স্কেরা তবলা ডুগি ও হারমোনিয়াম নিয়া বসিয়াছে।

একদল কুমারী বাজনার তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে তাঁবুতে ঢুকিল। তাহাদের কাহারও হাতে আরতির জিনিষ, কাহারও হাতে ফুলের ডালা, কাহারও হাতে মালা। মার নিকট আসিয়া নৃত্যের তালে তালে চরণে অঞ্জলি দিল, কেহ কেহ আরতি করিতে লাগিল। এইভাবে মার পূজা করিয়া, পরে মার উদ্দেশ্যে ইহারা যে গান রচনা করিয়াছে, মার সম্মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে নাচিতে তাহাই গাহিতে লাগিল।

তাঁবুর ভিতর যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে। অতি চমৎকার একটা ভাব প্রায় সকলের প্রাণেই জাগিয়া উঠিয়াছিল। বেলা প্রায় ২টায় মাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল।

বৈকালে অনেকে আসিয়াছেন। স্কুলের মেয়েরা ও তাহাদের একজন অধ্যক্ষ আসিয়াছেন। একটি স্ত্রীলোক বলিতেছেন, "মা, আপনি জগদম্বা।" মা এই কথা শুনিয়া এমন ভাবে হাসিয়া উঠিলেন যেন, "এ'সব তোমরা কি বলিতেছ?" আর বলিতে লাগিলেন, "মা, তোমার কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাই এমনি সব কথা বলিতেছ। তবে হাঁ, কথায় বলে—

যত্র নারী তত্র গৌরী। (চারিদিকের স্ত্রীলোকদের দেখাইয়া) এই সব স্ত্রীলোকদের সকলের উপরই যদি তোমার গৌরী, অর্থাৎ জগদম্বার ভাব হয়, তবে ত খুব ভাল কথা। চোখ খুলিয়া গিয়াছে বলিতে হইবে।"

তিনি বলিলেন, "কিসে চোখ খোলে?" মা বলিলেন, "দেখ, কখন কখন বলা হয়, 'তোমার ঘর কোথায়?' এই সব ত তোমার শ্বাসের ঘর, শ্বাসের সম্বন্ধ। আসল ঘরে না যাওয়া পর্য্যন্ত শান্তি নাই। সংসার দু'-নিয়া তাই দুঃখেরই কারণ হয়। দুই কিনা, আসা-যাওয়া, গতা-গতি তাই দুঃখ। তাই বলা হয় এই রোগ ভাল করিবার জন্য ডাক্তারের কাছে যাও, যেমন চোখ খারাপ হইল, ডাক্তার চোখের পরীক্ষা করিয়া চশমা দিয়া দিল। বেশ দেখিতে লাগিল।" মিসেস দীক্ষিত বলিলেন, "কিসে সেই চশমা পাওয়া যায়?" মা বলিলেন, "**সৎগুরু, সৎসঙ্গ**। সব সময় ত সৎলোকের সঙ্গ পাওয়া যায় না। সৎ ভাবের সঙ্গই সৎসঙ্গ।"

কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হইল। অনেকে চলিয়া গেলেন। অভয় আজ মাকে পূজা ও আরতি করিল। সকলেরই বেশ আনন্দ হইল। মিসেস্ ব্যানার্জী বলিতেছেন, "মা কি করি বল ত? তোমাকে নিয়া সর্ব্বদাই নাড়াচাড়া করিতে ইচ্ছা হয়।" উপস্থিত সকলে এই কথায় হাসিতে লাগিলেন। বাস্তবিক অনেকেরই এই অবস্থা, মাকে ছাড়িয়া একটু উঠিতে হইবে বলিয়া কেহ কেহ খাইতে যাইতে চাহিতেছেন না। মিসেস্ দীক্ষিত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া এক একজনকে খাওয়াইতে নিতেছেন—খাইতে যাওয়াটা একটা বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাহাড়ী মেয়ে গঙ্গোত্রী কথা কিছুই বলে না, মার মুখের দিকে চাহিয়া একপাশে বসিয়া থাকে; কিন্তু সেও উঠিয়া খাইতে যাইবে

না। মা এই সব দেখিয়া হাসেন; আমরা ত আকর্ষণের জ্বালায় অস্থির।

১৫ই কার্ত্তিক, বুধবার—

আজ আমরা বিন্ধ্যাচল রওনা হইলাম। পথে দিল্লী হইয়া যাইবার কথা হইল। কারণ সেখান হইতে ভক্তদের আকুল আহ্বান অনবরত আসিতেছে।

১৬ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার—

আজ দিল্লী পৌছিয়া আশ্রমে যাওয়া হইল। সকলের অনুরোধ এড়াইয়া আজই বিন্ধ্যাচল রওনা হওয়া হইল।

১৭ই কার্ত্তিক, শুক্রবার—

আজ বিন্ধ্যাচল আশ্রমে পৌছিলাম। মার শরীর বড়ই খারাপ।

১৯শে কার্ত্তিক, রবিবার—

মা যে অমৃতসরে রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া কি সব কথা বলিতেছিলেন, সেই কথা উঠিয়াছে; কথাটা আবার আলোচনা হইল। কথাটা এই, মা বলিতেছিলেন, (চোখ বন্ধ), "দেখ খুকুনি, অভয় সেদিন বলিতেছিল আমি স্বপ্ন দেখি। এখন কি দেখিতেছি, দেখিতেছি উত্তর কাশীর মত একটা স্থানে, গঙ্গায় একটা পাথরের চারিদিকে জল। সেই পাথরের উপর কয়েক জন সাধু সাধন করিতে করিতে একেবারে শিশুর মত হইয়া গিয়াছে। তাই তাহাদের ৭।৮ বছরের শিশুর মত দেখাইতেছে। (নিজের শরীর দেখাইয়া) এই শরীরটাও সেইখানে গিয়াছে

ঠিক্ যেমন তোদের নিকট আছে ঠিক ঠিক এই ভাবেই সেই-খানেও প্রকাশ রহিয়াছে।” উপেনবাবু বলিলেন, “মা, ঐ দিকে বালখিল্য ঋষিদের এক পাহাড় আছে শুনিয়াছি।” আমি মাকে তখনই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “মা, কয়জন সাধু?” মা সেই সময়েতেই যেন শুনিয়া শুনিয়া বলিলেন, “নয় জন।”

তারপর আবার তখনই বলিতেছিলেন, “এখনও আর কি দেখিতেছি জানিস্? দেখিতেছি গঙ্গোত্রীর রাস্তায় এক সাধু; তাহার বাহিরের আহারের দরকার নাই তাহার কাছেও এই শরীরটা ঠিক্ এই ভাবেই প্রকাশ রহিয়াছে। তোরা ভাবিতেছিস্ তোদের নিকটই আছি। কিন্তু ঐ সব স্থানেও কিন্তু ঠিক ঠিক এই রকমই রহিয়াছে। এ' যদি স্বপ্ন হয় তবে স্বপ্নই বল, সবই স্বপ্ন।”

উপস্থিত এক ভদ্রলোক বলিতেছেন, “যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের বলে আত্মা ব্রহ্ম ও ভগবান প্রকাশ হন, এই তিনই কি এক?” মা বলিলেন, “তিনই এক”।

২৬শে কার্ত্তিক, রবিবার—

মা বিন্ধ্যাচলেই আছেন। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল। আজ আশুতোষ কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কালীদাস সেন সকালেই মায়ের নিকট আসিয়াছেন। ইনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বিন্ধ্যাচলে আসিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ২।৩ দিন মার নিকট আসিয়াছেন। এখানেই ইঁহার সঙ্গে পরিচয়।

ইনি আজ আসিয়া আমাকে বলিতেছেন, “আমি প্রথম দিন আসিয়া মাকে দেখি, মা সে সময় উপরের এই ঘরটিতে শুইয়াছিলেন। দেখিলাম

যেন কোটি চন্দ্রের জ্যোতি মার মুখে। আমার বাবা একবার দশ-মহাবিদ্যার ছবি আনিয়াছিলেন। আমার মনে পড়িল, আমি পরিষ্কার দেখিলাম ষোড়শী ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি। এমন পরিষ্কার দেখিলাম কি বলিব। তখন মনে হইল চরণ ত দর্শন হইল না। আরও একদিন আসিয়াছিলাম সে দিনও চরণ দর্শন হইল না। আমি কিছুই বলি নাই। মার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তাও হয় নাই। গতকল্য মা যে আমাদের ঐ দিকে বেড়াইতে গেলেন ও বেড়ানো কিছুই নয়। আমি বেশ বুঝিয়াছি মা আমাকে চরণ দর্শন করাইতে গিয়াছিলেন। আমি দেখিলাম, চরণে কোটি পদ্ম। আমি দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম।" মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবা মেয়েটাকে এই রকম বলে না।" তিনি হাতযোড় করিয়া বলিলেন, "মা, আমি আপনাকে চিনিয়াছি। আপনি দুষ্টামী করিলে কি হইবে?" মা অমনি খল খল করিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "বাবা, নিজের মেয়েটাকে চিনিবে না!" তিনিও হাসিয়া বলিলেন, "তা মা, এখন যত গালাগালি দিন, আমি আপনাকে চিনিয়াছি।" মা হাসিয়া বলিলেন, "বাবার স্বভাবই ত মেয়েটা পাইয়াছে।"

আজ কথায় কথায় মা বলিতেছেন, "অভয় একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভোলানাথকে যে আপনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, আপনি ত কাহাকেও দীক্ষা দেন না।" সেইটা কি রকম জান? যেমন সাধনার ক্রিয়াগুলি কিছু সময়ের জন্য এই শরীরে খেলিয়া গিয়াছিল ঐ ব্যাপারটাও সেই রকমই হইয়া গিয়াছে।"

২৭শে কার্ত্তিক, সোমবার—

দুপুরে শঙ্করানন্দ স্বামিজীর সঙ্গে কথা উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন,

"দেখ সবই ভোগ, এই যে ফুলটি দেখিয়া ভাল লাগে ইহাও ভোগ, গাছটি দেখিয়া ভাল লাগে, শিশুটী জড়াইয়া ধরিতে ভাল লাগে, সবই কিন্তু ভোগ ; ইহাও চাই না। এই শরীরটার কি রকম ছিল, শরীরের মার কাছে শিশুকালে শুইয়াছি কিন্তু কখনও যে জড়াইয়া ধরা বা জড়াইয়া শোওয়া তা হয়ই না। এখন অবশ্য যে যাহা ইচ্ছা শরীরটা নিয়া করিতেছে বা তাহাদের ভাবে শরীরটা দিয়াও কত কি হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে এ'সব ছিলই না।

আবার কথায় কথায় বলিতেছেন "দেখ বাবা, যোগক্রিয়া যে হইয়া গিয়াছে কি বলিব কত কাণ্ড যে হইয়াছে ; তোমরা হাত দিয়া মুদ্রাদি কর না, এই রকম আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি নেওয়ার সময় যেমন সংহার মুদ্রা করা হয় সেই রকম (দেখাইতেছেন) পায়েও ঠিক ঐ রকম হইয়া যাইত। আঙ্গুলগুলি প্রথমে টান হইয়া পরে ধীরে ধীরে যে রকম ভাবে মুদ্রাটি হইবে হইয়া যাইত।"

২৮শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার—

আজ সকালে শঙ্করানন্দ স্বামিজীর সঙ্গে আবার নানা কথা উঠিয়াছে গানের কথা উঠিল, মা বলিতেছেন, "দেখ এই যে গান, এই শরীরটার এমন অবস্থা গিয়াছে যে গানটাও ভাব ভাঙ্গিয়া দিবে। একেবারে স্থির শান্ত ভাব। এই যে সুর বা গানের পদগুলি ইহাতেও সেই অবস্থার ভিতরের গভীরতা ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। তাই ইহাও চলে না। অনেক সময় পাহাড়ের মধ্যে চলিতে চলিতে পাহাড়ের স্থির ভাবের সঙ্গে মিশিয়া এমন

হয়, যেন কথা বন্ধ হইয়া আসে। আবার সবই হইতে পারে। যেমন চাঞ্চল্যের মধ্যেও একটা স্থির ভাব, আবার স্থিরতার মধ্যেও চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যায়।

২৯শে কার্ত্তিক, বুধবার।

আজ প্রাতে পরমানন্দ স্বামিজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। দেরাদুনের সেই সূক্ষ্ম শরীরধারী সাধু ৩টীর কথা স্বামিজীর নিকট মাকে বলিতে বলায়, মা বলিতেছেন, "কি বল্‌ব, তোমরা যেমন এই শরীরটার নিকট বসিয়া থাক, গায় পায় হাত বুলাও ওরাও ঠিক্ তাই করে। কত আসে, স্পর্শ পর্য্যন্ত বোঝা যায়।" আবার তখনই, হয়ত তাহারা কেহ নাই, তোমরা আসিলে; তবে কথা কি জান? তোমরা যখন থাক বা ও'রা যখন আসা যাওয়া করে, এ'র মধ্যে যে কিছু প্রভেদ আছে তা' মোটেই নয়। এই যে টাইম ধরিয়া তোমরা খাওয়া দেও, ও'দের সঙ্গেও হয়ত খাওয়া হইল, ৬ ঘণ্টা এর মধ্যেই হইয়া গেল। ওখানে ত সময়ের মাপ তোমাদের মত নয়। এ যদি স্বপ্ন হয় তবে তোমাদের যে দেখিতেছি, এই যে সব ব্যবস্থা হইতেছে, এ'ও ত স্বপ্ন।" আবার হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "কাল দেখিতেছি, তোমরা যেমন কাছে বসিয়া থাক, এই রকম মহাবীর (হনুমানজী) আসিয়া বসিয়া আছে।"

আমি বলিলাম, "কি করিল?"

মা বলিলেন, "তোরা যেমন করিস্ তেমনই করিতেছিল।"

মার শরীর অসুস্থই চলিতেছে, তবে, আনন্দের খেলাও সমানেই চলিতেছে। এলাহাবাদ, মীর্জাপুর, কাশী, ফয়জাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে,

ভক্তরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতেছেন। যতীশদাদা ও বুনি কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে।

মা আজ রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া বলিতেছেন, "সেদিন রাত্রিতে যতীশ (গুহ) আমার এই ঘরে শুইয়া আছে, দেখিতেছি, তাহার ভয়ানক রুগ্ন মূর্ত্তি, একেবারে উলঙ্গ। যেমন আমার কথা হরিদ্বারে বলিয়াছিলাম না? সেই রকম আর কি; একজন অশরীরী জিজ্ঞাসা করিতেছে, কোথায় স্থান করা হইবে—তখনই আমার খেয়াল হইল, আগামী রাত্রিতে আর উহাকে এইখানে রাখা হইবে না। প্রথম ত ঠিক হইয়াছিল উহারা আরও কয়েক দিন থাকিয়া যাইবে, কিন্তু ঐরূপ দেখার পরই উহাকে কলিকাতা পাঠাইবার খেয়াল হইল। আর এক রাত্রিও এই স্থানে শুইতে দেওয়া হইল না।"

সত্যিই তাই, যতীশদাদারা আরও কয়েকদিন এখানে থাকিবেন, রাত্রিতে মার সঙ্গে এই ভাবেরই কথা হইল। প্রাতেই মা বলিলেন, "না; আজই তোমরা কলিকাতা রওনা হইয়া যাও। আমার খেয়াল হইতেছে তাই বলিতেছি।" মার আদেশে সেই দিনই তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

এই কথা তখন প্রকাশ করেন নাই, আজ বলিলেন।

৩রা অগ্রহায়ণ, রবিবার।

বাচ্চুর মার আহ্বানে ২।৩ দিনের জন্য মা কাশী আসিয়াছেন। কীর্ত্তনাদি হইবার কথা।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, সোমবার।

আজ গুরু সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে, এক ভদ্রলোক কথা উঠাইয়াছেন।

তাঁর স্ত্রীর কুলগুরুর নিকট মন্ত্র নিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু স্বামীর কুল-গুরুর নিকট দীক্ষা নিবার মত নাই, কিন্তু কুলগুরুর প্রতি যথা কর্ত্তব্য করা উচিত, এ ভাবটা আছে। মাকে বলিতেছেন, "মা, আপনি যাহা বলেন, তাহাই করিব ; আমাদের যাহা বলিবার বলিলাম।" মা বলিলেন, 'দেখ খুঁৎ খুঁৎ যখন আছে, প্রথমে কুলগুরুর কাছেই নেও, পরে যদি দরকার হয়, আবশ্যক মত গুরু মিলিবেই। **আর সৎগুরু আবার কি? গুরু সবই সৎ।** আর, দেখ বাবা। মন্ত্রে ত তোমার বিশ্বাস আছে? ইষ্টেও বিশ্বাস আছে শুধু গুরুর বাহ্যিক ব্যবহারে শ্রদ্ধা নাই। এই তিনই ত এক, দুইটীর উপর যখন বিশ্বাস আছে, বাকিটাও হইয়া যাইতে পারে। তোমরা প্রথমে তাই কর। গুরুর আদেশ অবিচারে প্রতিপালন করা। সাধন পথের প্রথম অবস্থা কি ? না, হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হওয়া। তাই ত বলি যখন হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছ, তখন আর চিন্তা কি ?"

"রোগী যতক্ষণ, তত্তক্ষণ ত্যাগী। তারপর যখন রোগ আরোগ্য হইতে থাকে, তখন দুর্ব্বল হয়। তখন পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার। তখন ভোগী হওয়া চাই। যতক্ষণ চল্‌তে পারে ততক্ষণ আর কেহ হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হয় না; যখন আর পারে না, রোগ বেশী হইয়া পড়ে, তখনই হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হয়। কেহ কেহ ঐ অবস্থায়ই (অর্থাৎ সাধন আরম্ভ হইলেই) দেহত্যাগ করে, আবার কেহ কেহ রোগ মুক্ত হইয়া যেমন তেমনটি হইয়া বাহির হয়। সবল খাদ্য অর্থাৎ "সাধন।" আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "দেখিস্ না রোগ যখন একটু সারিতে আরম্ভ করে তখন ধীরে ধীরে নানা রকম খাদ্য, যেমন ছানার জল, ফলের রস ইত্যাদি দেওয়া হয়, আর তখন খাইতেও পারে, ক্রমে ক্রমে যখন সবল হইয়া উঠিল, তখন তাহাকে স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সে যেমনটি তেমনটি হইল।"

(নিজের শরীর দেখাইয়া) "এই শরীরটাও কিছুদিন হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছিল, যখন সাধনের ক্রিয়াগুলি হইয়া যাইত।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

৫ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার।

আজ বাচ্চুদের বাড়ী কীর্ত্তন হইল। উদয়াস্ত কীর্ত্তন ও ভোগাদি হইল। মা'ও গিয়া কীর্ত্তনে বসিলেন। খানিকক্ষণ মেয়েরাও করিল। খুব আনন্দ হইল। শ্রীযুত মহেশবাবুর আগ্রহে মা তাঁর ধর্ম্মশালায় গিয়াছিলেন। আজ লক্ষ্য করিলাম, মোটরে এতটুকু পথ আসিতেই মার শরীর একটু কেমন হইল, একটু গরম গ্লুকোস্ সঙ্গে নিয়াছিলাম, মোটরে তাই খাওয়াইয়া দিলাম। মহেশবাবুর ওখানেও কিছু সময় কথাবার্ত্তা হইল। তারপর মাকে অন্য একটা মেয়েদের স্কুলে নিয়া গেল। সেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী আসিয়া বিশেষ অনুরোধ করিয়া নিয়া গেলেন। মার শরীর এত অসুস্থ কিন্তু কাহাকেও সহজে ব্যথা দেওয়া মার স্বভাব নয়, তাই রাজি হইয়াছেন। সেখানে সিঁড়ি দিয়া ওঠা নামা বড়ই কষ্টকর। দয়াময়ী মা তাঁর আগ্রহে তা'ই করিলেন। ধর্ম্মশালায় ফিরিতে আমাদের একটু রাত্রি হইয়া গেল।

৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার।

আজ বৈকাল ৫টার গাড়ীতে মার সঙ্গে আমরা বিন্ধ্যাচল রওনা হইলাম।

৭ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার।

কাশীতে একটি ভদ্রলোক মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, কি করিয়া মন স্থির করিব? তাঁকে পাইব?" মা বলিলেন,

"একখানা ঘর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ, ধূপবাতি ইত্যাদি দ্বারা পবিত্র ভাব যাহাতে জাগে, সেইরূপ ভাবে সাজাইয়া রাখ, যেন সেই ঘরে গেলেই তাঁর (উর্দ্ধদিকে হাত উঠাইয়া) কথা মনে জাগে। এই ভাবে সেই ঘরে বেশি সময় বসিবার চেষ্টা কর। ফল পাইবে।"

আর একটি ভদ্রলোক বলিতেছেন, "মা, রাস্তাই ত পাই না; জানিনা কোন পথে চলিব ?" মা বলিলেন, "এক রাস্তা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ কর, দেখিবে পথে আরও যাত্রী পাইবে! উদ্দেশ্য ঠিক্ রাখিয়া যে কোন পথ ধরিয়া চলিলেই পথে যাত্রী পাওয়া যায় এবং তাহারা পথের সন্ধান বলিয়া দেয়। তোমরা চলিতে থাক ত। বসিয়া থাকিও না।"

১০ই অগ্রহায়ণ, রবিবার।

কাল শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এখানে আসিয়াছেন। মার রান্না শেষ করিয়া মাকে খাওয়াইতে বসিয়াছি। মা এতক্ষণ সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, এখনও সেই কথাই বলিতেছেন, "সমাধি একটা অবস্থা বই কি। পথ চলিতে চলিতে যেমন তোমরা একটু বিশ্রাম করিয়া নেও, তারপর, যখন পথ চলা শেষ হইল, অথবা ছাতে উঠিয়া গেলে, তখন আর বিশ্রামের দরকার নাই। তারপর বিশ্রাম অবিশ্রাম বলিয়া কোন কথাই নাই।" এই বলিয়া ছোট্ট একটি তুড়ি দিলেন। তারপর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি ত শাস্ত্র টাস্ত্র তোমাদের জানি না, আবোল তাবোল বলি।"

১৫ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার।

একটি ভদ্রলোক সংসার ছাড়িয়া কিছুদিন আশ্রমে আসিয়াছিলেন, স্ত্রী পুত্রের অনুরোধে পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হয়। বাড়ীতে কিছু দিন থাকিয়া পুনরায় স্ত্রীকে নিয়াই মার কাছে বিন্ধ্যাচল আশ্রমে আসিয়াছেন। ইচ্ছা, কয়েকদিন থাকিয়া আবার বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন। সংসার ছাড়িয়া আসিবার মত মনে বল পাইতেছেন না। স্ত্রীও বলিতেছেন, "মা উনি ত ঘরে বসিয়াও বেশ কাজ করেন, এখানে এই বয়সে কি ফেলিয়া যাওয়া যায়?" ভদ্রলোকটিও সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন, "আচ্ছা মা, তিনি ত সব স্থানেই সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তিনিই ত মনের ভিতর বসিয়া আমাদের যেভাবে চালাইতেছেন আমরা সেই ভাবেই চলিতেছি।"

মা প্রথম কয়েকদিন এ'সব কথায় কিছুই জবাব দিতেন না। আবারও আজ এই ভাবের কথা তাঁহারা বলিতেই, মা বলিতেছেন, "দেখ বাবা, ও সব গোঁজামিল দেওয়া; আমাদের যেই দিকে যাইতে মন চায়, আমরা সেই দিকের কথাই বলি। ভগবানই সব করাইতেছেন, তিনি সকল স্থানেই আমাদের সঙ্গে থাকেন, এই সব কথা বল্‌বারও তোমরা অধিকারী নও। একটা অবস্থা আছে তাহা হইলে তবেই, লোকে বুঝিতে পারে তিনিই সব করাইতেছেন, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আর, তোমরা যে এই সব কথা বল, উহা বইপড়া অথবা শোনা কথা মাত্র।" মার পরিষ্কার ভাবে এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি একেবারে চুপ!

১৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার।

আজ মা সকালেই গিয়া সম্মুখের বড় গাছটির (খরষ্ঠিতলা) তলায়

২২

বসিয়াছেন। একটি কাশ্মিরী মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সাকার উপাসনা ভাল, না নিরাকার উপাসনা ভাল?" মা বলিলেন, "সাকার না করিয়া নিরাকারে যাইতেই পারে না। সাকারের ভিতর দিয়াই নিরাকারে যাইতে হয়। যেমন, দেখনা, গঙ্গার যাইব, আমরা রাস্তা দিয়া অর্থাৎ সাকারের মধ্য দিয়া চলিয়াছি, চলিতে চলিতে নদীর পাড়, নদীর পাড় ধরিয়া যখন নদীর মধ্যে গেলাম তখন আর সাকার নাই, এমন কি নীচে মাটিও পায় লাগিতেছে না। আবার, যখন উঠিলাম, তখন দেখিলাম, সাকার ও নিরাকার সবই তিনি।"

১৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার।

আজ প্রাতে মা শুইয়া আছেন। নিকটে অভয়, আমি ও শঙ্করানন্দ স্বামিজী বসিয়া আছি। মা বলিতেছেন, "উপনিষদ্ কি? না, উপ যেখানে নিষেধ সেইখানে।" তারপর স্বামিজী প্রেম সম্বন্ধে কথা উঠাইলেন। কথায় কথায় মা বলিতেছেন "পরম যেইখানে সেইখানে হইল প্রেম।"

২১শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার।

উপেনবাবু ডাক্তার, শঙ্করানন্দ স্বামিজী ও আমরা ২।১ জন আজ প্রাতে মার নিকট বসিয়া আছি। নানা কথা উঠিয়াছে। কথায় কথায় মা বলিতেছেন, "দেখ, এই শরীরটা (নিজ শরীর দেখাইয়া) আগেও যা' ছিল এখনও তাহাই, মধ্যে শুধু কয়েকটা দিন, যোগক্রিয়াদি শরীরটার মধ্যে হইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, তোমাদের জন্যই তাহা হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ও এখন যে একই,

তাহার প্রমাণ দেখ ; এইবার যখন এই শরীরটা, কুমিল্লা বিদ্যাকুট, খেওড়া, সুলতানপুর প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে গেল, গ্রামের লোকেরা, ছোটবেলায় যাহারা দেখিয়াছে, সকলেই এই শরীরটা দেখিয়া বলিতেছে, 'আমাদের নির্ম্মলা ত দেখিতেছি আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। তবে এতগুলি বড় বড় লোক সব সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে কেন, বুঝি না। ইহাতেই তোমরা বুঝিতে পার আগেও যাহা, এখনও তাহাই, মধ্যে ক্রিয়াগুলি কিছুদিন হইয়া গিয়াছে মাত্র।"

২২শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার—

মা আজ বিন্ধ্যাচল হইতে রওনা হইয়া অনেকের আগ্রহে একদিনের জন্য এলাহাবাদ চলিলেন। একরাত্রি কালীবাড়ীতেই কাটাইলেন।

২৩শে অগ্রহায়ণ, শনিবার।

এলাহাবাদ হইতে আমরা আজ নবদ্বীপ যাত্রা করিব স্থির হইয়াছে। এখানে মাকে দর্শন করিবার জন্য সকলে বেসেণ্ট্ হলে একত্র হইবেন। কালও প্রতিমাদেবী ও বাঁকেবিহারী বাবু প্রভৃতি মাকে খানিক সময়ের জন্য বেসেণ্ট্ হলে নিয়া গিয়াছিলেন। তথায় কীর্ত্তনাদিও হইয়াছিল। আজও প্রাতে মাকে তথায় নিয়া গেলেন। কীর্ত্তনাদি হইল। বহুলোক একত্র হইয়াছিলেন। মা ১০টায় তথায় গেলেন। ১১টা অবধি তথায় থাকিবেন কথা হইয়াছে। মার একটু উপদেশ শুনিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন।

একজন বলিলেন, "মা, আমাদের কিছু বলুন।" মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি বলিব ? আমার বলিবার কিছুই নাই।" ঘর ভরা লোক,

হয়ত কেহ পত্রিকায় মার উপদেশ বাহির করিবেন, এই আশায় গিয়াছেন, মার ২।৪টী কথা বাহির করিবার জন্য তাঁহারা কত ব্যস্ত, কিন্তু মার কোন কথাই বাহির হইল না।

বিকালে রওনা হইলাম। ট্রেনে এই নিয়া মার সঙ্গে আমার কথা হইল। আমি বলিলাম, "এতগুলি লোক তোমাকে কিছু বলিতে বলিল, তোমার কথা শুনিবার জন্য হয়ত কত লোক উৎসুক হইয়াছিল, তুমি ত বলিলে, 'কিছুই বলিবার নাই।' মা বলিলেন, "তা আমি কি করিব বল্? কখনও হয়ত কেহ শুনুক বা না শুনুক শরীরটা বলিয়াই যাইতেছে, আবার ঘরভরা লোক উপদেশ শুনিতে চাহিতেছে, আমার ত কিছুই বলিবার নাই, কিছুই বাহির হইল না। আমি ত লেক্চার দিতে যাই না। তোরা যখন যাহা বাহির করাবি, তাই'ত বাহির হইবে।"

দেখিলাম মার এই একরূপ। এত লোক উৎসুক হইয়া বসিয়া আছে, পত্রিকায় সংবাদ দিয়াছে, মা এক ঘণ্টা এই সময়ে এইখানে থাকিবেন। মার একটু কথা শুনিবার জন্যই তাঁহারা মাকে তথায় নিয়াছেন, আর মা একেবারে চুপ। "তোমরা ভগবানের নাম কর" এই কথাটুকুও ত বলিতে পারিতেন,—একেবারে কিছুই না। সাধারণ একটু ভাব থাকিলেও এই অবস্থায় ২।১টী কথাও হয়ত বলিতেন কিন্তু এ'যে নিয়ম-কানুনের একেবারে বাহিরে। তাই কোন কথাই বলা হইল না। আমি মার মুখের দিকে চাহিয়া শুধু বলিলাম, "তোমার সবই অদ্ভুত কাণ্ড।"

২৪শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—

আজ প্রাতে আমরা ব্যাণ্ডেলে পৌছিয়াছি। ৪।৫ ঘণ্টা এখানে বসিয়া থাকিতে হইবে। ২॥টার সময় নবদ্বীপ যাওয়ার গাড়ী মিলিবে।

মার জন্য একটু দুধ পাওয়া যায় কিনা দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছি, ষ্টেসনের ভিতরেই রেলওয়ের একজন কর্ম্মচারী আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায়, আমি তাহাকে বলিলাম যে আমি একটু দুধের সন্ধানে যাইতেছি। এই সূত্রে ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

কর্ম্মচারীটি ছেলেমানুষ। খানিক পর সে মার নিকট আসিল। দুপুরে আসিয়া মার নিকট কথা বলিতে লাগিল। মাকে বলিতেছে, "আপনাকে বড়ই আপনার বোধ হইতেছে। আমার গুরুদেব রাঙ্গামার সঙ্গে থাকিতেন। গুরুদেব আমাকে বড় ভালবাসিতেন। কিন্তু আমি একটু ক্ষ্যাপা গোছের, তাই তাঁর নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি।" মা বলিলেন, "কি অপরাধ?" ভদ্রলোকটী বলিল, "এই ধরুণ আমি যখন মেসে ছিলাম, গুরুদেব গেলেন; আমি ডিম খাই, সেইখানেই গুরুদেবকে খাওয়াইলাম, পরিষ্কার করিয়া দিবার কথা মনেই হয় নাই—এই রকম অনেক আছে। আজ, আপনার জন্য বাসা হইতে একটু দুধ আনিতেছিলাম, কিন্তু জুতা পায়ে দিয়া আনিতে পারিলাম না। এই দিকটা আমার কখনও মনে হয় নাই। আজ আপনার দুধ আনিবার সময়েই প্রথম বুঝিলাম, গুরুদেবের নিকট আমি অপরাধ করিয়াছি।"

মা এই সব কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। কথায় কথায় বলিল, "পৈতা ফেলিয়া দিয়াছি, গায়ত্রী পড়ি না।" মা বলিলেন, "পৈতা রাখিতে হয় ও গায়ত্রীও পড়িতে হয়।" ভদ্রলোকটি বলিল, "ও' বড় একটা বন্ধন।" মা বলিলেন, "কাপড় যে পর, ইহাও ত একটা বন্ধন।" তখন সে বলিল, "তাইত।" কথায় কথায় ছেলেটী খুব আপনার মত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। গুরুর প্রতি বিশ্বাসের কত কথা বলিতে লাগিল। মা আমাকে বলিলেন, "দেখ্ ত, দুধ ভিক্ষা করিতে গিয়া ভাব

ভিক্ষা পাইলি। দুধ আর কতটুকু সময় থাকিত এই ভাবটুকু যে অনেক বড়।"

আমরা ২॥টার গাড়ীতে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় নবদ্বীপ পৌছিলাম। পূর্ব্বেই যতীশদাদাকে খবর দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ও বুনি টেলিগ্রাম পাইয়াই নবদ্বীপ যান। তথায় মাকে না দেখিয়া ফিরিতেছিলেন, ব্যাণ্ডেলে মার দেখা পাইলেন। আবার আমাদের সঙ্গে নবদ্বীপ চলিলেন। আমরা নৌকায় গিয়া উঠিলাম। নৌকাতেই থাকা স্থির হইল। রাত্রিতে নৌকায় পাক করিলাম, মার ভোগ দিয়া সকলে প্রসাদ পাইলাম।

২৫শে অগ্রহায়ণ, সোমবার।

আজ ভোরেই যতীশদাদা, বুনি ও অভয় কলিকাতা চলিয়া গেলেন, আমি ও মা রহিলাম। সকালেই নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল, খানিক দূর গিয়া নৌকা লাগাইয়া হাত মুখ ধোয়া হইল। তারপর নৌকা অপর পাড়ে লাগাইয়া তীরেই পাক করিলাম। মা শুইয়াছিলেন, শরীরে আবার সেইরূপ অবসন্নতা প্রকাশ পাইতেছে। আমি ভয় পাইলাম, যদি মার শরীর বেশী খারাপ হয়, এই নৌকার ভিতর আমি কি করিব ? এ'র মধ্যে কি করিয়া খবর রটিয়া হইয়া গেল, 'মা আসিয়াছেন'।

দলে দলে লোক নৌকা ভর্ত্তি হইয়া মার দর্শনে আসিয়া উপস্থিত। আমি দেখিলাম এখানে থাকা বড়ই মুস্কিল, মার শরীরের এই অবস্থা। মাকে কলিকাতা যাইবার জন্য বলায় মা বলিলেন, "যাহা ভাল হয় কর।" আমি রওনা হইবার ব্যবস্থা করিলাম। তখনই বাসে রওনা হইয়া কৃষ্ণনগর গিয়া ট্রেন ধরিলাম। পথে একটি ভদ্রলোক মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা বিশ্বাস, ভক্তি, অনুরাগ কি প্রার্থনা দ্বারা হয়, না কর্ম্ম দ্বারা হয় ?" মা বলিলেন, "প্রার্থনাও ত কর্ম্ম, তাহাতেও হয়।"

রাত্রি ৮॥টায় আমরা কলিকাতা পৌঁছিলাম। কাহাকেও খবর দেওয়া হয় নাই, আমরা সোজা বিরলা মন্দিরে চলিয়া গেলাম। বিশ্রাম করিবার জন্য মাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল।

২৬শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার।

আজ যতীশদাদার বাসায় খবর দিতেই, অনেকে খবর পাইয়া মন্দিরে আসিলেন। মার শরীরের অবসন্ন ভাবটা একটু কমিয়াছে। দেখা যাইতেছে, চলা ফেরা একটু করিলেই এই ভাবটা হইতেছে। ভক্তরা মার শরীর খারাপ দেখিয়া দুঃখিত হইলেও মাকে কাছে পাওয়ার আনন্দে উৎফুল্ল।

মাকে আজ একটা নূতন বাড়ীতে নিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে; কারণ আমাদের সকলেরই ইচ্ছা, মাকে এইস্থানে কিছুদিন রাখিয়া ভাল করিয়া ডাক্তারদের দেখান হউক। ঔষধ ত দেওয়া যায় না, বিপরীত ফল হয়; এই শরীরে ঔষধ চলিবে না, তবুও শরীরে কি ব্যারাম, তাহা দেখান হউক। তাই কিছুদিন এখানে থাকার কথা হইল, অবশ্য যদি আবার চলিয়া যাওয়ার খেয়াল না জাগে। বেশীদিন থাকিলে মন্দিরে সুবিধা হইবে না, তাই নূতন একটা বাড়ীর খোঁজ হইতে লাগিল।

ভক্তদের সঙ্গে কথা বলিয়া মা আনন্দ করিতেছেন। কথায় কথায় বলিতেছেন, "দেখ ছোট বেলায়, শ্রাবণ মাসের কি একটা ব্রত আছে, সেই ব্রত করিয়া স্রোতের জল খাইতে হয় নিয়ম আছে। শরীরের মা এই কথা বলায়, এই শরীর তখন ছোট, জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'স্রোতের জল খাইব কেন? পুকুরের জল খাইলে হয় না?' শরীরের মা বলিতেছে, 'না নিয়ম আছে স্রোতের জল খাইতে হয়।' বলিতেছি, 'এই স্রোতের

সঙ্গে কি একেবারে গঙ্গার সঙ্গে ছোঁয়া আছে নাকি ?' তখন কিন্তু, গঙ্গা দেখা ত দূরের কথা, শরীরের মামাবাড়ী বড় পণ্ডিতের বাড়ী ছিল তাই শুদ্ধ আচার নিয়মগুলি ছিল, সেখানে গেলে দেখিতাম, উপরে এক কোণায় কমণ্ডলুতে করিয়া একটু গঙ্গাজল রাখিয়া দিয়াছে। কেহ শুদ্ধ হইতে হইলে কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল নামাইয়া এক ছিটা গায়ে দিত, দিলে শুদ্ধ হইয়া গেল। এই দেখিতাম ও শুনিতাম। তা' ছাড়া গঙ্গার আর কোন ধারণা বাহির হইতে ছিল না। আমার প্রশ্ন শুনিয়া শরীরের মা বলিত, 'এত কথা রাখ, এখন যা ত, গিয়া স্রোতের জল খাইয়া আয়।' এই কথায় খেয়াল হইতেছে, গুরু না করিলে হয় না। বই পড়িয়া সব করা যায়, বীজও জানা যায়, কিন্তু তাহা যেন পুকুরের জল খাওয়া আর গুরুমুখে শোনা যেন স্রোতের জল খাওয়া। যদিও দুইটাই জল, বই পড়ায়ও জানা যায় সত্য, কিন্তু পার্থক্য আছে।"

দুপুরে মাকে শোয়াইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মার শুইবার ভাব নাই। তবুও আমাদের কথায়, ঘরের ভিতর শুইয়া আছেন। ভক্তেরা কি প্রকারে খবর পাইয়া ক্রমে ক্রমে সকলে উপস্থিত হইতেছেন। মার শরীর অসুস্থ বলিয়া সকলকে খবর দেওয়া হয় নাই, তাই অনেকেই খবর পান নাই। মায়ের শরীর খুবই দুর্ব্বল, একটু বেশি কথা বলিলেও যেন কখনও কখনও খুব ক্লান্ত দেখায়। আর হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। মা বলেন, "কোন অসুবিধা নাই ত, শুধু কথা বন্ধ হইয়া যায়, শরীরটা চুপ হইয়া যায়।" আমরা দেখিতেছি অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িতেছে, নাড়ীর গতিই খুব খারাপ হইয়া যায়।

অবশ্য আবার পরিবর্ত্তন হইতেও বেশী সময় লাগে না। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে নাড়ীর গতির এইরূপ চঞ্চলতা, ইহাতে সকলে ভয়

পাইতেছেন। মা নিজেই শরীরের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারেন। নাড়ী দেখাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া বলেন, "এখন ভাল দেখিবে", "এখন খারাপ দেখিবে", ঠিক ঠিক তাই দেখা যায়। এখন আবার কিছুই প্রায় হজম হইতেছে না। কিন্তু ভক্তেরা মার চেহারা দেখিয়া এত অসুস্থতা বুঝিতেও পারিতেছেন না। কারণ মার রূপ-লাবণ্য এক এক সময় যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। এত দুর্ব্বল অবস্থায়ও চেহারার বিশেষ পরিবর্ত্তন নাই। শরীরের গঠনের সৌষ্ঠবও কমে নাই। নিজেই আমাদের শরীর দেখাইয়া বলেন, "দেখিতেছিস্ ত এই শরীর; এই শরীরে আবার অসুখ নাকি? সর্ব্বদাই সুখ। এই বলিয়া হাসিতে থাকেন।"

রাত্রিতেও প্রায় ১০টায় সকলকে সরাইয়া দিয়া মা খেলা আরম্ভ করিলেন, তারপর অতি ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া ছেলে মানুষের মত হাসিতে লাগিলেন। সেই ভাবেই যেন সকলকে ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, "কি করি বল ত, শুইবার ভাবই নাই। চোখ বুজিয়া কতক্ষণ লুকাইয়া থাকা যায়। যেন ঠিক লুকাইয়া থাকা। আচ্ছা কাল হইতে তোমাদের কথা মত শিগ্‌গির শিগ্‌গির শুইতে চেষ্টা করিব।"

অনেকক্ষণ বারান্দায় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন, তারপর আবার ঘরে গিয়া শুইলেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন এই আনন্দটুকু উপভোগ করিলেন। মার শরীরের দিকে চাহিয়া সকলেই মাকে বেশী সময় বিশ্রাম দিতে ব্যস্ত, যদিও তাহাতে মার অদর্শন জনিত ব্যথায় সকলেই ব্যথিত। যখনই যেখানে রহিয়াছেন, দিনরাত মার দরজা খোলা থাকিত, ভক্তেরা কত আনন্দ করিয়াছেন—এখন তাহা না পাইয়া কেহ রাগ করিতেছেন, কেহ দুঃখ করিতেছেন; কিন্তু সকলেরই মার শরীরের দিকেই লক্ষ্য, তাই

কষ্ট হইলেও, সকলেই মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য বলিতেছেন। যথা নিয়মে বিশ্রাম দেওয়া হইতেছে।

মধ্যে মধ্যে মা নিজেই এই নিয়ম ভাঙ্গিতেছেন। কাহারও প্রাণ চায় না মাকে ছাড়িয়া যায়, যতটুকু সময় মাকে দেখিতে পারে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে—মা কাছে আসিয়াছেন। তাহাদিগকে সরাইয়া মার বিশ্রাম দেওয়া মহা মুস্কিলের ব্যাপার। কত অনুনয়, বিনয় করা হইতেছে' সকলেই বলিতেছে, "হাঁ এইবার যাইতেছি। মাকে বিশ্রাম দেওয়াই দরকার। শরীরটা মার সুস্থ থাকুক এই ত আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা"—কিন্তু কার্য্যতঃ কেহই উঠিতে পারিতেছে না। উঠি উঠি করিয়াও ঘণ্টা খানেক চলিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় কাহাকেও সরানো বিপদ। আবার মার শরীরে বিশ্রামের দরকার ভাবিয়া, এই কাজ করিতেই হইতেছে। সে এক চমৎকার ব্যাপার!

আজ সন্ধ্যাবেলা মা আরেক কাণ্ড করিয়াছেন। ২।৩টী ভক্তকে তাহাদের দোষগুলি দেখাইয়া হাসিয়া হাসিয়া এমন টস্ টস্ ভাবে কথা বলিতেছিলেন, তাহা দেখিয়াও সকলে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই খেলায়ও সকলেই মুগ্ধ। ঐ ভাবে বলিয়াই আবার তখনই বলিতেছেন, "তোমরা রাগ করিও না কিন্তু, রাগ করিলে আমি কোথায় যাইব?" এই বলিয়া মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন। ঐ হাসিতেই স্তব্ধ ভাবটাও যেন কাটিয়া গেল সকলে আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। "তোমরা রাগ করিও না, রাগ করিলে আমি কোথায় যাইব?" মার এই কয়টি কথা সকলেরই প্রাণ স্পর্শ করিল। ঐ ভাবে যখন দোষ দেখাইয়া ঠিক ঠিক কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন মায়ের যেন আরেক রূপ! আর ঐ ভাবের কথার উপর আর কাহারও যেন উত্তর যোগাইল না। মা হাসিতে লাগিলেন।

আবার বলিতেছেন, "মাথাটা হাল্‌কা হইয়াছে কিনা, তাই এইরূপ টস্ টসে্ কথা বাহির হইতেছে না? তোমাদের একটু একটু লাগিতেছে, কি বল বাবা?" তাহারা বলিতেছেন, "মায়ের কথায় কি সন্তানের রাগ হয়?" এইরূপ কত আনন্দই যে হইতেছে! কাহাকেও বলিতেছেন, "তোমরা শুধু ঘর, আর ঐ সব ছেলে মেয়ে নিয়াই থাক, এই মেয়েটাকে দেখিবে না? তাই অসুখ হইবে না, তবে কি?"

২৭শে অগ্রহায়ণ, বুধবার।

আজ আমরা লেকের ধারে, নূতন একটা বাড়ীতে গেলাম। অনেকেরই ইচ্ছা, মাকে ডাক্তার-কবিরাজ দেখাইবেন। মা'ও হাসিয়া জবাব দেন, "বেশ ত, এবার ডাক্তার কবিরাজ বাবাদের কিছু দর্শন পাইব।"

২৮শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার।

বেলা ১২টা হইতে ৪টা অবধি মাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। দুইবেলা একটু লেকের ধারে বেড়াইতে নিয়া যাওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলা ছাতে সকলেই বসেন, মাও বসেন, কীর্ত্তনাদি হয়। মা মধ্যে মধ্যে বলেন, "তোমরা মিশ্রি মুখে রাখ ত? মিশ্রি মুখে রাখার এমনই গুণ যে মুখে জল বাহির হইবেই হইবে। মিশ্রি কি, না তাঁর নাম।" একজন এত সব না বুঝিয়া পকেট হইতে এক কৌটা মিশ্রি বাহির করিয়া, এক টুকরা মিশ্রি নিজের মুখে ফেলিয়া দিলেন। মা তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "ওটা কি বাবা?" তিনি বলিলেন, "মা সর্ব্বদা মিশ্রি মুখে রাখিতে বলিয়াছে, তাই রাখিতেছি।" সকলেই এ'কথায় হাসিয়া উঠিলেন। মা বলিলেন, "বেশ ত বাবা! ঠিকই করিয়াছ, এই মিশ্রি মুখে দিতে

দিতেই সেই মিশ্রির কথা মনে পড়িবে। বাবা আজ মিশ্রির কৌটা নিয়া আসিয়াছে, এ'কথা আরও ভাল ভাবে সকলের মনে পড়িবে। সবই ভাল।" তখন আরও ২।১ জন সেই মিশ্রি নিয়া মুখে দিতে লাগিলেন।

মা হঠাৎ এমন গম্ভীর ভাবে এই "মিশ্রি নিয়া মুখে দেওয়া", "হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়া" "ধর্মশালা বানাও" ইত্যাদি কথা বলেন, অনেকে প্রথমটা তাহার ভাবার্থ না বুঝিয়া অন্য রকম উত্তর দিয়া বসেন। মা তাহা নিয়াও আনন্দ করেন ও প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দেন।

৩রা পৌষ, মঙ্গলবার।

আজ ভক্তদের কি প্রশ্নের উত্তরে মা বলিতেছেন "গুরু কৃপায় সব হয়, এ'কথা মনে রাখিও।"

৯ই পৌষ, সোমবার।

কলিকাতায় মাকে নিয়া আনন্দ উৎসব চলিতেছে। আজ সন্ধ্যার কীর্ত্তনের সময় অবনীদাদা মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কীর্ত্তনের পূর্ব্বে যে ধ্বনিটা দিয়া নেয় তার অর্থ কি?" মা বলিলেন, "অর্থ আর কি, অপর সব ভাবগুলিকে সরাইয়া মনটাকে কীর্ত্তনের মুখি করিয়া নিল। আর সবগুলি সরাইয়া দিল, এই আর কি।"

১২ই পৌষ, বৃহস্পতিবার—

শ্রীযুক্ত সি, আর দাস মহাশয়ের স্ত্রী ও কন্যা এবং তাহাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন মার দর্শনে আসিয়াছেন। মা শুইয়াছিলেন, তাঁহাদের একান্তে দেখা করিতে দেওয়া হইল। বাসন্তীদেবীর কি কথার উত্তরে মা বলিতেছেন, "গুরুকৃপাই সব, গুরুমন্ত্র ভিতরে ভিতরে

স্পন্দিত হইলে, তাহাতেই অঙ্কুর হয়, গাছ হয়। তার পরে ফুলে ফলে ভরিয়া ওঠে। ধ্যান, জপ, কীর্ত্তন, পাঠ ও সৎসঙ্গ এই পাঁচটির যে কোনটি নিয়ে থাক্।" এই বলিয়াই হাসিয়া বলিতেছেন, "পাঁচ তরকারী দিয়া খাওয়া, আর কি ? এক তরকারীতে অরুচি হইতে পারে।" এই কথায় সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

আজ একটি কবিরাজ মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। প্রথমেই বলিতেছেন, 'আমার নাড়ীজ্ঞান একটু আছে।' মা অমনি হাতখানি বাড়াইয়া তাঁহার দিকে দিলেন। কবিরাজ মহাশয় খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া নাড়ী দেখিয়া বলিতেছেন, "একি ? আপনি কি নাড়ীর গতি বন্ধ করিতে পারেন নাকি ? এ ত বড় আশ্চর্য্য নাড়ী দেখিতেছি, আপনি আমার দর্পচূর্ণ করিতেছেন নাকি ?" তারপর বলিতেছেন, "একটা বায়ু ও একটা তেজ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। তেজটা কি তাহা ধরিতে পারিতেছি না। পিত্ত বলিয়াও ধরা যায় না। অসুখ ত আপনার কিছুই নাই। একি, ফস্ করে নাড়ী যে কোথায় যায়, ধরাই যায় না।"

এক ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনি প্রথমেই বলিয়াছিলেন, 'নাড়ীজ্ঞান আমার আছে'—সেই অহংকার চূর্ণ হইল।" মা নেহাৎ ছেলে মানুষের মত বসিয়া আছেন, মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। কবিরাজ মহাশয় তখন বলিতেছেন, "দেখিতেছি, অসুখ দেখা টেখা কিছুই নয়, এ' আমার দর্শনের যোগাযোগ।" মা হাসিয়া বলিলেন, "মেয়েকে ঐ রকম বলে না বাবা। এ'বার ডাক্তার কবিরাজরূপে সব দর্শন হবে বাবা, তোমরা দর্শন দিতে আসিয়াছ।"

১৩ই পৌষ, শুক্রবার—

আজ বৈকালে আগড়পাড়া গিরিবালা দেবীর রাধাগোবিন্দের মন্দিরে যাওয়া স্থির হইয়াছে। তথায়ই মার থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিকালেই আমরা আগড়পাড়া আসিলাম। প্রকাণ্ড মন্দির, রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তিও ভারি সুন্দর। গঙ্গার পাড়েই মন্দিরটি। গঙ্গার ধারেই একটি ছোট কোঠায় মার বিছানা করা হইল। ভক্তেরা একে একে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। সকলে মাকে নিয়া ছোট ঘরটিতে বসিয়াছেন। আগড়পাড়ায় ম্যালেরিয়া ছিল, এইজন্য মার এখানে থাকায় অনেকের বিশেষ আপত্তি; মা হাসিয়া বলিলেন, "কি করিব, রাধাগোবিন্দজী এখানে নিয়া আসিলেন।" রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত সকলে মাকে নিয়া আনন্দ করিলেন; পরে মার বিশ্রামের জন্য মাকে শোওয়াইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

১৪ই পৌষ, শনিবার—

আজ প্রাতে কলিকাতা হইতে এক ভদ্রলোক মার দর্শনে আসিয়া মাকে বলিতেছেন, "চলুন, আপনাকে একটু বেড়াইয়া নিয়া আসি।" তবে রাস্তা খারাপ ; তা' ছাড়া মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে, মোটরে যে বেড়াইতে যান, তাহাতেও শরীর কেমন হইয়া যায়। মোটর খুব আস্তে আস্তে চালাইতে হয়। তাই কেহ কেহ আপত্তি তুলিলেন। মা কিন্তু নিজেই বলিলেন, "এখানে নাকি মহাপ্রভুর কি একটা যায়গা আছে? তাহা কতদূর!" ভক্তেরা বলিলেন, "এই ত নিকটে পানিহাটিতে।" মা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সেখান হইতে বেড়াইয়া আসি, কি বলিস্?" আমি বলিলাম, "বেশত চল।" মা অমনি উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "চল্ তবে।"

ভক্তদের নিয়া মা রওনা হইলেন। মার রান্নার দেরী হইয়া যাইবে বলিয়া আমি সঙ্গে গেলাম না। মা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখ, কাল রাত্রিতে যখন আমি শুইয়াছিলাম, তখন দেখিতেছি, একটা স্থানে গিয়াছি, গিয়া এই শরীরটার রোমাঞ্চ হইয়াছে। আমি তাহা দেখাইতেছি। আজ যখন ওরা রাঘব পণ্ডিতের আঙ্গিনায় নিয়া গিয়াছে, তখন দেখি সর্ব্ব শরীরে রোমাঞ্চ হল। রাত্রির ঘটনাটা খেয়াল হইবার জন্যই এখনও রোমাঞ্চ হইয়াছে।" একজন ভক্ত এই কথা শুনিয়া মাকে বলিলেন, "মা মহাপ্রভুর একটা কথা আছে, বৈষ্ণবরা বলেন—

"শচীর রন্ধনে, আর নিতাইর কীর্ত্তনে
শ্রীবাস অঙ্গনে আর রাঘব ভবনে—

তিনি নিত্য বিরাজ করেন।" ভক্তেরা মাকে বটবৃক্ষতলে যেখানে দন্তোৎসব হইয়াছিল সেইখানেও পরে নিয়া গিয়াছিলেন।

১৬ই পৌষ, সোমবার—

আজ আবার মা আমাদের নিয়া নৌকায় রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী ইত্যাদি দেখাইতে চলিলেন, সকালবেলা আমরা চলিলাম। ভক্তেরা গঙ্গায় নৌকার মধ্যে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বড় আনন্দ হইল। ঘাটে নৌকা লাগিল। মার শরীর খারাপ বলিয়া মা আর নৌকা হইতে নামিলেন না আমরা নামিয়া বটবৃক্ষমূলে গেলাম, তথায় বৃক্ষতলটি বাঁধানো, লিখা আছে—

"শ্রীপাট পানিহাটী,

১। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব—

৯২১ কার্ত্তিক, কৃষ্ণা দ্বাদশী।

২। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—

৯২৩ সালে এই বৃক্ষতলে শুভাগমন করেন।

৩। প্রেমের অবতার দয়ার সাগর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক ১৪৩৮ সাল জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে এই স্থানে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কৃপাদণ্ড মহোৎসব লীলা।”

তারপর আমরা রাঘব ভবনে গেলাম। সমাধি-স্থান প্রদক্ষিণ করিলাম। মা নৌকায় আছেন তাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। নৌকায় কীর্ত্তন চলিতেছে। আমরা ফিরিয়া চলিলাম। দুইপাশে লোক দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। অনেকেরই মনে হয়ত মহাপ্রভুর লীলার কথা জাগিল।

১৮ই পৌষ, বুধবার—

ডাক্তাররা বলিয়াছেন, মার বিশ্রামের বিশেষ দরকার, নতুবা শরীর রাখা দায় হইবে। ভক্তদের প্রাণে ভয়ানক আশঙ্কা জাগিল। সকলে মিলিয়া কি করিয়া লোকের ভীড় কমান যায়, মার শরীর বিশ্রাম পায়, তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলেন আরও দেখা যাইতেছিল, মোটরে চলিলেও শরীর কেমন অবসন্ন হইয়া আসে, তাই মোটরে ওঠাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিছুদিন মাকে এখানেই রাখা যায় কিনা, এই কথা চলিতেছে। মা হাসিয়া বলিতেছেন, “ডাক্তারদের কথায়ই কি আর মোটরে বা ট্রেনে চলা বন্ধ হইত? দেখা যাইতেছে, শরীর আর চলে না, মোটরে উঠিলেও কেমন হইয়া যায়, এই শরীরটার সবই ত আপনা আপনিই হইয়া গিয়াছে, হইয়া যাইতেছে। এখন বোধ হয় শরীরটা কিছু সময় এক স্থানেই থাকিবে, তাই নড়াচড়াও এই ভাবে বন্ধ হইয়া আসিতেছে। আমি ত অনেকদিন যাবতই উহাদের বলিতেছি, “দেখ আমার কথাগুলি কেমন আটকাইয়া যায়, শরীরটা যেন আপন ভাবে

থাকিতে চায়, ইহা যে রোগের জন্য তা' মনে করিস্ না।' আমি ত অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই উহাদের এই কথা বলিতেছি।" সত্যই, মা কিছু-দিন পূর্ব্ব হইতেই এই সব বলিতেছেন। কথাগুলি মধ্যে মধ্যে ওলট পালট ভাবে বাহির হইয়া যায়, ঠেকিয়া যায় এমনও হইতেছে।

আজ দুপুরে শুইয়া আছেন, আমি কাছে বসিয়া আছি, বলিতেছেন, "দেখ্, শরীরটা আপন ভাবে থাকিবে, তোরা মনে করিস না ব্যারামের জন্য মার এইরূপ হইতেছে, ব্যারামের জন্য নয়, শরীরটা আপন ভাবেই থাকিবে। এই পর্য্যন্তই বলা আসিল তাই বলিলাম, কি ভাবে থাকিবে না থাকিবে, আর কিছুই বলা আসিতেছে না।"

রাত্রিতে ত্রিগুণাদাদা এবং আরও কয়েক জন বসিয়া আছেন। মা আজ প্রায় সারাদিনই শুইয়া আছেন। সকাল বেলা গঙ্গার দিকের বারান্দায় একটু বসিয়াছিলেন। হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বসিবার বা উঠিবার খেয়াল নাই। তারপর যখন বেশী খারাপ হইয়া উঠিল তখন উঠিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

আমি রান্না করিতেছিলাম, কাছে আসিতেই এই সব বলিলেন, কথা অতি মৃদুভাবে বলিতেছেন। তখন নাড়ীর গতি অতি খারাপ। শরীর ঠাণ্ডা। অনেক্ষণ পা ঘসিয়া দিতে দিতে আবার শরীর একটু গরম হইল। শরীরটা একটু ভাল বোধ হইল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা এখন একটু সুস্থ বোধ করিতেছেন কি ?" মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সব সময়ই ত সুস্থ আছি, কখনও একটুও অসুস্থতা নাই। তবে শরীরটা কেমন হইয়া যায়, তোমরা দেখ।" নাড়ীর গতি কখনও খুব খারাপ হয়, তখনও মুখের হাসিটুকু তেমনই থাকে। মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে শরীর এত ঘন ঘন ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ডাক্তাররা নাড়ীর

গতি দেখিয়া প্রায়ই ভয় পাইয়া যান, কিন্তু মা তখনও হাসিতেই থাকেন।

প্রায় সারাদিনই এই অবস্থায় কাটিল। তাই লোকের ভীড় হইতে দেওয়া হইল না। অনেক চেষ্টায় সকলকে ঘরে আসিতে বারণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। সন্ধ্যাবেলায় মা ত্রিগুণাদাদাকে বলিতেছেন, "দেখ, এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা কিন্তু অসুখের জন্য মনে করিও না। আমি কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই খুকুনী ওদের বলিয়াছিলাম যে শরীরটা আপনভাবে থাকিবে, কি ভাবে থাকিবে তা' বলা আসিতেছে না। জাগতিক ক্রিয়া যদি বন্ধ থাকে তবে জাগতিক আহার ইত্যাদি দ্বারা শরীর ঠিক করিবে কি করিয়া? মধ্যে মধ্যে বাহিরের সব বন্ধ থাকে, শ্বাসের গতিও ভিন্ন রকম হয়, তখন বাহিরের আহার ইত্যাদিও হজম হইতে পারে না।"

১৯শে পৌষ, বৃহস্পতিবার—

আজ গঙ্গাচরণ বাবু ডাক্তার দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে নিয়া আসিয়াছেন। শুনিলাম ইনি ১০৮ শ্রীশ্রী ভোলাগিরি মহারাজের শিষ্য। সাধনায়ও বেশ উন্নত। ৩।৪ দিন পুর্ব্বে ইনি একবার মাকে দেখিয়া গিয়াছেন। সেইদিন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'লিভারে' একটু দোষ হইয়াছে। আজ বলিতেছেন, সেই দোষটুকুও পাওয়া যাইতেছে না। ডাক্তার বাবু দেখিবার পূর্ব্বেই মা বলিতেছেন, "বাবা, অসুখ আর আজ কিছুই দেখিতেছি না।" ডাক্তার ও কবিরাজগণ সকলেই বলিতেছেন, মাকে এখন ঘি খাওয়ান বড়ই দরকার, তাই লুচি ও ঘিয়ের তরকারি খাওয়ানোর ব্যবস্থা হইয়াছে। মা কখনও হয়ত এইভাবে ঘি খান নাই। প্রায়ই জলে সিদ্ধ তরকারি, কি অতি সামান্য ঘি দিয়া দেওয়া

হইয়াছে। মা এই খাবারের ব্যবস্থা দেখিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "দেখ্, সবই তোরা করিতেছিস্, একবার ডাক্তারের কথায় শুধু জলে সিদ্ধ তরকারি, এমন কি ঘি, তেল যেন এক বিন্দুও না দেওয়া হয়, দুধ পর্য্যন্ত মাখন তুলিয়া খাওয়াইতে আরম্ভ করিলি, আবার, এখন ডাক্তারদের কথাতেই, লুচি, তরকারি, ক্ষীর খাওয়াইতেছিস্। আমি যদি এ'সব ব্যবস্থা করিতাম তবে তোরা বল্‌তিস, 'মা জলে সিদ্ধ খান ত্যাগ বুদ্ধিতে', আবার এই খাওয়ার ব্যবস্থা করিলে বল্‌তিস্ হয়ত, 'কয়দিন আর জলে সিদ্ধ খাওয়া যায়, এখন লুচি খাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছে'।" এই কথা বলিয়া খলখল করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

উপস্থিত সকলেও এই কথায় এবং মার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। মা বলিলেন, "দেখ্, শরীরটার যখন যাহা দরকার তোদের মুখ দিয়াই বাহির হইতেছে। এই শরীরটার পক্ষে ত ঐ জলে সিদ্ধ ডাল তরকারিও যেমন, এই লুচি, ক্ষীর, তরকারিও ঠিক তেমনই, কোনও তফাৎ নাই।

ডাক্তার আবার বলিলেন, "আপনার ত আজ অসুখ কিছুই দেখিতেছি না।" মা বলিলেন, "আমি কাল রাত্রিতেই খুকুনীকে বলিয়াছি অসুখ কিছুই নয়, পূর্ব্বেও ত শরীর এই রকম ঠাণ্ডা হইয়া আপন ভাবেই বেশী সময় পড়িয়া থাকিত। কথাও বন্ধ হইয়া যাইত, সমস্ত জাগতিক ক্রিয়াই বন্ধ হইয়া যাইত, এখনও যায়। ইহা অসুখের জন্য নয়, অসুখ কিছুই পাওয়া যাইবে না। কথা কি জান বাবা, জাগতিক ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে, বাহিরের খাওয়া দাওয়াতে শরীর পুষ্ট করিবে কি করিয়া? শ্বাসের গতিই ভিন্ন রকম থাকে। তাই একটু হয়ত বেশী খাওয়া হইল, হজম হইল না। তাই তোমরা কখনও 'লিভার,' 'ষ্টমাক,' খারাপ দেখ,

হয়ত অম্বল হইল। আবার, একটু ঠিক মত চলিলেই কাল হয়ত যে সব অসুখ দেখলে, আজ দেখিলে তাহা কিছুই নাই। এমন কি একটু পূর্ব্বে যে সব রোগের লক্ষণ প্রকাশ দেখিলে আবার খানিক পরেই হয়ত দেখিবে সে কিছুই নাই।"

ডাক্তার নাড়ীর গতি খারাপ দেখিতেছেন। মা বলিতেছেন, "দেখ, এই শরীর বেশ বোঝে যে নাড়ীর গতি এখন এইরূপ খারাপ হইয়া যাইতেছে, কি, কি রকমটা হইতেছে, সব বোঝা যায়। —এখনই নাড়ীটা দেখ।" এই বলিয়া মৃদু হাসিয়া ডাক্তারের দিকে হাত খানা বাড়াইয়া দিলেন, ডাক্তার বাবু নাড়ী ধরিয়া বলিতেছেন, "অদ্ভূত নাড়ীর গতি, অল্প সময়ের মধ্যেই যে কত ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে; মা যেন ঘোড় দৌড় করিতেছেন। আমাদের সঙ্গে মার লীলাখেলা চলিতেছে।"

আমি বলিলাম, "পূর্ব্বে মার শরীর কত রকম হইয়া যাইত, নাড়ীর গতি বন্ধ হইত কিন্তু তখন আমাদের ভয় হইত না, এখন ভয় হয়।" মা বলিলেন, "এই যাহারা কাছে থাকে তাহাদের এই ভয়ের ভাবও ত সেই এক হইতেই আসে, অনুকূল বাতাস বয়। ঐ ত সব খেলা, এই হইতে হইতে ব্যাস্।" বসিয়া হাসিতে হাসিতে ছোট্ট একটি তুড়ি দিলেন। আমরা এই কথায় বড়ই ভয় পাইলাম। ডাক্তার বাবু বলিলেন, "এই রকম অনুকূল বাতাস বহিতে দেওয়া হইবে না। সকলের মনেই অন্য রকমের ভাবনা আনা দরকার। সকলেই ভয়ে ভয়ে ভাবেন, বুঝি মা শরীর ছাড়িলেন, এই ভাবনাটা ঠিক নয়।" মা হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "এই ভাবনাটা আসে কেন? যাঁহার ব্যাপার তিনিই ত দেন। অনুকূল বাতাস বয় আর কি। আর দেখ,

এতদিন কোন বাধা মানে নাই, শরীরটা অনবরত ঘোড়াফেরা করিয়াছে। গাড়ীতে হউক, মোটরে হউক, হাঁটিয়াও কত চলিয়াছে, আর এখন মোটরে উঠিলেও শরীর কেমন হইয়া যায়, একটু পায়চারি করিলেও শরীর কেমন হইয়া যায়। সব আপনা হইতেই বন্ধ।"

২০শে পৌষ, শুক্রবার—

আজ দেবেন্দ্রবাবু ও বাণেশ্বর কবিরাজ মহাশয় মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। বাণেশ্বর কবিরাজ মহাশয় আজই মাকে প্রথম দেখিলেন। তিনি নাড়ী ধরিয়া খানিক সময় বসিয়া রহিলেন। নাড়ীর গতি দেখিয়া আজও উভয়েই অবাক, বলিতেছেন, "মা আমাদের সঙ্গে খেলা খেলিতেছেন না কি? নাড়ীর গতিতে যেন ঘোড়দৌড় হইতেছে। আবার একেবারে বন্ধ। অপর কাহারও নাড়ীর গতি এইরূপ দেখিলে আমরা খুবই খারাপ লক্ষণ বলিতাম।" আর বলিয়া ভাবিতেছেন মার খেলা। মা'ও বলিতেছেন, "এখন দেখ, এখন ভাল দেখিবে," আবার একটু পরেই বলিতেছেন," "এখন দেখ, এখন তোমাদের হিসাবে খুব খারাপ।" ডাক্তাররাও দেখিয়া তাই স্বীকার করিতেছেন। ডাক্তারদের কথা শুনিয়া সকলেই ভয় পায়, আবার মা যখন মধুর হাসি হাসিয়া কথাবার্ত্তা বলেন, সকলেই ঐ বিষয় ভুলিয়া থাকে। এই অবস্থাই চলিতেছে।

রাত্রিতে বৃদ্ধ মাতাদের সন্তানদের জন্য ব্যাকুলতার কথা উঠিয়াছে। দিদিমা, যতীশদাদার মা, অনুর মা, সকলেই আছেন, কি একটা ঘটনায় তাঁহাদের সন্তানদের জন্য ব্যাকুলতার কথা উঠিয়াছে; মা হাসিয়া বলিতেছেন, "এই সব 'মাতাল'। মাতাল কি জান না বুঝি? মা—দের তাল। সব মাদেরই এই রকম তাল।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

একটি বিধবা (মন্দির প্রতিষ্ঠাত্রীর আত্মীয়া), এখানেই থাকেন, তিনি প্রায়ই রাত্রিতে মাকে দেখিতে আসেন। আজও আসিয়াছেন। কি কথায় বলিতেছেন, "আমার বাড়ী ঘর কিছুই নাই, এই সবই গোবিন্দের।" মা অমনি হাসিয়া বলিতেছেন, "মাগো, আমরাই যে গোবিন্দের, তাই গোবিন্দের বাড়ী ঘরই যে তোমাদের বাড়ী ঘর। আমাদের আবার চিন্তা কি? আমরা তাঁর, তিনি আমাদের।" এই বলিয়া আবার মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, চেহারা দেখিয়া মার শরীর এত দুর্ব্বল, সব সময় মনে হয় না, মাঝে মাঝে একটু খারাপ দেখাইলেও চেহারার একটা স্বাভাবিক উজ্জ্বলতায়, প্রায় সব সময়ই মুখ দেখিয়া শরীর বেশ ভাল আছে বলিয়াই মনে হয়। হাসিলে সেই স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা যেন আরও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। মা অনেকদিন হইতেই যে কথাটি বলিতেছেন, আজও আবার বলিলেন, "শরীরটা যেন চুপ হইয়া যাইতেছে, বেশী কথা বলে না।"

২১শে পৌষ, শনিবার—

মার অবস্থা একরূপই চলিতেছে। অসুখ কিছুই নাই বলিলেও, নাড়ীর গতি ঐরূপ চঞ্চল চলিতেছে। সন্ধ্যাবেলায় নাটমন্দিরে হরিদাসের কীর্ত্তন হইতেছে। মাকে তথায়ই বিছানা করিয়া দেওয়া হইতেছে, কারণ মা গত ৩।৪ দিন যাবৎ বেশী সময় শুইয়াই ছিলেন, একটু নড়িলেও শরীর খারাপ হইয়া পড়িতেছিল। আজ একটু ভাল, তাই নাটমন্দিরে নিয়া বসান হইয়াছে। এখানে আসিয়া প্রথম প্রথম কয়দিন মা বিকালে গঙ্গার ধারে সিঁড়ির উপর গিয়া বসিতেন, আর দলে দলে স্থানীয় লোক মার

দর্শনে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। কলিকাতা হইতেও বিকালের দিকেই বেশী লোক আসিতেন। কিন্তু গত ৩।৪ দিন আর মা বাহির হইতে পারেন নাই।

আজ কীর্ত্তনে মা তথায়ই শুইয়া আছেন, আমি দেখিতেছিলাম, ভাবের একটু পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। হঠাৎ মা উঠিয়া বসিলেন, চোখ বুজিয়া আছেন, ঘাড় এক পাশে হেলিয়া পড়িয়াছে। মা দেয়ালে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিলেন। হঠাৎ সোজা হইয়া বসিলেন। প্রায় ৮টার সময় মাকে উঠাইয়া ঘরে নিয়া আসা হইল। আজ ৩।৪ দিন যাবৎ শরীরের যে অবস্থা চলিতেছে তাহাতে এতটা সময় মাকে বাহিরে রাখা হইয়াছে ভাবিয়া আমরা একটু চিন্তিত হইয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম এ'কয়দিনের মত চেহারা এখন নাই। চেহারা ও ভাবের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বেশ চট্‌পট্ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন যেন পূর্ব্বের স্বাভাবিক ভাব।

একটু জল খাওয়ার পরই মাকে রোজ শোওয়াইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; আজ মা নিজেই নরেশদাদাকে ডাকিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। মায়ের মুখে কথাবার্ত্তা শুনিয়া উপস্থিত কেহই আর যাইতে পারিতেছেন না। আমরাও বাধা দিতে সাহস পাইতেছি না, মা নিজের ভাবে কথা বলিতেছেন, বেশ স্বাভাবিক ভাব। কথায় কথায় বলিলেন, "কীর্ত্তনের সময় দেখিলাম ঘাড়টা হেলিয়া পড়িল, তখনই বুকের বাম দিক দিয়া একটা টানের মত পড়িল যেন বিদ্যুতের মত একটা 'শক' লাগিল। তারপর হইতেই বুকের অবস্থাটা বেশ ভাল চলিতেছে।" আমরা মার মুখে এই কথা শুনিয়া সকলেই মহা আনন্দিত হইলাম। অভয় বলিল, "কীর্ত্তনের গুণ আছে।" আজ রাত্রি প্রায় ১০টা অবধি মা অনবরত কথাবার্ত্তা বলিলেন। কতদিনের মধ্যেও এইরকম কথাবলার ভাব দেখা

যায় নাই। অনেক সময় আবার বলেন, "আমার ত খেয়াল থাকে না, বেশী কথা বলিতে আরম্ভ করিলে তোরা বারণ করিলেই ত পারিস্।" এতক্ষণ আমরা কিছু বলি নাই। রাত্রি বেশী হইয়া যাইতেছে এবং মা এত কথা বলিতেছেন দেখিয়া আমরা এ' বিষয় একটু কি বলা মাত্রই মা ছেলে মানুষের মত হাসিয়া নিজেই মুখে হাত চাপা দিলেন। আর কথা বলিলেন না। একে একে সকলে বিদায় নিয়া চলিয়া গেলেন।

আমরা ২।১জন ঘরে আছি মা ইসারায় বলিলেন, বুকের অবস্থা ভাল, বেশ ভালই আছেন। মুখখানা যে রকম করিয়া বুঝাইলেন আমি একটু ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, "বড়ই মুস্কিলের কথা, বেশ ভাল আছ, এখন তুমি উপায় কি করিবে?" মা তবুও কথা বলেন না শুধু হাসিলেন, ইহাতে আবার আমার ভয় হইল, এই কি কথা বন্ধ করিলেন নাকি? জিজ্ঞাসা করায় ইসারায় বলিলেন, কাল কথা বলিবেন। তখন নিশ্চিন্ত হইলাম।

আজ কথায় কথায় নরেশদাদাকে বলিলেন, "তুমি তোমার মেয়েটাকে মা বলিয়া ডাকিও," নরেশদাদা বলিলেন, "তা ত ডাকিই," মা বলিলেন, "বেশ, মা বলিয়া ডাকিও, আর রোজ তাহার নিকট প্রণামের ভাবে মাথা নামাইও। বাইরে না পার অন্ততঃ হাতযোড় করিয়া মনে মনে হইলেও প্রণামের মত করিও।"

২২শে পৌষ, রবিবার—

আজ বেলা প্রায় ১০টায় মাকে নাটমন্দিরে নিয়া একটু রৌদ্রে বসাইয়া দেওয়া হইল। ভক্তেরা সকলে কাছে বসিলেন। কথায় কথায়

অভয়ের কি একটা অন্যায় কথায় নরেনদাদা ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন, অভয়কে মারিতে উদ্যত, অভয় গিয়া মার পিছনে লুকাইয়াছে। মা অভয়কে ডাকিয়া নিকটে বসাইয়া নরেনদাদাকে বলিলেন, "কই নরেন, অভয়কে মার দেখি? তখন আর তাঁহার মারিবার ভাব নাই, বিশেষতঃ মার শান্ত ভাবের এ' কথা শুনিয়া তিনি একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছেন। মার আদেশে আস্তে আস্তে আঘাত করিলেন।

তারপর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন বন্ধ হইলে মা উভয়কে বসাইয়া অনেক কথা বলিলেন। মা বলিলেন, "দেখ, যে যাহাই কর **মুখে শাসন কর, কিন্তু মারামারি করিও না। আর তোমরা ইহা নিশ্চয়ই জানিও যে, যে ভাবেই অপরকে আঘাত কর, এই শরীরটাকে আঘাত করিতেছ।** অভয় যে অন্যায় কথা বলিল, এই শরীরটাকেই বলিল, আবার তুমি যে মারিতে উদ্যত হইয়াছিলে তাহাও এই শরীরটাকেই। **এখানে থাকিলে অনেক কাঁটার খোঁচা সহ্য করিতে হইবে। এই পথের প্রধান সহায়ক সহ্যগুণ।"** নিজের হাত বাড়াইয়া নরেনদাদার দিকে দিয়া বলিলেন, "মারিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, এই শরীরটাকে মার।" নরেনদাদা দুই হাত দিয়া মার হাত দু'খানি জড়াইয়া ধরিলেন; মার কথায় মৃদুভাবে আঘাত করিতে হইল! তারপর মা এই ভাবের অনেক কথা বলিলেন। ভক্তবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল!

তারপর মা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, এই মারামারিটা কি ভাল? বল, আর কাকেও মারিবার কথা বলিবে না?" নরেনদাদা বলিলেন, "কি করিয়া এতবড় কথাটা তোমার কাছে বলি?" তখন মা বলিলেন, "বিশেষ চেষ্টা করিবে বল?" তখন স্বীকার করিলেন, "তা করিব।" মা

তখন হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নরেনদাদা গিয়া অভয়কে কোলে নিলেন। মার আদেশে অভয়ও নরেনদাদাকে প্রণাম করিল।

মার এই লীলায় ভক্তেরা মুগ্ধ হইয়া গেল। মার তখনকার কথায় ও ব্যবহারে এবং মূর্ত্তির উজ্জ্বলতা দেখিয়া ভক্তেরা বলাবলি করিতে লাগিল, মা আজ আবার এই ব্যাপারে এক বিশেষ লীলা করিলেন।

২৩শে পৌষ, সোমবার—

আজ দুপুরে মা চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন। আমি কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতেছি। মা ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "একটি মূর্ত্তি দেখিতেছি।" আর কিছুই বলিলেন না। বৈকালে ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছেন, মা বিছানায় বসিয়া আছেন, ভক্তেরা সকলে সেই ছোট ঘরখানাতেই বসিয়াছেন। তখন মা বলিতেছেন, "আজ দুপুরে দেখিতে ছিলাম তোমরা ছদ্মবেশ না কি বল, সেই রকম ছদ্মবেশে বিধবার বেশে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া এই স্থানে দাঁড়াইয়াছে। এই ঘরের দেয়াল যেন কিছুই নাই। স্ত্রীলোকটির মুখখানা যেন বিষণ্ণ, চোখে একটু একটু জল। তারপর যেমন তোমাদের বলা হয় না, "কে গো তুমি ?" তেমনই তাহাকে বলা হইল, "কে গো তুমি ?" অমনি সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া দিল, তার পর ধীরে ধীরে ঐ মন্দিরের (রাধাগোবিন্দের মন্দির দেখাইয়া) দিকে চলিল, যাইতে যাইতে রাধার মূর্ত্তিটি যেখানে আছে সেইখানে গেল। তখন আর রাধার মূর্ত্তিটি তথায় ছিল না। এই স্ত্রীলোকটি গিয়া ঐ স্থানে বেদীর উপর পা ঝুলাইয়া বসিল। খানিক পর সে রাধার মূর্ত্তিতে পরিণত হইল।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। ভক্তেরা সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, "মার নিকট আজ রাধা আসিয়াছিলেন।"

তারপর আবার মা বলিতেছেন, "এরপর আবার দেখিতেছিলাম, ঠিক রাধাকৃষ্ণের যে'রকম মূর্ত্তি আছে, ঠিক ঐ রকমই যেমন পুতুলের মূর্ত্তি হয়, ঠিক ঐ সাইজের ঐ রকমই রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি দুইখানা এই শরীরটার উপর গড়াগড়ি দিতেছে, করিতে করিতে সব এক হইয়া গেল।"

এখানে আসার পর মা একদিন বৈকালে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আছেন, নিকটে ভক্তেরা অনেকেই আছেন। কথায় কথায় মা যখন বলিলেন, "রাধাগোবিন্দ এই শরীরটাকে এখানে নিয়া আসিয়াছেন।" তখন অমূল্য দাদা একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "রাধাগোবিন্দ নিয়া আসিলেন, এ' কথাটা ঠিক বুঝিলাম না।" মা উত্তরে অনেক কথা বলিলেন, মোট কথাটা এই—"ঠিক তাই, যেমন তোমরা নিয়া আস, ঠিক তেমনই! এক হিসাবে ত আসা যাওয়া নাই-ই, আর যদি আসা যাওয়া বল তবে রাধাগোবিন্দই নিয়া আসিয়াছেন।"

২৪শে পৌষ, মঙ্গলবার—

আজ সকালে মুখ ধুইয়াই মা আমাকে বলিলেন, "তুই বিন্ধ্যাচল কবে যাবি?" ২।৩ দিন হয় আমাকে যাওয়ার কথা একটু বলিয়াছিলেন, শরীর খারাপ বলিয়া আর সে সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই। এখন এই কথা বলিলেন; আরও বলিলেন, "আমার খেয়াল হইতেছে, তুই কিছুদিন ওখানে যাইয়া যজ্ঞে আহুতি দে। আরও একবার পাঠান হইয়াছিল কিন্তু তারপর আবার এ'শরীরই সঙ্গে করিয়া নিয়া গেল, ওখানে যাওয়া হইল না। কাছে থাকিলে সাধন ভজন হয় না।"

মাকে ছাড়িতে হইবে এই কথা শুনিয়াই আমার চোখে জল আসিল।

তারপর মা আমার দোষ দেখাইয়া যত বলিতেছেন, আমিও ততই জবাব দিতেছি, চোখের জলও পড়িতেছে। ভক্তেরা কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। মা হাসিয়া হাসিয়া নানারকম কথা বলিতেছেন। যাওয়ার কথাতেই মনটা খারাপ লাগিতেছিল। খানিক পরে আমি বারান্দায় গিয়া বসিলাম।

চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল দেখিয়া আবার উল্টা সুর আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "চোখের জল পড়া ভাল, ভিতরের ময়লা কাটিয়া যায়। আর দেখ ত কাণ্ড, খুকুনি কিন্তু জানে এ'শরীরটা এক এক সময় এ'রকম করে। ও জবাব না দিলেই ত পারিত, তবেই ত সব বন্ধ হইয়া যাইত, এক এক সময় কিন্তু ও তাই করে, চলিয়া যায়, আর আজ জবাব দিতে লাগিল, তাইত এই শরীর হইতেও নানারকম কথা বাহির হইতে লাগিল, যাহা বলিলে ব্যথা লাগিবে তাই বলা হইল।" এই ভাবের কত কথাই বলিতেছেন, "কই, এই শরীরকে খাইতে দিবি নাকি, শীগ্‌গীর উঠিয়া আয়।"

বৈকালে মা শুইয়া আছেন, চোখ বুজিয়াই বলিতেছেন, "কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, সেই ভাব যেখানে দেখে, সেই আকর্ষণে আসে। কেহ মাকে ভালবাসে, কাহারও নিকট এই ভাবটা ভাল লাগে, সেই লোভে আসে, এই রকম নানা ভাবে আসে। তবেই দেখ, কাহার সেবা করিল? যদি তোমার জন্যই তোমাকে ভালবাসা হয়, সে ভিন্ন কথা।" ত্রিগুণাদাদা বলিলেন, "কৃষ্ণের মহিষীদের ও বৃন্দাবনের ভালবাসার এই পার্থক্য।"

২৫শে পৌষ, বুধবার।

আজ সুকেতের রাজা এক সাহেব ডাক্তার নিয়া আসিয়াছেন। রাজা কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতা আসিয়াছেন। তাঁর ইচ্ছা ডাক্তারসাহেব

মাকে একটু দেখেন। এই ডাক্তারই তাঁদের চিকিৎসা করেন! রাজার এই ডাক্তারের উপর খুব বিশ্বাস। যে যাহা ইচ্ছা করিতেছে, মার ত কিছুতেই আপত্তি নাই।

ডাক্তারসাহেব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "অসুখ কিছুই নাই। মা মধ্যে মধ্যে তাঁহার সঙ্গে ২।১টি ইংরাজী কথা বলিয়া নিজেই ছেলেমানুষের মত হাসিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলেই মার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। মা বলিতেছেন, "তোমরা আনন্দ করিবে, হাসিবে, তাই বলিলাম।" ভক্তরা বলিতেছেন, "মা, বলিতেছ কিন্তু ঠিক ঠিক, আর উচ্চারণও কি চমৎকার কর।" মা হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, ভাল বল, না হইলে কিন্তু কাঁদিব। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে যা'ই বলুক, বাবা মা এই রকমই বলে।"

ডাক্তারসাহেব হাতযোড় কবিয়া প্রণাম জানাইয়া চলিয়া গেলেন। মা বলিতেছেন, "সাহেব ডাক্তার দেখানটাই বা বাকী থাকে কেন? দেখ, ডাক্তার-টাক্তার দেখাইয়া তোদের একটা কাজ হইল। কাহারও কাহারও হয়ত মনে হইতে পারে; মার কি অসুখ কে জানে? ভক্তেরা বলে, অসুখ কিছুই নয়, আবার দরজাও বন্ধ করিয়া রাখে, মা'ও শুইয়া থাকে, কি জানি কি অসুখ? ভক্তেরা হয়ত গোপন করিতেছে এখন বড় বড় সব ডাক্তাররা দেখিয়া গেল, বলিল অসুখ কিছুই নয়। এখন সকলে তোদের কথা বিশ্বাস করিবে, কি বলিস্?" ঐ কথা কয়টি বেশ ভঙ্গী করিয়া বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

উপস্থিত সকলেই এ'কথার সমর্থন করিয়া বলিল, "তা ত হইতেই পারে।" মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কাহারও ভিতর এ'কথা না আসিলেই বুঝি এই মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে!" তখন আমরা ব্যাপারটা বুঝিলাম।

তারপর, আবার বলিতেছেন, "দেখ, সকলের প্রথমে অসুখ হয়, তারপর খারাপ হইতে হইতে নাড়ী ডুবু ডুবু হয়। আর এই শরীরের কি হইল, প্রথমেই নাড়ী ডুবু ডুবু, বাহিরের ক্রিয়াদি বন্ধ, তারপর সেই অবস্থায় বাহিরের খাওয়া দাওয়ার ও অসুখের প্রকাশ। আগে নাড়ী খারাপ তারপর অসুখ।"

আজ মার শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল। গত দুইদিন যাবৎ একেবারে শয্যাগত ছিলেন, আজ একটু হাঁটিয়া গঙ্গার ধারে গিয়া বসিলেন। একটু পরেই আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। শরীরটা আবার একটু খারাপ বোধ করিতেছেন। কীর্ত্তনাদি হইল। মা উঠিয়া বসিলেন এবং সুস্থ মানুষের মত আবার কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। নিজেই হাসিয়া বলিতেছেন, "আচ্ছা এমন তোমরা দেখিয়াছ নাকি? এই শরীর খারাপ—বিছানায় বাহ্য প্রস্রাব, আবার একটু উঠিতেই গঙ্গার ধারে হাঁটিয়া চলিল। কথা হইল কি জান? তোমাদের মত ইচ্ছা করিয়া ত কিছু করা হয় না, যাহা হইয়া যাইতেছে। আর ঠিকমত খেয়াল করিয়া চলিতেও পারি না তাই গোলমাল হয়। শরীরটার কেমন সেই খেয়ালই থাকে না; কখনও যে অসুস্থ ছিল তা'ও মনে হয় না। সব সময়ই সুস্থ।"

আজ প্রাতে আরও একটি ঘটনা হইয়াছে। ঘটনাটি এই যে, কাল রাত্রি প্রায় ৪টায় মা বলিতেছেন, "কে শব্দ করে?" মা কয়েক দিন যাবৎ একাই ঘরে শুইতেছেন, আমরা দরজার বাহিরেই শুই। মা শব্দ করিতেই মার ঘরে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করায়, মা গঙ্গার ধারেই বারান্দা দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ ধারে কে যেন 'হা, হা, হা—হি, হি, হি' এই রকম শব্দ করিল।" আমি দরজা খুলিয়া দেখিলাম, সেই বারান্দায় পরমানন্দ স্বামী বসিয়া আছেন। তিনিই ঐ বারান্দায় শয়ন করেন। আমি প্রথমে মনে

করিয়াছিলাম, স্বামীজী ঘুমের ঘোরে শব্দ করিয়াছেন কিন্তু তিনি বলিলেন, "প্রায় ঘণ্টা খানেক হয় আমি উঠিয়া বসিয়াছি।" আর কিছু কথা হইল না। আজ প্রাতে মা উঠিলে আবার ঐ কথা উঠিতেই অভয় বলিল, "কে শব্দ করিয়াছিল মা? কেহ আসিয়াছিল কি?" মা বলিলেন, "হাঁ, আসিয়াছিল।" অভয় ছাড়েনা—বলিল, "খারাপ, কি ভাল?" মা বলিলেন "এই যে ভূত-টুত বলে না? সেই জাতীয়।" তখনই অভয় সকলের নিকট বলিতে লাগিল, "মা বলিয়াছেন, কাল ভূত আসিয়াছিল।"

২৬শে পৌষ, বৃহস্পতিবার।

আজ সকালবেলা মার গায়ে তৈল মালিশ করিতেছি, তখন এই স্থানেরই একটি বিধবা আসিয়া উপস্থিত। তিনি মাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে আসেন। আজ আসিয়া বলিতেছেন, "আমি মুড়ি ভাজিতে ছিলাম কিন্তু মার কথা মনে হইয়া কি রকম হইল, মা বেটি আমাকে ঘরে থাকিতে দিল না, সব ফেলিয়া মার জন্য চারটি মুড়ি নিয়া চলিয়া আসিয়াছি। যে'দিন হইতে মার ছবি নিয়া আমি ঘরে আসনে বসাইয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার এই এখানে ছুটাছুটি। ঘরে থাকিতে পারি না; এখানে ছুটিয়া আসিতে হয়। বড় বিপদেই পড়িয়াছি।" মাকে একটু মুড়ি মুখে দিয়া দিল। মা বলিতেছেন, "মেয়ের জন্য মার এই রকমই হয়।"

অনেকক্ষণ মার নিকট বসিয়া থাকিয়া যখন বিধবাটি বাড়ী যাইবার জন্য মার অনুমতি চাহিয়া বলিল, "মা এই বার অনুমতি কর যাই, কতক্ষণ আর থাকৃব বল, আমারও ত বাড়ী, ঘর, ছেলে মেয়ে সব আছে, কিন্তু তবুও মা তোমার জন্য ছুটে আসি।" মা হাসিয়া বলিলেন, "যাও মা

আমার ঐ বাড়ীঘরগুলিও ঠিকঠাক করিয়া রাখ। বাড়ীঘর দেখ শোন গিয়া। ভিতর বাহির সব পরিষ্কার রাখিও। তোমারই ত এ' শরীর, তাই তোমার বাড়ী এ'শরীরের বাড়ী। সব দিকেই পরিষ্কার রাখিও কিন্তু মা। আর শোন একটা কথা, এই মেয়েটা কোন সরিক থাকতে দেবে না,, একেবারে একা, ষোল আনা চাই।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আর একজন আসিয়াছেন, যাইবার সময় বলিতেছেন, "উঠি মা এখন, বাড়ী যাই।" মা হাসিয়া বলিতেছেন, "ওঠ মা, ওঠাই ত চাই, নামিও না। আর বাড়ী যাওয়াই চাই; বাড়ীতে গেলেই শান্তি। ধর্ম্মশালায় আছ কিনা তাই অশান্তি। আপন বাড়ী কোথায়, সেই খোঁজ কর মা। ইহা ত শ্বাস প্রশ্বাসের বাড়ী ঘর, শ্বাস প্রশ্বাসের সম্বন্ধ। আর সংসার কর ত, ধর্ম্মের সংসার করিও। ধর্ম্মকে বাদ দিলেই অশান্তি পাইতে হয়।"

আমাকে আদেশ করিয়াছেন আগামী ২৯শে পৌষ, সংক্রান্তির দিন হইতে বিন্ধ্যাচলের কুণ্ডে আহুতি দিতে আরম্ভ করিতে হইবে। সেই জন্য আগামীকল্য আমাকে রওনা হইতে বলিয়াছেন।

একটি ভক্তের একখানা চিঠি এখানে উল্লেখ করিতেছি। ভক্তটি সন্ন্যাসী, তিনি মাকে লিখিতেছেন, "গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছি, প্রথমে আমার গুরুমাকে দেখিলাম—উজ্জ্বল মুখ স্পষ্ট ভাষায় তত্ত্ব জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। আমি নিকটে বসিয়া উন্মুখ হইয়া ঐ সব কথা শুনিতেছিলাম। মায়ের মুখের দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া দেখি শ্রীশ্রীগুরুমার শরীর আর সেখানে নাই, ঠিক সেই স্থানেই শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা। আপনাকে পরিস্কার দর্শন করিলাম! তারপরই ঘুম

ভাঙ্গিয়া গেল! জাগিয়াই আনন্দের একটা অনুভূতি হইতে লাগিল। তখন রাত্রি প্রায় দুইটা। আসনে অনেকক্ষণ বসিয়া ঐ আনন্দের স্মৃতি নিয়া কাটাইলাম।”

“শ্রীশ্রীগুরুমার মহা সমাধির পরেই যখন নিরাশ্রয় মাতৃহারা বোধ করিতেছিলাম ঠিক সেই সময়তেই অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনি আসিয়া আপনার কৃপা ও স্নেহ দিয়া শান্তি ও আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি আপনার কৃপা নিয়ত অনুভব করি। গুরুমাতার শরীর ছাড়ার পর এ এক পরমগুরু আপনার দেহে আমাকে কৃপা ও স্নেহ করিতেছেন। আমি এই ধারণা নিশ্চিতরূপে হৃদয়ে পোষণ করি। তাই আজ স্বপ্নেও ঐ দৃশ্যই দেখা গেল। একথা যে সত্য তা আরও বুঝি, যখন দেখি যে শ্রীশ্রীগুরুমার সন্তানরা প্রায় সকলেই আপনার স্নেহ ও কৃপা পাইতেছেন।”

একবার একটি ব্রহ্মচারী ছেলের পত্রোত্তরে মা তাহাকে যাহা লিখিতে বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করিতেছি। ছেলেটি লিখিয়াছিল, “আপনার উপর আমার টান যেন কিছু কমিয়াছে......। ....প্রেম কাহাকে বলে?...নিঃসংশয় কখন হতে পারে?” মা লিখাইতেছেন, **“একমাত্র ভগবৎ প্রেমই ত প্রেম।”** যদিও তাঁর দোহাই দিয়া সাধারণের মধ্যে বিশেষ কোন কোন ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। আসলে ত একই, তবে ইহাও ভাল, বাস্তব ভাবের আশা! **শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধা ভক্তি হইতেই প্রেমের প্রকাশ, আবার প্রেম স্বয়ম্ প্রকাশ।** নিঃসংশয় কখন হতে পারে? সেটা ভেবে দেখবার বিষয় নয় কি?... ...জোঁক যেমন একদিক ধরিয়া অন্যদিকটা ছাড়ে...। আকর্ষণ কমা মানে অপর কোন দিকে আকর্ষণ হওয়া। সেটা যদি, ভগবৎ ভাবের দিকে,

২৪

নিঃসংশয় হওয়ার সহায়ক আকর্ষণ না হয়, তা' হলেই পতন। বাস্তবিক পক্ষে আকর্ষণ কমে না।"

"তোমার গৃহস্থের বাড়ীতে থাকার কথা ছিল না, তবে যদি কাহারও বাড়ীতে একান্তে একখানা ঘর পাও, তবে থাকিতে পার। তোমার কি সেইরূপ সুবিধা হইয়াছে? কোথায় যাও? কোথায় থাক? বেশী সময় কোথায় কাটাও? কি কর? কি বল? কথা বলবার সময় আধ্যাত্মিক কথার আনন্দ ছাড়া আর কোন কথায় আনন্দ ও হাসি তামাসায় সময় কাটান ব্রহ্মচারীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। যে সঙ্গ অসহায়ক বলে মনে হবে সেই সঙ্গ তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা দরকার। কখন যে কি সূত্রে কিসের দোহাই দিয়া মানুষকে কোন্ দিকে টেনে নিয়ে যায়, যাহাকে নিচ্ছে সে বোঝে না। সর্ব্বক্ষণ উচিৎ সৎসঙ্গ, আর সেই সঙ্গে নিত্য আত্ম কর্ম্মের ব্যবস্থা রাখা। তা'না হলেই চুরি করে খাওয়া, তার স্বভাব হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে সেই স্বভাবটা যদি অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়ে, তবে আর তাহা, তেমন বিবেকবান ছাড়া নিজে ধরিতেই পারে না।"

"কাজেই বুঝ্তে হবে—কি চাই? কিসের জন্য কোথায় যাই? সর্ব্বক্ষণ বিচার করিও। যেমন মাষ্টারের কাছে ছেলে পড়তে গেলে, ভুল হইলেই সে সংশোধন করিয়া দেয়, আর ভুল হওয়াটাও ছেলের পক্ষে স্বাভাবিক। ছেলে যখন মাষ্টারের সম্মুখে না থাকে, একা একা পড়ে, তখন ভুলটা শুদ্ধ ভাবিয়া পড়িয়াই সে বেশ মশগুল্ থাকে। কাজেই যাহাতে ভাল, শুদ্ধ ভাব নিয়া সর্ব্বক্ষণ থাকৃতে পার তারই বিশেষ চেষ্টা কর্বে।"

মা কাহাকেও চিঠি লিখেন না। মাকে যাঁহারা চিঠি দেন, মার নিকট পড়িয়া শুনান হয়, মা কখনও কখনও কাহাকেও উত্তরে কি লিখিতে

হইবে, ২।৪টী কথা বলিয়া দেন। তাহার মধ্যেও কত অমূল্য কথা থাকে।

২৭শে পৌষ, শুক্রবার।

মার আদেশে অশ্রুপূর্ণ নয়নে মার নিকট হইতে বিদায় নিয়া রাত্রির গাড়ীতে বিন্ধ্যাচল রওনা হইলাম। দিদিমাও আমার সঙ্গে আসিলেন। আসিবার সময় মার নিকট গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মা হাসিয়া বলিতেছেন, "কি, একটা প্রণাম পাওয়ার ইচ্ছা আছে বুঝি?" দিদিমা বলিলেন, "থাক;" মা হাসিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা আছে।" উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এ'কথায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। মা বিছানা হইতে নামিয়া মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া, "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া হাতযোড় করিয়া উঠিলেন।

২৮শে পৌষ, শনিবার।

আজ আসিয়া বিন্ধ্যাচল পৌছিলাম। কেশব এখানে যজ্ঞের ভার নিয়া আছে।

২৯শে পৌষ, রবিবার—

আজ পৌষ সংক্রান্তি, মার আদেশানুযায়ী আজ হইতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলাম।

৫ই মাঘ, শুক্রবার।

আজ অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর চিঠি পাইলাম। মার নিকট ভীড় কমাইবার কথা আরও বিশেষরূপে হইয়াছে। কলিকাতার লোকেরা শনি-রবিবার মার দর্শনে আসিবেন। স্থানীয় লোকেরা যাঁহারা সন্ধ্যা-

বেলা আসিয়া কিছু সময়ের জন্য দর্শন করিয়া চলিয়া যান তাঁহারা আসিবেন। মার নিকট বেশী লোক থাকিবে না। মার শরীরের দুর্ব্বলতা একরূপই আছে ; বেশী সময়ই শুইয়া থাকেন।

১৭ই মাঘ, বুধবার।

মার খবর পাইতেছি, একরূপই আছেন। এখন মন্দিরের চারিধারে একটু একটু হাঁটেন। স্বামীজী, সাধন, বেবীদিদি, কমলাকান্ত প্রভৃতি যাহারা নিকটে ছিল, সকলেরই প্রায় অন্যত্র যাওয়ার কথা হইতেছে। আমি কোনও কার্য্যোপলক্ষে আজ দিল্লী রওনা হইলাম।

১৮ই মাঘ, বৃহস্পতিবার।

আজ দিল্লী পৌঁছিয়াছি। কলিকাতা হইতে নরেনদাদার কাছে চিঠিতে মার খবর আসিয়াছে—তাঁর পুরী যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়া হয় নাই। শুনিলাম, একজন মাকে একখানা নীলাম্বরী শাড়ী দিয়াছিলেন, মা তাহা পরিয়া ঘোম্‌টা দিয়া বসিয়া অনেক লীলা করিয়া ভক্তদের খুব আনন্দ দিয়াছেন।

২৪শে মাঘ, বুধবার।

কলিকাতার চিঠিতে মার বিস্তারিত খবর পাইলাম। মা গত ১৮ই মাঘ, বৃহস্পতিবার আগড়পাড়া হইতে কলিকাতায় যান, তথা হইতে ২০শে শনিবার পুরী রওনা হইয়াছেন। আগড়পাড়া ছাড়িবার পূর্ব্বেই, অর্থাৎ ১৭ই মাঘ বুধবার হইতে মার শ্বাসের গতি অন্য রকম হয়। মার শরীরে ক্রিয়ার সামান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ দিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯টা

অবধি ক্রিয়ার লক্ষণ সামান্য সামান্য প্রকাশ ছিল। ১৮ই মাঘ বৃহস্পতি-বার সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১০॥টা অবধি, পুনরায় রাত্রি প্রায় ২টা পর্য্যন্ত অতি সামান্য প্রকাশ হইয়াছিল। ১৯শে মাঘ, শুক্রবারও মা বলিয়াছেন, "এখনও ভিতরে ভিতরে ঐরূপ একটা চলিতেছে।" গত ১৭ই মাঘ ও ১৮ই মাঘ তারিখে হাত পা অল্প অল্প ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছিল। মার সঙ্গে অনেকেই পুরী গিয়াছেন। আমি আজ বিন্ধ্যাচল রওনা হইলাম।

২৮শে মাঘ, রবিবার।

পরমানন্দ স্বামীজীর পত্রে জানিলাম, মার শরীরে ক্রিয়াদি প্রকাশ পাওয়ার পর শরীর একটু ভাল দেখাইতেছিল। মা পুরী গিয়া তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর সমুদ্রতীরের ঘর খানাতেই আছেন। তার পাশেই মার নূতন আশ্রম তৈরী হইতেছে। কিছু দিন হইল নর্ম্মদার আশ্রম তৈরী হইয়াছে। মা বিশু ব্রহ্মচারীকে তথায় পাঠাইয়াছেন। মা পরমানন্দ স্বামীজীকে দিয়া আমাকে সাধন ভজন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখাইয়াছেন, তার মধ্যে ইহাও লিখাইয়াছেন, "তোর মঙ্গলের জন্যই তোকে এইভাবে রাখা হইতেছে, ইহা মনে রাখিস্।"

১১ই ফাল্গুন, শনিবার। (বিন্ধ্যাচল)

এলাহাবাদ হইতে মহারতন কাল দিদিমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। তার মুখে অন্য কথা নাই। মায়ের জন্য যেন পাগল। তাহার মুখে মায়ের কথা ছাড়া কয়েকটী ঘটনা শুনিলাম, তাহা উল্লেখযোগ্য।

মহারতন বলিতেছে, 'দিদি কি আশ্চর্য্য। আজ ২দিন হইল আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, মাতাজী যেন আমাদের শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের

মূর্ত্তিতে দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। গুরু নানকের কেশ ছিল না, কিন্তু গুরুগোবিন্দজীর কেশ ছিল, ঠিক সেই রকম পাঞ্জাবী পোষাকে ফুলের সাজ পরিয়া, ঠিক সেই রকম বেশে মা দাঁড়াইয়া আছেন।”

“আরও এক ঘটনা শোন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার ভাই দেরাদুনে আমার বাসায় আসিয়াছিল। আমার আরও কয়েকজন আত্মীয়ও আসিয়াছিল। সকলকে নিয়া আমি রায়পুর মাতাজী যেখানে ছিলেন, সেইখানে গিয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল মাতাজীর স্থানগুলি উহাদের দেখাইব। তা'ছাড়া তথায় 'পিক্‌নিক্' করা হইবে। তথায় যাইয়া মার কথা সব তাহাদের বলিতেছি। আমার ত এই কাজ, কেহ আসিলেই মায়ের কথা বলি, তাই বলিতেছি।”

“মায়ের কথা শুনিতে শুনিতে আমার ভাই বলিয়া উঠিল, 'দিদিজী, তুমি যাহাই বল, গুরু নানকের সমান কেহ হইতেই পারে না, মা যতই বড় হউন।' আমি তাহার কথা শুনিয়া বলিলাম, 'ঠিক কথা, তোমার পক্ষে ইহা সত্য, কিন্তু আমার নিকট আজ মা'ই সব।' এই ঘটনার কিছুদিন পর আমার এই ভাই অসুস্থ হইয়া আমার বাসায় আসে, তখন আমি বেরিলিতে। আমি এই ভাইকে সদ্‌বাণীখানা (ইংরাজি) পড়িতে দেই। মায়ের উপদেশবাণী সে আমাকে পড়িয়া শুনাইত। তখন দেখিতাম, তাহার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া যাইত। এই বই পড়িতে পড়িতে মায়ের উপর তাহার একটা ভক্তিভাব জাগে।”

“উহার অন্তঃকরণটা খুবই ভাল। যাইবার সময় সে মায়ের একখানি ছবি আমার নিকট চাহিতেই আমি বলিলাম, “দেখ, ছবি আমি দিতেছি কিন্তু এই ছবির 'ইজ্জত' তুমি রক্ষা করিও ; গ্রন্থ সাহেবের যে ঘরে পূজা হয় সেই ঘরে এই ছবি রাখিয়া তুমি পূজা করিও।” সে রাজী

হইয়া ছবি নিয়া গেল। তাহার চাকুরী ইত্যাদি নিয়া সে বড়ই মনঃকষ্টে ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ছবি নিয়া যাইবার পরই তাহার স্বাস্থ্যও ভাল হইয়া গেল, আর চাকুরীর গোলমালও মিটিয়া গেল, এমন কি তাহার চাকুরীতে উন্নতি হইল।" কিছুদিন পর সে আমাকে লিখিল, "আমি মাতাজীর ছবি বিশেষ ভাবে 'ইজ্জত' করিতেছি, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় ত'হার মধ্যে আমি 'অকাল পুরুষের'' মূর্ত্তি দেখিয়াছি। আমাদের মধ্যে, যাহার কাল নাই, অর্থাৎ মৃত্যু নাই, তাহাকেই 'অকাল পুরুষ' বলে। আমার স্বামী এই পত্র পড়িয়া বলিতেছিলেন, 'তোমার ভাইকে ও তোমাকে মা যতরূপে' দেখা দেন, আমাকে ত দেন না।'

"আরও একটি ঘটনা আছে ; একবার মায়ের দুই হাততোলা ছবি-খানি সঙ্গে নিয়া আমি আমার এক ভগ্নীপতির বাড়ী যাই, ভগ্নী মারা গিয়াছে ভগ্নীপতি আবার বিবাহ করিয়াছে। এই স্ত্রীটি বেশ নম্র স্বভাবের। একদিন রাত্রিতে এক ঘরে আমি ও ভগ্নীর সপত্নী এবং আমার আরও এক ছোট বোন, শুইয়া আছি, হঠাৎ ভগ্নীর সপত্নীটী কেমন করিয়া উঠিল, যেন কি দেখিয়াছে। সে জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া আমাকে বলিতেছে, 'দিদিজী তুমি যে মায়ের হাত তোলা ছবি আনিয়াছ, ঐ মা আসিয়া আমাকে কত কি বলিতেছিলেন। ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার শরীর কেমন যেন হইয়া গিয়াছে।' তারপর দিন, সে রান্নাঘরে বসিয়া আছে, সেই অবস্থাতেও সে বলিতেছে মা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি বলিতেছেন, সে প্রত্যক্ষ দেখিতেছে।"

"কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাহার হাবভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া রহিল। কেমন নেশাখোরের মত। আমি আসিবার সময়, মায়ের ছবির কপি রাখিবার জন্য, সে তাহার ছেলের নিকট মায়ের ছবিখানি দিয়া ফটো-

গ্রাফারের নিকট পাঠাইয়া দিল। ঐ ছেলের এক কাশ্মীরী বন্ধু ঐ ফটো তাহার পকেটে দেখিয়া মহা আনন্দে নিজেদের বাড়ী নিয়া গেল। তাহারাও মায়ের ভক্ত, মায়ের ফটো দেখিয়াই চিনিল এবং কত ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখ দিদি, মা যে কোথায়, কাহাকে, কি ভাবে কৃপা কবিতেছেন আমরা কিছুই জানি না। ভগ্নীর সেই সপত্নীর মুখে আমি আরও শুনিলাম, যে বিবাহের পরই নাকি একদিন স্বপ্নে সে মাতাজীর দর্শন পাইয়াছিল। ছবি দেখিয়াই সে চিনিয়াছিল। দেখ দিদি, আমার ভাই আর এই ভগ্নীর সপত্নী কিন্তু এখনও মাতাজীর দর্শন পায় নাই, কিন্তু কত কৃপা পাইয়াছে। এই রকম কত যে ঘটনা আছে তাহা বলা যায় না।" এই সব নানা কথা মহারতন বলিল।

১৩ই ফাল্গুন, সোমবার—

ইতিমধ্যে আরও ঘটনা ঘটিয়াছে। গত ৪ঠা ফাল্গুন, শনিবার পুরী হইতে বাবার এক টেলিগ্রাম পাইলাম, লিখিয়াছেন, "তুমি কেমন আছ টেলিগ্রাম কর, চিঠি যাইতেছে।" গত ২রা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার সকালে মুখ ধুইতে বসিয়া হঠাৎ আমার বুকে পিঠে একটা ভয়ানক ব্যথা উঠে। একথা বাবা জানেন না। আজ হঠাৎ এই টেলিগ্রাম পাইয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, যে ব্যাপার কি!

২।৩ দিন পরই বাবার চিঠি পাইলাম, বাবা ৪ঠা ফাল্গুন চিঠি লিখিতেছেন :—

"তোমাকে টেলিগ্রাম করার কারণ এই যে, গতকল্য মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে মা দেখিলেন যেন তুমি আমাকে ঔষধ লাগাইতেছিলে ঔষধে বিপরীত ফল হইল, জ্বালা, বেদনা বৃদ্ধি হইয়া বুক ধড়ফড়ানি আরম্ভ

হইল, তখন সেই ব্যারামের মূর্ত্তি মা দেখিলেন; একটা বানরের মত, মাথায় ও শরীরে লোম নাই। সেই মূর্ত্তিটা প্রথম মার দিকে ঝোঁক করিল কিন্তু মা তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন, তখন সেইটা তোমাকে লইয়া চলিয়া গেল। তারপর আমি আসিলাম, তখন মা আমাকে বৃত্তান্তটী বলিলেন, আমি তখন তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া তোমাকে ছাড়াইয়া আনিবার জন্য গেলাম। মা আমার ভাবটা দেখিলেন যে, আমার ছাড়াইয়া আনিবার শক্তি আছে কিন্তু ছাড়াইয়া আনিলাম কিনা তাহা আর দেখেন নাই। আমি আজ মাকে জিজ্ঞাসা করায় চিঠি লিখিতে বলিলেন। তবে, চিঠি আসা যাওয়ার দেরী হইবে বলায় টেলিগ্রাম করিয়া খবর জানিতে বলিলেন।"

আজ পরমানন্দ স্বামীজী ও অভয়ের পত্র পাইলাম। মা ১১ই ফাল্গুন শনিবার বেলা ১১টায় ভুবনেশ্বর নিম্বার্ক আশ্রমে গিয়াছেন। সঙ্গে অভয়, পরমানন্দ স্বামীজী, দেবীজী, যোগেশদাদা ও কেশব গিয়াছে। অন্যান্য সকলে পুরীতেই আছেন। পুরীতে মার শরীর ভালই ছিল। একদিন কোনও ঘটনার পর হইতে মার শরীর একটু খারাপ হইয়াছে। তারপর হইতেই শুইবার ভাব নাই বা পুরীতে থাকিবার যে ভাব ছিল তাহাও নাই। কতদিন ভুবনেশ্বর থাকা হয় তাহারও ঠিক নাই।

অভয় লিখিয়াছে, মার সূক্ষ্মে ও অলক্ষ্যে মাঝে মাঝে অলৌকিক ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে আপনার অসুখ একটী।

২৫শে ফাল্গুন, শনিবার—

পরমানন্দজীর পত্র পাইলাম। মা ২২শে ফাল্গুন পুরীতে ফিরিয়াছেন।

২৮শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার—

আজ বাবার টেলিগ্রাম পাইলাম, আগামীকল্য বুধবার মোগল-সরাইতে মার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য লিখিয়াছেন।

২৯শে ফাল্গুন, বুধবার—

আজ মা বিন্ধ্যাচল আসিয়াছেন।

৪ঠা চৈত্র রবিবার—

আজ অতি প্রত্যুষেই মা মির্জ্জাপুর ষ্টেশন হইয়া দেরাদুনের গাড়ী ধরিলেন। ২।৩ দিনের জন্য বিন্ধ্যাচলে আনন্দের হাট বসিয়াছিল, আবার সব, অন্ধকার। সকলের প্রাণেই হাহাকার। আমাকে বলিলেন, "আমার খেয়াল হইয়াছে, তোর এখন একস্থানে কিছুদিন সাধন ভজন করাই দরকার। তাই তুই এখানে থাকিয়াই সর্ব্বদা যাহাতে তাঁর ভাবে ডুবিয়া থাকিতে পারিস্ সেই জন্য নিত্য নিয়মিত কাজ করিয়া যাবি।"

মেজদিদি ও শচীদাদা আসিয়াছেন। তাঁহারা ২।১ দিন এখানে থাকিয়া মার নিকটই যাইবেন। মেজদিদির নিকট শুনিলাম, এইবার পুরীতে একদিন মার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়াছিলেন, মা ভুবনেশ্বরে ছিলেন সেই সময়তে একদিন জগন্নাথ দর্শনে গিয়া মেজদিদি পরিষ্কার দেখিতেছেন, জগন্নাথদেবের স্থানে মা দাঁড়াইয়া আছেন। ধাঁধাঁ দেখিতেছেন মনে করিয়া আবার ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া দেখিলেন, ঠিক সেই ভাবেই মা দাঁড়াইয়া আছেন। উপস্থিত সঙ্গীয় সকলেই বলিতে লাগিল, একি, এযে মার মূর্ত্তি! দেখিতে দেখিতে মার মূর্ত্তিতেই রাজবেশ, তারপর মার মূর্ত্তির স্থানে কালীমূর্ত্তি, তারপর আবার জগন্নাথদেবের

মূর্ত্তি। মেজদিদি আরও বলিলেন তিনি জপ করিবার সময়, অথবা গুরুকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিবার সময় মার মূর্ত্তিই গুরুর স্থানে আসিয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এই ভাবে নিজ নিজ ইষ্ট বা গুরুর মূর্ত্তিতে অনেকেই মাকে দেখিয়াছেন।

৫ই চৈত্র, সোমবার—

মহিলাশ্রমের একটু কাজে শচীদাদা আমাকে নিয়া দিল্লী যাইতে চাহিয়াছেন। মা'ও আদেশ দিয়া গিয়াছেন যাইতে হইবে; তাই আজ আমরা দিল্লী রওনা হইলাম।

এবার মার মুখে আমার অসুখের সম্বন্ধে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিল, সেই ঘটনাটি শুনিলাম। মা যাহা বলিলেন তাহা মোটামুটি এই যে, বাবা পূর্ব্বে যেমন রোগের ব্যবস্থা করিতেন সেই ব্যবস্থামত আমি ঔষধ মাকে দিতে যাই, তাহাতে বিপরীত ফল হয়। পরে মা দেখিলেন, আমাকে মার নিকট হইতে রোগের মূর্ত্তিটা নিয়া গেল, অর্থাৎ রোগেই হউক বা যে কোন রকম যন্ত্রনাতেই হউক, মাকে বিস্মৃত হইলাম। তাহাতে মা বাবাকে ডাকিয়া আমার উদ্ধারের জন্য পাঠাইলেন। মা'ই বলিলেন, "বাবাকে ত তোর উদ্ধারের জন্য আমিই পাঠাইয়া দিলাম।"

৭ই চৈত্র, বুধবার—

আমরা আজ দিল্লী পৌছিয়া অমলদাদার বাসায় যাইয়া শুনিলাম, অমলদাদা কাজে দেরাদুন গিয়াছেন। চিঠি দিয়াছেন, তিনি নিজের মোটরে মাকে দিল্লী নিয়া আসিতেছেন।

৮ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার—

আজ সন্ধ্যায় মা দিল্লী পৌঁছিয়াছেন। ভক্তদের প্রাণে কত আনন্দ! তাঁহারা কীর্ত্তনাদি করিলেন। মার শ্রীমুখের বাণী শুনিতেছেন। আবার, মায়ের শরীর অসুস্থ, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলে মার বিশ্রামের জন্য যথা সময়ে উঠিয়া গেলেন।

৯ই চৈত্র, শুক্রবার—

আজও মার দর্শনে ভক্তেরা সকলে আসিয়াছেন। দেরাদুন গিয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া মার শরীরটা বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তারবাবু একটু ঔষধ শুঁকিবার কথা বলিতেছেন, আবার ভয়ও পাইতেছেন, পাছে বিপরীত ফল হয়। মা হাসিয়া বলিতেছেন, 'নেচারের', উপরই থাকতে দাও বাবা, কি বল ? যা' হইবার হইবে। সকলে মার ইংরাজী ভাষা শুনিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিলেন। মা মধ্যে মধ্যে সকলকে আনন্দ দিবার জন্যই ২।১টী ইংরাজী শব্দ বলেন।

চারুদাদাকে বলিলেন, "বাবা, তুমি পাঠ শুনাইবে না ?" তিনি মহানন্দে স্বীকৃত হইলেন। বৈকালে পাঠ হইল। আগামীকল্য দোলপূর্ণিমা. সকলেই আশা করিয়া আছেন, মার নিকট কীর্ত্তনে আনন্দ করিবেন।

১০ই চৈত্র, শনিবার—

আজ দোলপূর্ণিমা ভক্তেরা সব আশ্রমে, মার নিকট একত্র হইয়াছেন। বেলা প্রায় ৯টা হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভক্তেরা ফুলের মালা, চন্দন ও আবিরে সাজিয়াছেন। মহানন্দে দুই হাত তুলিয়া ঘুরিয়া

ঘুরিয়া তাঁহারা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মা'ও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু ঘুরিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ দিবার জন্য বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাসিমুখে যখন বাম হাতখানি উঠাইয়া ধীরে ধীরে তালে তালে দোলাইতে লাগিলেন, ভক্তেরা তাহা দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নাম করিতে লাগিলেন।

আজই মার বৃন্দাবন রওনা হইয়া যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়া হইল না, দেরাদুন গিয়াই, হঠাৎ ঠাণ্ডায় মার ভয়ানক সর্দ্দি কাশি ও জ্বর হয়। সেই অবস্থা না কমিতেই মোটরে ১৫০ মাইল, দিল্লী আসিয়াছিলেন। কিন্তু গরমে নামিতেই শরীর একটু হাল্কা হইয়াছে। বুকে এদিকে ভয়ানক কফ্ জমিয়াছে। আজ বৈকালে ডাক্তার জে, কে, সেন মহাশয় পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'জ্বর বেশ আছে, আর ব্রঙ্কাইটিস্ হইয়াছে।' সকলেই মার যাওয়ার বাধা দিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "শরীরটা যদি বিশেষ অচল হইয়া পড়ে, তখনই যাতায়াত বন্ধ হইবে। তা'ছাড়া ত অনবরত চলিতেছে।" নানা কথার পর যাওয়া বন্ধ হইল, জিনিষ পত্র বাঁধা হইয়া গিয়াছিল। মার শরীর অসুস্থ হইলেও যাওয়া যে বন্ধ হইল ইহাতে সকলেই আনন্দিত হইলেন।

সন্ধ্যা ৬টা অবধি কীর্ত্তন চলিল। তারপর খানিক সময় চারুদাদা পাঠ করিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টায় মার বিশ্রামের জন্য দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

১১ই চৈত্র, রবিবার—

আজ মেয়েরা ১২টা হইতে ২টা অবধি মার নিকট কীর্ত্তন করিবেন, কথা হইয়াছে। মার আজ রওনা হইবার কথা আছে। প্রাতেই

বলিতেছেন, "আজ ডাক্তারবাবু বিশেষ কিছু অসুখ পাইবে না।" ডাক্তারবাবু আসিতেই মা বলিলেন, "বাবা তুমি এখনই দেখ ত। আজ আর বেশী কিছু পাইবে না।" ডাক্তারবাবু বলিলেন, "মা সবই তোমার খেলা।" সত্যিই আজ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আজ ভালই আছেন, বিশেষ কিছুই নাই।" মা আজ রওনা হওয়ার কথা বলিতেই, ডাক্তারবাবু বলিলেন, "মা আমাদের ইচ্ছা নয়—আজ তুমি যাও, তবে আমি ইহা বিশ্বাস করি যে, তুমি আমাদের মত ইচ্ছা করিয়া কিছু কর না। তাই তোমার কাছে বাধা দেবার ক্ষমতা আমাদের নাই।" মা আমাকে গোপনে আজই রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া দিলেন।

দুপুরে ৺হারাণবাবুর স্ত্রী আসিয়া মাকে বলিতেছেন, "মা কাল আমার বাবা বাসায় বসিয়া বসিয়া বলিতেছিলেন, "মা যদি সত্যিকার মা হন, তবে আজ কিছুতেই যাইবেন না, আমি আজ ঘরে বসিয়া বসিয়া মাকে ডাকিব দেখি কি হয়।" তোমার কাল যাওয়া হয় নাই শুনিয়া, বাবা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। মা এই কথা শুনিয়া হাসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "খুকুণী ঐ শোন, কাল কেন হঠাৎ অসুখ হইয়া যাওয়া বন্ধ হইল। আমি ত তোদের মত ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না, তোরা যে কোথায় কি করিস্ আর শরীরটার গতি বন্ধ হইয়া যায়। এই শরীরটার ত গাছের ঝরিয়া-পড়া শুক্‌না পাতার মত, বাতাসে যে দিকে নিয়া যায়।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ছেলেরা আজ মেয়েদের বলিতেছে, "কাল আমাদের কীর্ত্তনে মা রহিয়া গেলেন, আজ মেয়েরা রাখিতে পারে কিনা, দেখা যাইবে। মা অমনি তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "তা বাবা জান ত, মেয়েদের প্রাণ বড়ই কোমল।

মায়েরা এই মেয়েটাকে বাধা দিবে না। তোমরা ১২ ঘণ্টা কীর্ত্তন করিলে মায়েরা ৪ঘণ্টা, এবার তোমরা ৯ঘণ্টা করিয়াছ মায়েরা ৩ঘণ্টা করিবে। ৩টা অবধি কীর্ত্তন করিয়া তারপর মেয়েটা যা' করে তাহাতেই মায়েরা রাজী হইবে। কি বল?" বলিয়া মেয়েদের দিকে চাহিলেন। আবার বলিতেছেন, "আর, মায়েদের স্বভাবই ত মেয়েটা পাইয়াছে, মাথার ত ঠিক নাই, যাইব বলিলেই রওনা। মেয়েটাকে বাবা মা সবাই কৃপা করিয়া স্নেহ করে, তাই বাধা দিতে পারে না। জানে ত মেয়েটা তোমাদের মত ইচ্ছা করিয়া কিছু করে না। কীর্ত্তন ৩টা পর্য্যন্ত করিয়াই মেয়েটাকে আর বাধা দিবে না। কি বল!" বলিয়া এমন ভাবে মায়েদের দিকে চাহিলেন এবং কথাগুলি বলিলেন যে ভঙ্গি দেখিয়া মায়েরা হঠাৎ রাজী হইয়া গেলেন। মা অমনি হাসিয়া বলিলেন, "এই দেখ মায়েরা কেমন লক্ষ্মী, আমাকে কিছুতেই বাধা দিবে না। তারা ত জানে এই শরীরটার সাধারণ ভাবে ইচ্ছা করিয়া কিছু হয় না, যা হইয়া যায়, কি বল?" অনেক কথা কাটাকাটির পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে রাজী হইলেন। মা যেন কথার চাতুরীতে সকলকে রাজী হইতে বাধ্য করিলেন।

বৈকালে প্রায় ৫টায় রওনা হইবার কথা। মেয়েদের কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভক্তেরা ২।৪ জন এ'র মধ্যেই চুপে চুপে মেয়েদের ডাকিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। আশা যে, তাহা হইলে মা থাকিয়া যাইবেন। কিন্তু মেয়েরা বলিতেছেন, "কি করিব, মার নিকট রাজী হইয়া গিয়াছি। মাও ঠিক সময় কীর্ত্তনে গিয়া মেয়েদের উৎসাহ দিবার জন্য খানিক সময় তাহাদের সহিত ঘুরিলেন। মেয়েরা মহানন্দে নাম করিতেছেন, সময় হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া মা নিজেই কীর্ত্তন শেষে "হরি হরয়ে নমঃ, বলিয়া কীর্ত্তন শেষ করে, সেইটি আরম্ভ করিতে বলিলেন,

তাহাই হইল। যথা সময়ে কীর্ত্তন শেষ হইল। কাহারও কোন বুদ্ধি খাটিল না, মা রওনা হইলেন। বীরেন নিমাই সন্ন্যাস শুনাইবে বলিয়াছিল, তাহাকে কাছে ডাকিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতেছেন, "শোন্, একটা কথা বলি, তোমাকে ত কথা বলিতে একটু কেমন ঠেকে। তুমি কিন্তু গোঁ ধরিয়া থাকিও না। আমাকে বকিও না; নিমাই সন্ন্যাস যদি এবার শোনা না-ই হয়, তুমি রিহার্সেল না কি সব বল তোমরা, সে সব দাও, যখন শুনিবার হইবে, হইয়া যাইবে। লক্ষ্মী ছেলে, যদি আজ বৃন্দাবন যাওয়া হয়, আর ফিরিবার সময় এখানে থাকা না-ও হয়, গোঁ ধরিয়া থাকিও না, যা' হইয়া যায়, কি বল ?" এই ভাবের কথাগুলি যে রকম ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, তাহা না দেখিলে বোঝান যায় না। বীরেন ছেলে মানুষ সুন্দর নাম কীর্ত্তনাদি করে। কীর্ত্তনেই আনন্দ। সে নিমাই সন্ন্যাস মার নিকট গাহিবে, মাকে থাকিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল, তাই তাহাকে এইভাবে কথাগুলি বলিলেন, অগত্যা সেও রাজী হইল। মার তাহাতে কত আনন্দ, বলিলেন, "বাস্ বীরেনও মত দিয়াছে।" এই ভাবে যাহার নিকট যে ভাবে দরকার তাহাকে সেই ভাবেই ভুলাইয়া দিলেন।

মা বলেন, "এই শরীর ত তোদের মত ইচ্ছা করিয়া কিছু করে না, তোরা হয়ত এই সব দেখিয়া ভাবিস্, নিশ্চয় নিজে একটা বুদ্ধি ঠিক করিয়া এই সব করে, না হইলে এই সব বলে কি করিয়া ? কিন্তু তা মোটেই নয়। তোরা বুদ্ধি শুদ্ধির ভিতর আছিস্ কিনা, তোদের এইরূপ বোঝা কিছু দোষের নয়, কিন্তু এই শরীরটার কথা বোঝা তোদের পক্ষে মুস্কিল। কখনও বুঝিস্, কখনও কখনও আবার নিজেদের মত বুঝিয়া ভুল করিস্। যেখানে যাহা দরকার ঠিক ঠিক হইয়া যাইতেছে, এ'কথা বোঝা সাধারণের পক্ষে সহজ নয়।"

রওনা হইবার সময় ভক্তদের কি প্রশ্নের উত্তরে মা বলিতেছেন, "তোমার যতটুকু শক্তি করিয়া যাও, তাঁর কৃপা ত আছেই, শক্তি অনুযায়ী নালা কাট, তাঁর কৃপা সেই নালা দিয়া আসিয়া তোমাদের ভরিয়া দিবে। চিন্তা কি? তোমাদের কাজ, শক্তি মত তোমরা করিয়া যাও।"

বৈকালে পঙ্কজদাদা মোটরে মাকে নিয়া বৃন্দাবন রওনা হইলেন। হরিসভায় কীর্ত্তন হইতেছিল, যাওয়ার পথে তথায় মাকে একটু নামান হইল। আমরা প্রত্যেকবার বর্দ্ধমান রাজার মন্দিরে উঠি, এ'বার এক ভদ্রলোক অন্য একটা ধর্ম্মশালায় চিঠি দিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া দেখি স্থান পাওয়া যাইবে না। তারপর আরও একটা মন্দিরে খোঁজ করা হইল, স্থান পাওয়া গেল না; তারপর পুনার ধর্ম্মশালায় স্থান নেওয়া হইল।

রাত্রি প্রায় ৯টায় বর্দ্ধমান রাজার মন্দিরের ম্যানেজার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়কে খবর দেওয়া হইল। খবর পাওয়া মাত্রই তিনি আসিয়া উপস্থিত। তাঁর ইচ্ছা তখনই মাকে তাঁহাদের মন্দিরে নিয়া যান, কিন্তু রাত্রি হইয়া গিয়াছে বলিয়া আজ আর যাওয়া হইল না। মা, শচীদাদা ও পরমানন্দ স্বামীজী প্রভৃতিকে দেখাইয়া বলিলেন, "বাবা, এবার উহাদের উপর ভার, ইহারা যেখানে ব্যবস্থা করে।" কাল যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে বলিয়া দেওয়া হইল। অগত্যা কাব্যতীর্থ মহাশয় রাত্রি ১২টায় বিদায় লইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি "সন্তদাস বাবাজী" মহাশয়ের শিষ্য, শিশির রাহা এ'বার মার সঙ্গে আছেন। তিনি বলিতেছেন, "আমি, কিন্তু একটা আশ্চর্য্য দেখিলাম, দিল্লীর ভক্তেরা মার জন্য এত ব্যস্ত, কিছুতেই মাকে ছাড়িতে চাহিতেছে না, কিন্তু মা রওনা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদিগকে হাসি কথায় এমন ভাবে ভুলাইয়া রাখিলেন যে, মার বিরহের ব্যথাটা

তখনকার মত কাহাকেও অনুভব করিতে দিলেন না। মা যে অল্প সময়ের মধ্যে রওনা হইয়া যাইতেছেন এ'কথাটা যেন তখন সকলে ভুলিয়াই ছিল। একটা আনন্দে যেন সকলে ডুবিয়া ছিল। পরে বুঝিবে। মা হাসিয়া বলিলেন, "সত্যিই, একটা আনন্দে সকলে ডুবিয়া থাকে। শরীরটাকে স্নেহ করে কিনা ?"

১২ই চৈত্র, সোমবার—

আজ প্রাতে উঠিয়াই মা নীচে গেলেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় ও সঙ্গীয় অন্যান্য সকলে নানাস্থান দেখিতে বাহির হইলেন, কোথায় ভাল স্থান পাওয়া যায় ; কিন্তু এই সময় এখানে অনেক যাত্রী আসিয়াছে সুবিধা মত স্থান পাওয়া গেল না। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, সকলে তাঁহার ওখানে যাওয়াই স্থির করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মাকে নেওয়ার ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেলেন।

এ'দিকে প্রাতে মা হাঁটিতে হাঁটিতে এই ধর্ম্মশালার রাস্তার অপর ধারে যে মন্দিরটী আছে তাহার মধ্যে গিয়া ঢুকিয়া বলিলেন, "বাঃ এই ত বেশ স্থান, বারান্দা আছে, এইখানে পড়িয়া থাকিলেও ত হয়।" এই বলিয়া তথায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। দেখিলাম, মন্দিরের সম্মুখে আঙ্গিনায় একটী শ্বেতবর্ণের বাছুর ছুটাছুটি করিতেছে। বাছুরটি অতিশয় সুলক্ষণ যুক্ত। এমন রূপ সব সময় দেখা যায় না। মা ও আমরা এই কথা বলাবলি করিলাম।

মা ঐ আঙ্গিনার নিকটের বারান্দায় বসিলেন। শচীদাদা, পরমানন্দ স্বামীজীও ছিলেন। মা বলিলেন, এর মধ্যে কোন সময়তে আমরা বিশেষ কেহই কাছে ছিলাম না। তখন নাকি বাছুরটি মার কাছে দৌড়াইয়া

আসিয়াছিল, মা তাহার গায় মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেই বাছুরটির নাকি মহা আনন্দের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। বাছুরটির চেহারার মধ্যে একটু অসাধারণত্ব ছিল।

একটু বেলা হইতেই আমরা বৰ্দ্ধমান রাজার মন্দিরে আসিয়া দেখি কাব্যতীর্থ মহাশয় চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। সব ব্যবস্থা প্রস্তুত। ভদ্রলোকের প্রাণে বড়ই আগ্রহ ছিল, তাই আর অন্যত্র জায়গা পাওয়া গেল না।

শিশির রাহা তাঁহাদের আশ্রমে যাইয়া খবর দিতেই আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা অনেকেই মার দর্শনে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারাও মাকে তাঁহাদের আশ্রমে নিবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মা এখানে আসিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, "যেখানেই নেও এবার যেখানে যাইব সেইখান হইতে নড়িতে হইলে বৃন্দাবন ছাড়িয়া যাওয়া হইবে।" এই ভাবের কথা বলিয়াছিলেন তাই আর নাড়াচাড়া করা হইল না। ব্রহ্মচারীদের মা বলিলেন, "শিশির কেন আমাকে প্রথমে ওখানেই উঠাইল না।" ব্রহ্মচারীরা তখন শিশির দাদাকেই অনুযোগ দিতে লাগিলেন। সে বেচারাত অপ্রস্তুত! তিনি নানাদিক বিচার করিয়াই প্রথমে আশ্রমে মাকে নেন নাই। জায়গা আছে কিনা তাহারও খবর ছিল না। এই নিয়া মা আনন্দ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কথা হইল, বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় তাঁহাদের আশ্রম হইয়া যাওয়া হইবে।

সাধুদের সঙ্গে মার কিছু কিছু কথাবার্ত্তা হইল। একসঙ্গে এতজন একই ভাবের সাধুদের দেখিয়া আমাদের বেশ আনন্দ হইল। মাও আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা মাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ

করিতে লাগিলেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "আমরা সব সাধুদের বাতাস পাইলাম। মেয়েটাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছে।" সাধুরা বলিতেছেন, "মা, আমরাই আপনার দর্শন পাইয়া বাতাস নিয়া গেলাম।" মা বলিলেন, "তাও ঠিক। সব সত্যই। দেওয়া নেওয়া আদান প্রদান সর্ব্বদাই চলিতেছে।" একটি সাধু বলিতেছেন, "মা আপনি কৃপা করুন।" মা মৃদু হাসিয়া ওপরের দিকে হাত দেখাইয়া বলিতেছেন, "আপনি কৃপা করিলেই হইল। এক তিনি ছাড়া ত কিছু নাই।"

বৃন্দাবনে আসিয়া আরও একটি ঘটনা শুনিলাম। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের স্ত্রীও মার নিকট আসিয়া বলিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে নাকি তাঁর খুব অসুখ হয়। তিনি ৭দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। শেষ দিন তিনি নাকি দেখিতে পান মা তাঁহার নিকট বসিয়া হাত তুলিয়া অভয় দিতেছেন, তার পরই তাঁর জ্ঞান হয়। তাঁহার তখন মনে হইতে লাগিল, যেন কতদিন পর তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। এর পর হইতেই তাঁহার মাকে দেখিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়। বহুবার মা বৃন্দাবন আসিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নাই। তিনি এসব বিষয় নিয়া দুঃখ করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে তাঁহাদের এক পরিচিতা স্ত্রীলোক আগ্রা হইতে তাঁহাদের বাসায় আসেন। তিনি এইসব কথা শুনিয়া ইঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেছিলেন যে, "মা ত অন্তর্যামিনী তিনি নিশ্চয়ই তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছেন। কে জানে, হয়ত মা হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়া তোমাকে দর্শন দিবেন।"

মা কোথায় আছেন, তাঁহারা কিছুই খবর রাখেন না। মা হঠাৎ গিয়া উপস্থিত হইলে তখন ২।৪ দিন মাত্র দেখা শোনা হয়। যাক এই কথাবার্ত্তার পরদিনই মা বৃন্দাবন গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বধূটি এইসব-কথা বলিয়া

কতভাবে নিজের প্রাণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। মা একটু একটু হাসিয়া ২।৪ কথা বলিতেছিলেন। ইহাও বলিলেন, "কালই তোমাদের কথা হইতেছিল, কালই ত আমার জিনিষ পত্র বাঁধা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল।"

এইসব কথা শুনিয়া শচীদাদা ও আমরা বলাবলি করিতেছিলাম, এখানে আসিবার কারণ ত জানা গেল। এখন পুণা ধর্ম্মশালায় রাত্রি যাপনের কারণ জানা গেল না। হঠাৎ ওখানে যাওয়া হইল কেন? এইসব কথা বলাবলি করিতেই মা আপন মনে কতকটা যেন আমাদের প্রশ্নের জবাব স্বরূপে বলিলেন, "ঐ বাছুরটি কিন্তু বড় সুলক্ষণযুক্ত। আর যখন বিশেষ কেহ কাছে ছিল না, তখনই ছুটিয়া কাছে আসিয়াছিল। গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেই কত আনন্দ।" আমরা বলিয়া উঠিলাম, "ওঃ, তবে বাছুরটির জন্যই ওখানে যাওয়া হইয়াছিল।" মা কিছু জবাব দিলেন না। কে জানে বাছুরটি আবার কে!

সন্তদাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্যেরা আসিয়াছেন। নানা কথাবার্ত্তা হইতেছে। শিশির রাহা, "কিছুই হইল না, শুধু জ্বালাই পাইতেছি, কত সাধুদের কাছে রহিলাম," ইত্যাদি ইত্যাদি বলিতেছেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা ত রাজার ছেলে ঠিকই, তবে সাবালক না হইলে ত রাজ্য পায় না। সময়ের প্রতীক্ষা করিতেই হইবে।" এই বলিয়া হাসিয়া সকলের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "কয় বছরে যেন সাবালক হয়?" শচীদাদা প্রভৃতি অনেকেই বলিলেন, "দুই রকম আছে। এক ১৮ বছরে হয়। আবার ২১ বছরেও হয়। আচ্ছা মা, বলত ২১ বছর কবে হইবে?" মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "একাদশ ইন্দ্রিয় না কি বল তোমরা, সেই একাদশ ইন্দ্রিয়ের সংযম হইলে।" একজন

পাদপূরণ করিলেন, "তা হইলে বুঝি ২১ বছর হইবে?" মা হাসিয়া বলিলেন, "তারপর দেখা যাইবে।"

আবার কথায় কথায় বলিতেছেন, "কথা কি জান? তোমাদের যতটুকু শক্তি আছে, চেষ্টা করিয়া যাও, তিনি ত আছেনই। যাহা হয় করিবেন।"

১৩ই চৈত্র, মঙ্গলবার—

প্রতিমা দেবী প্রভৃতি আসিয়াছেন। সঙ্গে আলমোড়ার পরিচিত সেই মেমসাহেবটিও আসিয়াছেন। ইনি বিন্ধ্যাচলেও মার নিকট গিয়াছিলেন। মেমসাহেবটির এখানকার একজন মহাপুরুষকে গুরু করিবার ইচ্ছা। তাঁহার নাম করিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, গুরু তাঁহাকে করিবেন কিনা? ইহাও বলিতেছেন, "মাকে গুরুরূপে পাইলেই তিনি ধন্য হইতেন, কিন্তু তাহা হইবার নয়। মা দীক্ষা দিবেন না, তাই মা অনুমতি দিলে এই মহাত্মার নিকট দীক্ষা নিতে পারেন।" মা বলিলেন, "দেখ, খুব ভাল করিয়া বিচার করিয়া গুরু করিতে হয়। কারণ একবার করিয়া ফেলিলে পরে গুরুর উপর অবিশ্বাস আসিলে বড় অপরাধ হয়। এক হয়, আমার প্রাণ উহাকেই গুরু করিতে চাহিতেছে, আমার আর কোনরূপ বিচার করা আবশ্যকই মনে হইতেছে না, সে ভিন্ন কথা। কিন্তু সেইরূপ ভাব হইলে করিয়াই ফেলিতে, আর জিজ্ঞাসা আসিত না। যখন জিজ্ঞাসা আসিয়াছে, তখন ভাল করিয়া নিজের মনের সঙ্গে বিচার করিয়া কাজ করিও।" মেমসাহেব বলিতেছেন, "দেবীর উপরেই বিশেষ আকর্ষণ। এই অবস্থায় যদি আমার কৃষ্ণমন্ত্র

থাকে, তবে কি করা? আর কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতে করিতে যদি দেবী আসেন, তবে কি আমি দেবীর মন্ত্রই জপ করিতে আরম্ভ করিব?"

শুনিলাম, মেমসাহেবটির তেমন ভাবে দীক্ষা হয় নাই। তবে একজন স্পেন দেশীয় সাধুকেই ইনি গুরু বলিয়া মানিতেন এবং সেই গুরুর গুরু হইল ভারতবর্ষীয় একজন তান্ত্রিক সাধু। তাই মেমসাহেবটি চণ্ডী পাঠ করেন। দেবীর স্তোত্রদি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন, চণ্ডীর কতকাংশ আবৃত্তি করিলেন। শুনিলাম, কামাখ্যা পর্ব্বতেও সাধনার জন্য গিয়াছিলেন।

মা তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "দেখ, কথা হইল তুমি নিজ গুরু মন্ত্রই নিয়া বসিবে, তারপর যে মূর্ত্তিই আসুক। মূর্ত্তি ভালও আসিতে পারে, খারাপও আসিতে পারে। মনে করিবে, আমার ইষ্টই এইসব মূর্ত্তিতে আসিতেছেন। যেমন তুমি কখনও প্যান্ট পরিয়া আসিতে পার, কখনও সাড়ী কাপড় পরিয়া আসিতে পার। আবার তোমার ২।৩টা নামও আছে কিন্তু তুমি একজনই। আবার দেখ, এক তিনিই ত। বলে না, কাত্যায়ণী পূজা করিয়া কৃষ্ণকে পাইল। তাই কৃষ্ণনাম করিতে করিতে যদি দেবী আসে, অথবা দেবীর নাম করিতে করিতে যদি কৃষ্ণ আসে। তুমি তোমার ইষ্টমন্ত্র নিয়াই বসিবে। কখনও হয়ত দেখিলে এক ঋষি আসিয়া তোমাকে কিছু বলিয়া গেল। কখনও হয়ত দেখিলে কিছু খারাপ মূর্ত্তি, যেমন মদের বোতল নিয়াই একজন আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া তোমার প্রাণে খারাপ ভাব জাগিল। কিন্তু তখনও তুমি মনে করিবে ইষ্টেরই এই সব। তুমি নিজের মন্ত্রের উপরেই জোর দিয়া বসিয়া সব দেখিয়া যাইবে।"

"তাই বলি, যদি দুইটা তোমার ভাব থাকে, তুমি বেশ

করিয়া বিচার করিয়া দেখ ঐ দুইয়ের মধ্যে কোনটা তোমার মধ্যে প্রবল ভাব। নিশ্চয়ই একটা প্রবল দেখিবে। যেমন তুমি ঘর হইতে বাহির হইতেই ২৷৩টা রাস্তা দেখিতেছ, কিন্তু একটা রাস্তা ধরিয়াই ত তোমার বাহির হইতে হইবে। কথা কি জান? একটা সংস্কার থাকে, তাহা তোমার মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে। আর কতকগুলি আছে বাইরে সকলকে দেখিয়া বা কাহারও বড় নাম শুনিয়া শুনিয়া তাহাকে তোমার পূজা করিতে ইচ্ছা জাগিতেছে। এইটা তেমন শিকড় নিয়া তোমার মনের মধ্যে বসে নাই। একটু বিচার করিলেই একসব বুঝিতে পারা যায়।"

১৪ই চৈত্র, বুধবার—

আজ প্রাতে মা উঠিয়া পায়চারি করিতেছেন। আমি ও মেজদি' রান্না ঘরে কাজ করিতেছি। মা দরজায় দাঁড়াইয়া গাহিতেছেন—

'হাত সে কাম করনা
মন্ সে নাম চালানা
মুখ্‌সে নাম চালানা।"

ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এই গান গাহিতে লাগিলেন। আমাদের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

আজই মার দেরাদুন যাওয়ার কথা ছিল। বিকালে মথুরায় যাইয়া ট্রেন ধরিবার কথা। দুপুরেই মার শরীর হঠাৎ খুব খারাপ হইয়া পড়িল, তাই যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। আজও জিনিষ পত্র বাঁধা হইয়া গিয়াছিল। মা বলিতেছেন, "জিনিষপত্র বাঁধা ছাদা হইয়াও এর মধ্যেই দুইদিন যাওয়া বন্ধ হইল। আমি ত বলিয়াছি তেমন খেয়াল হইলে ভিন্ন কথা, তখন

কিছুই দাঁড়ায় না। কিন্তু তা'ছাড়া শরীর যখন চলিবে না, তখনই যাওয়া আসা বন্ধ হইবে। এইরূপ বন্ধ হইতে হইতে কোথায় গিয়া শরীরটা থাকিবে।" এই কথা কয়টা আপন মনে বলিতেই, শচীদাদা বলিলেন, 'তা কি হয় মা।' মা আবার আপন মনেই যেন মৃদু ভাবে বলিলেন, "দীর্ঘকালের জন্য।"

যাওয়া বন্ধ হইল। গতকল্য দেরাদুনের ডাক্তার সোমের মা তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষ্যে বৃন্দাবন আসিয়াছেন। মা এখানে আছেন খবর পাইয়া এখানেই আসিয়াছেন। সন্ধ্যা বেলায় তিনি বলিতেছেন, "মা তোমার অসুস্থতার কারণ আমিই। কারণ আমি কাল রাত্রি হইতে শুধু মনে মনে বলিতেছি, "মা আমি আসিলাম আর তুমি চলিলে। একটা দিন আরও থাক। দেখি মা, তুমি ডাক শোন কিনা? মা হাসিয়া বলিলেন, তোমরা কোথা দিয়া কি করিয়া আমার যাওয়া বন্ধ করিয়া দেও। জানই ত শরীরটা অচল হইয়া না পড়িলে যাওয়া আসা বন্ধ হইবে না।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মার হার্টের অবস্থা ভাল নয়। মাকে বেশী কথা না বলিতে মধ্যে মধ্যে আমরা অনুরোধ করিতেছি। মাও কথামত খানিক সময় চুপ করিয়া থাকেন। উপস্থিত সকলকে বলেন, "উহারা কথা বলিতে বারণ করিতেছে।" আবার ছেলে মানুষের মত সব ভুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করেন। তখন মনে হয় না নাড়ীর গতি এত খারাপ। সামনে যে বসিয়া আছে খেলায় খেলায় হয়ত তাহার হাতে চিমটি কাটিবার মত করিতেছেন, আবার নিজেই বলিতেছেন, 'দেখ এই যে বেশী বেশী কথা বলা বা এই যে চিমটি কাটার ভাব এই সবও দুর্ব্বলতার লক্ষণ। দেখ না, রুগীর অবস্থা খারাপ হইলে চট্‌পটে ভাব হয়। সেইরূপ বিকার হইলেও চিমটি কাটে, এই সব ভাল

লক্ষণ নয়। তবে এই শরীরটা বলিয়া তোমরা অবস্থাগুলি বুঝিতে পার না। যদি এই শরীরটার শ্বাসের গতি এবং অন্যান্য অবস্থা সাধারণের মত হইত, তবে যে রকম বড় বড় অসুখ ও হার্টের খারাপ অবস্থা গিয়াছে ও যাইতেছে, অনেক পূর্ব্বেই সব শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু এই অবস্থাতেও হাসি ও কথাবার্ত্তা বলা হয়, তাই সকলে অবস্থা ধরিতে পারে না।" আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া সব শুনিতেছি। নাড়ীর গতি দেখিয়া ও রোগের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তাররাও অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মার মুখের উজ্জ্বলতা ও হাসিমুখের বাণী শুনিয়া ভক্তেরা সেই অবস্থা অনেক সময়েই বুঝিতে পারেন না।

সন্ধ্যায় সন্তদাস বাবাজীর আশ্রমের সাধুরা আসিয়াছেন। গতকল্য হইতেই মা সন্ধ্যাবেলা ছাতে গিয়া সকলকে নিয়া বসিয়া বলেন, "আমি দেখি আমরা কিছু সময় সকলে চুপ করিয়া বসি। তাঁর নাম অথবা ধ্যান, যাহার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।" আজও সকলে বসিলেন। সাধুদের মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের একটু দেরী হইলে আশ্রমের কাজের ত কিছু ক্ষতি হইবে না?" তাঁহারা ক্ষতি কিছুই হইবে না বলিলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক পর মাকে প্রণাম করিয়া একে একে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শিশির রাহাকেও তাঁহারা এই ২।৩ দিন যাবৎ আশ্রমে নিয়া যাইতেছেন। এই কথা উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের মধ্যে কে একজন বলিল, "শিশিরদাদা আমাদের ত্যাগ করিয়াছেন।" মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা এইরূপ মনে কর কেন? ঐ স্থান কি আমাদের নয়? দুইভাব আন কেন? সব একেরই আশ্রম। কেহ এ'ঘরে থাকে, কেহ

ও'ঘরে থাকে, তাতে কি হয়? মার এ'কথা বলার ভাব ও ভঙ্গীটুকু দেখিয়া সকলেই বড় আনন্দ পাইলেন।

আনন্দ পাইবারই ত কথা, কারণ মার ত ইহা শুধু মুখের কথা নয়। মার জীবনের প্রতি কাজে, প্রতি কথায়, যে এই ভাবই ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাই মার মুখের এই ভাবের কথায় সকলেই মুগ্ধ হয়।

১৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার—

আজ প্রাতঃকাল হইতেই আবার মার যাওয়ার খেয়াল উঠিয়াছে। শচীদাদাকে বলিতেছেন, "কি বল? আজ রওনা হওয়া যাক। তাই হইল। কাব্যতীর্থ মহাশয় মার যাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করিতেছিলেন। ভদ্রলোক যথাসাধ্য সকলের যত্ন করিতেছেন। কি করিয়া সকলের আদর যত্ন করিলে তাহার তৃপ্তি হইবে, তাহা যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। মার ত দূরের কথা, সঙ্গীদের নিকটও তিনি যেন প্রতিটি আদেশ পালনের জন্য সর্ব্বদা দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সুন্দর স্বভাব সাধারণতঃ দেখা যায় না।

আজও তিনি এবং বিনোদ বলিয়া আরও একটি ছেলে মথুরা পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়া মাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। যাওয়ার পথে শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজীর আশ্রম হইয়া যাওয়া হইল। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই দিল্লী পৌঁছান গেল। ভক্তেরা অনেকেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মাকে নামিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু এবার মা নামিতে রাজী হইলেন না, বলিলেন, 'যদি সব ঠিক ঠিক থাকে দেরাদুন হইতে নামিবার সময় তোমরা এখানে নামাইও।' এই কথা শুনিয়া মনোজদাদা বলিলেন, "মা আমরা কি তোমাকে নামাইয়া নিবার কর্ত্তা?" আমাদের কি শক্তি যে তোমাকে নামাইব। মা হাসিয়া বলিলেন, "বাঃ কি বল বাবা, তোমাদের জিনিষ তোমরা নামাইয়া নিবে না? যার মাল

সেই ত নামায়।" একজন বলিলেন, "তুমি কি আমার ?" মা বলিলেন, **"আমি সকলের"।**

দিল্লী ষ্টেশনে মাকে একঘণ্টা দেখিতে সময় পাইয়াছেন, সকলেই মার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। জিতেনই খুব অধৈর্য্য হইয়া মাকে নামাইবার জন্য কাঁদাকাটা করিতেছিল। মা তাহাকে নানা কথায় শান্ত করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়া আসিল। ডাক্তার জে, কে, সেন মহাশয় মার দিকে চাহিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "আমাদের জন্য ঠিক মত বিচার করিও।" মা হাসিয়া বলিলেন, "তা, কি করিব বাবা, জান ত তোমাদেরই মেয়ে, তোমাদের স্বভাবই পাইয়াছে। কাহার দোষ দিবে বল ?" এই কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। দেরাহুনের গাড়ী ছাড়িয়া দিল, বিষণ্ণ মুখে সকলে যতক্ষণ দেখা যায়, মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মাও জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া রহিলেন।

আমার বিন্ধ্যাচল যাওয়ার কথা, ২।১ দিন দিল্লী থাকিয়াই বিন্ধ্যাচল রওনা হইব।

২৭শে চৈত্র, মঙ্গলবার—

আজ মা দেরাহুনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পরমানন্দজীর পত্রে জানিলাম ঠাণ্ডা মার সহ্য হইতেছে না, আবার জ্বর জ্বর ভাব হইয়াছে। দিল্লী হইতে ১৭।১৮ জন ভক্ত গিয়াছেন : গত ২৫শে চৈত্র রবিবার অমাবস্যা ছিল, তাই তথায় নাম-যজ্ঞ হইতেছে। ইহার পরই মার একটু গরম স্থানে যাওয়ার কথা হইতেছে।

৩০শে চৈত্র, শুক্রবার।

আজ দেরাহুনের চিঠিতে জানিলাম, ২৫শে চৈত্র রবিবার তথায়

নামযজ্ঞ হইয়াছে। ২৬শে চৈত্র, সোমবার বিকাল বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত মেয়েদের কীর্ত্তন চলিয়াছে। মেয়েরা মাকে গেরুয়া রংয়ের কাপড় পরাইয়া মাথায় চূড়া বাঁধিয়া দিয়াছিল। মা মেয়েদের কীর্ত্তনে ঐ সাজে খুব আনন্দ করিয়াছেন। ২৭শে চৈত্র মঙ্গলবার, সকাল ৭টায় ৩০।৩৫ জন ভক্ত নিয়া একটা মোটর বাসে মা প্রথমে দেরাদুন ষ্টেশনে যান। ভক্তেরা কীর্ত্তন করিতে করিতে গিয়াছিল। তথা হইতে রায়পুর যান। তথায় ঘণ্টা দুই থাকিয়া বেলা প্রায় ১১টায় মা কিষণপুর আশ্রমে ফিরিয়াছেন। ওদিকে একটু গরম পড়িয়াছে। তাই হয়ত এখন ওখানে মার থাকা হইতে পারে। এই কয়দিন কীর্ত্তনাদিতে মার বিশ্রাম প্রায় হয় নাই, তাই শরীর দুর্ব্বল, জ্বর জ্বর ভাবও চলিতেছে।

মার ত শরীরের দিকে মোটেই লক্ষ্য নাই। এই দুর্ব্বল ও অসুস্থ শরীর নিয়াই অনিয়ম যথেষ্ট করিতেছেন। এই ভাবেই মার শরীর দিন দিন খারাপই হইয়া পড়িতেছে। কখনও কখনও মনে হয়, বেশ আছেন। দুর্ব্বলতার বা রোগের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। কিন্তু আবার সেই ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। অনেক সময়ই বলেন, "এই শরীরের যে অবস্থা নিয়া যে রকম চলাফেরা চলিতেছে, অন্য কোন শরীরে এইরূপ করিলে শরীর হয়ত থাকিত না।" এক এক সময় হার্টের অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভয় পাইয়া যান। শরীর বুঝি আর চলিল না। কয়েক ঘন্টা পরেই আবার সেই ভাবের পরিবর্ত্তন, বেশ হাসি খুসী, কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। কে বলিবে কিছু পূর্ব্বেই এই শরীরের অবস্থা দেখিয়া ভয় হইয়াছিল। যাহা হউক শরীর যে দিন দিন একটু অসুস্থ দেখা যাইতেছে এ বিষয় কাহারও সন্দেহ নাই। আমাদের শুধু ভাবনাই, সার, কিছুই করার সাধ্য নাই!

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী
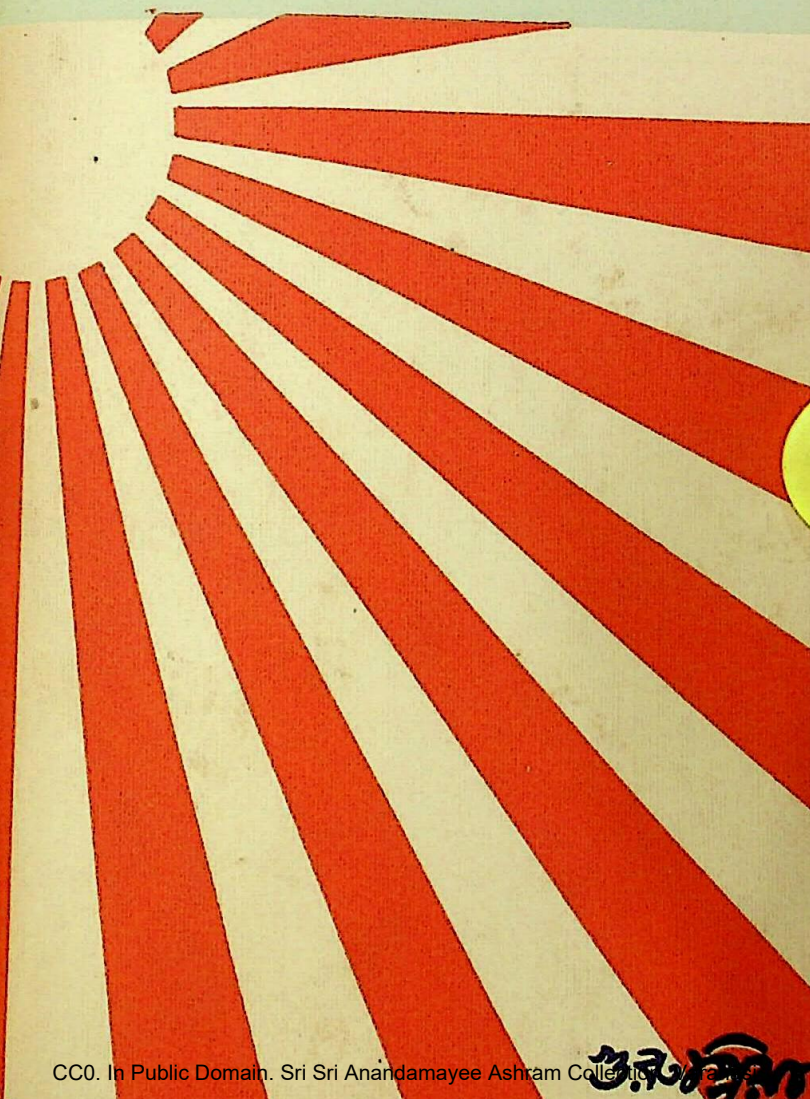
সপ্তম ভাগ—উত্তরার্দ্ধ

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

সপ্তম ভাগ—উত্তরার্দ্ধ

[বৈশাখ, ১৩৪৭—চৈত্র, ১৩৪৮]

শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

প্রকাশক : শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ
ভাদাইনী, বারাণসী।

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৬৫

মূল্য :
দুই টাকা মাত্র।

মুদ্রক :
হিন্দ্ পেপার প্রিণ্টার্স
৭৯৷৯, লোয়ার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-১৪

প্রকাশকের কথা

শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়া দেবী লিখিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" পুস্তকের সপ্তম ভাগ প্রকাশিত হইবার পরে সম্পূর্ণ দুই বৎসরের পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যাওয়ায় ঐ অংশ বাদ দিয়াই ১৩৪৯ হইতে ১৩৫১ পর্য্যন্ত ডায়েরী অষ্টম ভাগ রূপে ছাপা হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত হারান অংশ উদ্ধার করিয়া সপ্তম ভাগ—উত্তরার্দ্ধ নামে প্রকাশিত হইল।

বাঁধাই, আবরণ পৃষ্ঠা ও চিত্রাদির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ইহাকে যথাসাধ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিনীত—

আশ্বিন, ১৩৬৫

প্রকাশক।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

নানা স্থানে মা (১৩৪৭ সন)

দেরাদুন, সোলন প্রভৃতি স্থানে মায়ের অবস্থান ... ১
স্বামী পরমানন্দের জীবনরক্ষা ... ২
মায়ের জন্মভূমির উপর শিব প্রতিষ্ঠা ... ৩
মাকে রায়পুরস্থ শিবমন্দির অর্পণ ... ৪
কিশনপুর আশ্রমে ৺দুর্গাপূজা ... ৪
হরিদ্বার ডোঙ্গা ও মীরাট গমন ... ৬
জলন্ধরে সাবিত্রীদেবী আশ্রমে ... ৭
গুজরাটে নানা স্থানে ... ৮
রায়পুর মন্দিরে নামযজ্ঞানুষ্ঠান ... ৯
রায়পুর ডোঙ্গার স্থান বিশেষত্ব ... ১০
মার সর্ব্বদাই একই অবস্থা ... ১২

দেরাদুনে মা (বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৪৮ সন)

ভাইজীকে স্বপ্নে দর্শন ... ১৩
দাদামহাশয়ের দেহ মাতৃঅঙ্গে বিলীন ... ১৩

স্বরূপে যাওয়ার প্রকৃত অর্থ কি ... ১৪
নির্ম্মলবাবুকে স্থক্ষ্মে দর্শন ... ১৫
মায়ের শরীর হইতেই পূজার প্রকাশ ... ১৫
বাক্‌সংযমের উপকারিতা ... ১৭
সত্যের অনুসন্ধানই কর্ত্তব্য ... ১৭
জনৈক বৈষ্ণবকে স্থক্ষ্মে দর্শন ... ১৮
স্থরবালাকে স্থক্ষ্মে দর্শন ... ১৯
অমলদাদার ভগ্নীর মৃত্যু সময়ে স্থক্ষ্মে গমন ... ২০
মায়ের শরীরে নানা ক্রিয়াদির প্রকাশ ... ২২
রায়পুর আশ্রমে মায়ের জন্মোৎসব ... ২৩
স্থক্ষ্ম জগতে মাকে লইয়া উৎসব ... ২৪
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা ... ২৫
ভোলানাথের রোগাবস্থার কথা ... ২৭
বাজিতপুরে সাধনার প্রকাশ ... ৩৩
স্থক্ষ্মে অন্ধ বৃদ্ধা সহ বালককে দর্শন ... ৩৩
স্থক্ষ্মে কলিকাতা গমন ... ৩৪
স্থক্ষ্মে কবিরাজ মহাশয়কে দর্শন ... ৩৫
নানা স্থক্ষ্ম দর্শনাদির বর্ণনা ... ৩৯
সন্ন্যাসীর প্রতি উপদেশ ... ৪৪
সাধনার খেলা সম্বন্ধে নানা কথা ... ৪৭
স্থক্ষ্মে আরও নানা রূপ দর্শন ... ৫৬

তান্ত্রিক সাধুর মাকে বশীভূত করার দুশ্চেষ্টা ... ৬০
মায়ের সহিত অন্যায় ব্যবহারের ফল ... ৬২
ভোলানাথের আদেশে পুরুষমুখ না দেখা ... ৬৩
নেপালী ভদ্রলোককে স্বপ্নে মন্ত্রদান ... ৬৪
মুসৌরী গমন ... ৬৬

সোলন, সিমলা ও হরিদ্বারে মা (শ্রাবণ, ১৩৪৮)

সোলনে গমন ... ৬৭
সিমলা কালীবাড়ীতে নামযজ্ঞ ... ৬৮
ভাইজীর তিরোধান উৎসব ... ৬৯
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা ... ৭০

রায়পুরে অবস্থান (ভাদ্র, ১৩৪৮ সন)

মায়ের ভাবপরিবর্তন ... ৭০
যমুনালাল বাজাজের মায়ের নিকট আগমন ... ৭১
মায়ের মুখ হইতে মন্ত্রোচ্চারণ ... ৭২
যমুনালালজীর মায়ের প্রতি আকর্ষণ ... ৭২
যমুনালালজী সম্বন্ধে নানা কথা ... ৭৩
স্বপ্নে পাঞ্জাবী মহিলাকে দর্শন ... ৭৪

নানা স্থানে মা (ভাদ্র-মাঘ, ১৩৪৮)

হরিদ্বারে ধর্ম্মশালায় ... ৭৫

দিল্লী হইয়া বিন্ধ্যাচলে ... ৭৬

কাশীতে গঙ্গাবক্ষে অজ্ঞাতবাস ... ৭৬

মায়ের মুখ হইতে নানা কথা ... ৮২

স্বপ্নে রোগমূর্ত্তি দর্শন ... ৮৬

এলাহাবাদে পূর্ণকুম্ভ ... ৮৮

পুণ্ডরীগ্রামে মা ... ৮৯

জনৈকা দেবীজীর সহিত মায়ের সাক্ষাৎ ... ৯৪

স্বপ্নে ভোলানাথের মায়ের নিকট আগমন ... ৯৬

লখ্নৌতে গোমতী তটে অবস্থান ... ১০২

ডাঃ পান্নালালের সহিত কথাবার্ত্তা ... ১০২

লখ্নৌতে নাগযজ্ঞ ... ১০৬

যমুনালালজীর পরলোকগমন ... ১০৮

ঝাঁসিতে মা ... ১১১

মায়ের দেহে নানা ক্রিয়াদির প্রকাশ ... ১১২

অলৌকিক ভাবে জনৈক ভদ্রলোকের রোগমুক্তি ... ১১৫

ললিতপুরে একরাত্রি ... ১১৬

নানারূপ ক্রিয়া ও মন্ত্রের প্রকাশ ... ১১৭

স্বপ্নে বিন্ধ্যাচল গমন ... ১১৯

ওয়ার্দ্ধাতে মা (ফাল্গুন ১৩৪৮ সন)

গাড়ীতে স্বপ্নে যমুনালালজীর উপস্থিতি ... ১২১
গোপুরীতে মায়ের অবস্থান ... ১২২
যমুনালালজী সম্বন্ধে নানা কথা প্রকাশ ... ১২৩
সেবাগ্রাম আশ্রমের মিটিংএ মাকে নিমন্ত্রণ ... ১৩১
মায়ের নিকট রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও বিনোবাজী ... ১৩৪
সেবাগ্রাম আশ্রমে মায়ের রাত্রিবাস ... ১৩৫
মহাত্মাজীর সহিত কথাবার্ত্তা ... ১৩৫
মহাত্মাজীর পরলোকগমন সম্বন্ধে সূক্ষ্ম নির্দ্দেশ ... ১৪১

সাগরে অজ্ঞাতবাস (ফাল্গুন—চৈত্র, ১৩৪৮ সন)

সাগরে মা ... ১৪৬
ব্যাসনদী তটে অজ্ঞাতবাস ... ১৪৭
মায়ের মুখ হইতে মন্ত্রোচ্চারণ ... ১৪৮
মায়ের দেহে যুগলমূর্ত্তি বিলীন ... ১৪৯
স্বপ্নে জনৈক ব্রহ্মচারীকে দর্শন ... ১৫১
নাম সম্বন্ধে নানা কথা ... ১৫৪
মায়ের জন্মের নিগূঢ় রহস্য ... ১৫৬
প্রচ্ছন্নরূপী প্রেতাত্মা দর্শন ... ১৫৭

মায়ের মুখে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় গান ... ১৫৮

নর্ম্মদা তটে অজ্ঞাতবাস ... ১৬৪

দুষ্ট আত্মা হইতে মাতৃকৃপায় রক্ষা ... ১৭০

সূক্ষ্মে রোগমূর্ত্তির মায়ের নিকট আগমন ... ১৭৩

মানসিক পূজার ক্রম বর্ণনা ... ১৭৩

কান্তিভাই ব্যাসের মায়ের নিকট আগমন ... ১৭৫

অপবিত্র আত্মার মাতৃদর্শনে ঊর্দ্ধগতি ... ১৭৭

নানা স্থানে (চৈত্র, ১৩৪৮ সন)

ঝাঁসিতে দুইদিন ... ১৭৯

কাশীতে মাতৃসমক্ষে সাতটি বালকের উপবীত গ্রহণ ... ১৮০

বিন্ধ্যাচলে দুইদিন .. ১৮০

দেরাদুনে অখণ্ড নামকীর্ত্তন ... ১৮১
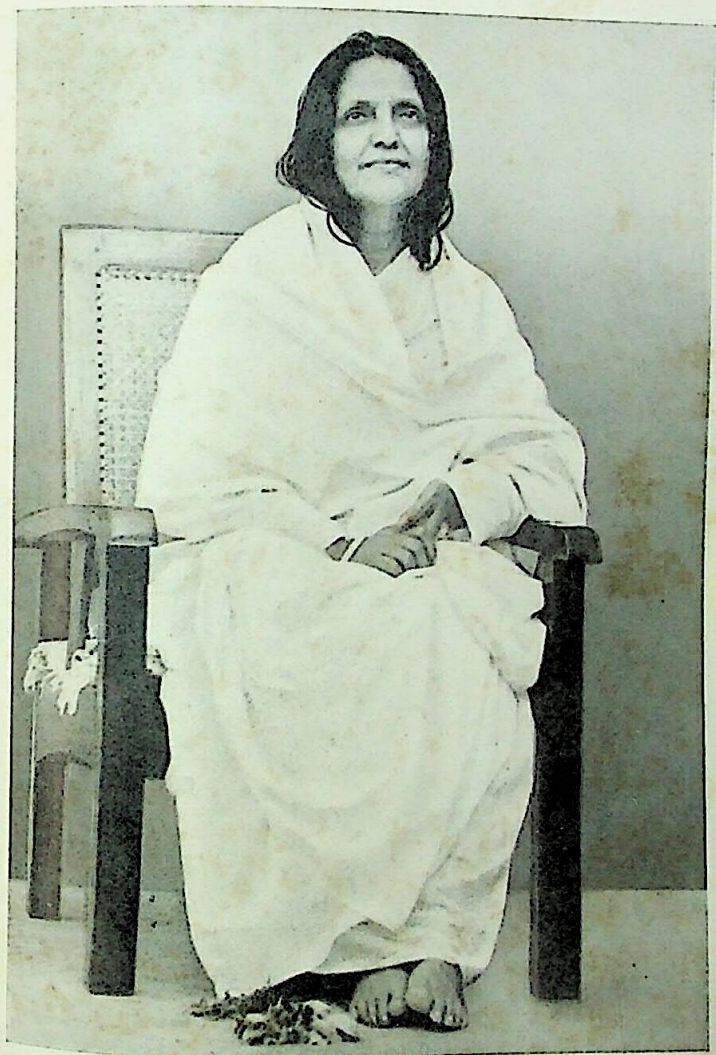
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

সপ্তম ভাগ

(উত্তরার্দ্ধ)

২০শে বৈশাখ, শুক্রবার।

গত ১৬ই চৈত্র হইতে মা দেরাদুনে আছেন। মাঝে মাঝে পরমানন্দ স্বামীর পত্রে মার সংবাদ জানিতে পাই। ইতিমধ্যে দেরাদুন, সোলন প্রভৃতি স্থানে একদিন অসুস্থ শরীর লইয়াই ডোঙ্গা * ঘুরিয়া মায়ের অবস্থান আসিয়াছেন।

আমি মার নির্দ্দেশে উপস্থিত বিন্ধ্যাচলেই আছি। ১৯শে মার জন্মদিন। সেইজন্য গতকাল হইতে এখানে মার শরীরের আরোগ্যার্থে নিত্য প্রায় পাঁচ হাজার করিয়া আহুতি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী ১০ই জ্যৈষ্ঠ মার জন্মতিথির দিন পর্য্যন্ত একলক্ষ আহুতি দেওয়া হইবে।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

ডোঙ্গা হইতে লিখিত পরমানন্দ স্বামীর পত্র পাইলাম। মা গত ৯ই সোলন রওনা হইয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ এক সপ্তাহের মধ্যেই পুনরায় ডোঙ্গাতে ফিরিয়া যাইবেন।

---

* এই স্থানটি দেরাদুন হইতে প্রায় ১৬ মাইল দূরে। এখানকার জমিদার ৺শেরসিংহ চৌধুরী মায়ের জন্য আশ্রমের মতই বানাইয়া ছিলেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

চিঠি আসিয়াছে মা গত পরশুই সোলন হইতে ডোঙ্গা ফিরিয়া আসিয়াছেন। সোলনে মাত্র এক দিন ছিলেন। মার অবিচ্ছিন্ন ঘোরাফেরার আর শেষ নাই। উপস্থিত কয়েকটি দিন হয়ত ডোঙ্গাতে থাকিতে পারেন আশা করা যাইতেছে।

১৬ই আষাঢ়, রবিবার।

মার সংবাদ প্রায়ই পাইতেছি। রায়পুর, কিশনপুর, ডোঙ্গা এই সব স্থানেই মা ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকিতেছেন। ইতিমধ্যে একবার হরিদ্বারও গিয়াছিলেন। মার শরীর একপ্রকার ভালই আছে লিখিয়াছেন।

৩২শে আষাঢ়, সোমবার।

ইতিমধ্যে মার হাতে নাকি ভয়ানক একটি ব্যথার সৃষ্টি হইয়াছিল এই সংবাদ পাইয়া মনটা মার শরীরের জন্য খুবই অশান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু করিবারত কোনও উপায় নাই। দূর হইতে মার চরণেই প্রার্থনা জানাই।

২১শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার।

রায়পুর হইতে পরমানন্দ স্বামীর চিঠি আসিয়াছে। মা সেখানে কয়েকদিন হয় গিয়াছেন। মার অসীম কৃপায় পরমানন্দজী নাকি সর্পাঘাত হইতে আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা পাইয়াছেন। বিস্তারিত ঘটনাটি জানিতে পারা গেল না।

স্বামী পরমানন্দের জীবনরক্ষা

গতকাল আমরা মার জন্মভূমি খেওড়া গ্রামে আসিয়াছি। কথা হইয়াছে এখানে ২৩শে শিবপ্রতিষ্ঠা হইবে। ২৮শে একাদশী হইতে ১লা ভাদ্র পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মার জন্মস্থলে একটি মেলা বসাইবার আয়োজন করা হইয়াছে। প্রতি বৎসরই যাহাতে এইস্থানে এইরূপ মেলা হয় তাহার জন্যও চেষ্টা করা হইতেছে। গত বৎসর ঝুলন পূর্ণিমার দিন মা এখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই উপলক্ষে এবারও ভক্তেরা সকলে মিলিয়া এখানে অহোরাত্রি কীর্ত্তন করিবেন স্থির হইয়াছে।

মায়ের জন্মভূমির উপর শিব প্রতিষ্ঠা

৩১শে শ্রাবণ, শুক্রবার।

মার জন্মস্থানটি মুসলমান মালিকের নিকট হইতে অনেক চেষ্টা করিয়া ক্রয় করা হইয়াছে। সেইস্থানে গত ২৩শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার শিব প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। আগামীকাল ঝুলন উৎসব উপলক্ষে ঐস্থানে মায়ের পূজারও আয়োজন হইয়াছে।

মার এইসময়ে এখানে আসা হইল না তাই এখানকার অনেকেই খুব দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। আকুল আগ্রহে সকলেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—মা আসিবেন কিনা? তাহাদের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে 'না' বলিতে আমাদেরও প্রাণে ব্যথা অনুভব হয়। মার দর্শনের আশায় কত দূর দূর গ্রাম হইতে লোকজন নৌকা করিয়া আসিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

২রা কি ৩রা আমাদের এখান হইতে ঢাকা যাইবার কথা।

১৮ই আশ্বিন, শুক্রবার।

ঢাকা, কলিকাতা হইয়া কয়েকদিন হয় কাশীতে আসিয়াছি। দেরাদুন হইতে আজ সংবাদ আসিল কিশনপুর আশ্রমে এবার ৺দুর্গাপূজার আয়োজন হইতেছে।

মা রায়পুরে আছেন। সঙ্গে অনেকেই এখন আছেন। মার শরীর কখনও একটু ভাল আবার কখনও একটু খারাপ এই ভাবেই চলিতেছে।

রায়পুর শিব মন্দির মাকে অর্পণ

আরও একটি সংবাদ পাইলাম যে কিছুদিন হয় রায়পুরের শিবমন্দিরাদি জমি সহ মার নামে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছে। উহা বহু পুরাতন দেবোত্তর সম্পত্তি। এখন হইতে উহার রক্ষণাবেক্ষণ মার পক্ষ হইতেই করা হইবে।

২১শে আশ্বিন, সোমবার।

কিশনপুর আশ্রমে ৺দুর্গাপূজা

আজ সপ্তমী পূজার দিন আমি মার চরণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা শুনিলাম কলিকাতা হইতে যতীশদাদা সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। মার নির্দ্দেশে তাঁহার নিকট দেরাদুন হইতে পরমানন্দ স্বামী ট্রাঙ্ককল করিয়া বলিয়াছিলেন প্রতিমা লইয়া আসিবার জন্য। তিনিত শুনিয়া একেবারে অবাক। পূজার মাত্র তখন ৪।৫ দিন বাকী। অত অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট মাপ মত প্রতিমা তিনি কিভাবে সংগ্রহ করেন। কলিকাতার মত বিশাল নগরীতে আগে হইতে অর্ডার না দিলে সাধারণ প্রতিমা পাওয়াই দুষ্কর।

যাহাই হউক মার নির্দ্দেশ মাথায় তুলিয়া তিনি প্রতিমার খোঁজে বাহির হইলেন। সমস্ত স্থান দেখিতে দেখিতে কুমারটুলীতে গিয়া

দেখিলেন সেখানে অতি চমৎকার নির্দ্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী একটি প্রতিমা রাখা আছে। এ প্রতিমাটির জন্য কেহ নাকি অর্ডার দেয় নাই। অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইহাকেই বলে মায়ের লীলা। মায়ের ব্যবস্থা মা পূর্ব্ব হইতেই সব করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ প্রতিমাটি যতীশদাদা তখনই কিনিয়া লইলেন এবং ভালমত দেরাদুন নিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

২রা কার্ত্তিক, শনিবার।

কিশনপুর আশ্রমে মার উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত সমাগত হইয়াছিলেন।

আজ খাওয়া দাওয়ার পরে মা সকলকে সঙ্গে লইয়া রায়পুর চলিয়া গেলেন। আমি মার নির্দ্দেশে দিল্লী রওনা হইলাম।

দেরাদুনে এবার মার সম্মুখে দুইটি পূজাই হইল। হরিরাম ভাই তাই মাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছে যে এবার কালীপূজাও মার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হউক। কালীপূজা যদিও প্রধানতঃ বাঙ্গলাদেশেরই পূজা; তবে উত্তর ভারতে ঐদিনে মহালক্ষ্মীর পুজা হয়। মা তাহাতে বলিয়াছেন—"বেশত, দুর্গাপূজা লক্ষ্মীপূজাত তোমরা বাঙ্গালীদের নিয়মে করলে। এবার মহালক্ষ্মী পূজা যদি তোমরা করতে চাও তবে পাহাড়ে যেমন তোমাদের নিয়মে হয় সেই ভাবেই কর। যদি শরীরটা এদিকে থাকে তবে সেই সময়ে এখানে আসবার খেয়াল হলে দেখা যাবে।"

মার সঙ্গে একদিন নরেশ দাদার কথা হইতেছিল। তিনি মাকে বলিয়াছিলেন যে মনে বড় গোলমাল হয়। মা এই কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন—"গোল জিনিষটাকে মাল বলে ধরে

বসে আছ কিনা তাই এত গোলমাল।" হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—"গোল জিনিষটি মানে গোলাকার জিনিষটি—মানে টাকা। সেই একমাত্র অখণ্ডকে ধরতে চেষ্টা কর। আকার নিরাকারের কোনও কথাই নেই। সেখানে কোনও গোলমালও নেই।"

মনের ভিতর গোলমালের মূল কারণ

২৪শে কার্ত্তিক, রবিবার।

পরমানন্দ স্বামীর চিঠিতে জানিলাম মা শ্রীশ্রীকালী পূজার ২।১ দিন পূর্ব্বে কিশনপুর আশ্রমে আসিয়াছিলেন। সেখানে ১৩ই বুধবার বেশ আনন্দের সহিত পূজা সম্পন্ন হইয়াছে। পরদিনই দিদিমা, নিশিদাদা, প্রভা ও গোপালকে নর্ম্মদা পাঠাইয়া দিয়াছেন। ১৫ই মা নিজেও হরিদ্বার গিয়া সেখানে প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন। তাহার পর পুনরায় ডোঙ্গা রওনা হইয়া গিয়াছেন।

১১ই অগ্রহায়ণ, বুধবার।

আজ প্রাতে মা হঠাৎ দিল্লী আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম ডাঃ জে, কে, সেন নাকি বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। বিকালের দিকে পঞ্চুদাদার মোটরে মা মীরাট রওনা হইয়া গেলেন। প্রায় ৩।৪ বৎসর যাবৎ সেখানকার ভক্তেরা মাকে সেখানে নিবার চেষ্টা করিতেছেন।

দিল্লী হইয়া মীরাট গমন

১৩ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার

সকাল প্রায় এগারটায় মা মীরাট হইতে ফিরিয়া সোজা ডাঃ সেনের বাড়ীতেই আসিলেন।

দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জলন্ধর গমন

রাত্রির গাড়ীতে মা জলন্ধর রওনা হইলেন। জলন্ধরের পুরাতন ভক্ত সাধুসিংয়ের বিশেষ প্রার্থনাতেই মা যাইতেছেন। সাধু সিং ও তাঁহার ছেলেদের ধর্ম্মপ্রাণ স্বভাবের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চারটি ছেলের মধ্যে তিনটিই প্রায় ব্রহ্মচারী ভাবে থাকে। সাধু সিংয়ের দীর্ঘকাল হয় স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। সমস্ত পরিবারটিই যেন ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ। চাকুরী ও অর্থোপার্জ্জন অনেকেই করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের অর্জ্জিত ধন প্রায় সবই দান অথবা সেবা কার্য্যে ব্যয় হয়। সাধনভজনের দিকেও তিনটি পুত্রই বেশ সচেষ্ট। উহাদের গুরু দেহরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এখনও নাকি গুরুর আদেশ পাইয়া থাকেন এবং সেই মতই সাধনভজন করেন। ইতিমধ্যে সাবিত্রী দেবী নামে একজন সাধিকার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের জীবনের আরও সুন্দর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সাবিত্রী দেবীর নামে একটি আশ্রম বানাইয়া সেইস্থানেই ব্রহ্মচারী ছেলেরা থাকে।

তৃতীয় ছেলেটির নাকি সাধনভজনে বেশ সুন্দর অবস্থা। তাহার সহিত সংসারের বিশেষ সম্বন্ধও নাই।

২১শে অগ্রহায়ণ, শনিবার।

পঞ্চুদাদা মার সঙ্গে জলন্ধর চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আজ ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে মার কথা জানা গেল।

গুজরাটের দিকে

মা গতকাল জলন্ধর হইতে ভীমপুরা (নর্ম্মদা) আশ্রমের দিকে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার

মার সম্বন্ধে আজকাল আর বিশেষ কিছু লিখিবার সংবাদ পাইনা তাই লেখাও আর হয় নাই। মধ্যে মধ্যে চিঠি আসে। মা এখনও ভীমপুরা আশ্রমেই আছেন, তবে ইতিমধ্যে একবার চান্দোদে টিকম্‌জীর মন্দিরে গিয়াছিলেন। রাজপিপ্‌লা এবং ওঙ্কারেশ্বর ও উজ্জয়িনীও গিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

মার শরীর আজকাল ওদিকে গিয়া ভালই আছে। একস্থানে যদি কিছুদিন একটু বিশ্রামে থাকেন তবেই শরীরটা ভাল হইয়া যায়। তবে মা যদি নিজ খেয়ালে ঘোরাফেরা করেন তাহার উপর আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

২৮শে ফাল্গুন, বুধবার।

আজ প্রাতে মা দিল্লী ফিরিয়া আসিয়াছেন। শুনিলাম ইতিমধ্যে বরোদা হইয়া আমেদাবাদে গিয়াও ২।৩ দিন থাকিয়া আসিয়াছেন। ওঙ্কারেশ্বরেও আবার গিয়াছিলেন।

১লা চৈত্র, শনিবার।

বরোদা আমেদাবাদ

তিনদিন মা দিল্লীতে ডাঃ সেনের বাসায় থাকিয়া আজ রাত্রির গাড়ীতে দেরাদুন রওনা হইয়া গেলেন।

দেরাতুন প্রত্যাবর্ত্তন

ওঙ্কারেশ্বর হইয়া সেখানে মাত্র একদিন থাকিয়াই পুনরায় ডোঙ্গা যাইবার কথা শুনিলাম। রায়পুরেও হয়ত যাইতে পারেন।

২৩শে চৈত্র, রবিবার।

রায়পুর মন্দিরে নামযজ্ঞ

গতকাল আমি মার নিকট রায়পুরে আসিয়াছি। আজ এখানকার নূতন মন্দিরে নামযজ্ঞ হইতেছে। সেইজন্য দিল্লী, মীরাট, রুড়কি হইতে অনেক ভক্তেরা আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। বেশ সুন্দর প্রাণমাতান কীর্ত্তন চলিতেছে। মাও মাঝে-মাঝে সকলের মধ্যে গিয়া কীর্ত্তনে আরও আনন্দ দিতেছেন। ৪।৫ জনেরত একটু ভাবের মতই দেখা গেল। এক একজনের শরীরে এক একরকম ভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে। যাঁহারা কীর্ত্তনে এইভাবে যোগ দিতে বিশেষ পছন্দ করেন না তাঁহারাও নামের ধ্বনিতে আবিষ্টের মত একপাশে চোখ বুজিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। নামরসে অল্পক্ষণের জন্য হইলেও স্ত্রীপুরুষ শিশু প্রভৃতি সকলেই যেন বিভোর।

কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ, আরতি, যজ্ঞ, পূজাপাঠ, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি সবই সুন্দরভাবে হইতেছে। রায়পুরের মত একটি গ্রামের ভিতর যে এইরূপ উৎসবের আয়োজন কিভাবে হইল তাহা দেখিয়া সত্যই আশ্চর্য্য হইতে হয়। ভক্তেরা আনন্দে গদগদ হইয়া তাই অনবরত মায়ের নামে জয়ধ্বনি দিতেছে—

"জয় শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাইজী কী জয়।
জয় জঙ্গলমে মঙ্গল করনেওয়ালী মাইজী কী জয়।"

একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলে সত্যই বুঝিতে পারা যায় যে মা

জঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলই করিয়াছেন। ঢাকা হইতে প্রথম বাহির হইয়া মা যখন এখানে আসেন তখন এখানে বিশেষ কিছুই ছিল না। এই ভাবে মার আশীর্ব্বাদে যে কত পুরাতন স্থান পুনরায় নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিতেছে তাহা সত্যই অদ্ভুত।

ভক্তেরা মাকে গতকাল সন্ধ্যার পর এই প্রশ্নই করিতেছিলেন যে মা ঢাকা হইতে ঐ ভাবে বাহির হইয়া প্রথমেই একেবারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাহার পরও প্রায়ই ঘুরিয়া ফিরিয়া রায়পুরে কিংবা ডোঙ্গায় আসেন সেজন্য এই দুই স্থানের বিশেষ কোনও মহত্ত্ব আছে কিনা।

রায়পুর ও ডোঙ্গার বিশেষত্ব

মা উত্তর দিয়াছেন—"সেদিক দিয়ে বিচার করলেত বলতে পার যে তুমি যে ট্রেনের মধ্যে বসেছ, ঐ স্থানে কেন বসেছ। এবার গোপীবাবা যখন সঙ্গে ছিল তখন এই কথাই উঠেছিল। আমি বলেছিলাম—বাবা যেবার রমনার নূতন আশ্রম হওয়ার সময় তোমার সঙ্গে হরিদ্বারে দেখা হয় তখন তুমি সহস্রধারা দেখতে পাঠিয়ে দিলে। সেই রাস্তায় একটি পুরান শিবমন্দির দেখে আসা হয়েছিল। তারপর যেবার এখানে আসা হল সেবার ঢাকা থেকে বের হবার সময়ই একটা শিবমন্দিরের ছবি খেয়ালে আসল। এখানে এসেও দেখি ঠিক সেই শিবমন্দির। তাই বিশেষ কিছু একটাত থাকতেই পারে। এই স্থানটি কি ডোঙ্গা দুইটিই সাধুদের স্থান ছিল। কতবার এইরকম স্থান সব জাগ্রত হয়ে ওঠে আবার কতবার লুপ্ত হয়ে যায়। এই খেলাই চলছে।"

কীর্ত্তন উৎসব সমাপ্তির পর আজ রাত্রের গাড়ীতেই দূরের ভক্তেরা বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন। এইটুকু সময়ের জন্যও মার সঙ্গ করিতে মার সম্মুখে কীর্ত্তনে যোগ দিতে সকলে কত আগ্রহ করিয়া কত দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

যাইবার সময় মা সকলকে বলিলেন—"তোমাদের সকলের এই শরীরটার উপর কত স্নেহ। আসাযাওয়ায় দুইরাত্রি সমানে জেগে টাকা পয়সা খরচ করে এইটুকু সময়ের জন্যও নাম শুনাতে এসেছ।"

সকলে হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন—"মা, আমাদের কিই বা শক্তি। তোমার টানেই সব এসেছি। আমরাত দিব্যি সংসার নিয়ে গল্পগুজব করে দিন কাটাচ্ছিলাম। তুমিই নিজে কৃপা করে এসে আমাদের মধ্যে এই শক্তিটুকু দিয়েছ। তাইত আমরা ছুটে আসতে পেরেছি।"

সকলেরই কি সুন্দর ভাব।

২৫শে চৈত্র, মঙ্গলবার।

দিল্লীর ভক্ত অমলদাদা ও ডাক্তার সেন এখানেই ছিলেন। আগামী কাল তাঁহারা দিল্লী ফিরিয়া যাইবেন। তাই আজ তাঁহাদের সঙ্গে মার একান্তে অনেকক্ষণ কথা হইল।

মা যে যেমন অধিকারী তাহার সঙ্গে সেইভাবেই কথা বলেন। এমন সুন্দর ভাবে সরল ভাবে তাহাদের সঙ্গে কথা বলেন যে তাহা সকলের পক্ষেই বোধগম্য হয় এবং সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভও করে। ইহাই মায়ের বিশিষ্টতা। সকল কথার ভিতরেও অবশ্য মায়ের মূল কথা একটিই— **"তাঁকে লক্ষ্য করে চল। সময় চলে যাচ্ছে। ভাল লাগুক না লাগুক, চেষ্টা করে যাও।"**

২৬শে চৈত্র, বুধবার।

গত রবিবারের নাম কীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ব্রহ্মচারী মহাশয় আজ মার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। কীর্ত্তনের মধ্যে ভক্তদের সঙ্গে মাকে ঘুরিতে দেখিয়া এবং মধ্যে মধ্যে হাতখানি উঠাইয়া নামের তালে তালে দুলাইতে দেখিয়া তিনি মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"মা, উহাদের সকলকে নৃত্য করিতে দেখিয়া আপনারও কি কীর্ত্তনের আনন্দে নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইতেছিল?"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন—"ওরা মধ্যে মধ্যে শরীরটাকে ধরে নিয়ে যায়। বলে মা তুমি একটু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাক। ওরা ঘুরছে তাই এই শরীরটাও একটু ঘুরে আসল। আনন্দ নিরানন্দের কোনও কথাই নেই।"

আবার হাসিয়া বলিতেছেন—**"আর বাবা, তাও বলি, এই যেমন আবার তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি হাসছি হয়ত শুয়ে থাকি তাও যেমন, আবার কখনও কখনও যে দেখতে পাও এই শরীরটাও কীর্ত্তনের মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে, কত কি শরীরের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, তাও কিন্তু ঠিক ঐ একই অবস্থা। সবটাই একই ভাবে থেকে দেখা হচ্ছে। এমনও হত, আমি হয়ত ভোলানাথকে ভাত দিচ্ছি এমন সময় কীর্ত্তনের শব্দ কানে আসা মাত্র ভাতের থালা হাত থেকে পড়ে গেল, শরীর অবশ হয়ে পড়ল। ঐ সবও ঐ একই অবস্থা।"**

মার সর্ব্বদাই একই অবস্থা

ব্রহ্মচারী মহাশয়, আর কিছু বলিলেন না। নীরবে মার মুখের এই সব কথা শুনিয়া গেলেন।

১৩৪৮ সন

৬ই বৈশাখ, শনিবার।

আজ দুপুরে হঠাৎ জ্যোতিষদাদার কথা উঠিল। জ্যোতিষদাদা দেহরক্ষা করিয়াছিলেন ১৯৩৭ সনের ভাদ্রমাসে। তাহার ৩।৪ মাসের মধ্যেই কর্ণালীতে অবস্থান কালে মা স্বপ্নে কিছু দেখিয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধেই আজ বলিলেন—"দেখেছিলাম জ্যোতিষের একটা দেহ—বস্ত্রাদি শূন্য। শরীরটা কি রকম জানিস্? যেন ধোঁয়ার মতই ধর্ না। বেশ উজ্জ্বল শুভ্র জ্যোতিতে গড়া একরকম মূর্ত্তি। ধোঁয়া এক জায়গায় জমলে যেমন মূর্ত্ত আকারে প্রকাশ, ঐরকমটা। বেশ স্পষ্ট। সাধারণত কেহ যদি ধরতে যায়, স্পর্শ বোধ হবে না। কিন্তু স্পষ্ট তোদের স্পর্শের মতই মনে কর্ না এই ভাবে ঐ মূর্ত্তিটি এর মধ্যেই (নিজ শরীর দেখাইয়া) ব্যাস্। স্বরূপে আর কি? আবার শোন মিলাবার সময় বলা হল খেয়াল হলে সাময়িক আলাদা মূর্ত্ত আকারে প্রকাশ করাও যেতে পারে। সেই অবস্থাতেই জ্যোতিষও মাথা নেড়ে স্বীকার প্রকাশ করল।"

ভাইজীর সম্বন্ধে স্বপ্নে দর্শন

আবার বলিতেছেন—"এই শরীরের বাবার বিষয়েও কি সুন্দর দেখা হয়েছিল। ঐবার মাঘ মাসে শরীরটা তখন দেরাদুনের দিকেই ছিল। প্রথম যখন দেখা গেল মাথায় সাদা পাগড়ী বাঁধা, পরনে বস্ত্রাদি নেই। বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি যেন। কিন্তু চেহারা যেমনটা ছিল তেমনটাই—স্পষ্ট। প্রথমে এই শরীর থেকে কিছু দূরে ছিল। কিন্তু তামাসা শোন,

দাদামহাশয়ের দেহ মাতৃ অঙ্গে বিলীন

যেই এই শরীরের ডান দিক দিয়ে কাছে আসল তখনই ঐ চেহারার পরিবর্ত্তন হল। কেমন যেন একরকম হয়ে গেল। অর্থাৎ শুভ্র ঘন জ্যোতিতে গড়া উজ্জ্বল মূর্ত্তি। তারপর ঐ মূর্ত্তিও এই শরীরের সঙ্গে সর্ব্ব অঙ্গে মিলে গেল। ইহাও কিন্তু ঐ স্বরূপেই। পিতা বলে যে জাগতিক প্রকাশ, তাও কিন্তু খেয়ালে আছে।"

মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। আবার বলিলেন—"এমন নয় যে এই সব যখন দেখা যাচ্ছিল তখন একটা বিশেষ ভাবে ছিলাম।"

আমি অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম কাহাকে লইয়া কাহার সঙ্গে খেলা করিতেছি। খণ্ড ও অখণ্ড ভাব দুই-ই একই সঙ্গে খেলা করিতেছে। আমাদের মত সাধারণ শক্তি সম্পন্ন মানুষের ক্ষমতা কি যে মার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারি।

মা আবার হাসিয়া বলিলেন—"তুই যে একেবারে অবাক হয়ে গেলি! এই সব কথার মধ্যে এমন কি আছে আর? কত রকম কত কি হয়।

স্বরূপে যাওয়া কি?

অনেক সময় কথা উঠাস্ তাই বলা হয়ে যায়। স্বরূপে যাওয়া অর্থ কি? যা—তাই। অংশই বল, কণাই বল। সর্ব্বময় সর্ব্বভাবে সর্ব্বরূপে প্রভু-দাস বল, রূপ-অরূপ বল, আত্মস্থ বল, যাই বল, ঐ-ই যে স্বয়ং প্রকাশ। ওখানে ভাষা বাণী চলে না। এই শরীর—ওই শরীর—যে কথা, এটা কেবল মূর্ত্ত নিবদ্ধেরই কথা না কিন্তু। নিবদ্ধ অাবদ্ধর যেখানে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না সেখানকার কথা। স্বরূপ-অরূপ এ কি কোনও ভাষায় বললে বলা হয়? ব্যাস—ঐ-ই।"

একটু পরে আবার কাশীর ৺নির্ম্মল বাবুর বিষয়ে মা বলিতেছেন —"আবার দেখ্, তোদের বলেছিলাম না যে নির্ম্মলবাবুকে দেখা

৺নির্ম্মলবাবুকে সূক্ষ্মে দর্শন

গিয়েছিল। আকাশে রথের মত একটা গাড়ীতে বসে আছে। কিরকম একটা আলোতে সমস্ত দিক উজ্জ্বল হয়ে আছে। যে লোকে যাচ্ছে সেই লোকেরই জ্যোতি। জাগতিক লোকে তোরা যেমন মাটির উপর দিয়ে দেখা করতে আসিস্, এও তেমনই দেখা করতে আসা। তার গতিটা ঊর্দ্ধলোকে আর কি।"

আবার বলিতেছেন—"অনন্তের কথায়ও যার যার আলাদা আলাদা রকমারী আছে কিন্তু। অংশ কণা এই সব তোরা কি

অনন্তে এক একেতে অনন্ত

বলিস্ না। সেও যে পূর্ণাঙ্গীন। কি চমৎকার। এই সব তত্ত্বের ব্যাপার তোদের এই দৃষ্টিতে বোঝা যে কঠিন। তাই ঐ চশমা চাই। জগতের মধ্যে তোরা তোদের এই দৃষ্টি দিয়ে কত কি দেখছিস্। আবার এই দৃষ্টি দিয়েই দূরবীণের সাহায্যে আরও কত কি দেখতে পাওয়া যায়। তাই অনন্ত আর ঐ এক। অনন্ততে এক, একেতে অনন্ত। পূর্ণ বললে তোদের এই দৃষ্টিতে যা ধরে নিস্, তাও শেষ কথা না কিন্তু।"

৭ই বৈশাখ, শনিবার।

প্রফুল্ল ব্রহ্মচারীর জিজ্ঞাসায় আজও মার মুখ হইতে কিছু কিছু কথা প্রকাশ হইল।

মা বলিতেছিলেন—"যখন পূজা ইত্যাদি হত তখন যে দেবতার বা যে দেবীর পূজা হচ্ছে একেবারে ঠিক ঠিক সেই দেবদেবীর

মায়ের শরীর হইতেই পূজার সবকিছু প্রকাশ

ভাব আসন মুদ্রা শক্তি ইত্যাদি সবকিছুই এই শরীরটায় সেইভাবে হয়ে যেত। পূজার ফুল দুর্ব্বা ইত্যাদি সবই কিন্তু হয়ে যেত। কল্পনা করে নেওয়া, তা না কিন্তু। তোমরা যেমন

প্রত্যক্ষ ঠিক সেই রকমই। সব কিছু একেবারে সাজান। এই শরীর থেকেই কিন্তু সব, বুঝলে না? দেব-দেবীকেও এই শরীর থেকেই বের করে নিয়ে বসিয়ে পূজা হল। আবার পূজা শেষ হলে এই শরীরটার ভিতরেই সব—যেখানে সেখানেই। আবার যেখানকার সেখানে থেকেও কিন্তু এইসব হতে পারে। এটা নিশ্চয় জেনো।"

১১ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

বিকাল বেলা মা কীর্ত্তনের ঘরে বসিয়া আছেন। কাশ্মীরী ও এতদ্দেশীয় কয়েকজন ভদ্রলোক মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

একজন বৃদ্ধ ডাক্তার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই যে মহাযুদ্ধ চলিতেছে ইহাতে কে জিতিবে এবং হিন্দুস্থানের কোনও ক্ষতি হইবে কিনা।

মা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"বাঃ, যুদ্ধ কোথায়?

"যুদ্ধও যে তিনিই"

দুইপক্ষ কোথায়? কে জিতবে? তাঁর জয় যে সর্ব্বত্র। যুদ্ধ কোথায়? তিনিই-যে। দুই হাতে তালি দেয় না সেইভাবে তালি দিচ্ছেন। তাঁর খেলা তাঁর লীলা এইসব। তোমরা বাবা চিন্তা কর কেন? বসে বসে শুধু তাঁর লীলা দেখে যাও। আর যা হবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করো।"

কলিকাতার শিশির ব্রহ্মচারী মার নিকটেই বসিয়া আছেন। তিনি বাক্‌সংযম করিয়া আছেন। তাই কোনও প্রয়োজনে কি জানি লিখিতেছিলেন ইহা দেখিয়া আগন্তুকদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন—

"আচ্ছা, ইহার তবে উপকারিতা কি? কথা বলেন না কিন্তু লিখছেন ইসারা করছেন। মন কিভাবে শান্ত হবে?"

মা বলিয়া উঠিলেন—"ইহাতেও উপকার হয়। শুধু বাক্‌সংযম করে থাকলেও ধীরে ধীরে শান্তভাবের অনুকূল হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজন না হলে ইসারা করা বা লেখাও ঠিক না। আর দেখ এই ভাবের সংযম করলেও মিথ্যা কথা, কটু কথা, বাজে কথা ইত্যাদি বন্ধ থাকে। বেশী কথা বললেই শক্তি ক্ষয় হয়। তাই শুধু বাক্‌সংযমেও ভিতরে একটা শক্তি হয়। কিন্তু অন্তরে সর্ব্বদা যথাশক্তি ধ্যান জপের চেষ্টা রাখা দরকার।"

বাক্‌সংযমের উপকারিতা

একটি কাশ্মীরী ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, এইসব মিথ্যা কথা ইত্যাদি কে বলায়? তিনিইত আমাদের বলান।"

মা অমনি উত্তর দিলেন—"এই যে বাক্‌সংযম ইহাওত তিনিই করাচ্ছেন।"

মা এককথায় প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন দেখিয়া উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

আজ একজনের চিঠির উত্তরে মা বলিলেন—"দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে সত্যের অনুসন্ধান করা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সত্য, ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য এবং সংযমাদির সহায়তায় শ্রীগুরু দত্ত বিষয়ের আশ্রয়ে থাকাই কেবল করণীয়।"

সত্যের অনুসন্ধানই কর্ত্তব্য

এইরূপ কত মূল্যবান কথা অনেক সময়েই মার মুখ হইতে বাহির হইতেছে। কিন্তু সব সময়ে আমরা তাহা লক্ষ্য করি কই? অনেক সময় অনেকেই মায়ের নিকট বাণী চাহিয়া থাকেন। মা-ত নিজে চিঠি পত্র পড়েন

২

না। তাই চিঠি মাকে পড়িয়া শুনান হইলে মা কখনও কখনও ২।১টি কথা উত্তরে বলেন। তাহাই লিখিয়া দেওয়া হয়।

১৩ই বৈশাখ, শনিবার।

জনৈক বৈষ্ণবকে সূক্ষ্মে দর্শন

ইতিমধ্যে একদিন রায়পুরে উপরের নূতন ঘরটিতে রাত্রিতে মা শুইয়া আছেন। পরমানন্দ স্বামী, পিসিমা, অভয় এবং আমিও সেই ঘরে শুইয়াছি। রাত্রি প্রায় ১২টা। মা বলিতেছেন—"একজন এসেছে দেখছি। বৈষ্ণব, স্বরূপ মুছে গেছে। গলায় একটি ঘটি বেঁধে নিয়েছে। ঘটিটা বেশ পরিষ্কার। মাথায় পাগরী বাঁধা।"

একটু পরেই আবার বলিলেন—"ওমা, গনেশজী হয়ে গেল।"

আমরা কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অভয় মাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ বৈষ্ণব মূর্ত্তিই কি গনেশজী হয়ে গেল ?"

মা—"হ্যাঁ। তোরা সব প্রণাম কর্।"

মার নির্দ্দেশ মত প্রণাম করিয়া আবার প্রশ্ন করিলাম—"মা, গনেশজী কি করছেন ? এখনও কি এখানেই আছেন ?"

মা—(হাত দিয়া দেখাইয়া) "আমার চৌকীর কোণ বরাবর দরজার ঐ দিকে (হাত জোড় করিয়া দেখাইয়া) এই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।"

পরমানন্দ ও অভয় বলিল—"মাকে প্রণাম করে না কেন ?"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন—"ওমা শোন কথা ! কিন্তু চৌকীর উপর মাথা রেখে প্রণামের মতই করছে। এখনও যায়নি।"

খানিক পরে নিজেই বলিলেন—"এখন নাই।"

আজ সকালে ভোগে বসিয়াও মা নানা কথা বলিতেছিলেন। হঠাৎ

বলিলেন—"কাল সুরবালাকে (মার কনিষ্ঠা ভগ্নী) দেখলাম। আরও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কাল দেখলাম একটা তীব্র ত্যাগের ভাব। সব বন্ধন কেটে যেন বের হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই শরীরটা যেন বাধা দিল। কি রকম জানিস্ না। যেমন জলটা গড়িয়ে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে জলটা ঐদিকে গেলে অসুবিধা হইবে। তাই গিয়ে সেই জলধারা সেই দিকে চলতে না দিয়ে বাধা দেওয়া হল। সুরবালা কিন্তু বাধা মানছে না। কিন্তু এই শরীরটা দেখছে যে ঐভাবে বের হয়ে গেলে বাধা পাবে। তার উপকার হবে না। তাই বাধা দিয়ে রাখা হল। তার পরেই পরিবর্ত্তন অন্যরূপ হয়ে গেল। মানে আরও ঊর্দ্ধলোকে চলে গেল।"

সুরবালাকে সূক্ষ্মে দর্শন

আবার বলিতেছেন—(দিদিমাকে লক্ষ্য করিয়া) "তিনটি ছেলেত মারা গেল। এই শরীরের খেলার সাথীও আর কেউ রইল না। ইনিও কান্নাকাটি করেন। তার পর এই শরীর হতেই সৃষ্টি। সুরবালার বিয়ের পরই এই শরীরের ভাবটা এইরকম হল যে—এখন আর না—যাও। তার পরেই অসুখে পড়ল। রোগের শেষ অবস্থায় খেয়াল হল—এখন মুক্ত হও। তার পরেই মৃত্যু। মুক্তি অর্থাৎ সেই মুক্তি না। যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থা হতে মুক্তি। তারপর যে লোক থেকে এসেছিল সেখানেই গেল। মাঝে মাঝে তাহাকে দেখা যায়। খুব সুন্দর টকটকে রংটা ছিল। কাল দেখলাম যেখানে ছিল তার থেকেও পরিবর্ত্তন হয়ে গেল।"

দুপুরে মা শুইয়া আছেন। ঘরে দিদিমা ও আমি। মা বলিতেছেন—"দেখ, তামাসা। (দিদিমাকে দেখাইয়া) ইহার নিকট হতে মৃত্যু হয়ে গিয়েছে তাই ইনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু এই শরীরটা দেখছে।

আবার দেখ কার সঙ্গে যে কি সূত্রে যোগ আছে তাত কেউ জানতে পারে না। সুরবালা যে লোকে প্রথম ছিল সেইখানে সুরবালার কাছে দেরাদুনের ডাক্তার সোমের মাকেও একটু সময়ের জন্য দেখা গেল। যোগাযোগ আছে আর কি।"

১৪ই বৈশাখ, রবিবার।

দুপুর বেলা আজকেও মা বলিতেছেন—"দেখ, সেদিন দেখছিলাম একটি রথজাতীয় জিনিষে আমি, তুই আর উমেশানন্দের পূর্বাশ্রমের বোন যাচ্ছি। অভয় যেমন পাগলামি করে সেইরকম করছে। যেই আমরা রওনা হয়েছি অমনি গিয়ে পিছনে উঠে বসল। একটা স্থানে যাওয়া হল। সকলের মনে হল—মা-ত গৃহস্থ-বাড়ীতে যান না, তবে এখানে কি করে আসা হল? কথাটা কি জানিস্। গৃহস্থও অনেক রকমের আছেত। যেখানে যাওয়া হল বাইরে তাদের গৃহস্থ দেখলেও ভিন্ন রকমের। এটাত সকলে বোঝে না। তারপর যা বলা হচ্ছিল। তুই সেখানে গিয়ে কি কাজ করতে গেলি। উমেশানন্দের বোন সেই বাড়ী থেকে দুধ এনে আমাকে দিল। অভয়কেও খাওয়াতে গেল।"

অমলদাদার ভগ্নীর মৃত্যুসময়ে সূক্ষ্মে গমন

একটু পরেই দিল্লীর অমলদাদার * স্ত্রীর চিঠি পড়িয়া দেখিলাম তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহার ঠাকুরঝি মৃত্যু সময়ে নাকি 'পাইয়াছি, পাইয়াছি' বলিয়া উঠেন এবং হাত জোড় করিয়া প্রণাম করেন। বোধহয় মা তখন তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন।

---

*হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার শ্রীঅমল চন্দ্র সেন।

এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন—"ঐযে তোদের নিয়ে গৃহস্থ বাড়ী যাওয়ার কথা বলেছিলাম না। ওখানেই যাওয়া হয়েছিল।"

অমলদাদার বোন * মৃত্যুশয্যায় মার দর্শনের জন্য খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক বৎসর পূর্বে মাকে সিদ্ধেশ্বরী ও শাহবাগে দর্শন করিয়াছিল। হঠাৎ এবার মার দর্শনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠে। একদিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেও নাকি বলিতেছিল—"মা এসেছিলেন। কি দিয়ে গেলেন ?"

তাহার মৃত্যু সময়ে যাইবার জন্য আত্মীয় স্বজনেরা মাকে অনুরোধ করাতে মা বলিয়াছিলেন—"এখনত শরীরের ওদিকে যাওয়ার কথা না। ওর ভিতরের ভাবটা ভাল। ও ত পাচ্ছেই।"

ইহার কিছুদিন পরে তাহার মৃত্যুসংবাদ আসিতেই আমি মাকে বলিয়াছিলাম—"মা, তোমাকে দেখবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিল। দেখা হল না।"

মা বলিয়া উঠিলেন—"কেন, দেখেছে।"

১৬ই বৈশাখ, মঙ্গলবার।

আজ বিকালে সকলকে লইয়া মা কিশনপুর চলিলেন। এবার মার জন্মোৎসব কিশনপুর আশ্রমেই হইবার কথা। উৎসব ১৯ শে পর্য্যন্ত চলিবে।

কাল রাত্রে মা তখনও চুপ করিয়া একেবারে শুইয়া পড়েন নাই। রাত্রি প্রায় এগারটা। অভয় শুধু মার ঘরে বসিয়াছিল। মা তাহাকে

* বর্দ্ধমানের ডাক্তার সত্যরঞ্জন দাসগুপ্তের স্ত্রী। আমার বাল্যবন্ধু।

দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শুইতে যাইতে বলিলেন। কিন্তু অভয় মার কথা না শুনিয়া বসিয়াই রহিল।

একটু পরেই মার শরীরে আশ্চর্য্য রকমের সব ক্রিয়াদি আরম্ভ হয়। অভয় ইহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া আনিল। কিন্তু তিনি যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আসন মুদ্রাদি বন্ধ হইয়া গেল। কেবল মন্ত্রগুলি তখনও উচ্চারিত হইতেছিল। মুখে একটা অস্বাভাবিক ভাব। চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। মন্ত্রগুলি কিন্তু ধীরে ধীরে অতি স্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হইতেছিল।

সূক্ষ্ম দেহীর প্রার্থনায় মায়ের শরীরে নানা ক্রিয়াদির প্রকাশ

ইতিমধ্যে আমিও মার ঘরে গিয়াছি। খানিক পর মা চুপ করিলেন। ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া মা আস্তে আস্তে বলিলেন—"বাবাকে দেখ আবার উঠিয়ে এনেছে। আমিত ওকেও (অভয়কে) বলেছিলাম— দরজাটা বন্ধ করে শুতে যা। ও নিজেও গেলনা। আবার বাবাকেও উঠিয়ে নিয়ে এসেছে।"

ব্রহ্মচারীজী একটু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন—"মা, খুব ভাল করেছে। আপনার এইরূপ ভাব আমি আগে কখনও দেখিনি। বইতে অনেক অবস্থার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা বহু ভাগ্যের কথা। এ সব না দেখলে বিশ্বাস ও ধারণা করা যায় না। আপনার মুখ দিয়ে আজ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বীজ বের হয়ে গেছে। আর এক বার কাশীতে কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে এইরকম দেখেছিলাম। কিন্তু সেবার আপনি মাটিতে পড়ে ছিলেন। পরে উঠে বসেছিলেন। পরে মুখ থেকে এইরকম অনেক স্তোত্রাদি বের হয়েছিল। কিন্তু এবার আরও আশ্চর্য্য

দেখা গেল যে আপনি বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বসে আছেন। এই অবস্থাতেই ক্রিয়াদি হচ্ছে।"

মা বলিলেন—"**কোনও রকম অস্বাভাবিক ভাব হয়ে যে এই-রূপটা হয় তা না। যেমন তোমাদের সঙ্গে কথা বলি, হাসি, বেড়াই, এও তেমনই।**"

ব্রহ্মচারীজী—"এইসব হইলে আপনার শরীরে কোনওরূপ ক্লান্তি হয় না?"

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"**কিছুই না। আপনা হতেই সব হয়ে যাচ্ছে। কোনও রূপ ক্লান্তি নেই। যেমন—তেমন।**"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। রাত্রি প্রায় একটায় মা শুইয়া পড়িলেন। শুনিতে পাইলাম কোনও একজন অশরীরী আত্মা আসিয়া মার নিকট কিছু চাহিয়াছিলেন। তাই এইসব হইয়া গেল। সেই সূক্ষ্ম দেহীও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এখানেই ছিলেন মার এই সব দর্শন করিবার জন্য।

৩০শে বৈশাখ, মঙ্গলবার।

রায়পুরে মার জন্মোৎসব

গত ১৯ শে হইতে মার জন্মোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আজ কৃষ্ণা চতুর্থী—উৎসবের শেষ দিন। এই কয়দিন নিয়মিত রূপে অখণ্ড নাম রক্ষা এবং পূজা যজ্ঞাদি চলিয়া আসিতেছে। বেশ আনন্দের সহিত সকলে উৎসবে আসিয়া যোগদান করিতেছে।

শেষরাত্রি তিনটায় পূজা আরম্ভ হইল। মন্মথদাদা মায়ের পূজা

করিবেন স্থির ছিল। কিন্তু মার পায়ে পূজা করিতে মা নিষেধ করিয়া দেওয়াতে ঘটের উপরই বিধিমত পূজা করা হইল।

পূজা সমাপ্ত হইলে মন্মথদাদার সঙ্গে সকলেই আসিয়া মায়ের পায়ে অঞ্জলী দিলেন এবং আরতি করা হইল।

সূক্ষ্ম জগতেও মাকে লইয়া উৎসব

আরতির পর মা বলিলেন—"দেখছিলাম নিরঞ্জনবাবু ও তার দলের আরও অনেকে এসেছে। তার কোনও এক সময়ের একজন গুরুভাইও এসেছে। সে বৈষ্ণব, নাম দীনবন্ধু। নিরঞ্জন বাবুর চেহারা ঠিক ঠিক সেরকম নেই। তারা সকলে যেন এই শরীরটাকে নিয়েই উৎসব করছে। আবার আরও একটা স্থান ঐ সময়েই দেখা হল। যেমন বড়লোক ছিল এক সময়ে, এখন গরীব হয়ে গিয়েছে। ভাল ভাল দামী কাপড় সব পুরাণ হয়েছে। সেই সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে সামিয়ানার মত করে টানাচ্ছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"সেখানেও কি তোমার উৎসব ?"

মা—"হ্যাঁ। এই শরীরটাকে নিয়েই আনন্দ। কি রকম দেখছি জানিস্? বিরাট ভাবে রান্নাবান্না সব চলছে। এই শরীরটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। একজায়গায় দেখা গেল মাংস রান্না করে ঢেকে রেখেছে। আমি স্পর্শ করিনি। কিন্তু যেন বেশ বোঝা গেল যে গরম আছে। জিজ্ঞাসা করা হল—এ কোথা থেকে আসল ? সেখানকার একজন আর একজনকে দেখিয়ে বলল—এই লোকটি এইমাত্র এসে এর মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে।"

আমাদের মধ্যে একজন মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, যে দুই জায়গার কথা বললে সেই দুই জায়গাতেই কি তুমি উপস্থিত আছ ?"

মা—"হ্যাঁ। যেভাবে এখানে আছি ঠিক সেই ভাবেই সেখানেও শরীরটা আছে। সব সময়ে সব স্থানে সব আছে কিনা। পূর্ণভাবেই আছে। এই দেখা কিন্তু শোয়া, বসা, চলাফেরার অপেক্ষা রাখে না। সব সময়েই দেখা যেতে পারে।"

আবার আমাদের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"পুরান দামী কাপড় দিয়ে সামিয়ানা কি বুঝলিনা? সেই সময়ের কামনা বাসনা ছিন্ন। গরীব মানে? জাগতিক ঐভাবের শিথিলতা।"

কথায় কথায় ডোঙ্গার কথা উঠিল। একজন মাকে বলিল—"মা, আমরাত শুনিনি। কি হয়েছিল বলনা আমাদের।"

মা বলিলেন—"ওখানে একটা খুব বড় অশ্বত্থ গাছ আছে। তার নীচে পুরাতন শিবলিঙ্গ ভাঙ্গা অবস্থায় রাখা আছে। একদিন দুইজন মহাপুরুষ সেখানে এসে বসেছিলেন। আবার পাহাড়ের উপর যেখানে তাঁবু ফেলেছিল সেখানে দেখা হল। সের সিংয়ের যে ভাইপো মারা গিয়েছে তাকে এবং আর একজন বৃদ্ধা—উলঙ্গ—এই দুইজনকে দেখা গেল। তোমরা যেমন আস, এই রকমই আরও অনেকেই আসে।"

ডোঙ্গার কথা

যে বৃদ্ধার কথা মা বলিলেন পরে তাহার সম্বন্ধে জানা গেল যে শের সিংজীরা বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের মধ্যে ঐরকম একজন বৃদ্ধা ছিলেন।

আজ মার শুভ জন্মতিথির দিন ছোট ছোট কয়েকটি ছেলেকে লইয়া কিশনপুর আশ্রমেই বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। আশ্রমে থাকিয়া তাহারা ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিয়া চলিবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক শিক্ষাও দেওয়ার

বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা

ব্যবস্থা করা হইবে, ভাইজীর এইরূপ একটি সৎ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনকালে এই ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে নাই। আজ ভাইজীর একনিষ্ঠ ভক্ত সোলনের রাজাসাহেব দুর্গাসিংহজী এবং শচীদাদার চেষ্টায় ও সহায়তায় সেই শুভ সঙ্কল্প পূর্ণ হইল।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

মীরাট হইতে মাকে যাইবার জন্য সেখানকার স্থানীয় ভক্তেরা খুবই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধপত্র আসিতেছে।

আজ তাই মা বিকালে বাসে করিয়া মীরাট রওনা হইলেন।

ভক্তদের প্রার্থনায় মীরাট গমন

সঙ্গে প্রায় ২৫।২৬ জন ভক্ত। প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টায় আমরা মীরাট পৌঁছিলাম। বহুলোক রাস্তায় আলো ফুলমালা ইত্যাদি লইয়া মার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া ছিল। মাকে দেখিবামাত্র সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি দিল। স্ত্রীলোকদের উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইল।

মাকে দুর্গা বাড়ীর মেয়েদের স্কুলে লইয়া যাওয়া হইল। অনেকক্ষণ কীর্ত্তনাদি চলিল। বহুলোক ক্রমাগত মার দর্শনের জন্য আসিতেছেন।

মার বিশ্রাম করিতে করিতে মধ্যরাত্রি হইয়া গেল।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

মা মীরাটেই আছেন। দিল্লী হইতে অনেকেই আসিয়াছেন। আগামীকাল উদয়াস্ত নাম কীর্ত্তনের আয়োজন হইতেছে।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

আজ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা আসিয়া মাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নাম আরম্ভ করিলেন। 'হরে কৃষ্ণ' নাম চলিল।

ভোর বেলা হইতে সানাইও বাজিতেছে। মীরাটবাসীদের আর আনন্দের সীমা নাই। এতদিন পর তাঁহারা মাকে আনিতে পারিয়াছেন। মা মাঝে মাঝে গিয়া ভক্তদের সঙ্গে কীর্ত্তনের মধ্যে ঘুরিতেছেন। আর হাতখানি উঠাইয়া তালে তালে দুলাইয়া ভক্তদের উৎসাহ শতগুণ বাড়াইয়া দিতেছেন।

সূর্য্যাস্তের পর নাম সমাপ্ত করিয়া সকলে আসিয়া মার চরণে লুটাইয়া পড়িল। মায়ের তখনই দেরাদুন ফিরিবার কথা।

দেরাদুনে প্রত্যাবর্ত্তন

দিল্লীর ভক্তেরা মাকে একবার দিল্লী যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মা এখনই কিছু কথা দিলেন না। শুধু বলিলেন—"এখানেই ত তোমাদের সঙ্গে দেখা হল। আজ এখানেই দিল্লী।"

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর মীরাট হইতে রওনা হইয়া প্রায় মধ্যরাত্রিতে আমরা আসিয়া কিশনপুর পৌঁছিলাম।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

মা কয়েকদিন হয় পুনরায় রায়পুরে চলিয়া আসিয়াছেন। আজ ভোলানাথের অসুস্থ অবস্থার কথা উঠিল। মা বলিতেছেন—"দেখ, সেবাটি কিরকম ঠিক ঠিক ভাবে হয়ে যেত। ডাক্তাররা বা যারা সর্ব্বদা

ভোলানাথের রোগাবস্থায়

মায়ের শরীর দ্বারা নিখুঁত সেবা

সেবাদি করে তারাও সে রকম পারে না। পরে জিজ্ঞাসা করা হলে বলত— ঠিকই করেছেন। রোগী বাঁচুক কি মারা যাক সেদিকে লক্ষ্য না রেখে যথাশক্তি সেবা করে যাওয়াই কর্ত্তব্য। যাতে রোগী একটু আরাম পাবে সযত্নে তাই করা দরকার।”

আবার বলিতেছেন—“আর কি তামাসা দেখ। এই শরীরটা দিয়ে কি রকম সব ঠিকঠাক হয়ে যেত। ঐরূপ কেন হত জান? সেই রোগীও যে আমিই, যন্ত্রণাও যে আমিই, সেবাও করছি আমিই। তাই যখন যেখানে যেটা দরকার ঠিক ঠিক হয়ে যেত। তোমরা চেষ্টা কর অন্ততঃ। যতটুকু সাধ্য সেবা করে যাও। নিজের মত করে প্রাণ দিয়ে সেবা করো। তাহলে সময়ে সব সেবাই প্রাণময় হবে।”

গতকাল দুপুরেও মা ভোলানাথের সম্বন্ধে কি কথা প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন

ভোলানাথের বিশিষ্টতা

—“তার ভিতরে ভাবের যে একটা বিশেষত্ব ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাধারণ যেমন ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের কথা সকলের বিষয়ে শোনা যায়, ভোলানাথের কিন্তু সে ভাব ছিল না বললেই হয়। কিছুই প্রকাশ ছিল না এমন না, তবে অসাধারণ ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। লোকে মনে করতে পারে তাঁর ক্রোধ ইত্যাদি অন্য রিপুর প্রকাশত দেখা গিয়েছে। তবে ও ভাবটিরই বা কম কেন হইবে? কিন্তু সে বিষয়ে কথা এই যে যেমন শিশুর মধ্যে ঐ ভাবটা অস্ফুট ভাবে থাকে, কিন্তু রাগ দ্বেষ লোভ সবটাই প্রকাশ পাচ্ছে, কতকটা সেই রকমের। স্বভাবের এইসব

দিকটা সাধারণ লোকে বুঝবে না। তারা বাইরের বিষয়টাই দেখে। ভিতরে যে আরও কতরকম থাকে তাত বোঝে না। মৃত্যুর আগে আবার এই শরীরটার উপর—পূর্ব্বে কিছুদিন যেমন ছিল—সেই রকম মাতৃভাব পূর্ণভাবে জেগেছিল। আগে যে অনেক সময় এই শরীরটা পাশে শুয়ে থাকত, কিন্তু ভোলানাথের ভাবটা এমন থাকত, যেমন মরণীতে নিয়ে শু'ত, সেই রকম শিশু নিয়ে যেন শুয়েছে। কিন্তু এই চরিত্র কে বুঝবে?"

ইতিমধ্যে একদিন অমূল্যদাদার* নিকটেও বলিতেছিলেন—"এইসব কথা শুনলে লোকে মনে করবে স্বামীর প্রশংসা করছে! কিন্তু কি ভাবে যে কি কথা হচ্ছে তা'ত সাধারণ সকলের পক্ষে বোঝা কঠিন।"

ভোলানাথের সম্বন্ধে আমি আবার কয়েকটি কথা উঠাইলে মা বলিলেন—"দেখ, এই শরীরেরত গতিই এই। যখন যে দিকটা বলবে তখন সেই দৃষ্টিতেই সেই দিকটা বলে যাচ্ছে। তোদের মত সামঞ্জস্য দিয়েত সব সময়ে কথা বলা হয়না। সেই যে ঘটনার কথা বলছিস্। তাও খেয়াল করে দেখিস্ যে পাঁচ বছর শাহবাগে ছিলাম তারপর সিদ্ধেশ্বরীতে। এত বৎসরের মধ্যে কয়দিন আর ভোলানাথের ঐরূপ ঘটনা হয়েছিল। এটাও লক্ষ্য করবার বিষয়। কতজনের এই ভাবের কত কথা কানে আসে। আর সকলের ভাবগুলিইত চোখের সামনে ভাসে। সেই হিসাবে ভোলানাথের কিছুইত দেখিনি বললে হয়। আর দেখ, মুনি-

---

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত।

ঋষিদেরও সাময়িক ভাবে ক্বচিৎ কখনও এইসব ভাবের প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তবুত তাঁরা কত শক্তিশালী ছিলেন। আমি যদিও বলছিনা যে ভোলানাথ মুনি ঋষি ছিল। তবে একটা উপমার কথা বলা হল আর কি ?"

আজ মার মুখ হইতে এই সব কথা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ পাইল। সাধারণতঃ এই জাতীয় আলোচনা মাকে করিতে দেখা যায়না। আজ আমি কয়েকটি কথা তোলাতে এত কথা হইয়া গেল। তবু মা বারবারই বলিলেন—"এ সব কথা সকলে বুঝবে না।" সত্য সত্যই আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ভুল বুঝাই সহজ।

আজকাল আমরা অনেকেই অনুভব করিতেছি যে মার চুপ থাকার ভাবটাই যেন বেশী। দুপুরবেলা বা রাত্রিতে প্রায় একা ঘরেই থাকেন। মাও নিজে বলিতেছিলেন—"দিন দিন শরীরটা যেন একটু বেশী সময় ঘরে বন্ধ থাকতেই চাচ্ছে।"

আমাদের মধ্যে অনেকেই অনেক সময় মনে করিয়া থাকে যে মা বুঝি কাহাকেও বেশী ভালবাসিতেছে—কাহাকেও কম। মার মধ্যেও বোধহয় তবে এইরকমের খেলা চলে। আজ এইরূপ কি কথা প্রসঙ্গে প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারীজী বলিতেছিলেন—"মা যে সকলকেই একদৃষ্টিতে দেখেন ইহা সকলে সর্ব্বদা ধরতে পারে না। আমিও অনেকরকম খোঁচা দি দেখলাম। কিন্তু কোনও রকমেই কিছু পরিবর্ত্তন আনতে পারিনি।"

মাও মধ্যে মধ্যেই এই সম্পর্কে বলেন—"দেখ এই যে তোমরা এই শরীরটার জন্য বসে থাক, কিন্তু এক এক সময় এমন হয় যে এইসব কোনও দিকেই যেন একটুও খেয়াল আসছেনা। আবার

কখনও কখনও তোমাদের সঙ্গে ব্যবহারটা হয়ে যাচ্ছে। তোমরা নিজের নিজের ভাব অনুযায়ী এক একটা কথা ধরে নিচ্ছ।"

শিশির ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করিলেন—"যিনি আত্মজ্ঞ তিনি এই জাগতিক ব্যাপারটা কি ভাবে করিয়া যাইতেছেন ?"

মা—"কি ভাবে, সেটা তোমায় কি করে বুঝাব ? তবে এই মাত্র বলা যায় স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যাচ্ছে। কোনও গোলমাল নেই অর্থাৎ দ্বন্দ্বের কোনও বংশই নেই।"

২০শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

ভোরবেলা মা তখনও বিছানায় শুইয়া আছেন। চোখ বন্ধ অবস্থাতেই আস্তে আস্তে বলিলেন—"একজন এসে বলে গেল, শিশিরের জ্বর হয়েছে।"

সূক্ষ্মে শিশিরদার অসুস্থতা দর্শন

মার কথার ভাবে বুঝিলাম যে সূক্ষ্ম শরীরী কেহ এইরূপ বলিয়া গেলেন। নীচে আসিয়া দেখি সত্য সত্যই শিশির দাদা শুইয়া আছেন। পেট খারাপ ও জ্বর হইয়াছে।

বিকালের দিকে জ্বর আরও বাড়িয়া গেল। মা অনেককেই সেবার কথা বলিয়া দিলেন।

রাত্রে আবার মা বলিতেছেন—"জ্বর যে একটু আধটু হয়েছে তা কিন্তু না। বেশ একটু ভালমতই। আরও একটু কথা আছে। এখন বের হচ্ছে না।"

একটু পরেই নিজে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"যখন কোন কথা বের হবার তখন কেউ শুনুক আর নাই শুনুক, বুরবুর করে বের হয়ে

আসছে। আবার যখন বের না হওয়ার তখন শত বললেও হবে না।"

২১শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

আগ্রার নিকট আওয়াগড়ের রাজার ভাই এবং অন্য এক রাজ-পরিবারেরও কেহ কেহ মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। মা নীচে কীর্ত্তনের হলে বসিয়াছেন। নানা কথাবার্ত্তা হইতেছে।

মার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় একজন বলিলেন—"মাতাজী, আমরা যদি মধ্যে মধ্যে আসি তবে আপনার কষ্ট হইবে নাত ?"

মা বলিয়া উঠিলেন—"বাবা, এক কথা। অপর কেহ হইলে কষ্টের কথা আসে। যদি সংসারের ভাব দিয়া দেখ তবে এক মাতা-পিতারই সন্তান। একই ঘরের লোক। তবে আর কষ্টের কথা কি করিয়া উঠিবে ? এই শরীরের কাছে এক ছাড়াত তুই নাই। কে কাহাকে কষ্ট দিবে ? আবার দেখ আমি আমার হাত পা শরীর নিয়া আছি। আনন্দে হাততালি দিতেছি। ইহাতে কি কাহারও কষ্টের কথা হইতে পারে ?"

তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন—"মাতাজী, আমরা আপনার চরণে পৌঁছিয়াছি। এখন কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়া নিবেনই। না হইলে আপনারই দোষের কথা।"

মা বলিলেন – "ঠিক কথা। আপনার কাছে পৌঁছিতে পারিলেই হয়। তবে আর চিন্তা নাই। আপনাকে আপনিই কৃপা করেন।"

ভদ্রলোকটি—"আমি এত জ্ঞানের কথা বুঝিনা ! আমি অজ্ঞানী !

পূজাঅর্চ্চাও কিছুই করিনা। আমাদের মত লোককে আপনারই উদ্ধার করিতে হইবে।''

মা—"যে বোঝে যে আমি অজ্ঞানী তার নিশ্চয়ই কিছু জ্ঞান হইয়াছে বুঝিতে হইবে।"

মার পূর্ব্বের কথাও আজ কিছু কিছু মার মুখ হইতে শুনিলাম। বাজিতপুরে পাঁচমাস যখন পূজা আসন মুদ্রা যোগ ক্রিয়াদি হইয়া গিয়াছিল তাহার পরই কিছু দিন কথা বন্ধ ছিল। তাহাও, মার কথায়, সাধনার একরকম প্রকাশ বলিতে হইবে। আপনা আপনি ভিতরে সব হইয়া যাইতেছে। পাঁচমাস যে ক্রিয়াদি হইয়া গিয়াছিল তাহাও অবশ্য আপনা আপনিই হইয়াছিল। কিন্তু এই দুইটি অবস্থার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তবে মৌনের অবস্থাটাও সাধন অবস্থারই একদিকের প্রকাশ। মৌন সমাধি ইত্যাদি নিজকে নিয়াই নানা রকমের খেলা। মা ত ইহাই বলিয়া থাকেন।

বাজিতপুরে সাধনার প্রকাশের কথা

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

রাত্রিতে মা ছাতের উপর শুইয়াছেন। আমরাও চারপাশে শুইয়াছি। জ্যোৎস্না রাত্রি। সকলে তখনও ঘুমায় নাই।

মা খুব ধীরে ধীরে বলিলেন—"একটি বৃদ্ধা অন্ধ। আর একটি ছোট কালো ছেলে তার পাশে খেলা করছে। ঐ অন্ধের উপাস্য দেবতাই ঐ ছেলেটি। এত কাছে কিন্তু তবু সে দেখতে পাচ্ছেনা।"

সূক্ষ্মে অন্ধ বৃদ্ধাকে দর্শন

একজন জিজ্ঞাসা করল—"কখনও কি দেখবে না?"

মা—"বাঃ, তার ডাকেইত কাছে কাছে ঘুরছে। এই দেখাশুনা যে বলা হয়—তোমাদের সঙ্গে যেরূপ কথা বলা হয় সেই রূপই আর কি।"

আবার কেহ জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায়?" মা হাসিয়া উত্তর দিলেন—"এইখানেই শূন্যের মধ্যে কতকটা। তোরা যে সব বিছান পেতেছিস্ সে সব কিন্তু আর নাই। শুধু ঐ দুই মূর্ত্তি খাটের কাছে।"

অভয়—"এইখানেই কি?"

মা—"না, স্থানটা অন্যস্থান। হাঁ, অন্যস্থানও আবার এইস্থানও"।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

আজ মা একটু দেরী করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"শরীরটা অনেকদিনত চলাফেরা কথাবার্ত্তা বলল। এখন যেন কিরকম হয়ে যাচ্ছে। যা হওয়ার হয়ে যাচ্ছে।"

কলিকাতায় সূক্ষ্মে যতীশদার বাসায় গমন

বিকাল বেলা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—"প্রায় একটার সময় দেখা গেল যতীশদের * ওখানে গিয়েছি। ঘরে যাব না। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে যেই হেসে উঠেছি অমনি যতীশের মা এবং বাড়ীর সকলেই হেসে উঠল। শচীও একধারে দাঁড়িয়ে আছে। আজ রবিবারত। ওদের বাড়ীতে কীর্ত্তনাদি হয়।"

একটু থামিয়া বলিতেছেন—"ওদের হয়ত খেয়াল হয়েছিল এই শরীরের দিকে। আবার কখনও কখনও খেয়াল না হলেও দেখা যায়। কখনও আবার খেয়ালটা যে ওদের কোন মুহূর্ত্তে হল তা' তারা হয়ত বুঝলই না। কিন্তু যে দেখতে জানে সে সেই সময়টুকুতেই দেখতে পায়।"

* কলিকাতার পুরাতন ভক্ত অ্যাডভোকেট শ্রীযতীশচন্দ্র গুহ।

আজ দুইজন ভক্তের কথা মার নিকট হইতে শুনিলাম। একজন বলিতেছেন যে মার নিকট আসিয়া কয়েক মিনিট মাত্র থাকিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন। কারণ মার নিকট আসিলেই মনের সব দোষ মূর্ত্ত আকারে প্রকাশ পায়। আর একজন বলিতেছিলেন যে মার নিকট আসিলেই তাঁহার সমস্ত কুপ্রবৃত্তি কোথায় যেন চলিয়া যায়। তাহাদের চিহ্নমাত্রও থাকে না। যে কয়দিন মার নিকটে থাকেন ঐ অবস্থায়ই থাকেন।

মাতৃসঙ্গের প্রভাব

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

বিকালবেলা মার বিশ্রামের পর ঘরের দরজা খুলিয়াছি। দেখিলাম মা তখনও চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন। আমাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—"গোপীবাবাকে* দেখছিলাম। তাদের বাড়ীতে যাওয়া হয়েছে। একজন কে বলল—'আসুন'। সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। দেখি গোপীবাবা ও গৌরীবাবা (গুরুভ্রাতা) খেতে বসেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—মা কই? যে লোকটি আমাকে 'আসুন' বলে নিয়ে গিয়েছিল সে একজন স্ত্রীলোককে দেখিয়ে বলল—'এই যে'। আমিত গোপীবাবার স্ত্রীকে আগে দেখেছি। দেখলাম সে না। এই স্ত্রীলোকটি দেখতে পাতলাও না মোটাও না। গোপীবাবাদের কাছে যাচ্ছে না—একটু যেন আল্‌গা ভাবে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এই শরীর

সূক্ষ্মে কবিরাজ মহাশয়কে দর্শন

* কাশীর গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়।

ঐ কথা শুনে আর কিছু বলল না। একেবারে চুপ করে গেল। আবার দেখছি গোপীবাবার এই বাড়ীই না, আর একটা বাড়ী। কি একটা উৎসবের জন্য সাধুদের ঐ বাড়ীটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উৎসবের পরে গোপীবাবার স্ত্রী এসে আমাকে বলছে—দেখুন বাড়ীটা একটু পরিষ্কার করেও যায়নি। দেখলাম পুরীর মহাপ্রসাদের মত শুকিয়ে ভাত সব জমা হয়ে আছে। আমি মাকে বললাম যে আমি এত বড় উৎসবের মধ্যে এসে দেখি একটুও জায়গা নেই। বাবা শুয়েছিল। শেষে আমি এখানে এসে বাবার পিছন দিক দিয়ে এই বালিশের উপরই মাথা দিয়ে ছোট্ট মেয়ের মত শুয়ে পড়েছিলাম। এই বলে আমি তাকে বালিশটি পর্য্যন্ত দেখিয়ে দিলাম। বালিশটির ওয়ার কালো কালো। বাড়ীর ঐ অংশটা আশ্রমেরই মত। ঐ বাড়ীর পাশেই আরও একটি আশ্রম।"

আবার বলিতেছেন—"দেখছি বিশুদ্ধানন্দ বাবার আশ্রমের একটা ঘরে আমি আছি। তোমরাও অনেকেই সঙ্গে আছ। গোপীবাবার বাড়ীতে কিসের একটা উৎসব। একটা সময় নির্দ্দিষ্ট আছে কীর্ত্তনের জন্য। অভয়ও সঙ্গে আছে। সেত কীর্ত্তন ভালবাসে। কিন্তু খবর ঠিক পাওয়া গেল না কি এইরকমই কিছু একটা হোক আমাদের কারো কীর্ত্তনে যাওয়া হল না। আরও দেখছি উৎসবে বিশুদ্ধানন্দ বাবার আশ্রম থেকে কিছু জিনিষপত্র গোপী বাবার বাড়ীতে গিয়েছিল। উৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর গোপীবাবা তা' ফেরৎ দিতে এসেছে। এই শরীর সবই দেখছে।"

মা আর একদিনের ঘটনা বলিলেন—"দেখলাম গোপীবাবার বাড়ী খাওয়া হয়েছে। মা বাবা কি একটা উৎসবে বিশুদ্ধানন্দ বাবার আশ্রমে যাবে। কিন্তু আমার তখনও খাওয়া হয়নি বলে অপেক্ষা করছে। আমি যদিও বলছি যে উৎসবে ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকাই দরকার। সব জিনিষ রেখে দিয়ে তাদের যেতে বললাম। কিন্তু গোপীবাবার যেমন ভাব

সেই মত বলছে—'না, না, তা কি হয়।' আবার সাধারণতঃ গোপীবাবাত এই রকমের কথা বলেনা। অথচ আমাকে বলছে—'এই রকম ছোট লুচি হলে আমি একশ' খানা খেতে পারি। আপনি করান। আমি একশ' খানাই খেতে পারি।' এই রকম কথাটা।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মা চুপ করিলেন। ঐ সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না। একটু পরে আবার বলিলেন—'ঐখানেই আবার গোপীবাবাকে দেখছিলাম। কি একটা কথা বলে বাবাকে আবার জিজ্ঞাসা করছি যে বাবা কি বুঝলে। বাবা মুখে তার কোনও জবাব না দিয়ে কার্য্যতঃ দেখিয়ে দিল। গোমুখী আসনের মত বসে মাথাটি নামিয়ে উপুড় হয়ে প্রণামের মত ভাবে পড়ে থাকল। তারপর শরীরটা ছোট হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল। অথচ আমি জানছি যে বাবা ঐ খানেই আছে। কিন্তু আর সকলে তাকে দেখতে পাচ্ছে না। যেন কর্পূরের মত একেবারে উড়ে গেল। আকার নেই অথচ গন্ধ আছে। এই রকমটা আর কি।"

গতকালও মার সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারীর নানা কথা হইতেছিল। কি কথায় কথায় মা তাঁহাকে বলিলেন—"দেখ, সকলের নিকট সব কথা হয় না। তোমাদের সঙ্গে অনেকটা কথা হয়ে যায়। এওত ভাবতে পারে লোকে যে নিজেকে বাড়াচ্ছে। তবে বাবা এও সত্য যে ঐরূপ ভাববে বলে যে তাদের কাছে বলিনা সেটা না।

মায়ের কথা 'আমিই তিনি তিনিই আমি'

সব কথা সব সময় বেরই হয় না। বলা হচ্ছিল না—আমিই তিনি তিনিই আমি। দেখ মাতা পিতা হতেত সন্তান। এমনত না যে পিতা হতে ছেলে মাতা হতে মেয়ে। দুইজনের মধ্যেই পিতামাতার সত্ত্বা পূর্ণ ভাবে আছে। তাই বলা হয়

স্ত্রীলোকের মধ্যেও পুরুষ আর পুরুষের মধ্যেও স্ত্রীলোকের পূর্ণ সত্ত্বা আছে। কারণ তুটা মিলিয়ে যে সন্তান। তবেই দেখ আমার মধ্যে পিতাও আছে মাতাও আছে। কাজেই আমিই তিনি, তিনিই আমি।"

ইহা বলিয়াই আবার বলিলেন—"এইসব কথা শুনে কেউ যদি কিছু বলে বলুক। যা সত্য তাই বের হয়ে যাচ্ছে। যখন যা দরকার তাইত হয়ে যাচ্ছে। আর বলেই বা কে? আমিই যে বলি আমাকে। শুনিও আমিই। শোনাটাও ঐ-ই।"

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

আজ মা কথায় কথায় বলিতেছেন "সকালে গোপীবাবাকে দেখলাম। বাবা প্রশ্ন করছে যে এমন কয়জনের হয়েছে যে দীক্ষা দেওয়া মাত্রই তারা মুক্ত হয়ে গেছে। তখনই এই শরীরটার এই রকম একটা হয়ে গেল। (ডান হাতখানি সম্মুখের দিকে টান করিয়া আঙ্গুলগুলিও টান করিয়া দেখাইলেন) আরও ভিন্ন রকমের একটা ক্রিয়া হল। সাঙ্কেতিক একটা ইসারাও হল। ঘরে অনেক লোক ছিল। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারল না। গোপীবাবা শুধু বলল—"হাঁ, বুঝেছি।"

সূক্ষ্মে গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে দর্শন

আবার বলিলেন—"হৃষিকেশের পূর্ণানন্দ স্বামীকেও দেখলাম। বাবা বৈরাগ্যের বিষয়ে কি একখানা বই এনে আমাকে বলছে—'এই জায়গাটা পড়'। আমি বাবাকে বললাম—'বাবা, তুমি কি এই মেয়েটাকে পড়িয়েছিলে যে লেখাপড়া শিখবে। তারপর বাবা বলল—'আচ্ছা

পূর্ণানন্দ স্বামীকে সূক্ষ্মে দর্শন

তবে এই যে নীলরংয়ের কাগজে লেখা আছে এইটা পড়।' তখনও আমি সেই আগের কথাই বললাম। পূর্ণানন্দ বাবার নিজের লেখা কি একখানা বই।"

এই বলিয়া মা পরমানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবার লেখা ঐরকমের কিছু বই তোমাদের কাছে আছে নাকি?" স্বামীজী সম্মতি জানাইলেন।

নানা সূক্ষ্ম দর্শনের কথা

আর একদিন সকালের কথা। নীচে হলঘরে কানু প্রভৃতি নিয়মিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে। মা উপরে শুইয়া শুইয়া দেখিলেন যে কীর্ত্তনের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কে একজন নাচিতেছে। সেই সম্বন্ধেই মা বলিলেন—"ওমা, তারপর দেখি যে এই শরীরই নাচছে। কারণ একই সময়ে একই শরীর যে নানা স্থানে প্রকাশ হতে পারে। সব সময়ে সব কিছু সব স্থানেই আছে কিনা তাই।"

আর একবার মা দেখিলেন যে একটি নীলরংয়ের ঘর। তাহার মধ্যে একজন সাধু বসিয়া আছেন। একটু অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ঐ সাধুটিকে স্থূল শরীরেও মা পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছেন বলিলেন। ঐ সম্বন্ধেই মা বলিলেন—"কি চমৎকার দেখ। যেমন তোমাদের দেখছি এই রকমই পরিষ্কার দেখা যায়।"

এইরূপ কত কিছু মা সদাসর্ব্বদাই দেখিতেছেন। কিন্তু কতটুকুই বা তাহার আমরা জানিতে পারি। মার নিজ খেয়ালে কৃপা করিয়া যৎসামান্য কিছু বলেন তাহাই মাত্র।

কয়েকটি অল্পবয়স্কা কুমারী মেয়ের সঙ্গে মার কথা হইতেছে। তাহারা নানা প্রশ্ন করিয়া নিজেদের বিষয়ের সমাধান করিয়া লইতেছে। মাকে

বলিতে শুনিলাম "নিরাশ হবার কিছুই নেই। কিরকমটা জান? যেমন তোমরা হয়ত দেরাতুন আসছ। ট্রেনে আসতে আসতে একটা পাহাড়ের আড়ালে পড়েছ। ভাবছ—দেরাতুন আরও জানি কতদূর। কিন্তু তারপর পাহাড়টি যেই পার হয়ে এলে অমনি দেরাতুন সহর দেখা গেল। এমনি তাঁর কৃপা। তিনি কখন এসে তোমার অন্ধকার নষ্ট করে দেবেন তা তুমি জানও না। তুমি হয়ত মাত্র দুই পা দূরে দাঁড়িয়ে আছ। অথচ ভাবছ কতই না জানি দূরে।"

"নিরাশ হইবার কিছুই নাই"

আর একটি কি প্রশ্নের জবাবে মা বলিতেছেন—"প্রাণী হত্যা করা পাপ। আবার দেখ একটা প্রাণী হত্যা করে সেই আহার করেই আর একটা প্রাণী বেঁচে আছে। কোনও একটা বিশেষ কাজবিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য এই রকম পাপ কাজ হয়ে যাচ্ছে। আবার তার শুভকর্ম্মগুলির দ্বারা এই কর্ম্মফল কেটেও যাচ্ছে। ভেবে চিন্তে ঠিক করে সংসারের এইসব কাজ ছাড়া বা ধরা যায় না। যখন যেমন হবার হয়েই যাচ্ছে। তবু যতটা পারা যায় শুদ্ধ ভাব রাখার চেষ্টাই সকলের করা দরকার।"

শুভ কর্মের দ্বারা অশুভ কর্মফল নাশ

৪ঠা আষাঢ়, বুধবার।

এই কয়দিন হয় মার ভাবটি একটু চুপচাপই চলিতেছে।

সকালে কীর্ত্তনের ঘরে সকলে বসিয়া আছে। মা পাশের ছোট ঘরটিতেই বসিয়া বসিয়া মাঝে মাঝে একটু কথা বলিতেছেন।

বিকালবেলাও অনেকে মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। মা কি কথায় কথায় বলিলেন— "দেখ, তিনিইত আকর্ষণ। কাজেই খারাপ কাজ করতে গেলে সেই কাজে যেমন একটা আকর্ষণ আছে আবার ভাল কাজেও দেখবে পবিত্র শুদ্ধ একটা আকর্ষণ আছেই। সবের মধ্যেই সব আছে। সব সময়ে সব কিছুতে পূর্ণভাবেই আছে। তাই বলা হয় দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েছ বৃথা সময় নষ্ট করো না। যতটুকু তোমাদের শক্তি, কৃপা অনুভব করবেই। যেভাবে পার যতটুকু পার সময় দেওয়া চাই-ই। ধর্ম্মশালায় বাস। সময় আসলেত কেউ কাহারো জন্য অপেক্ষা করবে না।"

"তিনিইত আকর্ষণ—বৃথা সময় নষ্ট না করা"

এই সব কথা বলিতে বলিতে মার ভাবের কিরকম যেন একটু পরিবর্তন হইয়া গেল। মুখে লালবর্ণের আভা, চক্ষু জলপূর্ণ। সকলে মুগ্ধ হইয়া মার মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল।

৭ই আষাঢ়, শনিবার।

শচী দাদার* বোন মেজদির শরীর অসুস্থ বলিয়া আশ্রমের নিকটেই অন্য একটি বাসায় আছেন। আজ ভোরে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া খুব চোট পাইয়াছেন। খবর পাইয়া আমরা সকলেই গেলাম। দুর্ব্বল শরীর, আঘাতও খুব পাইয়াছেন দেখিলাম।

মেজদির আঘাত প্রাপ্তির সময়ে মার সূক্ষ্মে উপস্থিতি

কিন্তু আমাদের দেখিয়াই মেজদি হাসিয়া

* শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ, ইনকামট্যাক্স কমিশনার। অবসর গ্রহণের পর ইনি কয়েক বৎসর আশ্রমবাস করেন। আশ্রমেই ইঁহার দেহরক্ষা হয়।

উঠিলেন। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"মা এসে ঘরে দাঁড়িয়েছিলেন দেখলাম। আর আমি যখন পড়ে যাই তখনও মাকে সামনে দেখেছিলাম। মাকে দেখবার পর থেকেই যন্ত্রণা কমে যায়।"

নেপালদাদাকে বৃশ্চিকাঘাত

রাত্রে নেপালদাদাকে* কি একটা কামড়াইয়া দিল। রায়পুরে ভীষণ বিচ্ছু। সকলে অনুমান করিল উহাই বোধহয় কামড়াইয়াছে। রাত্রি যতই বাড়িয়া চলিল যন্ত্রণাও বাড়িয়া চলিল। মা সেঁক দিতে বলিলেন। নেপাল-দাদা যন্ত্রনায় অস্থির। মধ্যে মধ্যে 'মা মা' করিতেছেন। মা নিজে উঠিয়া বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন!

সূক্ষ্মে নানা দর্শনাদি

একটু পূর্ব্বেই মা শুইয়া শুইয়া বলিতেছিলেন—"দেখছি একটি ভয়ানক স্ত্রী মূর্ত্তি। যেন ঝক্ ঝক্ করছে।"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা কিরকম? কিসের মূর্ত্তি?"

মা শুধু বলিলেন—"চুপ করে শুয়ে থাক।" আমরা বুঝিলাম বিশেষ খারাপ কিছু মা দেখিতেছেন।

রাত্রে হঠাৎ নীরজদাদার* ছোট ছেলেটি ভয় পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহাতে আমরা অনেকেই জাগিয়া গেলাম। মাও বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—"একটু আগেই সামনের গাছটা খুব

---

* শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র চক্রবর্তী। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নাম হইয়াছে শ্রীমৎ নারায়ণানন্দ তীর্থ।

* এলাহাবাদের পুরাতন ভক্ত অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীনীরজনাথ মুখোপাধ্যায়।

নড়ছিল। তখনই মনে হয়েছিল এখনই হয়ত কাহারো মধ্যে এটা প্রকাশ হবে।" এই কথা শুনিয়া আমরাও কিঞ্চিৎ ভয় পাইয়া গেলাম। তবে মা নিকটেই আছেন, এই শান্তি।

ঘড়ি দেখিলাম। রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। নেপালদাদার যন্ত্রণা আরও বাড়িয়াছে। মা হঠাৎ বলিলেন—"উনানটা সরিয়ে ফেল। আর সেঁক দেওয়ার দরকার নাই।"

পরমানন্দজী উনানটি সরাইয়া রাখিয়া আসিতেই মা আবার বলিলেন —"উনানটা নিয়া আস।" স্বামীজী উহা আনিতে গিয়াই দেখেন খুব বড় একটি বিচ্ছু স্বামীজীর বিছানার নিকটে আসিতেছে। স্বামীজীকে যদি মা আবার না পাঠাইতেন তবে বিছানার উপর গিয়া শুইলে যে কি হইত তাহা বলা যায় না। রায়পুরের বিচ্ছুর কামড়ে লোকে সাময়িক ভাবে পাগলের মতও হইয়া যায়।

স্বামীজী মার নিকট বিচ্ছুটিকে চিম্‌টা করিয়া আনিয়া দেখাইতেই মা বলিলেন—"দেখেছ, কত বড়, কি ভয়ানক। এটা স্ত্রী বিচ্ছু। এটারই মূর্ত্তি দেখেছিলাম।"

ইহার পর সকলে আবার শুইয়া পড়িল। মাও শুইয়া শুইয়া একটু পরে বলিতেছেন—"একটি অতি সুন্দর দেবীমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বেশ সাজসজ্জাও আছে। নেপালের দিকে দেখতে দেখতে এই দিক দিয়ে চলে গেল।"

কানু বলিল—"বিষহারিণীর মূর্ত্তি বোধহয়।"

মাও বলিলেন—"এবার বোধহয় নেপালের বিষের যন্ত্রণা কমে যাবে।" প্রকৃত পক্ষে তাহাই হইল

৮ই আষাঢ়, রবিবার।

মার একজন সন্ন্যাসী ভক্তের পত্র আসিয়াছে। আশ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কোনও একটি কাজের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

মা তাহার জবাবে কয়েকটি খুব সুন্দর কথা বলিলেন—"বাবাকে লিখে দে, বাবাত এই শরীরের খেয়াল জানেই। এ সব ব্যাপার যে এই শরীর করে না। করলে তোমার কথা নিশ্চয়ই রক্ষা করার চেষ্টা করা যেত। যদিও এ শরীরের লাভ কি হানি কোনও কথাই নেই। তবে এসবে কি পার পাবে

সন্ন্যাসীর প্রতি উপদেশ

বাবা? ভব-সমুদ্র পার হওয়ার জন্য তরীর রঙ্গীন সাজসজ্জা (গেরুয়া বস্ত্র) আর তা' চালাবার সরঞ্জাম স্বরূপ নিত্যক্রিয়া নিয়ে বসে আছ। তুমি যা লিখেছ এসবত কেবল জাগতিক ব্যাপারের কথা। এ সব চিন্তায় যে সমুদ্র পার হয়না—হয়না। শুধু অকূল সমুদ্রে ডুবে মরবার ভয় যারা উঁকিঝুঁকি মেরে মনটাকে বিশেষ ভাবে নাচিয়ে তুলেছে তাদের হাতজোড় করে বলো—আমাকে তোমরা কৃপা করে রাস্তা ছেড়ে দেও। যা কিছু উপস্থিত তোমার মনে এসেছে কেবল বিঘ্ন বিঘ্ন বিঘ্ন। কেবল আত্মচিন্তায় মনটাকে লাগাবার চেষ্টা চেষ্টা চেষ্টা। নিরুপায়ের চেষ্টা করবে না। উপায়ের চিন্তা কর। নির্ধনী হতে চেওনা। স্বধনের আকাঙ্ক্ষা সদা কর্ত্তব্য। সময় বড় কম।"

আর একজন স্ত্রীলোক মাকে অনুযোগ দিয়া কিছু লিখিয়াছে

তাহার উত্তরে মা বলিলেন—"পাগলীমার আমার মনটা উপস্থিত অনুযোগকারিণী একটু বিক্ষিপ্ত হয়েছে। এও মায়েরই স্ত্রীলোকের আমার সুন্দর এক রূপ। যেসঙ্গে থাকা প্রতি উপদেশ হয় তার গুণগুলি এইরূপ ভাবেই প্রকাশ হয়। সঙ্গগুণ। মিথ্যা বলে আর কিছু বলবার আছে রে মা! একমাত্র সেই যে সব ঘর জুড়ে আছে। এক সে-ই নিত্য বসে আছে। নিত্যই আছে। সর্ব্বক্ষণ তার নিত্যলীলা বর্ত্তমান। এই শরীরটা কিছু না মা। তোমরা সকলেই এক ঠাকুরের অনুসন্ধান কর। এই শরীরটা পারত ফেলে দেও। এইটি মনে রাখা উচিত যে তাঁকে পাওয়াই লক্ষ্য, সেই একমাত্র ভগবান। তিনি যে পথে যাকে চালাবেন, চলতে বাধ্য। ইচ্ছা করে কেউ কিছুই করতে পারবে না। তিনি কৃপাময় দয়াময় তাঁর দিকে টেনে নিচ্ছেন। অভিমানীনী মা আমার—তাঁরই এক রূপ ত। তিনি যখন যা বলেন করেন সবই সুন্দর। স্বয়ং প্রকাশ কিনা। এই সুন্দর মনুষ্য জন্মটা যে কয় বছরের জন্য পাওয়া গেছে কেবল তাঁরই চিন্তা। ঐ ভাবনার মূর্ত্তি নিয়ে মিথ্যা বৃথা অস্থিরতা। দুর্ব্বলতার সহায়তা না নিয়ে বীর কুমারীর মত সর্ব্বাবস্থায় তাঁর চরণ শরণ। সর্ব্বরূপে তাঁরই সেবাজ্ঞানে ক্রোধ ইত্যাদি ভাবের সঙ্গে বন্ধুতা করে শান্তভাবে কেবল সেই ঠাকুরের সেবা ঠাকুরের সেবা ঠাকুরের সেবা। সেবার আশ্রয়ের ভাব যতই থাকবে ততই তাঁতে ভালবাসা প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধার প্রকাশ বেড়ে যাবে। জগতে দুটো

দিনের মামলা। বিঘ্নদায়ক মামলায় সময় নষ্ট করতে আছে? সঙ্গীরূপেই যে তিনি। তাদের সেবা করে সন্তুষ্ট রেখে ঠাকুরকে কেবল প্রাণময় করার চেষ্টাই সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবে করা কর্ত্তব্য। পারিনা বললে হবেনা। সময় চলে যাচ্ছে—ক'দিনের জন্য এইসব মেলামেশা। কখন কার কি সময়—এক নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নেই। আপনা গাঁঠুরী বাঁধো ভাই সঙ্গে যাত্রী কেহ নাই। এই শরীর-টাকে বকৃতে ইচ্ছা করে? যা করতে ইচ্ছা করে প্রাণখুলে করো। কে কাকে কি করে? আপনাকেই আপনি করে। এই শরীরের খেয়াল কি জান? এই শরীরত কাউকে কিছু করে না। বকুনি দিয়ে এইভাবে কৃপা করে যদি তোমরা সেবা নেও সেও আনন্দের কথা। কীর্ত্তন চলছে সব। হে ভগবান, তোমার অনন্ত-রূপ দেখিয়ে দিচ্ছ।"

১০ই আষাঢ়, মঙ্গলবার।

সকালে মা তখনও উঠেন নাই। অভয় ও আমি মার ঘরে গিয়াছি। হঠাৎ অভয় বলিয়া উঠিল—"কি সুন্দর গন্ধরাজের গন্ধ আসছে। এখানে সামনেত কোথাও ফুল নেই।" আমিও গন্ধ পাচ্ছিলাম।

সূক্ষ্মশরীরী মহাত্মার উপস্থিতি প্রকাশ

মাও বলিলেন—"হাঁ, বেশ গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।"

অভয় সহজে ছাড়িয়া দিবার ছেলে নয়। মাকে তখনই জিজ্ঞাসা করিল—"কেউ এসেছে নাকি?"

মা তখন কিছুই বলিলেন না। পরে অভয়ের অনেক জিজ্ঞাসাতে প্রকাশ পাইল যে স্থূক্ষ্মশরীরী একজন উলঙ্গ সাধু ঘরের মধ্যে আসন করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারই গায়ের গন্ধ।

দিদিমার মৃতদেহ দর্শন

আজ দুইদিন যাবৎই মার মুখ হইতে বাহির হইতেছে—"মরা দেখছি।" সর্ব্বদাই তাই আশঙ্কা হয় কাহার কি সংবাদ আসে।

১১ই আষাঢ়, বুধবার।

আজ সকালে উঠিয়াই দিদিমাকে দেখিয়া মার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"ইহারই মৃতদেহ দেখা গিয়েছে।"

সকালবেলা মার পূর্ব্বাবস্থা, সাধনার খেলা এবং অন্যান্য বিষয়েও অনেক কথা মার মুখ হইতে প্রকাশ হইল। মা বলিলেন—"বৈদিক

মায়ের পূর্ব্বাবস্থা ও সাধনার খেলা সম্বন্ধে নানা কথা প্রকাশ

ধারায় মন্ত্র ও ছন্দের প্রকাশটা কি সুন্দর। সেদিন ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে বৈদিক ক্রিয়াদি দেখে এই শরীরের সাধন ক্রিয়ার সময়টায় ঐসব ক্রিয়াগুলি যে নিখুঁতভাবে হয়ে গিয়েছে সেই কথাটা কেমন যেন খেয়ালে আসছিল। যেমন কীর্ত্তনে স্বাভাবিক ক্রমে কোনও কোনও সময় শরীরটা কেমন হয়ে যেতে দেখেছিস সেইরকম এই মন্ত্র ও ছন্দের ভাবটাও শরীরের উপর দিয়ে যেতে শরীরটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিল। এই শরীরের ক্রিয়াগুলি সবই স্বয়ংপ্রকাশ কিনা। তাই ক্রিয়ার ফলগুলিও আপনা হতেই প্রকাশ দেখাত।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মুখ দিয়ে কোন সময়েতে কি অবস্থায় কি ভাব নিয়ে কি সব মন্ত্র বের হত। কি চমৎকার প্রকাশ! সবই যে অনন্ত।

"এই শরীরের কেমন হত দেখেছিস্ না। ঐরূপ বেদ মন্ত্রাদি অঙ্গভঙ্গী সহ এই শরীরের মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতির ছন্দেবন্ধে কি ভাবে বের হত। আবার দৃষ্টিরই বা কি ভঙ্গী! হাবভাব, আসন ইত্যাদির রকম অর্থাৎ বসা ইত্যাদিও অন্য রকম। কিরূপ একটা ভাব হয়ে যেন ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ভঙ্গী। তখন নিঃশ্বাসের গতি এবং সমতাও সেই প্রকার। তোরা যদি ঋষিদের কথা বলিস্ তবে সেই সময়ে ঠিক ঠিক তাদেরই মত প্রকাশ এই শরীরে।

"সমুদ্রে একঘটি জল ঢাললে যেমন স্বাভাবিক গতি বা ঢেউয়ের কিছুই বাধা আসেনা, তেমনই স্বভাবের ক্রিয়া যে কোনও দিক নিয়ে বা ভাব নিয়ে যখন যেটা আরম্ভ হোক না কেন সেইটাই কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন। স্বাভাবিক প্রকাশ যে কি সুন্দর। যখন যেটা নিল সেটাই সর্ব্বাঙ্গীন প্রকাশ আর কি! কি সুন্দর যেই যেই ভাবের গতি ও ধারায় যখন স্থিত সেই সেই ভাবের মন্ত্রাদি স্ফুরণ, যেমন সন্ন্যাস মন্ত্রাদি। যেমন ধর গাছ পুতলে মাটিতে, কিন্তু তার স্বাভাবিক সেবা রক্ষা করলেই বর্দ্ধিত হওয়া বা পুষ্পে-পত্রে সুশোভিত হওয়া। স্বাভাবিক প্রকাশের সৌন্দর্য্য আর কি। মানুষত আর তাকে টেনে বড় করতে পারেনা। শুধু সেবা ও এক লক্ষ্যের দ্বারা

প্রকাশিত হবার সহায় হয়। যদিও ইচ্ছা শক্তির ক্রিয়ার মত দেখায়।

"এই শরীরটা কিরকম যেন একটা ময়দার ডেলার মত। তা' দিয়ে তুমি পুতুল তৈরী কর বা যে রকমারীটা ইচ্ছা কর। আবার সব ভেঙ্গে তুমি ময়দার ডেলাই করতে পার। সব কাজটাই এতে করা যায়। আবার কিছুই না। একটা ডেলাই মাত্র। ঘি যেমন আগুনে গলালে, আবার ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেল। দুধ দেখে তার মধ্যে ঘি আছে বলে সাধারণভাবে বোঝা যায় কি? কিন্তু যখন জানলে কিভাবে ঘি বের করা যায় তখন মাখন বার করলে। তাও আবার দুধের উপর ভাসছে। কি চমৎকার! জীবাত্মা পরমাত্মা তোমাদের সেইরূপই যে। ময়লা জল যেই ফিণ্টার করলে শুদ্ধ জল দেখা দিল। পরমাত্মা কোথায় নেই? তোমাদের দৃষ্টিতে ময়লাটা যেই দূর করলে, অমনি শুদ্ধজল অর্থাৎ পরমাত্মা। আর ময়লা অর্থাৎ বদ্ধজলে গন্ধ হয়, কত কীটাণু হয়। ঐ হল জীব। যখন যে দৃষ্টিতে যা কিছু নেরে ঐ-ই ত।

"তোমরা বলনা বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক। এ শরীরেত কোনও রকমটাই বাদ যায়নি। বৈদিক দীক্ষা শিক্ষা তার রকমারী প্রকাশগুলি শরীরটা যখন যেখানে যেভাবে নিয়েছে সেই দিকটারই স্বয়ং স্বাভাবিক গতি ধরে প্রকাশ কিনা। আবার শক্তি বিষয়ক—সেখানেও যেখানে যা তাই হয়ে প্রকাশটা। যেমন, শক্তির রকমারী

দিকগুলি প্রজ্জ্বলিত, মূর্ত্ত আকারে বোধ প্রত্যক্ষ তদ্‌রূপে, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত যা বল তাই-ই। পৌরাণিক মতের দিকটাও সেই মতই। যেখানে যা যেভাবে প্রকাশ, নামই বল রূপই বল, মন্ত্রই বল; বাদ আর কোথায়? সত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যা তাই ত। যখন যেদিকটা নিয়ে যে সাধনা করবে সেই দিকটারই পূর্ণাঙ্গীনটা পাওয়া যায়। মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি যাই বল তাদের ভিন্ন মত ও স্বভাবের ক্রিয়াগুলি যখন এই শরীরে দেখা দিয়েছিল তখন ত' কত দিকই এই শরীরে প্রকাশ পেল। এই শরীরে ত কত রকমটাই হল ও হচ্ছে।

"শরীরের মা বাবা ত শৈব শাক্ত। তাই ছোটবেলায় ঐ ভাবের প্রাধান্য নিয়ে কথা বলা। একবার সপ্তমী পূজার দিন খেওড়াতে স্নান করিয়ে নূতন কাপড় পরিয়ে শরীরের মা বলল—'যা ও পাড়ার পূজা দেখ্ গিয়া।' পূজা দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে শক্তি পূজার মন্ত্র ইত্যাদি সব বের হতে লাগল। কিন্তু পাছে লোকে দেখে বা শোনে তাই আস্তে আস্তে বের হচ্ছিল। পরে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। আবার ছোটবেলায় আর একদিন মা এসে কীর্ত্তন শুনতে কীর্ত্তনের স্থানে বসিয়ে দিল। কিন্তু এই শরীরটা কেমন হয়ে গেল। দেখা ও শোনা অর্থের প্রকাশটা চাইত, তাই হয়েছিল। আবার শরীরের মা'ত এই শরীরটাকে পেয়েই তুলসীতলায় গড়াগড়ি দিইয়েছিল। শরীরের বাবাও হরিনাম করতেন। সেই সময় এই শরীরই জিজ্ঞাসা করল

হরিনামের কথা। তখন শরীরের বাবা বলেছিল হরিনাম বিষয়ক কথা। পরে যখন এই শরীর নিজের খেয়ালে হরিনাম করল তখন সেই নামের কি গুণ, নামে কি হতে পারে এই শরীরে তারও প্রকাশটা হচ্ছিল আর কি! এই শরীর ত নিজের খেয়ালে যখন যেটাই করে তৎস্বরূপই কিনা।

"আবার যখন ভোলানাথ বলল—'আমরা শৈব শাক্ত—হরিনাম, এসব কি হচ্ছে আমি বুঝিনা।' তার এই সব ভাল লাগছিল না। সেই সময়ে একদিন ভোলানাথকে বলা হল—'কি বলব তবে? জয় শিব শঙ্কর, ব্যোম ব্যোম হর হর?' সেই সময়ে আবার এই শরীরটা সেই ভাবেই নিজকে নিয়ে শিব শক্তির ক্রিয়াদি তন্ময়ত্ব ব্যক্ত অব্যক্ত খেলতে লাগল। তাই বলা হয় এই শরীরে শাক্ত বৈষ্ণব শৈব কোনটাই বাদ যায় নি।"

একটু থামিয়া মা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"নানা যোগাদির ক্রিয়াসহ অনন্ত গতি অনন্ত ভাবে। এরই ভিতরে মহাশক্তি মহাপ্রকৃতি মহাকারণের কারণ সব কিছু; যা তোমরা বলনা। সেই যে নানাপ্রকারে মহা-শক্তির ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রকাশ খেলা ও প্রাকৃতিক শক্তির মেলা অনন্ত আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। শক্তির নিত্য নূতন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। সবখানেই যে সব হয়। এক-মাত্র তিনিই ব্যয় ও অব্যয়। এইসব উপলক্ষ্য হয়ে সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় ও যুগপৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশ, শিবশক্তির মিলন ইত্যাদি।

"আবার বৈষ্ণবের দশম দশাই বল আর মহাভাবই বল, সেই নামের মহাকৃপাই বল আর নামনামীর অভিন্নভাবে তন্ময়তাই বল, সেবক—সেবিকা ভাবই বল, আর তোমাদের সারূপ্য সামীপ্য সাযুজ্য ইত্যাদিই কি সব তোমরা বল। প্রেম সাধনা, শ্রীরাধার বিরহ-মিলন, মহাবিষ্ণুই বল আর তত্ত্বই বল ইত্যাদি—সবপ্রকার ভাবের প্রকাশ ও তৎস্বরূপত্ব নানাভাবে ঐ আর কি! এখানেও শৈব মহাযোগী ধ্যানস্থ পূর্ণ শিবত্ব পরম ব্রহ্ম ইত্যাদির প্রকাশ আর কি। যাই বল না কেন।

"আবার এর ভিতর থেকেই সাধকেরা যে নানারকমের ও যে যে পথ বেছে নিয়ে সাধনা করে তার নানাত্বের প্রকাশ, সাধনার পূর্ণত্ব—কি ভাবের অনন্ত গতিগুলি সব! যেমন ধর সোনা। তা দিয়ে অনেক রকম গয়নাই তৈয়ার হতে পারে। আবার সেই আকার প্রকার প্রকাশ-টাও ত সোনাই। এক একটা দিকের পূর্ণত্ব আবার খণ্ডত্ব অংশ এই সব প্রকাশটা এই শরীরে আর কি।

"হঠযোগ রাজযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগ লয় যোগ সব কিছু প্রকৃষ্ট রকমে পূর্ণাঙ্গীন আর কি এই শরীরের ভিতরে। নাদ বিন্দুতে স্থিত হয়ে অনুলোম বিলোম গতিতে যে কারণ হতে সৃষ্টি সেই মহাকারণে অনুলোম বিলোম গতিতে অনন্ত ব্যক্ত অব্যক্ত এক বিন্দু অনন্ত বিন্দু প্রকাশ ধারাটায় সেই যে মহাশক্তির আশ্রয় পাওয়ার পূর্ণ প্রকাশটা ও পূর্ণাঙ্গীন পাওয়া আর কি। এইসব কিন্তু ঐ আর কি। এই শরীরত এখনও তোরা

যেমন দেখিস্, তোদের হিসাবে শিশুকাল যাকে বলিস্, সেই সময়েও তাই, খেলাটার সময়ও তাই। জন্ম-মৃত্যু আসা-যাওয়ারত কোনও প্রশ্নই নেই। যা বল তাই। (নিজের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) অর্থাৎ যা হতে পূর্ণ প্রকাশ আর কি। (আবার নিজ শরীরের দিকে দেখাইয়া) এতে কিন্তু তোদের দৃষ্টিতে যত রকমের সাধনা ইত্যাদির মত সব কিছু হতে পারে। সবই প্রকাশ হতে পারে। অবাধ গতি অবাধ প্রকাশ আর কি। তার কথা সেই বলছে কিনা, তাই কার কাছে সঙ্কোচ দ্বিধা ? অন্য কারো বলেত কথাই নেই। তাঁর কথা তাঁকেই তিনি বলছেনত। অথবা নিজের কথা নিজের কাছে নিজেই বলছে, যাই বল না কেন।"

হাসিতে হাসিতে মা একটি কবিতার পদ বানাইয়া ফেলিলেন—

"সঙ্কোচ দ্বিধা ভয় যেখানে।
বন্ধভাবে গন্ধ রয় সেখানে।
জানিও নিশ্চয়।
ইহা নিঃসংশয়॥

আবার বলিতেছেন—"এই শরীরটাকে দেখিয়ে কথা বলা হয়ত। (আমাদের সকলের শরীর দেখাইয়া হাতখানি ঘুরাইয়া) এই সবই কিন্তু ঐ ঐ ঐ ঐযে। তোমাদের আপন কথা তোমরাই বললে তোমরাই শুনলে। স্থান হিসাবেও সবখানেই কিন্তু ঐ সবই অর্থাৎ ঐ-ই একমাত্র।"

আজকাল অনেক সময় মার মুখ হইতে এমন পরিস্কার ভাবে

নিজের সব অবস্থার কথা প্রকাশ হইতেছে যে তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। পূর্ব্বে এমন হইত না। মা নিজেও বলিলেন— **"জ্যোতিষও অনেক জিজ্ঞাসা করে জবাব না পেয়ে বলত— এখন বলছেন না বটে, কিন্তু এক সময়েতে এই সব কথা বের হবেই হবে।"**

আগ্রার প্রফেসার শ্যামাচরণ বাবু মার সঙ্গে কিছু দিন হয় আছেন। তিনি মার মুখ হইতে এইসব কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত। আমাকে বলিলেন—"অহঙ্কারের লেশমাত্রও নেই। কথা শুনেই বোঝা যায় যেন শিশুর মত সরলভাবে সব বলে যাচ্ছেন।"

সাধুদের জীবনী লেখা প্রসঙ্গে কথা উঠিল। আমরা জানি যে প্রথমে যখন মার বিষয়ে কেহ কিছু লিখিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, মা তখনই তাহা নিষেধ করিয়াছেন। অনেকদিন পরে মাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই যখন বই লেখা হইয়া গেল তখন তাহা শুনিয়া পরে মা বলিয়াছিলেন—**"কে কার কথা লিখে? যার যা ইচ্ছা করে যাচ্ছেত। যা হবার হয়ে যাচ্ছে। জগতে কত ভুরি ভুরি বই লেখা হচ্ছে। এ শরীরটা কাউকে লিখতেও বলেনা, বাধাও দেয় না। উপস্থিত যা কিছু হচ্ছে তাঁর ভিতরেই সব।"**

শ্যামাচরণ বাবুদের প্রশ্নে আজ কয়েক দিন হয় মার অনেক কথাই বাহির হইতেছে। ইহারা নিশ্চয়ই শুনিবার অধিকারী। কারণ সব সময় সব স্থানে মার সব কথা বাহির হয় না। মা বলেন—**"আমি কি করব? তোমরা যেমন বের করাচ্ছ তেমনই শুনাচ্ছ। এক ছাড়া কিছু আর আছে নাকি? আবার এওত ভাষাই। দেখ, কি চমৎকার, কেউ এই**

শরীরটাকে নিন্দা হয়ত করছে। কিন্তু কথাটা কি জান? যে বলছে যা বলছে সবই তুমি না হয় আমি। একমাত্র এক আত্মাইত। আবার আমি তুমিই বা কোথায়? কোন গোলমালই নেই। এই সব কিন্তু বিচারের কথা না। সত্য প্রত্যক্ষ সব। দেখ, কেউ তোমাকে মাসীমা বলে, কেউ পিসিমা বলে, কেউ মা বলে, কেউ স্ত্রী বলে, কিন্তু তুমিত একই। আবার দেখ তুমি কারো মা বলে আবার যার মাসী তারও কিন্তু কিছু কম নও। সকলের নিকটই পূর্ণভাবেই সব কিছু।"

নিজের বিষয়ে আবার বলিতেছেন—"এই শরীরের সব কিছুই পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় বোঝা যায় কোনই বাধা নেই। তবে সব প্রকাশ করা হয় না। সব সময় বোধ হয় প্রকাশ করাটা ঠিক না তাই তোমরা বের কর না।" এই বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মায়ের সবই অপূর্ব্ব!

১৫ই আষাঢ়, রবিবার।

মা দুপুরবেলা খাইতে বসিয়াছেন। এমন সময় দিদিমা ও অভয় একটা কথা উঠাইল—যার সংস্পর্শে ভোলানাথের একবার কিরূপ শিবভাব হইয়াছিল। মা এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"হাঁ, কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। চোখের উর্দ্ধ দৃষ্টি আর শরীর জমে পাথরের মত হয়ে গিয়েছিল। ভোলানাথের ভাইপো আশু তো এই সব দেখে একেবারে কেঁদে আকুল।"

যেদিন মার মুখ হইতে বাজিতপুরে আত্মপরিচয় বাহির হইয়াছিল ইহা সেই দিনকার ঘটনা।

অভয়কে মা হয়ত বেশী স্নেহ করেন কোন কোন ভক্তের এই মত। আবার অনেকে হয়ত তাহার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ বিরক্তও। এই জাতীয় কথায় মা বলিতেছেন—"দেখ একত হয় গোলাপটি তুলতে হলে অনেক কাঁটার মধ্য দিয়ে হাত বাড়াতে হয়। গোলাপটির দিকে লক্ষ্য থাকলে আর তা তুলবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে কেহ কাঁটার ভয়ে ফিরে যায় না। আর দ্বিতীয় কথা যার পক্ষে যা করা দরকার মা তারই ব্যবস্থা করেন। সকলের পক্ষে ত এক ব্যবস্থা না। কার পক্ষে কি দরকার সেটা মা-ই জানেন। এই বিশ্বাসটুকু যদি তোমাদের থাকে তবে আর কোনও দুঃখের কারণ হয় না। নতুবা হিংসা বলে যে জিনিষ আছে তাতে সকলেই শুধু কষ্ট পায়। যার যা স্বভাব সেইভাবে চলাই ভাল। অনুকরণ করাটা ঠিকও না ভালও দেখায় না।"

অধিকারী ভেদে মায়ের ব্যবস্থা

১৭ই আষাঢ়, মঙ্গলবার।

৺নির্ম্মল বাবুর জ্যোতির্ম্ময় মুর্ত্তি দর্শন।

সকালে মা তখনও উঠেন নাই। আমি নিকটে বসিয়া বাতাস করিতেছি। মা অল্প অল্প চোখ খুলিয়া বলিলেন "এখনই নির্মল বাবুকে দেখলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম?"

মা উঠিয়া বসিলেন। হাত দিয়া বিছানার পিছন দিকটা দেখাইয়া বলিলেন—"এই খানে এসে বসেছে। উজ্জ্বল শরীর, জ্যোতিতে যেন ঘর উজ্জ্বল করেছে। জ্যোতির্ম্ময় শরীর আর কি। এই শরীরটা তাকে জিজ্ঞাসার ভাবে বলল—'কোথায় আছ'? সে বলল—

'তুমিত সবই জান।' আমি বললাম যে তোমাকে একবার জ্যোতির্লোকে যেতে দেখেছিলাম। সে বলল যে এখন সেখান থেকেই আসছে। এই বলে আরও কিছু বলল। তারপর আবার স্বস্থানে যাওয়ার কথা বলল। এই বলে এই শরীরটার পায়ের দিক থেকে ধীরে ধীরে শরীরের উপর দিকে উঠতে উঠতে শরীরের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।"

আমি বলিলাম— দাদামশায় ও জ্যোতিষ দাদার যেরূপ তোমাতে মিলিয়ে যাওয়া ও তোমাকে পাওয়া, এও কি তেমনি? না কোনও পার্থক্য আছে?"

মা বলিলেন—"হাঁ, পার্থক্য আছে। তাদের যেমন সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে পাওয়া, এ ঠিক তা না। যেমন এক তিনিই সব, তবুও এর মধ্যেই কারো কারো এক একটা ভাব তীব্র থাকে। সেই সেই ভাব অনুযায়ী এক একটা অংশে মিলিয়ে যাওয়া। সব স্থানেই যদিও সব, তবুও একটু পার্থক্য আছে। আমি আবার নির্ম্মল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তার কথা কাউকে বলতে তার কোনও আপত্তি নেইত। সে বলল—'না, কিছু না।"

নানা সূক্ষ্ম দর্শনাদি

একটু থামিয়া মা বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আবার দেখছি এই শরীরটা এই ঘরেই আছে। অনেক লোক আসছে। আমি যেন বলছি যে এই ঘরে দু'জনের বেশী থাকেনা। তারা দলে দলে আসছে যাচ্ছে মেলার মতন। এ শরীর আবার তাদের জিজ্ঞাসা করল—'তোমরা এখানে কেন এসেছ?' তারা উত্তর দিল—'তীর্থস্থান বলে তীর্থ করতে এসেছি।' এই বলে তীর্থে যেমন সকলে স্নানাদি করে সেইরকম তারাও করতে লাগল।"

পরে এই কথা লইয়া আলোচনা করিয়া প্রকাশ পাইল যে

পূর্ব্বে এই স্থানটি একটি বিশেষ তীর্থস্থানই ছিল এবং প্রতি বার শিবরাত্রির সময় একটি মেলা হইত।

রাত্রিতে মা ছাদের উপর শুইয়া আছেন। আমরা কেহ কেহ তখনও জাগিয়া আছি। মা ধীরে ধীরে বলিতেছেন—"দেখছি একটা নৌকা; নদীটি বেশী বড় না। নদীর ধারে কুশের ঘর, তীরে শুধু বালি। নৌকার মধ্যে তিনজন সাধু; দুজন নেংটি পরা আর একজন ব্রহ্মচারী।"

কিন্তু কে তাহারা সে সম্বন্ধে মা কিছু আর বলিলেন না।

১৮ই আষাঢ়, বুধবার।

বিকালে মার নিকট আজমীরের কয়েক জন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। তাঁহারা মুসৌরী গিয়াছিলেন। এখন দিল্লী ফিরিয়া যাইতেছেন। মার নাম শুনিয়া মার দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন খুবই আনন্দ সহকারে বলিলেন—"আমি আর ছাড়িব না। মাকে বিরক্ত করিব।"

মা হাসিয়া বলিলেন—আমিত মেয়ে। বাবা মা কিছু করলে মেয়ে কি বিরক্ত হয়? আমি ও বাবা মা যে অভেদ। নিজে কি নিজেকে নিয়ে বিরক্ত হয়?

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"মাতাজী, কৃপা যেন করেন।"

মা—"কৃপাত তিনি সর্বদাই করছেন। বুঝাবার অধিকারী হওয়ার জন্যই তাঁর দিকে লক্ষ্য করে বসে থাকতে হয়। আপন ঘর একটু বেশী সময় দেও সকলে। কে অনুসন্ধানই কার? ধর্ম্মশালায় আমরা আছি, পিতাজী। মানুষের কর্ত্তব্য সময় হলেই কেউ কারো জন্য বসে

থাকবে না। বিদেশে থাকলেই দুঃখ। আপন ঘরে আপন জনের নিকট থাকলেই আনন্দ। তাই আপন ঘর আপন জনকে খোঁজ। বিদেশে থেকে কতদিন আর কষ্ট পাবে? তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখ।"

১৯শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার।

রাত্রিতে মা শুইয়া শুইয়া বলিতেছেন—"দেখছি লোকনাথ ব্রহ্মচারী এসেছে। ছাদের ঐ স্থানে বসে আছে। রংটা খুব ফর্সা না। সঙ্গে আরও অনেকে এসেছে। ইসারা করছে। আরও দেখলাম খড় দিয়ে বানান একটি স্ত্রী মূর্ত্তি। খড়গুলিও যেন জীবন্ত।"

সূক্ষ্মে লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দর্শন

অভয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি মূর্ত্তি?" মা বললেন— "এখন বলা আসছে না।" তাহার পর আবার বলিলেন—"জিভ না থাকলে যেমন কালীমূর্ত্তি সে রকম। আবার দেখছি একটি ছেলে এখান দিয়ে যাচ্ছে। নীচের দিকে যেন গেল। পরনে কালো পোষাক।"

এইসব শুনিতে শুনিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম। তখন মধ্য-রাত্রি হইয়া গিয়াছে।

২২শে আষাঢ়, শনিবার।

সকালে মা ঘরে বসিয়া আছেন। নিকটে শিশির ব্রহ্মচারী, অভয় প্রভৃতি আরও অনেকে। কথায় কথায় মা বলিতেছেন—"সাধনার খেলাটার ঐ পাঁচ মাসের মধ্যে এমনও একটা সময় গিয়াছে যে জগতে যা কিছু দেখা যায় সবটার থেকেই যেন

সাধনার খেলার সময়ের কথা

সাড়া পাওয়া গিয়াছে। আর সকলের কাছেই একটা প্রার্থনার ভাব আসত—আমাকে পথ করে দেও। সবটার মধ্য থেকেই বাধা আসেত। তাই ঐভাবে প্রার্থনা আসত। এমন কি একটা শুকনা কাঠিই বল না; তা থেকেও সাড়া পাওয়া যেত। একেবারে সব পরিস্কার।"

রাত্রে ছাদের উপর হঠাৎ বৃষ্টি আসায় আমরা মাকে লইয়া নীচের হল ঘরে আসিয়া শুইলাম। একটু পরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"দেখছি একটা স্থানে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তোরাও সব সঙ্গে আছিস্। উজ্জ্বল চেহারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট একজন তান্ত্রিক সাধু আমাকে ডেকে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে চলল। একজন বিধবা মেয়েও আমার সঙ্গে। সে বেশ চালাক চতুর। যেতে যেতে দেখলাম একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী। তারা বলল যে যদি কোনও দরকার হয় তাদের যেন ডাকি।

সূক্ষ্মে জনৈক তান্ত্রিক সাধুর মাকে বশীভূত করিবার দুশ্চেষ্টা

"তান্ত্রিক সাধুটির ঘরে গিয়ে দেখি একপাশে তার ও একপাশে আমার বিছানা পাতা। এই সাধুটি কিন্তু একজন বিখ্যাত সাধু। সকলেই প্রায় তার নাম জানে। ঘরের মধ্যে গিয়েই সাধুটি আমার বিছানা থেকে বালিশটি নিয়ে তার বিছানায় রাখল। আর মুখে বলছে—তোমাদের সব ধন আমায় দিয়ে দেও। মুখে অবশ্য বলছে ধন কিন্তু আসল কথা হচ্ছে সব কিছু দিয়ে যাও। অর্থাৎ আমাদের যেন বশীভূত করে রাখতে চায়; এইরূপ ভাবটা।"

মা আরও বলিতেছেন—"বালিশটা ঐভাবে রাখতে দেখেই আমি একটু জোরে বললাম—'এ কি? তুমি যে ওখানে বালিশ রাখলে?' বিধবাটিকে বললাম—'চল্, যাই।' সে আমার বিছানা-

পত্র তুলতে যেতেই আমি বললাম—'থাক ও সব, চল্।' এর মধ্যে সেই সাধুটি এসে তর্জ্জনী ও বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ধরে একটা ছোট কাল জিনিষ এনে আমার সামনে ধরল। জিনিষটা কি রকম জানিস্? বশীকরণ করবার জিনিষ আর কি। কিন্তু তাতে এ শরীরের কিছুই হচ্ছে না। ঐ অবস্থাতেই তাকে কি বলা হল। সাধু তখন নানা রকমের বিভূতি প্রকাশ করতে লাগল। এখানে হল কি জানিস্? অনেকটা বিশেষভাবে শক্তির প্রকাশ হতে লাগল। আমি বিধবা মেয়েটিকে নিয়ে যেই রওনা হব এমন সময় দেখি সেই তান্ত্রিক সাধুটির আর একজন শিষ্য, অনেকটা তারই মত হৃষ্ট পুষ্ট, সেও এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। ভাবটা এই যে যদি গুরু আমাদের সঙ্গে না পারে তবে সেও সাহায্য করবে। কিন্তু এই শরীরের ভাবে তান্ত্রিক সাধুটি আর আগাতে পারছেনা। তখন এই শরীর ঐ সাধুটিকে অনেক তত্ত্ব কথা বলতে লাগল। ঐ সব কথা শুনতে শুনতে সাধুটির ভাব যেন পরিবর্ত্তন হয়ে যেতে লাগল। আস্তে আস্তে শুদ্ধ ভাব ফুটতে লাগল।"*

২৩শে আষাঢ়, সোমবার।

বিকালে মা হল ঘরে বসিয়া আছেন। নিকটে শাশ্বতানন্দজী, অভয়, নগেনদা প্রভৃতি আরও অনেক আছেন। পুরাতন কথা বিদ্যাকূটে মায়ের উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন—"একবার বিদ্যাকূটে সহিত অন্যায় এক বিয়েতে এই শরীর গিয়েছে। নতুন বউ

* এই প্রসঙ্গে অনেক জিজ্ঞাসায় মা পরে বলিয়াছিলেন যে সাধুটি খেওড়ার একস্থানে। নাম কিছুতেই প্রকাশ করেন নাই। বিধবা স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ৺নির্ম্মলবাবুর মেয়ে তরু।

কৌতুক করার ফলপ্রাপ্তি আসলে সকলেই মুখে চিনি দেয়। এই শরীরের দাদা সম্পর্কে একজন একটু চিনি নিয়ে এসে বলছে—'নাতিন, আমি তোমার মুখে একটু চিনি দেই।' ঠাট্টা করে এই কথা বলছে। বিয়ের পরেই ভোলানাথ বলেছিল যে পুরুষের মুখের দিকে চাইতে নেই। সেইদিন থেকে অন্য পুরুষ ত দূরের কথা শরীরের ভাই সম্পর্কীয়দেরও মুখের দিকে চাওয়া হয়নি। এখন এই রকম ঠাট্টা করে যেই মুখের সামনে চিনি এনেছে অমনি মাথা সরিয়ে নিয়েছি। চোখের দৃষ্টি ও ভাবটা যেন কি রকম হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছা করে যদিও কিছুই করা হয় নি। সে আবার এই ভাবটা দেখেই থতমত খেয়ে সরে গেল। হ'ল কি তারপর, শোনা গেল ২।৩ দিনের মধ্যেই বেচারা কলেরা হয়ে বোধ হয় মারা গেল।"

আবার বলিতেছেন—"তারপর শোন। গায়ে একটা কালো আলোয়ান দিয়ে আমি বসে পান সাজছি। আলোয়ানটা ভোলানাথ দিয়েছিল। সকলে তাকে বলেছিল যে এই রংয়ের আলোয়ান মানাবে তাই। আমি পান সাজছি এমন সময় ঐ লোকটিরই ছোট ভাই এসে ঠাট্টা করে বলছে—'বা, নাতিন! বেশ দেখাচ্ছেত। যেন ঢাকার...।' এই বলে কি একটা ঠাট্টা যেন করল। তার এই কথা কানে যাওয়া মাত্রই ভাবটা যেন কিরকম হয়ে উঠল। আমি কিন্তু পানই সাজছি। ভাবটা আপনা আপনিই ঐরকম হয়ে গেল। তার ফলে হল কি কে একজন একটা দোষ করেছিল, এই লোকটি কিন্তু কিছুই করেনি, লোকেরা যদিও হাতের কাছে একে পেয়ে এমন মার মেরেছিল যে লোকটা একেবারে আধমরা হয়ে গেল। লোকে অবশ্য সকলেই বলল যে বিনাদোষে এইরকম শাস্তি পেল। প্রকৃত কারণত লোকে জানে না তাই।"

মা আরও বলিলেন—"এই যে সব ঘটনা, এত বছরের মধ্যে কিন্তু কেউ এসব কথা জানে না। আজ তোমাদের কাছে প্রকাশ পেল। এই রকম ঘটনা হয়েছে। আবার অন্য রকমেরও আছে। কখনও হয়ত এই শরীরে কি রকম একটা বিদ্যুতের আলোর মত হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল। আবার পরমূহূর্ত্তেই যেমন তেমন। সকলের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করছি।"

বিকালে মা মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসিয়া আছেন। শিশির ব্রহ্মচারী কথা তুলিলেন যে ভোলানাথ-ত মাকে নিষেধ করেছিলেন কোনও পুরুষের মুখের দিকে চাইতে; কিন্তু এইরকমের সতীত্ব ধর্ম্ম সাধারণের পক্ষে অসম্ভব না কি?

ভোলানাথের আদেশে মায়ের পুরুষমুখ না দেখা

মা হাসিয়া জবাব দিলেন—"কি রকমকটা শোন। **পুরুষের মুখের দিকে চাইতে নিষেধ করেছে। শরীরের বাবাও পুরুষ, ভাইও পুরুষ। এমনত বলে দেয়নি বাবা, ভাইয়ের মুখের দিকে চাইতে পারি আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। কারণ আদেশের উপর জিজ্ঞাসা নেই। তাই সকলের মুখের দিকে চাওয়াই একেবারে বন্ধ।**

"আর একবার হল কি; শরীরের একজন জ্যেঠাত বড় ভাই কি কাজে যেন টিনে আলকাৎরা লাগাচ্ছে। খুব পান খাওয়া অভ্যাস। আমাকে একটা পান নিয়ে আসতে বলল। আমি পান নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে দেখে সে পানটা মুখের মধ্যে দিয়ে দিতে বলল। কিন্তু আমিত মুখের দিকে চাইব না। সেত পান মুখে নেওয়ার জন্য হাঁ করেছে। এদিকে আমি করলাম কি, ঠিক পানের দিকেই দৃষ্টিটা রেখে পানটা মুখের মধ্যে ফেলে

দিলাম। আশ্চর্য্য কিন্তু। মুখের ঠোঁটও আমার দৃষ্টির মধ্যে আসেনি।"

৩রা শ্রাবণ, শনিবার।

একজন নেপালী ভদ্রলোক মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। পূর্ব্বে আর একদিন মাত্র আসিয়াছিলেন। আজ আসিয়া বলিতেছেন

জনৈক নেপালী ভদ্রলোককে সূক্ষ্মে মন্ত্রদান

যে মা নাকি তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছেন। প্রথমবার তিনি খেয়াল করেন নাই। তাহাতে মা নাকি তাঁহাকে বলিলেন—অন্যমনস্ক হইতেছ কেন। মন্ত্রটা শোন। ইহার পর তিনি পরিষ্কার সব শুনিয়াছেন।

ভদ্রলোকটির সঙ্গে মার আরও সব কথা একান্তে হইল।

আজ অভয় মাকে কয়েকটি চিঠি পড়িয়া শুনাইতেছে। একটি ছেলে লিখিতেছে—"অনেকে বলে এবং তোমার কথায়ও প্রকাশ পায় যে তুমিই সেই।"

এই কথা শুনিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—"বাঃ, আমি আবার তোদের কাছে বলেছি নাকি যে আমিই সেই।"

অভয়—"বলেন নাই? পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ?"

মা—"ওঃ, কবে কি বের হয়ে গেছে। সেই কথা তোরা ধরে বসে আছিস্।"

অভয়—"কেন এখনও ত কতদিন এইভাবের কথা বের হয়।"

মা—"তা সেত আমি বলিই। সত্যি কথাই। বাবা মা আর এই শরীরত অভেদ। সেই হিসাবেত ঠিকই ঐ কথা। আর এক ছাড়া যখন দুই নেই-ই।"

আবার বলিতেছেন—"বেশ সুন্দর। অনেক সময় আবার এইরকম ভাবটাও গিয়েছে যে সবই তিনি, এমন কি শুকনা পাতাটি পর্য্যন্ত। একেবারে পরিষ্কার এই ভাব। তারপর আবার আমিই সব। এই ভাবটাও একেবারে পরিষ্কার।"

একজন বলিয়া উঠিলেন—"তুমিইত সব; ঠিকইত।"

মা (তাঁহাকেই দেখাইয়া)—"তুমিই-ত সব। এক্কেবারে ঠিক। আবার আমিই-ত সব। যা বল তাই। আনন্দময়ী মা কে? আনন্দময়ই বা কে? ঘটে পটে সর্ব্ব হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত। সর্ব্বত্রই তাঁর বাস, হয় না কখনও তাঁর নাশ। তাঁকে দেখলে তাঁকে পেলেই সব দেখা যায় সব পাওয়া যায়। অর্থাৎ আপনাকে জানলে আর ভয়ের কিছু থাকে না। নির্ভয়, নিশ্চয়, নির্দ্বন্দ্ব, অব্যয়, অক্ষয়,—আবার কি? আমিই সমস্ত, আমিই সর্ব্বাংশ। কেবল নির্ভর—কেবল স্মরণ। এই শরীরটাকে সকলে ভগবান, ভগবান, মা, মা—এই-সব বলবে। আবার বলবে কে? নিজেই-ত বলে নিজেই বলবে। (নিজের শরীর দেখাইয়া) এক ছাড়া দুই কই? অনন্ত প্রকাশ-ত। আমি কি অন্য কাহারো কথা বলি? আপ্ত বচন – প্রমাণ নিশ্চয়।"

এই বলিয়া খুব জোরে হাসিয়া উঠিলেন। মুখের ভাবটিও যেন কেমন অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। এই রকম কথা এত জোর দিয়া সাধারণতঃ কখনই মার মুখ হইতে বাহির হয় না।

৫ই শ্রাবণ, রবিবার।

হর্ষবাবু আমাদের সঙ্গেই আছেন। তিনি আজ মুসৌরী

যাইতেছেন। মাকেও একবার যাইতে প্রার্থনা করিলেন। মার-ত কিছুই ঠিক নাই। যখন যাহা হইয়া যায়।

মধ্য রাত্রিতে রায়পুর হইতে কিশনপুর গমন

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় মা সকলকে লইয়া কিশনপুর চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখি সমস্ত আশ্রম নিদ্রায় অচেতন। মা যে এইরূপ মধ্যরাত্রে হঠাৎ আসিতে পারেন তাহা সত্যই ধারণাতীত। অকস্মাৎ এত লোক-জনের গোলমাল শুনিয়া সকলে উঠিয়া আসিলেন। বিদ্যাপীঠের শিক্ষক নগেনবাবু, ধীরেন বাবু প্রভৃতির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বাবা, এই মেয়েটী রাত্রেও একটু শান্তিতে ঘুমাতে দেবেনা! কোথায় রায়পুর আর কোথায় কিশনপুর। এখানে এসেও এই ভাবে ঘুমে বাধা দেবে।" এই বলিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন। অন্যান্য উপস্থিত সকলেও হাসিতেছেন।

মধ্য রাত্রিতে রায়পুর হইতে কিশনপুর গমন

রাত্রি প্রায় দেড়টার পর মা শুইতে গেলেন। কথা হইল কাল সকাল আটটায় মুসৌরী রওনা হইবেন। সঙ্গে আশ্রমের ব্রহ্মচারী বালকেরাও শিক্ষকবৃন্দ সহ যাইবে।

৬ই শ্রাবণ, সোমবার।

মুসৌরীতে মা

আজ সকালে প্রায় ৩০ জনকে সঙ্গে লইয়া মা মোটরে মুসৌরী রওনা হইলেন। সেখানে গিয়া মাকে লইয়া আমরা সনাতন ধর্মশালায় উঠিলাম। ধর্মশালার কর্ত্তৃপক্ষ মাকে বিশেষ ভাবে চেনেন। মা এখানে আরও

কয়েকবার আসিয়াছেন। মার থাকিবার জন্য যথাসাধ্য ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিল।

বিকালে আমরা অনেকেই মুসৌরী হইতে ফিরিয়া আসিলাম। মা সেখানে সামান্য কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া থাকিলেন। কতদিন থাকিবেন তাহা কিছুই অনুমান করিতে পারা গেলনা।

৯ই শ্রাবণ, শুক্রবার।

কিশনপুর হইয়া সোলন গমন

গতকাল মা কিশনপুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজই আবার সোলন রওনা হইবার কথা হইয়াছে।

১০ই শ্রাবণ, শনিবার।

মার সঙ্গে আজ আমরা আসিয়া সোলনে পৌঁছিলাম। রাজাসাহেব* মার যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছেন।

১৩ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার।

সোলন সহর হইতে ৬ মাইল দূরে বহোচ্ নামক স্থানে রাজাসাহেবের একটি মন্দির ও সংলগ্ন বাড়ী আছে। বিকালে মাকে সেখানে

---

* রাজা শ্রী দুর্গা সিংহজী, সি, আই, ই। বাঘাট রাজ্যের রাজধানী হইতেছে সোলন। ইহা বর্ত্তমানে হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। সিমলা হইতে ৩০ মাইল দূরে।

লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে রাজাসাহেব নিজেও আছেন। বেশ মনোরম নির্জ্জন স্থানটি। মায়েরও স্থানটি বেশ ভালই লাগিল।

১৫ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।

স্থানীয় স্ত্রীলোকেরা আজ মার নিকটে কীর্ত্তনের আয়োজন করিয়াছেন।

পাঞ্জাবী মহিলাদের মায়ের প্রতি আকর্ষণ

একজন শিখ মহিলা মার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছেন। নাম প্রকাশ, ভাবটি খুবই সুন্দর। মাকে দেখিয়া একেবারে যেন গলিয়া গিয়াছেন। শরীর খারাপ। কিন্তু তবুও নিত্য মার দর্শনের জন্য আসা চাই-ই। পাহাড়ের উপর উঠিয়া হাঁপাইতে থাকেন। মাকে দেখা মাত্রই যেন তাঁহার সমস্ত কষ্ট দূর হইয়া যায়। শরীরের ভিতর দিয়া যেন একেবারে আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে। মার সঙ্গে সামান্য কয়েকটি দিনের পরিচয়। ইতিমধ্যেই বলিতেছেন—"আমি কিন্তু মার সঙ্গে কিছুদিন থাকিব। মাকে ছাড়িয়া বাসায় থাকা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হইবে।"

আরও একজন মহিলা, নাম কৃষ্ণকুমারী। ইনিও অসুস্থ শরীর লইয়াই প্রত্যহ মার দর্শনের জন্য আসেন। ইঁহারা মার কিছু কিছু বিভূতির প্রকাশও পাইয়াছেন শুনিলাম।

১৬ই শ্রাবণ, শুক্রবার।

সিমলায় কালীবাড়ীতে নাম যজ্ঞ। সেইজন্য মাকে লইয়া যাইবার

উদ্দেশ্যে জিতেন* আসিয়াছে। মা যাইবেন বলিয়া কোনও কথা এখনও দেন নাই। জিতেনের মনে তাই বেশ আশঙ্কা আছে। তবু মা যদি কৃপা করেন সেই জন্য বার বার প্রার্থনা জানাইতেছে।

শেষ পর্য্যন্ত মার যাওয়াই স্থির হইল। আমরা খাওয়া দাওয়ার পর সোলন হইতে মোটরে রওনা হইয়া দেড় ঘণ্টার মধ্যেই সিমলা কালীবাড়ীতে পৌঁছিলাম।

১৮ই শ্রাবণ, রবিবার।

আজ স্বর্য্যোদয় হইতেই নামযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। মাকে এই উৎসবে পাইয়া সকলেরই মহা আনন্দ। সন্ধ্যার সময় কীর্তন সমাপ্ত হইল। মা রাত্রি নয়টায় সোলন রওনা হইলেন। প্রায় এগারটা নাগাদ আমরা আসিয়া সোলনে পৌঁছিলাম। আসিয়া দেখি রাজা সাহেব সস্ত্রীক মার দর্শনের জন্য তখনও প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

সিমলাতে নামযজ্ঞ

১৯শে শ্রাবণ, সোমবার।

আজ জ্যোতিষদাদার (ভাইজী) তিরোধান তিথি উৎসব। রাজা সাহেব ভাইজীর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁহারই আগ্রহে এখানে উদয়াস্ত নামকীর্তন, পূজা, পাঠ, আরতি ইত্যাদির বন্দোবস্ত হইয়াছে। রাত্রি প্রায় বারটা পর্য্যন্ত উৎসব চলিল।

---

* ভারত সরকারের ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দত্ত। মায়ের পুরাতন ভক্ত। বর্ত্তমানে ইনি ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ্ কমিশনের মেম্বার।

২০শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার।

আজ সন্ধ্যায় মাকে লইয়া আমরা হরিদ্বার রওনা হইলাম। মাকে আরও কয়েকটি দিন এখানে থাকিবার জন্য রাণী সাহেব ও রাজা সাহেব বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু মার যখন খেয়াল হইয়াছে তখন তাহা পূর্ণ হইতে বাধ্য।

হরিদ্বার যাত্রা

২২শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।

মা হরিদ্বারে আছেন। একজন পাঞ্জাবী ভদ্র মহিলা তাঁহার একটি বাড়ী কন্যাপীঠের মেয়েদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজ ঝুলন পূর্ণিমার দিন মার উপস্থিতিতে কীর্ত্তনাদি করিয়া কন্যাশ্রমের কাজ এই বাড়ীতে আরম্ভ করা হইল।

কন্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা

বিকালের গাড়ীতেই মা রায়পুর রওনা হইয়া গেলেন।

৩১শে শ্রাবণ, শনিবার।

আজ হরিদ্বার হইতে রায়পুরে আসিয়া দেখিলাম মার শরীরটা বিশেষ ভাল যাইতেছে না। মার ভাবটা কেমন যেন চুপচাপ। বলিলেন—"কথা যেন সব সময়ে বের হচ্ছে না। আগে যেমন শরীরটা ২।৩ দিনও পড়ে থাকত সেই রকমটা এক এক সময়ে হয়ে উঠে।" মার কথাগুলিও শুনিতে একটু যেন অস্পষ্ট।

রায়পুরে মা

হৃষিকেশের পূর্ণানন্দ স্বামীজীর একজন শিষ্য আজ কয়েকদিন হয় মার নিকট আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে তবু কিছু কিছু কথা মা বলিতেছেন। তাহাতে মার চুপচাপ ভাবটা যেন একটু ভাঙ্গিতেছিল।

আজ মহাত্মা গান্ধীজীর বিশেষ অনুগত দেশসেবক শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ কাশীনারায়ণ তনখার সঙ্গে মার দর্শনের জন্য আসিলেন। শুনিলাম মহাত্মাজী তাঁহার নিকট মাকে দর্শন করিবার জন্য লিখিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলালজী বর্তমানে দেরাদুন জেলে আছেন। তাঁহার সহিত দেখা করিতেই বাজাজজী দেরাদুনে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া মহাত্মাজীর আদেশমত মার দর্শনে আসিয়াছেন।

যমুনালালজীর মায়ের নিকট আগমন

যমুনালালজী মার সঙ্গে বিশেষ পরিচিতের ন্যায় অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন। একান্তেও সাধন ভজন সম্বন্ধে কিছু কথা বলিলেন। যাইবার সময় বলিলেন—"আমার বড় ভাল লাগিতেছে। উঠিতে ইচ্ছা করিতেছে না।" আবার আসিবেন বলিয়া গেলেন।

তাঁহার ভাবটি দেখিয়া মাও বলিতেছিলেন—"**বাবা সব সময়েই মেয়েকে দেখে আনন্দ পায়। আর ছোট্ট মেয়ে ভুল শুদ্ধ যাই কিছু বলুক না কেন বাবার কাছে তাই খুব মিষ্টি লাগে। এ শরীর ত সর্বদাই বলে যে একটা বাজনা পড়ে আছে। তোমরা যে যেমন বাজাচ্ছ সেই রকমই শব্দ শুনছ।**"

কি কথায় যমুনালালজী বলিতেছিলেন তিনি যখন জেলে ছিলেন—

মা তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"**পিতাজী জেলেই-ত আছ। তুমি বুঝি ভেবেছ মুক্ত হয়েছ? আসল মুক্তির জন্য—তাঁর জন্য একটু একটু সময় দিতে চেষ্টা কর। যদি তাঁরই সেবা তিনিই করিয়ে নিচ্ছেন—এই ভাবটি রাখা যায় তবে বন্ধনের কারণ হয় না। তা না হলেই**

বন্ধনের কারণ হয়। প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ভাব জেগে ওঠে। আবার মার সেবা কে করে? নিজের সেবা নিজেই করছে। আবার তাঁর সেবা তিনিই করছেন। সেবাও তিনি, সেবকও তিনি, সেব্যও তিনি। এক ভিন্ন দুইত নাই-ই।"

মায়ের মুখ হইতে মন্ত্রোচ্চারণ

বিকালের দিকে মার মুখ দিয়া আবার নানাপ্রকার মন্ত্র বাহির হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছে। এইরূপ ভাবে অনেকক্ষণ কাটিলে তাহার পর চক্ষু বুজিয়া কিছু সময় চুপচাপ বসিয়া রহিলেন।

১লা ভাদ্র, সোমবার।

যমুনালালজীর মায়ের প্রতি আকর্ষণ

সকাল দশটার সময় কাশীনারায়ণবাবুর সঙ্গে যমুনালালজী মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। কাশীনারায়ণবাবু ও তাঁহার স্ত্রী লক্ষীর মুখে শুনিলাম যে যমুনালালজী মাকে দেখিয়া এবং মার কথা শুনিয়া খুবই মুগ্ধ হইয়াছেন। আজ সমস্ত দিনটা তিনি মার নিকটেই থাকিবেন এই ইচ্ছা লইয়াই আসিয়াছেন।

আজও যমুনালালজী মার সঙ্গে একান্তে কিছুক্ষণ কথা বলিলেন।

দুপুরবেলা মার খাওয়া প্রস্তুত করিয়া মাকে ডাকিতে গেলাম। মাকে বলা মাত্রই মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে খড়ম পায়ে দিলেন না। বাহিরে আসিয়া পরিলেন।

আমি মাকে বলিলাম—"তোমার সবই একেবারে ঠিক ঠিক হয়ে যায়। ঘরে সকলে বসে আছে তাই খড়মটি পর্য্যন্ত পরলে না।" মা

শুধু একটু হাসিলেন। সত্যই অনেক সময়ে দেখা যায় ঘরে লোকজন থাকিলে মা সাধারণতঃ পাদুকা লইয়া ভিতরে যান না। আমরা অনেক সময় মাকে হাসিতে হাসিতে বলি—"নিজের ঘরে যাইবে তাও জুতা আগে বাহিরে রাখা চাই। যেন কোনও মন্দিরে ঢুকছ!"

মা একবার বলিয়াছিলেন—"তোদের-ত সেইরূপই ভাব। তাই তোদের ভাবটা নষ্ট করা কেন? সেইরকমই ব্যবহারটাও আপনা থেকেই হয়ে যায়।"

২রা ভাদ্র, মঙ্গলবার।

যমুনালালজী গতকাল সমস্ত দিনটি আশ্রমেই ছিলেন। আজ যাইবার কথা ছিল। কিন্তু আজও থাকিয়া গেলেন। মার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন দেখা যাইতেছে।

৯ই ভাদ্র, মঙ্গলবার।

যমুনালালজীর কথা

যমুনালালজী মার নিকট আশ্রমে একদিন থাকিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ নয়দিন হইয়া গেল। এখনও তিনি মার নিকটেই আছেন। মার কাছে আরও কিছুদিন থাকার বিশেষ ইচ্ছা। মহাত্মাজীর নিকট টেলিগ্রাম করিয়া এখানে আরও থাকিবার অনুমতি আনাইয়াছেন।

এই সামান্য কয়দিনেই তিনি যেন আমাদেরই একজন হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ভাব এবং মার উপর অসীম শ্রদ্ধা ভক্তি বিশেষ লক্ষ্য করার বস্তু। তিনি বলেন যে তাহার একটা তীব্র ইচ্ছা

ছিল যে কোনও একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্না মাতাজীর নিকট সন্তান ভাবে থাকেন। গান্ধীজীকে তিনি নিজ পিতার ন্যায় মনে করেন সত্য। কিন্তু উপযুক্ত মাতা এতদিনেও পান নাই। উপযুক্ত মার নিকট থাকিয়া জগতের সমস্ত স্ত্রীজাতিকে মাতৃভাবে কল্পনা করিতে পারাই তাহার আদর্শ। সমস্ত অন্তর বাহির যাহাতে মা-ময় হইয়া যায়। আজ এতদিন পরে তিনি প্রকৃত মার দর্শন পাইয়াছেন বলিয়াই মনে করেন।

প্রত্যহই যমুনালালজী মার সঙ্গে কিছু সময় কথা বলেন। কয়েকটি জিনিষ তাঁহার খুবই লক্ষ্য করার বিষয়। ভোর চারটা বাজিতে না বাজিতেই তিনি নিঃসঙ্কোচে মার ঘরে ঢুকিয়া মার পায়ে হাত বুলাইতে থাকেন। খাওয়ার সময়ও মার প্রসাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি খাইতে আরম্ভই করেন না। বেশ আনন্দেই দিন কাটাইতেছেন।

সূক্ষ্মে জনৈক মহিলাকে দর্শন

আজ একজন পাঞ্জাবী শিক্ষয়িত্রী মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকালবেলা মা বিছানা হইতে না উঠিয়াই বলিতেছিলেন—"একজন মেয়েকে দেখছি।" বিকালে সেই মেয়েটি মার নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেই মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—'এর কথাই সকালে বলছিলাম। একেই দেখা গিয়েছিল।' আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এই মেয়েটি পূর্ব্বে মার নিকটে কখনও আসে নাই কিন্তু সে আসিবার অনেক আগেই মা তাহার সব কিছু দেখিয়া রাখিয়াছেন। মার নিকট দূরত্বের যে কোনও প্রশ্নই নাই!

১১ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার

আজ মা হরিদ্বার রওনা হইলেন। যমুনালালজীও মার সঙ্গেই চলিলেন। মা গিয়া কন্‌খলে স্থুরজমলজীর ধর্ম্ম-শালায় উঠিলেন।

হরিদ্বার গমন

যমুনালালজীর সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা লিখিবার আছে। একদিন তিনি শিশুর মত মার নিকট আবদার জানাইলেন যে মা তাঁহার তিনটি দাবী পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত তিনি অন্যত্র যাইবেন না। প্রথমতঃ—আমাদের আশ্রমের ভিতরেই একটি কুঠিয়া বানাইয়া তিনি মার নিকটে থাকিবেন। সেখানে মার পায়ের ধূলা দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—মার তাঁহাকে একটি নাম দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ—মার সঙ্গে একান্তে যে সব কথা হইয়াছে তাহা যেন আমরা কেহ না জানি ইত্যাদি।

যমুনালালজীর আশ্রম বাসের ইচ্ছা ও নূতন নাম গ্রহণ

যমুনালালজীর স্বভাবটি সত্যই এত সুন্দর যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। তিনিও নিজেকে মায়ের সন্তান বলিয়াই মনে করেন। তাই কেহ তাঁহাকে 'শেঠজী' বা 'বাজাজজী' বলিয়া সম্বোধন করে তাহা তাঁহার ইচ্ছা না। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে দুইটি নামের প্রস্তাব হইল—'ভাইজী' ও 'ভাইয়া'। অবশেষে 'ভাইয়া' নামই সাব্যস্ত হইল। যমুনালালজীর ইহাতে মহানন্দ।

১৭ই ভাদ্র, বুধবার।

মা হরিদ্বার হইতে গতকাল দিল্লীতে আসিয়াছেন। আজই সন্ধ্যার পর বিন্ধ্যাচল রওনা হইলেন। যমুনালালজী আমাদের

দিল্লী হইয়া বিন্ধ্যাচলের পথে

সঙ্গেই ছিলেন। তবে আজ পথে মোরাদাবাদ স্টেশনে তিনি মার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নামিয়া গেলেন। তিনি যখন মাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন সেই দৃশ্যে আমাদেরও মনে খুবই কষ্ট বোধ হইল। আমাদের সকলের সঙ্গেই তাঁহার এতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে কিরূপে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা সত্যই আশ্চর্য্য !

১৮ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।

মাকে লইয়া আজ বিন্ধ্যাচলে আসিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু কতদিন এখানে থাকা হইবে তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। একস্থানে বেশী সময় থাকিবার ভাব দেখা যাইতেছেনা।

২০শে ভাদ্র, শনিবার।

সন্ধ্যাবেলা কাহাকেও সংবাদ না দিয়া মা হঠাৎ কাশী রওনা হইলেন। সঙ্গে মাত্র পরমানন্দ স্বামী, কমলা, দেবীজী এবং আমি।

কাশীতে গঙ্গা-বক্ষে অজ্ঞাতবাস

রাত্রি প্রায় এগারটায় কাশী আসিয়া নৌকাতে থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল। শুধু অভয় ও নেপালদাদা মার সংবাদ জানিতে পারিলেন। আর কাহাকেও সংবাদ দিতে মা নিষেধ করিলেন।

২৪শে ভাদ্র, বুধবার।

আজ চারদিন হইল মা গঙ্গার উপরেই অজ্ঞাতবাসে আছেন। নৌকা কখনও অসির দিকে কখনও রামনগরে রাখা হয়। মা কোথায়

আছেন, তাহা কাশীর অন্য কেহ এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। শুধু নেপাল দাদা আসিয়া দেখা করিয়া যান। মাও বলিতেছিলেন—"যে কয়দিন চলে চলুক। যদি খবরাখবর হয়ে যায় যাবে।"

আজ রাত্রিতেই মার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দুই একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুঝিলাম এইবার মার অজ্ঞাত বাস সমাপ্ত হইল।

আগামী কাল সকলকে সংবাদ দিবার কথা মা নিজেই বলিলেন।

৪ঠা আশ্বিন, রবিবার।

মা এখনও নৌকার উপরেই আছেন। মার সহিত এই ভাবে গঙ্গার উপর বাস করিতে যে কত আনন্দ তাহা কল্পনাতীত।

আজ চূড়ামণি যোগ। সকলকে সঙ্গে লইয়া মা গঙ্গায় স্নান করিলেন।

২৩শে আশ্বিন, শুক্রবার।

কাশীতে প্রায় এক মাসের উপর হইল। মা আর কতদিন এই ভাবে নৌকাবাস করিবেন তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে মার শরীরটা একটু অসুস্থ হওয়ায় আজ মাকে অনেক বলিয়া ত্রিলোচন ঘাটের উপর একটি মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। আমরাও মার সঙ্গে মন্দিরেই গেলাম।

ত্রিলোচন ঘাটের উপর একটি মন্দিরে অবস্থান

১৭ই কার্ত্তিক, সোমবার।

এই কয়দিন মা আমাদের অনুরোধে মন্দিরেই আছেন। শরীরটা

পুনরায় নৌকাবাস

ইতিমধ্যে বেশ খারাপ হইয়াছিল। ৫।৬ দিন যাবৎ জ্বরও হইয়াছিল। শরীর একটু সুস্থ হইলেই মা আজ আবার নৌকায় ফিরিয়া গেলেন। এবার মার নির্দ্দেশে নৌকা অসিঘাট ছাড়াইয়া আরও দূরে রাখা হইল।

কাশীস্থ চৌখাম্বার মিত্রবাড়ী বেশ প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার। ঐ বাড়ীর অনেকেই মার নিকট প্রায়ই যাওয়া আসা করেন। মায়ের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব দেখিতে পাই। কেহ কেহ মাকে নাকি বিশেষ বিশেষ দেবী মূর্ত্তিতেও দর্শন করিয়াছেন।

১৯শে কার্ত্তিক, বুধবার।

বিন্ধ্যাচলে প্রত্যাবর্ত্তন

আজ প্রায় দুই মাস এই ভাবে মা আপন খেয়াল অনুযায়ী কাশীধামে থাকিয়া পুনরায় বিন্ধ্যাচলে রওনা হইলেন।

২৭শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

অনেক দিন পূর্ব্বে কাশী হইতে চৌখাম্বা মিত্রবাড়ীর পটল*, অজিত দাদা** ও শ্রীমান নেড়ু*** আসিয়াছিল। কথায় কথায় পটল বলিতেছিল—"এক মহাবিপদ হয়েছে। যার সঙ্গেই দেখা হয় সেই আমাদের জিজ্ঞাসা করে—'মার কাছে যে এত যাওয়া আসা করেন, কি পান?' "

---

* শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার বসু।

** শ্রীঅজিত কুমার বসু।

*** শ্রীসুনীতি কুমার বসু।

মা এই কথা শুনিতে পাইয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—
"কিছুই যে পাওয়া যায় না—এইটাই পাই! তবে বলতে পার যে কষ্ট আবার কেন? না—এইটা বুঝবার জন্যই। পেলেই হারায়!"

আজ বিকালে বেড়াইয়া আসিয়া মা উপরের বারান্দায় সকলের সঙ্গে বসিয়াছেন। কথায় কথায় বলিতেছেন—"আজ দুপুরে শোয়ার ভাব যেন ছিলনা। খুকুনী, বুনি, অভয় ওরা কে-কে সেখানেই আছে। এ শরীরটা যদিও পড়ে আছে যেমনটা থাকে। হঠাৎ একটা ধ্বনি হল। মুখে কিছু বলার দরকারই নেই। শুধু ধ্বনি হচ্ছে—'এই তিরোভাব'। সকলেই বুঝছে তিরোভাবই। কিন্তু অভয়ের ভাবটা যেন—'ওসব শুনবার আমার দরকার নেই। যা তা আমি বুঝেছি' এই রকম ভাবটা।

সূক্ষ্মে ধ্বনি শ্রবণ—'তিরোভাব'

এই পর্য্যন্তই মা শুধু প্রকাশ করিলেন। অধিক আর কিছু জানা গেল না।

কাশী হইতে মৌনীমা (কৃষ্ণা মা) কয়েক দিন হয় এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা বেশ উন্নত বলিয়াই মনে হয়। গতকাল তিনি আশ্রমের নীচের গুহায় বসিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার কিছু কিছু অনুভব হইয়াছে। আজ মার নিকট তিনি সেই কথাই বলিতেছিলেন—"গুহাটি অতি চমৎকার জায়গা। গুহার মধ্যে বসা মাত্রই আমার শরীর যেন পাথরের মত হয়ে গেল। তারপর ওখানে যে তোমার পাদপীঠ রাখা আছে সেটা আগে আমি দেখিনি। কিন্তু একটু পরেই পাদপদ্মটি সুন্দর জ্বল জ্বল করে চোখের সামনে ফুটে উঠল। তারপর

কৃষ্ণা মার দর্শনাদি

দেখলাম তুমি যেন আমার পাশে গিয়ে বলছ—'আর কাশী যেওনা।' সেখানে অভয়, রেণু (মৌনীমার মেয়ে) ও সুরেশানন্দ স্বামীকেও দেখলাম।"

মৌনীমার এইরূপ অনেক রকম বাণী শ্রবণ ও দর্শনাদি বহুদিন যাবৎই হইতেছে। তাঁহার নিজ মুখ দিয়াও অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা বাহির হইয়াছে। ঐসকল কবিতা পুস্তকাকারে 'কণিকা-মালা' নামে প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রতিটি কবিতা খুবই ভাবযুক্ত।

সন্ধ্যায় কীর্ত্তনাদির পর অভয় মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"আপনি যে দেখলেন 'তিরোভাব,' তখন আপনার শরীর ওখানে কিভাবে কোথায় ছিল ?"

মা বলিলেন—"শূন্যের মধ্যে।"

অভয়—"বসে না শুয়ে ?"

মা—"শোয়াও না বসাও না। ওরা সব বুঝছে আমিই বলছি। ওদিকে আমি কিন্তু মুখ দিয়ে বলছিনা। তারপর তোকে লক্ষ্য করে যেন ধ্বনিটা হল। তখন তুই বললি যে বুঝেছি। এইখানে থাকা সত্ত্বেও এই সব পাহাড় ইত্যাদি যেন নেই।"

সূক্ষ্মে পটল ও নেড়ুকে দর্শন

একটু থাকিয়া মা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"কাল রাত্রিতে নেড়ু ও পটলকে দেখা গেল। পটলের চেহারা আর একটু ভাল। কিন্তু নেড়ুর চেহারাটা আরও যেন বালকের মত।"

পটল ও নেড়ু আজই কাশী ফিরিয়া গিয়াছে। অজিত দাদা এখনও আছেন। তিনি এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"ওরা ভাগ্যবান।"

সূক্ষ্মে বিভিন্নরকমের দর্শন

মা বলিলেন—"আরও একদিন কাশীতে দেখছিলাম। তোমরাত রোজ নৌকাতে আসতে। বসে বসে আমি দেখছি তোমরা আসছ। নৌকার আগের দিকে তুমিই চেপে বসে আছ। এইরকম আরও কিছু কিছু দেখা গেল।"

এই বলিয়া বলিতেছেন—"ঐসব কত আর বলা যায়। সর্ব্বদাইত হচ্ছে। সিনেমা বায়োস্কোপের মত কত কিছুই দেখা যায়। আজ একটি মেয়েলোক এসেছিল। বলছিল কি শুনেছ? আশীদিন নাকি সমাধি অবস্থায় ছিল। আবার বলে চিঠিপত্রও নাকি কোথা থেকে আসে। আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে এসব হতে পারে কিনা। এ শরীর বলল যে সবই সম্ভব সবই হতে পারে। আজ দুপুরে একজন সাধুও এশরীরের কাছে এসেছিল। উপস্থিত ভাবটি বেশ কিন্তু দেখা গেল।"

৩রা অগ্রহায়ণ, বুধবার।

গতকাল মা কাশীতে আসিয়া বাচ্চুদের* বাগানে কুটিয়াতে আছেন।

কাশীতে মার মুখ হইতে পূর্ব্ব কথা প্রকাশ

রাত্রিতে মার মুখ হইতে নিজের পূর্ব্ব কথা কিছু কিছু প্রকাশ হইল। মা বলিতেছেন—"বাজিতপুরে থাকতে খেয়াল হল যে কারো সঙ্গে কথা বলা না। বিশেষ প্রয়োজন হলে শুধু ভোলানাথের সঙ্গে সামান্য কথা। অমনি মৌন আরম্ভ হল। ঐ খেয়ালটা

* আমার ভাগিনেয় শ্রীমান দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। ৺নির্ম্মল বাবুর পুত্র।

কিন্তু বাণীর আকারে প্রকাশ পেল। ঐ বাণীর সময় প্রশ্ন হল আপনা থেকেই—'তুমি যে বলছ, তুমি কে?' উত্তর এল—'আমি আপনা হতেই।' এই সব যে প্রকাশ এ কিন্তু আমা হতেই, আর কি। তারপর দেখ আবার কথা বের হল—'কাহাকেও প্রণাম করা না।' এই যে প্রণাম বন্ধ এর মধ্যেও কত রকমের ভাব থাকতে পারে। প্রথমে একটা কথা হল যে আমা হতেই সব। কাকে প্রণাম করব? এই রকম ভাবটাই কিন্তু বিশ্বব্যাপক। যা কিছু প্রকাশ অপ্রকাশ সব এই হতেই। যত সাকার নিরাকার সগুণ নির্গুণ, রূপ অরূপ; সর্বনাম সর্বরূপ সর্বগুণ। নাইও আছেও, আবার আছেও না নাইও না। যা কিছু তোমরা বল। কিছু বললেই কিন্তু কিছু বলা হয় না। ব্যক্ত অব্যক্ত এই যে। (নিজ শরীর দেখাইলেন) তবে প্রণাম কোথায়? আবার প্রণাম ইত্যাদি যা সবই যে হয়ে যাচ্ছে—ইহাতেই যে।"

মায়ের প্রণাম বন্ধ

মা আবার বলিতেছেন—"এই যে আমিই আছি আর কিছুই নাই—এওত ভাষায় বলা হচ্ছে। এছাড়া আর বুঝবার বা প্রকাশ করার অন্য উপায় কি? আবার দেখ, এই যে সকলে প্রণাম করছে এওত আমিই। ঐ একটা দিকত আছেই আবার এও কিন্তু একটা দিক। হাতে খাওয়া বন্ধ—সবই যে আমার হাত। আবার সেটা একসময় ভেঙ্গে গেল। হাতে খাওয়া আরম্ভ হল। কিন্তু ঠিক ঠিক

মায়ের নিজহস্তে খাওয়া বন্ধ

খাওয়া হয় না বলে তোমরা খেতে দিলেনা। এই যে বললাম এও কিন্তু কিছুই বলা হয় না। এখানেত প্রাপ্ত হওয়া বা স্থিত হওয়ার কোনও কথা নেই। যা তাই আছে। তবে অবস্থাগুলি যেভাবে খেলেছিল সেইগুলি বলা মাত্র।”

আরও বলিতেছেন—“আবার দেখ ঘটনা। ঐ যে দীক্ষার মত কি সব হয়ে গেল না। ভোলানাথকে বলা হল যে তিন দিন পর্য্যন্ত যেন কিছু জিজ্ঞাসা না করে। তিনদিন কি চারদিন পরে যখন জিজ্ঞাসা করল—কে তুমি? তখনই ঐ কথা প্রকাশ পেল— পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। আবার একথাও কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যে এই অবস্থার পরও আবার বাজিতপুরে ও শাহবাগে ঐ রকম সব নিয়ম, যেমন গাছের নীচের ফল খেয়ে থাকা, তিনটি ভাত খেয়ে থাকা ইত্যাদি সাধু-জীবনের নিয়ম সব পালন করা কেন আরম্ভ হল। কথাটা হল কি—এই শরীরে কোনও নিয়মইত বেশীদিন চলে নি। সেই সময়টা ঋষিমুনিদের ভাবটা যেন এই শরীরের ভিতরে একেবারে জ্বল জ্বল করে উঠল। তাই কয়েকটা দিন তাঁদের ভাবগুলিই চলল। এই নানা রকমারী ভাবগুলি নিয়ে শরীরটা খেলতে লাগল আর কি। আপনাকে নিয়ে আপনিইত। এই শরীরে কোনও অবস্থা-নিবন্ধের প্রশ্নই নাই।”

“পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ”

মায়ের শরীরে মুনিঋষিদের ভাবের খেলা

আরও বলিলেন—“অনেক সময় শোনা যায় যে সাধক-

দের এমন একটা অবস্থা অনেক সময় আসে যখন কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর তাড়না কিছু-দিনের জন্য খুব বেড়ে যায়। দেখ, এই শরীরটার কিন্তু সেরকম ভাব হলই না। এই শরীরটার কথা বাদই দেও। সাধারণতঃ কারো ভিতরে একটু বীজ না থাকলে ঐরকম ভাবগুলি আসতেই পারে না। এসব কথা সকলের পক্ষে বোঝা মুস্কিল। কারণ এই ভাবধারাত সকলের পক্ষে সহজ না।"

মায়ের শরীরে ষড়রিপুর অভাব

কথায় কথায় মা আবার বলিলেন—"একদিন দেখি এক সুন্দর দেবীমূর্ত্তি, কিন্তু বস্ত্রহীন। পাথরের মূর্ত্তির মত দিব্যি ছোট খাট সুন্দর। ওমা! কিছুপরে দেখি হাত মুখও নাড়ছে। শেষে এই শরীরটাকে যেন কোলে বসাল। যে দেবী, আমার ভিতরে ভিতরে কিন্তু সেই বীজমন্ত্রই চলছিল।"

সূক্ষ্মে দেবী মূর্ত্তির ক্রোড়ে মা

১৬ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার

খাওয়ার পরে মা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"আমি একটু ঘুরতে যাই।" হাসিতে হাসিতে এইটুকু বলিয়াই রওনা দিলেন। কোন দিকে যাইতেছেন কিছুই জানি না। তাড়াতাড়ি পরমানন্দ স্বামী, অভয়, বাচ্চু, পটল, মানিক ও আমি মার অনুগমন করিলাম। বাচ্চু ও মানিককে মা সঙ্গে আসিতে মানা করিলেন। মানিক বলিল যে সে সঙ্গে

গঙ্গাবক্ষে অজ্ঞাতবাস

যাইবে না। তবে বাচ্চু মার কথা শুনিল না। একটু পরেই দেখি বাচ্চু হঠাৎ কিভাবে যেন সাইকেল হইতে পড়িয়া গিয়াছে। মার আদেশ অমান্য করিবার ফল বোধ হয় এইভাবে সঙ্গে সঙ্গেই পাইল। তবে সাইকেল হইতে উঠিয়া আবারও মার পিছনে পিছনে রওনা হইল।

খানিকটা দূরে গিয়া মা বলিলেন—"গঙ্গার ধারে গিয়া নৌকা কর।" মার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ছোট একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া অজানা পথে রওনা হইলাম। মার সঙ্গে আমরা ২।৩ জন রহিলাম। বাকী সকলকেই মা ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন।

১৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার।

গতরাত্রিটা মাকে লইয়া আমরা নৌকার উপরেই কাটাইয়াছি। আজ ভোরে মণিকর্ণিকা ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া একটি শিব মন্দিরে গিয়া উঠিলাম। আহারাদি সেখানেই করিয়া মা একটু বিশ্রাম করিয়া লইলেন। রাত্রিবাস কোথায় হইবে এখনও জানা নাই।

১৯শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার।

দুইদিন মন্দিরে বাস করিয়া মা আজ আবার বাচ্চুদের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। পথে বেশ কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া মা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মাকে প্রথমে কেহই চিনিতে পারিল না। এই লইয়া বেশ আনন্দ হইল।

সন্ধ্যাবেলা মা ঘরে বসিয়াছেন। নানা প্রকার কথা হইতেছে। কি কথাপ্রসঙ্গে মা বলিলেন—"তাঁকে নিয়েই থাকতে চেষ্টা

নামকেই একমাত্র অবলম্বন করা

করা। বুড়া মানুষরা যেমন ঘরে ঢুকবার সময় লাঠিটি নিয়ে যায় আবার বাইরে আসার সময়ও লাঠিটি নিয়েই বাইরে আসে, চলবার সময়ও লাঠি তাদের সঙ্গেই থাকে। সেই রকম তাঁকে নিয়ে তাঁর নাম নিয়ে সর্ব্বদা থাকবার চেষ্টা করা। তাঁকেই একমাত্র অবলম্বন করা।"

২৩শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার।

সকালে মহেন্দ্রবাবু * মার দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ যাবৎ নানা দার্শনিক আলোচনা হইল। তিনি সম্প্রতি কাশীতে আসিয়াছেন। তাই প্রত্যহই প্রায় দুইবার করিয়া মার নিকট আসেন।

২৯শে অগ্রহায়ণ, সোমবার।

মা এখনও বাচ্চুদের বাড়ীতেই আছেন। সেদিন মা বলিতেছিলেন প্রায় হনুমানের মত উঁচু একটি মূর্ত্তি বাগানের ভিতরে ঢুকিয়া মার কুটিয়ার দিকে যাইতেছিল। রং অনেকটা লাল ও কাল মিশ্রিত।

সূক্ষ্মে রোগমূর্ত্তি দর্শন

হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে আসিতেছিল। মার খেয়াল হইল—'চলিয়া যাক'। কিন্তু সেই মূর্ত্তিটি যাইতে চায় না, আবার থাকিতেও পারিতেছে না। মার দিকে মুখ করিয়াই পিছনে হটিতে লাগিল। মার খেয়াল হইতেছিল যে পিঠ দেখাইবে না। মূর্ত্তিটিও সহজে পিঠ

* ডক্টর মহেন্দ্র সরকার—প্রসিদ্ধ দার্শনিক।

দেখাইতেছেনা। অগত্যা গেটের নিকটে যাইয়া পিছন ফিরিয়া চলিয়া গেল।

ঐ প্রসঙ্গেই মা বলিতেছিলেন—"চলে গেল সত্য। কিন্তু একটু তাপ রেখে গিয়েছে। যে কোনও প্রকারেই হোক একটু অসুস্থতা আসবে।"

পরদিনও মা আবার একটি মূর্ত্তি দেখিলেন—"এটি তত ভয়ানক না। কতকটা যেন ঠাণ্ডা ভাব। আসা যাওয়া না, প্রকাশ হল আবার মিলিয়ে গেল।"

একজন ভদ্রলোক মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে মায়ায় সব আবৃত হইয়া সত্যকে মিথ্যা বলিয়া এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি?

ব্যাকুলতাই একমাত্র উপায়

মা অমনি হাসিয়া বলিলেন—"উপায়ত তুমিই বলছ বাবা। **এই যে, 'উপায় কি', 'উপায় কি'—এই ব্যাকুলতাই হইল উপায়।"**

একজন ভদ্রমহিলা আদর করিয়া মাকে বলিলেন—"তুমি বড় দুষ্টু মেয়ে।"

মাও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—"হাঁ, মেয়েত বাবা মার স্বভাবই পায়।" মার কথা শুনিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

১৬ই পৌষ, বুধবার।

বিন্ধ্যাচলে প্রত্যাবর্ত্তন

প্রায় একমাস কাশীতে থাকিয়া আজ দুপুরের গাড়ীতে মা বিন্ধ্যাচল রওনা হইলেন। কাশীর আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। অনেকেই খুব কাঁদিতে লাগিল।

কাশীতে এই কয় দিনে বেশ সুন্দর একটি প্রোগ্রাম বাঁধিয়া গিয়াছিল। মার উপস্থিতিতে সন্ধ্যা সাতটা হইতে আধঘণ্টা মৌন থাকা হইত। তাহার পর স্তব পাঠ ও মহাভারত পাঠ চলিত। রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত বহু লোক মার নিকটে বসিয়া থাকিত।

৩০শে পৌষ, বুধবার।

আজ মা আবার কাশীধামে আসিলেন। বাচ্চুদের বাড়ীতেই উঠিলেন। আগামী পরশু পূর্ণকুম্ভ স্নানের যোগ। সেই উপলক্ষে একবার প্রয়াগে যাইবার কথা হইয়াছে।

২রা মাঘ, শুক্রবার।

পূর্ণকুম্ভে এলাহাবাদ গমন

আজ পূর্ণকুম্ভ যোগ। ভোরবেলা মাকে লইয়া আমরা এলাহাবাদ পৌঁছিলাম। মা স্টেশনেই রহিলেন। মার সংবাদ পাইয়া বহু ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফয়জাবাদের কাশ্মিরী ভক্তেরাও অনেকেই আসিয়াছেন। সকলে মাকে কুম্ভ মেলায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাই মাকে লইয়া ত্রিবেণী যাওয়া হইল। মা যদিও আর নামিলেন না, গাড়ীর ভিতরেই বসিয়া রহিলেন। বেশ বৃষ্টিও হইতেছিল।

পুণ্ডরীগ্রাম অভিমুখে যাত্রা

সন্ধ্যার গাড়ীতে মা মৈনপুরীতে স্থিত পুণ্ডরী গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুণ্ডরী গ্রাম এটাওয়া হইতে আরও ৩৬ মাইল দূরে। মোটরে যাইতে হয়। ডোঙ্গার জমিদার শের সিংহজীর মেয়ের বাড়ী সেখানে।

একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। সেই উপলক্ষে মাকে নিয়া যাইবার জন্য তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ। এবার মা যখন বিন্ধ্যাচলে ছিলেন তখনই শের সিংহজী মাকে নিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু মা তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"যদি যাইবার খেয়াল হয় এবং কোনও বাধা না আসে তবে তোমাকে পরে খবর দেওয়া হইবে।"

তাহার পরেও মা আবার বলিতেছিলেন—"কত জনেইত কত কাজ করছে। এই শরীরটাকে স্নেহ করে আদর করে নেবার জন্য কত আগ্রহ করে। কিন্তু সব জায়গায় যাওয়াওত বড় হয় না। এও যদি অন্য কোনও দিকে যাওয়ার খেয়াল হয় তবে এলাহাবাদ ও মৈনপুরী হয়ে যাওয়া যেতে পারে।"

রাত্রি একটার সময় এটাওয়া স্টেশনে আসিয়া রাত্রিটা সেখানেই থাকা হইল।

গাড়ীতে মা বলিতেছিলেন—"পটল ওদের সকলের চেহারাটা দেখা গেল।"

৩রা মাঘ, শনিবার।

দুইদিন হয় শের সিংহজীর লোকজন আসিয়া এটাওয়াতে মার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সকাল নয়টায় মাকে লইয়া আমরা মোটরে পুওরী রওনা হইলাম। ঘটনাক্রমে প্রায় ১৮ মাইল দূরে মোটর হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। ড্রাইভার ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল যে তেল একেবারেই নাই। কে জানি চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছে।

দুইখানি মোটর আসিয়াছিল। একখানিতে জিনিষপত্র লইয়া

পুণ্ডরীর পথে. মায়ের পদব্রজে যাত্রা ও ভিক্ষা গ্রহণ

পরমানন্দ স্বামী আগেই চলিয়া গিয়াছেন। অপর-খানিতে মা, আমি ও অভয়। গাড়ী বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া মা বলিলেন—"বেশ ভালই হয়েছে। চিন্তা কি ? চল্, আমরা হেঁটেই যাই। গ্রামটাম পেলে ভিক্ষা করা যাবে !"

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। পেট্রোল পাইবারত কোনও আশাই নাই। তাই গাড়ী আর কোনও প্রকারেই যাইতে পারে না। অগত্যা আমরা সত্যসত্যই হাঁটিয়া রওনা হইলাম।

একমাইল প্রায় আসিয়া কিম্ণী গ্রাম পাওয়া গেল। ড্রাইভারও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটিয়া আসিতেছে। তাহার আশা ছিল যে এখানে হয়ত একখানা সাইকেল পাওয়া যাইবে এবং কাহাকেও সাইকেলে পুণ্ডরীতে পাঠাইয়া অপর একটি গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে। কিন্তু এখানে একটিও সাইকেল পাওয়া গেলনা।

মার লীলা সবই অদ্ভুত। কোথায় শের সিংহজীর পরিবার মার অভ্যর্থনার জন্য সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে আর এদিকে মা সাধারণ যাত্রীর ন্যায় গ্রামের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন। ভিক্ষা করিয়া খাইবেন !

গ্রামের মধ্যে গিয়া সংবাদ পাওয়া গেল একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সাধুরা জায়গা ও ভিক্ষা পাইয়া থাকে। সেই বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ভিক্ষা পাওয়া যাইবে কিনা। পাওয়া যাইবে বলিল। শুনিলাম এখানে রুটি, ডাল ও তরকারী পাওয়া যায়। কিন্তু আমারত সকলের হাতে খাওয়া নিষেধ। তাই কিছু শুধু দুধ ও চাল ভিক্ষা করিয়া আনিলাম। তাড়াতাড়ি একটু চরুর মত বানাইয়া তাহাই

মা, অভয় ও আমি খাইলাম। মার সঙ্গে একটি মাত্র আসন ও কম্বল আছে। সেই কম্বল খানি বিছাইয়া মাকে একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।

এইরূপ অবস্থায় কি করিব তাহাই আমি ভাবিতেছি। মা বলিলেন—"হাঁটা দিয়া আজই আর একটা গ্রামে গিয়া থাকি চল্। সেখানেও ভিক্ষা করে আবার পরদিন হাঁটা দেওয়া যাবে। বেশত, মন্দ কি! এ শরীরেরত কোনই অসুবিধা নাই।"

কিন্তু এই ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে মার এতদূর হাঁটিয়া যাওয়া কোনও ভাবেই সঙ্গত হইবে না। তাই আমি অন্ততঃ একটি গরুর গাড়ী ঠিক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

শের সিংহজীর জামাতা নবরতন সিংহের ওখানে আগামীকালই মন্দির প্রতিষ্ঠা। সকলে কত আশা করিয়া মার প্রতীক্ষা করিতেছে। আর এদিকে মা কোথায়? তাঁহারা এই সংবাদ পাইলে না জানি কতদূর মর্ম্মাহত হইবেন।

বেলা প্রায় একটার সময় হঠাৎ পরমানন্দ স্বামী ও নবরতন বাবু মোটর লইয়া আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম পরমানন্দ স্বামীর গাড়ীতেও তেল ছিল না। কোনও প্রকারে পুণ্ডরী গ্রামের নিকট পৌঁছিয়া লোক পাঠাইয়া সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। ওদিকে শের সিংহজী প্রভৃতি সপরিবারে মার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সকলেই খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে লোক গিয়া সংবাদ দিল যে স্বামীজীর গাড়ী নিকটে আসিয়াছে কিন্তু মার গাড়ীর কোনও খবরই নাই।

এই সংবাদ শুনিয়াই নবরতন বাবু অপর একখানি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া রওনা হইয়া আসিয়াছেন। পথে পরমানন্দ স্বামীকে উঠাইয়া

নিয়া আসিয়াছেন। তিনি আসিয়াই মাকে প্রণাম করিয়া বারবার ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। লজ্জায় ভদ্রলোক যেন মাথা তুলিতে পারিতেছিলেন না। মা যে তাঁহাকে এইরূপ পরিস্থিতিতে ফেলিবেন তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। তিনি বলিলেন যে মাকে আনিতে তাঁহার নিজেরই এটাওয়া আসিবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার কিছু কাজ ছিল বলিয়া আসিতে পারেন নাই। আজ তাই মা তাঁহাকে এইভাবে শিক্ষা দিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ অপরাধ স্বীকার কারতে লাগিলেন।

নবরতন বাবুর সঙ্গে রওনা হইয়া বেলা প্রায় তিনটা নাগাদ আমরা পুণ্ডরী পৌঁছিলাম। মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান চলিতেছে। মার জন্য সব ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। মার মোটর পৌঁছিতেই ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল। মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করিয়া মাকে আবাহন করিল। শেষ পর্য্যন্ত মা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিলেন, তাহাতে সকলেরই কি আনন্দ!

৪ঠা মাঘ, রবিবার।

আজ নবরতন বাবুর মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। নবরতন বাবু এখানকার জমিদার। তাই জমিদার বাড়ীর উৎসবে সমস্ত গ্রামের লোক যেন আজ এখানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সকালবেলাই বিগ্রহকে রথে স্থাপন করিয়া এবং মাকে মোটরে বসাইয়া নগর ভ্রমণ বাহির হইল। নবরতন বাবু সপরিবারে পিছনে পিছনে পদব্রজে চলিয়াছেন। পথে যেখানে যেখানে মন্দির,

পুণ্ডরীতে নবরতন বাবু কর্ত্তৃক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

অশ্বত্থ বৃক্ষাদি আছে সেখানেই তাঁহারা পূজা করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ব্যাণ্ডের আওয়াজ, উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনিতে সমস্ত গ্রামটি যেন মুখরিত হইয়া উঠিল।

মা যাইতে যাইতে বলিলেন—"কেহ কেহ এই বাজানাতে একেবারে কেঁদে আকুল হয়।" নগর কীর্তনের প্রভাব এতই গভীর।

নগর ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসা হইল। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় অনেকেই মাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মা নবরতন বাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে ছুঁইয়া দিয়া বলিলেন—"এই যে আমি বাবা-মাকে স্পর্শ করলাম। বাবা-মাই প্রতিষ্ঠা করুক।"

মার কথামত তখন তাঁহারাই দুইজনে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ বেদীর উপর বসাইলেন। পূজা ও যজ্ঞ ইত্যাদি সম্পূর্ণ হইতে বেলা অনেক হইয়া গেল। মাও এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন।

সৃষ্টি রহস্য

সন্ধ্যার সময় মাকে লইয়া সকলে বসিয়াছে। একজন প্রশ্ন করিলেন যে সৃষ্টির সময় মানুষ কি সর্ব্ব প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল?

মা বলিলেন—"**সৃষ্টি যে অনাদি অনন্ত, সবই যে সব সময়।**"

মা কোন্ পন্থী?

আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাতাজী, আপনি কি সনাতনী না আর্য্য-সমাজী?"

মা—"পিতাজী, তোমার দেখে কি মনে হয়?"

ভদ্রলোকটি—"আপনি মূর্ত্তি মানিলেত সনাতনী বলিতে হয়।"

মা (হাসিয়া)—"**সবই—যা বল তাই।**"

আজকাল আমাদের দেশে প্রচলিত নানা মত এবং মত ভেদের কথায় মা বলিলেন—"**নিন্দা কারো করা খুবই অন্যায়। দেখ না,**

"সর্ব্বদাই এক-লক্ষ্যে চলতে হয়"

যে বদ্রীনাথ যাত্রায় চলছে সে যদি—পথে দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে ঝগড়া সুরু করে তাতে তার লাভের মধ্যে কি হবে, না বদ্রীনাথ দর্শনে দেরী হয়ে যাবে। তাই বলা হয় সর্ব্বদাই একলক্ষ্য হয়ে চলতে হয়।"

৫ই মাঘ, সোমবার।

পুণ্ডরী গ্রাম হইতে কিছু দূরে নবরতন বাবুর একটি বাগান আছে। মাকে আজ সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। বাগানের মধ্যে একখানি মাত্র ঘর। বেশ নির্জ্জন স্থান। ময়ূরের দল আসিয়া খেলা করে।

৮ই মাঘ, বৃহস্পতিবার।

জনৈকা দেবীজীর সহিত মায়ের সাক্ষাৎ

আজ নবরতন বাবু প্রভৃতি মাকে প্রায় নয় মাইল দূরে বড়েরিয়া নামক একটি গ্রামে লইয়া চলিলেন। সেখানে শুনিলাম একজন দেবীজী আছেন। তিনি ঐ গ্রামেরই গোয়ালার ঘরের মেয়ে। কাকা কাকিমার বাসায় প্রতিপালিতা। শিশুকাল হইতেই আপন ভাবে থাকিতেন। অন্য কাহারো সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা বলিতেন না। একদিন নাকি কোনও একজন সাধুকে কিছু দিতে গেলে তাঁহার কাকিমা খুব মন্দ বলেন। তখনই তিনি গ্রামের বাহির হইয়া একটি গাছতলায় আসিয়া বসিলেন। সেই যে গৃহত্যাগ করিয়া আসিলেন আর গৃহে ফিরিয়া যান নাই।

কিছুদিন পর গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে একটি কুটিয়া

বানাইয়া দেন। সেখানে তিনি ২।৩ বৎসর ছিলেন। তাহার পর নবরতন বাবু একখানা ঘর বানাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে সেখানেই আছেন। আজ নয় বৎসর যাবৎ মৌন আছেন। আরও নাকি তিন বৎসর থাকিবেন।

আমরাও মার সঙ্গে গিয়া দেখিলাম তিনি মৌন; চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছেন। দুই বৎসর হয় একটি স্ত্রীলোক সেবায় নিযুক্ত আছে। আমরা গিয়া দেবীজীর কাকা, বোন, আরও অনেককে দেখিলাম। দেবীজীর ভাবটি বেশ সুন্দর লাগিল। নবরতন বাবুর স্ত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেবীজী, মাতাজী আসিয়াছেন।"

তিনি মাথাটি নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন এবং বুকের উপর হাত রাখিয়া দেখাইলেন যে মা তাঁহার হৃদয়েই আছেন। মা হাসিয়া বলিলেন—"দেবীজী, আমি এখানে থাকিয়া যাই?" তিনি উত্তরে শুধু হাত জোড় করিয়া আবার যেমন তেমনই রহিলেন।

শুনিলাম ইনি ভোর চারটায় উঠিয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া পূজা করেন। তাহার পর একটু দুধ পান করেন। তাহার পর এইভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। রাত্রি আটটায় আবার উঠিয়া স্নান করিয়া পূজায় বসেন। ঘরের বাহিরে একমাত্র পায়খানায় যাওয়া ভিন্ন আর অন্য সময়ে কেহ দেখিতে পায় নাই।

আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক থাকিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় মা বলিলেন—"আমি দেবীজীর পক্ষ থেকেই বলছি এখানে তোমরা সকলে বেশী ভিড় করো না। দেবীজীকে নিজের ভাবে থাকতে দেও।" এই বলিয়া দেবীজীকে বলিলেন তাঁহার ক্রোড়ে শুইবেন। দেবীজী সারা করিয়া জানাইলেন যেই তিনিই মার ক্রোড়ে শুইবেন। কিন্তু তিনি কিছু আর করিলেন না। তখন মা নিজে দেবীজীর চৌকির

উপর তাঁহার শরীরের সঙ্গে একেবারে লাগিয়া বসিলেন। তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"নিজের ভাব লইয়া বেশ আছে।"

দেবীজীর গলাটি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। নবরতন বাবুর মা মায়ের হাতখানি সেইখানে বুলাইয়া দিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কষ্ট আছে কিনা। তিনি মাথা নাড়িয়া জানাইলেন— না। কিছুক্ষণ পর আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

১২ই মাঘ, সোমবার।

গতকাল হইতেই মা বেশ একটু চুপচাপ আছেন। কাল খুব ভোরে দেখি মা ঘরের ভিতর প্রায় এক ঘণ্টার উপর একভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পরে আস্তে আস্তে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসেন। ভাবটিও খুব গম্ভীর। কিছু ঠিক বুঝিতে পারা গেলনা।

সূক্ষ্মে ভোলানাথের মায়ের নিকট আগমন

আজও খুব ভোরে বিছানায় শুইয়া শুইয়া বলিয়া উঠিলেন— "ত্বোয়া অন্তর্ দিক্ষ (অথবা দৃক্ষ) বন্তি দৃক্ দিক্ষ (দৃক্ষ)" এই বলিতে বলিতেই উঠিয়া পড়িলেন। পরে যখন মুখ ধোয়াইয়া দিতেছি তখন দেখি মা সেই শব্দগুলিই আওড়াইতেছেন। আমি মাকে বলিলাম—"কি বলছ তুমি ? আমিত কিছুই বুঝছি না। অর্থটা কি ?"

মা—"সেদিন বলেছিলাম না ভোলানাথের মূর্ত্তি দেখা গেল। আজও তাই ।"

আমি—"ভোলানাথ বুঝি এই কথা আজ বলে গেলেন ?"

মা—"হাঁ"।
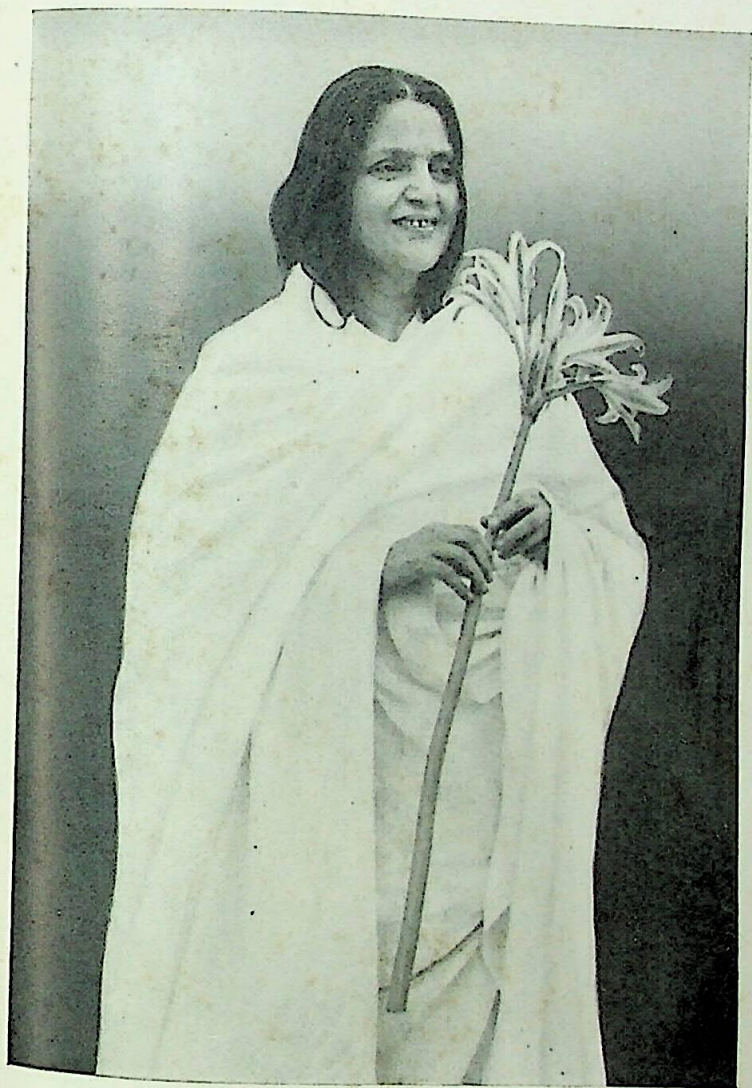
আমি—"কিন্তু এর অর্থ কি ?"

আমি দেখিলাম মা কিছুই বলিতেছেন না। তখন হাসিতে হাসিতে বলিলাম যে এই জন্মে আর মার মুখ হইতে ঐ অর্থ বাহির হইবে না।

মাও তখন হাসিয়া বলিলেন—"ভোলানাথকে এই শরীর বারবার জিজ্ঞাসা করছে সে কোথায় আছে। ভোলানাথ হেসে হেসে বলছে যে এই শরীরটা সবই জানে। অথচ যেন কিছুই জানে না এই রকম ভাব দেখাচ্ছে। এই বলে মাথা নেড়ে ইসারায় বলল (আমাকে দেখিয়ে)—তোমার অন্তর্গতই আমি, তোমাতেই অধিষ্ঠিত (ত্বোয়া অন্তর দৃক্ষ)। আবার এই বাগানের দিকে ইশারা করে বলল—তুমিও এই বনে অধিষ্ঠিতা (বন্তি দৃক দৃক্ষ)। তারপর আবার বলল যে—তিতিক্ষার মত।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মা আমাকে বলিলেন—"এখন এই সব বিষয়ে আর কাউকে কিছু বলিস্ না কিন্তু।"

১৪ই মাঘ, বুধবার।

দুপুরে খাইতে বসিয়া বলিলেন—"এখানে আসা হয়েছে আজ বারো দিন।" এই কথা শুনিয়াই নবরতন বাবুরা সকলে মিলিয়া আরও কিছুদিন থাকিতে প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু মার ভাব দেখিয়াই মনে হইল যে আর বেশী সময় এখানে থাকা হইবে না।

পরে মা বিছানার উপর বসিয়া আছেন। নবরতনবাবুর বাড়ীর অনেকে, পরমানন্দ স্বামী, অভয় ও আমি নিকটেই আছি। মা কথায় কথায় নবরতন বাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমার কালই খেয়াল হচ্ছিল যে ওকে সংযম পালন করা, শুদ্ধভাবে থাকবার

নবরতন বাবুর উপর মাতৃ-কৃপা

কথা বলা হয়েছিলত, তাই আমার এই বিছানাটা ওরই থাকুক।" এই বলিয়াই মা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এখনই বিছানাটা দিয়া দে।"

মার বিছানা নবরতন বাবু মাথায় করিয়া লইলেন। আমরা বলিলাম মা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কম্বলের উপরই শুইতে বলিলেন। শুনিয়া মা বলিলেন—"না, রোজের জন্য বলা হয় নি। যেদিন সংযম, ব্রত করবে, শুদ্ধভাবে থাকবে সেইদিন এই বিছানায় শোবে।"

নবরতন বাবুর স্বভাবে পূর্ব্বে কিছু কিছু দোষ ছিল। কিন্তু আজ প্রায় ছয় মাস যাবৎ মাতৃ সঙ্গের প্রভাবে সমস্ত কু-অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছেন। মায়ের শয্যা পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন যে আজ পূজা করিবার সময় তিনি মার পাদুকা হাতে লইয়াছেন এমন সময় আসিয়া তাঁহার স্ত্রী তাহা জোর করিয়া লইয়া গেলেন। নবরতন বাবু তখন তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন যে সে পাদুকাটি নিয়া নিতে পারে কিন্তু মার চরণত তাঁহার নিকট হইতে নিতে পারিবে না। ভদ্রলোকের ভাবটি দেখিতেছি খুব সুন্দর।

মা সমস্ত বিছানাপত্র নবরতন বাবুকে দিয়া দিলেন দেখিয়া তাঁহার মা বলিলেন যে ভগবানের কি লীলা বোঝা কঠিন। যে দুনিয়ার দৃষ্টিতে খারাপ ভগবান তাহাকে আরও বেশী কৃপা করেন। মার শুইবার কিছুই নাই দেখিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মা বলিলেন— "প্রতিষ্ঠার দিন আমাকে যে বিছানা দিয়েছিল তাতেই আমি শোব।" তখনই তাঁহারা মালীকে দিয়া সেই বিছানা পত্র সব আনাইয়া লইলেন। মা উহা সব দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"কম্বল দিয়েত বেশ ভাল জিনিষই আসল, দেখা যাচ্ছে।" কিন্তু মা যে এই বিছানায় কতক্ষণ শুইবেন তাহা অনায়াসেই অনুমান করিয়া লইলাম।

তাহার পর একটি পাতলা কম্বল আলখাল্লার মত করিয়া গায়ে দিয়া শিশুর মত আনন্দ করিতে করিতে বলিলেন—"বেশ হয়েছে। কোনও দিক দিয়ে ঠাণ্ডা যায় না। এইটা সব সময় গায়ে দিলেইত হয়।" আমরা উপস্থিত সকলে হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"দেখা যাক, কতক্ষণ মা এটা গায়ে দেন। আবার কার কাছে এটা যায় দেখি।"

জনৈক মুসলমান যুবকের স্বপ্নে মাকে দর্শন

এখানে একটি মুসলমান ছেলেকে আমরা দেখিলাম। সে নাকি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই স্বপ্নে মাকে দেখিয়াছিল। স্থূলভাবে অবশ্য এবারই প্রথম দর্শন হইল।

১৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার।

নবরতন বাবুর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে আজ অন্নভোগ। মার নির্দ্দেশে আমি ভোগ পাক করিলাম। এদিকে ঠিক ঠিক নিয়ম মত ভোগ পাক করা বা নিবেদন করার বিধি নাই। তাই মা আমাকে সব শিখাইয়া দিতে বলিলেন।

আগামী কাল সন্ধ্যায় রওনা হইবার কথা হইয়াছে। স্থানীয় সকলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু মা বলিলেন—"যাওয়ার জন্য ব্যবস্থাত কর। তারপর যা হয়ে যায়।"

১৬ই মাঘ, শুক্রবার।

আজ খুব ভোরে উঠিয়াই মা মাঠের মধ্য দিয়া মন্দির অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাড়াতাড়ি চলিলাম। কিছুদূর

গ্রামবাসীদের মায়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ

যাইতেই দেখি তিনটি মেয়ে মার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মার নিকটে আসিয়াই তাহাদের কি আকুল ক্রন্দন। শুনিয়াছে আজ মা চলিয়া যাইবেন তাই। মা অত্যন্ত আদরের সহিত তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। বলিলেন—"তোমরা আমার দোস্ত্।" তাহাদের যে যে নাম ভাল লাগে সেই সেই নাম লইতে মা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। তাহাদের সঙ্গে লইয়াই মা মন্দিরে চলিলেন।

গ্রামবাসী স্ত্রী পুরুষ যুবক শিশু আজ সকলেই আসিয়া জাঁগদার বাড়ীর মন্দিরে একত্রিত হইয়াছে। মা চলিয়া যাইবেন। এই সংবাদে সকলের মুখই বিষণ্ণ। কাহারো কাহারো অশ্রুধারা বহিয়া যাইতেছে। গাহিতেছে ব্রজগীত—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ব্রজগোপারা সকলেই শোকে মুহ্যমান।

ভোগের সময় মন্দিরে জিনিষপত্র সব সাজাইয়া রাখিতেছি। হঠাৎ মা ভিতরে ঢুকিয়া বিগ্রহের গালে ও শরীরে হাত বুলাইয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন—"ভাল করে খাওয়া দাওয়া করো।" আবার তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"একটু আদর করে এলাম।"

দুপুর বেলাই মা এটাওয়া রওনা হইলেন। নবরতন বাবু স্বয়ং মাকে মোটরে লইয়া যাইবেন। গ্রামবাসীরা মায়ের মোটর ঘিরিয়া

পুণ্ডরী ত্যাগ

দাঁড়াইয়া আছে। মাকে ছাড়িয়া দিতে যেন প্রাণ চায়না। স্ত্রীপুরুষ অনেকেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। সামান্য বারদিনের পরিচয়। তবুও

সকলের এইরূপ আকর্ষণ সত্যই অপূর্ব্ব। যেন তাহাদের কত নিকট একজন আত্মীয় আজ তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দূর দেশে গমন করিতেছে।

লখ্‌নৌ যাত্রা

মোটরে এটাওয়া পৌঁছিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে লখ্‌নৌ রওনা হইলাম। পূর্ব্বেই হরিরাম ভাইকে* মার সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি এবং আরও কয়েকজন স্টেশনে ছিলেন। একজন ভদ্রলোক তাঁহার গুরুদেবের জন্য নিজ বাড়ীর পাশেই একটু পৃথক স্থান করিয়াছেন। মাকে সেখানেই লইয়া যাওয়া হইল।

১৭ই মাঘ, শনিবার।

দুর্গাদত্তযোশীর জীবনরক্ষার ইতিহাস

আলমোড়ার ভক্ত শ্রীদুর্গাদত্তজীর** মুখে আজ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা শুনিলাম। কিছুদিন হয় তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। জীবনরক্ষার আর তেমন কোনও আশাই ছিলনা। একদিন তিনি শয্যাগত অবস্থায়ই দেখিলেন যে মা স্বপ্নে আসিয়া তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়াছেন। তিনি তখনই সকলকে এই ঘটনার বিষয় জানাইলেন। তাঁহার নিজের মনেও স্থির বিশ্বাস হইল যে তবে তিনি নিরাময় লাভ করিবেন। সত্য সত্যই তিনি সেই দিন হইতে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

---

*শ্রীহরিরাম যোশী—মায়ের পুরাতন ও একনিষ্ঠ ভক্ত। অবসরপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার কো-অপারেটিভ্ সোসাইটিজ্, ইউ, পি।

** শ্রীদুর্গাদত্ত যোশী—ইনি বর্ত্তমানে উনাও সেণ্ট্রাল জেলের জেলর পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

আমরা যাঁহার বাসায় আছি তাঁহার নাম শ্রীচন্দ্রদত্ত সান্যাল। গত বসন্ত পঞ্চমীর দিন তাঁহার গুরুদেব দরজা বন্ধ করিয়া পূজা করিতেছিলেন। বৈকাল বেলা দরজা খুলিয়া সকলকে বলিলেন যে মা আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া গিয়াছেন।

হরিরামজীর চেষ্টায় লখ্‌নৌর স্থানীয় ভক্তেরা মিলিত হইয়া প্রতি-মাসের শেষ শনিবার রাত্রে কীর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আজ মার উপস্থিতিতে সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন চলিল। বেশ আনন্দ অনুভব করিতে পারিলাম।

১৯শে মাঘ, সোমবার।

ভক্তদের আগ্রহে আজ সকালে মা গোমতী নদীর তীরে একটি বাগানে আসিয়াছেন। নবাবদের আমলের বাড়ীও আছে। এখানে সাধু মহাত্মারাও কেহ কেহ আসিয়া থাকেন। মা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিবেন না বলিয়া বাহিরে তাঁবুর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হাইকোর্টের একজন বিচারপতিই এই বাড়ীর মালিক ছিলেন। তিনি এখন জীবিত নাই।

লখ্‌নৌতে গোমতীর তীরে অবস্থান

সন্ধ্যাবেলা ডাঃ পান্নালালজী* তাঁহার একজন বন্ধুর সহিত মার নিকট আসিয়াছেন। মাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"জপ ও কীর্ত্তনের মধ্যে কোনটি ভাল?"

ডাঃ পান্নালালের সহিত কথাবার্ত্তা

---

* ডাঃ পান্নালাল, সি, আই, ই; আই, সি, এস্; সি, এস, আই; ডি, লিট্। রিটায়ার্ড অ্যাডভাইজর, গভর্ণর, ইউ, পি।

মা উত্তর দিলেন—"দেখ, পিতাজী। সকলের জন্য সব না। কাহারো পক্ষে জপ ভাল। আবার কাহারো পক্ষে বা কীর্তনই ভাল। যেমন দেখনা, কলমের সব অংশটা যদি মাটির নীচে পুঁতে রাখ তবে পচে যাবে। আবার বীজটা যদি মাটির নীচে না রাখ গাছ হবে না। এই রকম এক একটীর জন্য এক একরকম ব্যবস্থা।"

ডাঃ পান্নালালজী খুব আনন্দ সহকারে বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ, কি চমৎকার মীমাংসা! এই সব কি আর বাহিরের লেখাপড়ায় বাহির হইতে পারে!"

২০শে মাঘ, মঙ্গলবার।

মার দর্শনের উদ্দেশ্যে প্রত্যহই বহুলোক আসিতেছে। আপন আপন ভাবের সহায়ক ২।৪টি কথা বলিয়া মা তাহাদের আধ্যাত্মিক স্পৃহা আরও বাড়াইয়া দেন। যাহার মনে কিছু বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে তাহাকে মা বলেন—

নানা উপদেশ

"বেশত, সংসারটাত দেখলে। এখন একটু আল্‌গা হয়ে থাকতে চেষ্টা কর।" কোনও ডেপুটি কলেক্টরকে দেখিয়া মা বলিলেন—"আসল ডেপুটি হওয়াইত চাই। এই পেনসন ত শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয়ে যাবে। আসল পেন্সনের জন্য চেষ্টা কর।" একদল আর্ট স্কুলের ছাত্রেরা আসিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন—"সব জিনিষই সবের মধ্যে আছে। সেটাই প্রকাশ হওয়াতে সাহায্য করা হয় মাত্র। আসলে তোমাদের মধ্যেই সব আছে। না থাকলে প্রকাশ হয় কি করে?"

ডাঃ পান্নালালের বাড়ীতে মার ভোগ

ডাঃ পান্নালালজী ও তাঁহার স্ত্রীর অনুরোধে আজ মার ভোগের ব্যবস্থা সেখানে হইয়াছে। সকাল প্রায় এগারটায় মাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল।

পান্নালালজীর স্ত্রী বেশ নিষ্ঠাবতী। তাঁহার রান্নাঘর, পূজার ঘর দেখিলাম সব ভিন্ন। অন্য কোথাও গিয়া কাহারো হাতে কিছু খান না। পান্নালালজীও নাকি বাল্য কাল হইতেই সাধুভক্ত। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি তাঁহার গর্ভধারিণী মাকে বলিতেন সংসারের অন্য কোনও কর্মে মন না দিয়া কেবলমাত্র জপধ্যান লইয়াই থাকিতে। মাও সন্তানকে এই বিষয়ে এতদূর ভয় করিতেন যে তিনি কাছে যাইলেই মা জপ করিতে আরম্ভ করিতেন। মৃত্যুর সময়েও শুনিলাম যে তিনি ছেলেকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ছেলে নিকটে আসিতেই পূর্ব্ব অভ্যাস মত তিনি নাম করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ অবস্থাতেই তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল।

ভোগের পরই পান্নালালজীর বাড়ী হইতে চলিয়া আসা হইল। তাঁহার স্ত্রী আসিয়া বলিলেন—"ইচ্ছা ছিল যে মাকে বাসায় আনিয়া কিছু খাওয়াইব। সাহস করিয়া এতদিন বলিতে পারি নাই। আজ আমার বাসনা পূর্ণ হইল।"

২৪শে মাঘ, শনিবার।

আজ ১২টার গাড়ীতে মা হঠাৎ কাশী রওনা হইলেন। আগামীকাল এখানে উদয়াস্ত কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। তবু মা আজই রওনা হইয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—

"যদি বিশেষ কোনও খেয়াল না হয় তবে কালও আসতে পারি, আজও আসতে পারি।"

স্টেশনে একজন সাধু আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। তিনি নাকি কিছুদিন আগে মাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছেন। মা তাঁহাকে কয়েকটি নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—আত্মবোধ অধ্যয়ন করা, দুধ পান করিয়া থাকা এবং অল্প বিদ্যা শিক্ষা করা। আজই তিনি মার প্রথম দর্শন পাইলেন। স্বপ্নে মার নিকট হইতে যে নির্দ্দেশ পাইয়াছেন তাহা পালন করা সম্বন্ধে মা বলিলেন—"যেমন শুনেছ তেমনই করতে চেষ্টা কর।"

মায়ের নিকট হইতে স্বপ্নে জনৈক সাধুর নির্দ্দেশ লাভ

মা হঠাৎ রওনা হইতেছেন শুনিয়া অনেকেই স্টেশনে ছুটিয়া আসিয়াছেন। ডাঃ পান্নালালজীও সপরিবারে আসিয়াছেন। তিনি আসিয়াই মাকে বলিলেন—"মা, আপনি নাকি ছেলেমেয়েদের ছাড়িয়া যাইতেছেন?"

মা হাসিয়া বলিলেন—"বাবা, এ শরীরত ছেড়ে কোথাও যায় না, তাই বলবার কিছুই নেই। আর যদিই বা বল যাচ্ছে, তবে তুমি একটু ঘুরতে যাওয়ার সময় কি সকলকে বলে যাও? বলবারত কিছুই নেই যে।"

মাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া পুনরায় মার ছোট তাঁবুটিতে আসিয়া বসিয়াছি। খানিক পরে বরাবাঙ্কির একজন মুন্সেফ সপরিবারে আসিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম তিনি মাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। গত পরশুই প্রথম মার নিকট আসিয়াছিলেন। মা তাঁহাকে সেদিন দেখিয়াই বলিয়া উঠিয়াছিলেন

বরাবাঙ্কির জনৈক মুন্সেফকে সূক্ষ্মে দর্শন

—"এর চেহারাটাই কাল আমার সামনে এসেছিল।" মার এই কথা শুনিয়া তিনি খুবই বিস্মিত হইয়া পড়েন। আমাকেও বলিলেন—"আমিত মাতাজীর নিকট বাহিরের দিক হইতে আদৌ পরিচিত না। অথচ আমাকে মাতাজী ঐরূপ বলিলেন। ইহাতেই আমি বুঝিলাম যে মাতাজী সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান।"

২৫শে মাঘ, রবিবার।

কাল রাত্রিতেই কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। মার তাঁবুটির পাশেই গোমতীর তীরে প্রকাণ্ড দুইটি সামিয়ানা খাটাইয়া আয়োজন করা হইয়াছে। সকলেই মার প্রতীক্ষায় বার বার মোটরগুলির দিকে তাকাইতেছে। কিন্তু দুপুরের গাড়ীতেত মা আসিলেন না।

লখ্‌নৌতে নাম যজ্ঞ

শেষ পর্য্যন্ত সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার গাড়ীতে মা আসিয়া পৌঁছিলেন। তবু মা আসিয়াছেন এই কথা মনে করিয়াই সকলের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

২৭শে মাঘ, মঙ্গলবার।

গোমতীর তীরে যে বাড়ীর বাগানে মা আছেন ইহার মালিক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বাবুর পুত্র একজন ব্যারিষ্টার। বিশ্বেশ্বর বাবু নিজেও ন্যায়াধীশ ছিলেন। যেদিন এখানে কীর্ত্তন চলিতেছে সেইদিনই তাঁহার পুত্র বিশেষভাবে পীড়িত। অবস্থাও ভাল না। মাকে একবার লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাদের ড্রাইভার খুবই আগ্রহ

বিশ্বেশ্বর বাবুর পুত্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে মায়ের উক্তি

প্রকাশ করিতেছিল। মা শুধু গম্ভীর ভাবে বলিলেন শুনিলাম—**"যা হবে তাও জানা আছে। আর যা হচ্ছে তাও জানি।"** মার মুখে এইরূপ স্পষ্ট উক্তি শুনিয়া আমরা একটু আশ্চর্য্যই হইলাম।

সেদিন সকালে কাশী যাওয়ার সময় বিশ্বেশ্বর বাবুর পুত্রবধু মার নিকট আসিয়াছিল। মা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—**"পরম পতিই তোমার পতি। তাঁহার দিকেই লক্ষ্য রাখ। তোমার জন্ম ত এই জন্যই হইয়াছে।"** এইরূপ কথা শুনিতে পাইয়াই আমাদের মনে হইল যে ভদ্রলোকের হয়ত আর আয়ু নাই। সত্যই সেই রাত্রেই তাহার দেহত্যাগ হইল। মার নিকট সংবাদ আসিয়া পৌঁছিলে মা বলিলেন—"ভালই হয়েছে। বেচারা বড় কষ্ট পাচ্ছিল। আত্মাটা শুদ্ধ ছিল।"

২৮শে মাঘ, বুধবার।

শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদজীর * আহ্বানে মাকে সহরের মধ্যে একটি তাঁবুতে আনিয়া রাখা হইল। উদ্দেশ্য এখানে আরও অধিক সংখ্যক লোক মায়ের দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হইবে। শীতলপ্রসাদজী মার জন্য যথাসম্ভব আয়োজন করিয়াছেন দেখিলাম। ভক্তদের খাওয়া দাওয়া থাকারও কোন অসুবিধা নাই। ভদ্রলোক মার জন্য যেন একেবারে পাগল। কি ভাবে যে সেবা করিবেন তাহা যেন ভাবিয়া পাইতেছেন না।

এখানে আসিয়া কথাবার্তা বলিতে বলিতে মা একটু পরে

* লখ্‌নৌর পুরাতন ভক্ত শ্রীশীতলপ্রসাদ জয়স্ওয়াল। বর্ত্তমানে ইনি বাণপ্রস্থ জীবন যাপন করিতেছেন।

বলিয়া উঠিলেন—"শেষ গাড়ী কয়টায় যায় ?" বুঝিলাম মা আজই লখ্‌নৌ ছাড়িবেন। সংবাদ লইয়া জানা গেল যে লখ্‌নৌ হইতে শেষ গাড়ী রাত্রি দশটায় ঝাঁসি যায়। হরিরাম ভাই জিজ্ঞাসা করিল—"মা কি ঝাঁসি যাইবেন ?" মা কিছুই বলিলেন না। শীতল প্রসাদজী, হরিরাম ভাই প্রভৃতি সকলে মিলিয়া মাকে অন্ততঃ একটি রাত্রি এখানে থাকিবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু মা মিষ্ট ভাষায় তাঁহাদের সকলকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

অকস্মাৎ লখ্‌নৌ ত্যাগ

সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মা রাত্রির গাড়ীতে লখ্‌নৌ ত্যাগ করিলেন। স্টেশনে অনেকেই মাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। অধিকাংশের চোখেই জল।

গাড়ী তখনও ছাড়ে নাই এমন সময় হঠাৎ কেহ আসিয়া সংবাদ দিল যে আজই বেলা সাড়ে তিনটায় যমুনালাল বাজাজ মহাশয় দেহরক্ষা করিয়াছেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কমলনয়নও * এই গাড়ীতেই ওয়ার্দ্ধা রওনা হইতেছে।

যমুনালালজীর পরলোকগমন

যমুনালালজীরএইরূপ আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে আমরা একেবারে মর্ম্মাহত হইলাম। ভদ্রলোক এতদিন ধরিয়া মাকে একবার ওয়ার্দ্ধা নিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আর এই ভাবে হঠাৎ আজ তিনি চলিয়া গেলেন। মায়ের নিকট থাকা কালীন তিনি মহাত্মাজীর নিকট চিঠিও দিয়াছিলেন যে তিনি লিখিলে হয়ত মা যাইতে পারেন। মহাত্মাজী চিঠি পাইয়াই তার করিয়াছিলেন—"মাতাজীকে লইয়া এস।" যমুনালালজী তখন মার সহিত হরিদ্বারে ছিলেন। তারের খবর মাকে

* ৺যমুনালাল বাজাজ মহাশয়ের পুত্র শ্রীকমলনয়ন বাজাজ, এম্‌-পি।

জানাইলে মা হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"এখনইত খেয়াল হচ্ছেনা।" তাহার পরও বিশেষ অনুরোধ করায় মা বলিয়াছিলেন যে যদি শীতের সময় নর্ম্মদার দিকে যাওয়া হয় এবং যদি তখন খেয়াল হয় তবে তাঁহাকে খবর দেওয়া হইবে।

সেই হইতেই যমুনালালজী মাকে ওয়ার্দ্ধা যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিতেছিলেন। এবার মা বিন্ধ্যাচলের দিকে গিয়াছেন শুনিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন যে সেখান হইতে হয়ত মা ঐদিকে যাইবেন।

ইতিমধ্যে একবার হরিরাম ভাই ওয়ার্দ্ধা গিয়াছিলেন। সেখানেও মার সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথা হইয়াছে। ভদ্রলোক অল্প কয়েকদিনের পরিচয়েই যেন মার জন্য একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হরিরাম ভাইকে তিনি বলিয়াছিলেন যে মহাত্মাজীকে তিনি পিতার মত পাইয়াছেন আর মাকে নিজের মায়ের মত লাভ করিয়াছেন। বাস্তবিকই তিনি মার সঙ্গে এমন শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন যে তাহা সত্যই অপূর্ব্ব।

ট্রেনেও বার বার আমি যমুনালালজীর কথাই বলিতেছিলাম। মা হাসিয়া বলিলেন—"**তোদের যে কথা! কে আবার কোথায় চলে যায় বা কোথা থেকে আসে? এই শরীরটার কাছেত আসা যাওয়া নেই। তখনও যা এখনও তা। মরা বাঁচা আবার কি? মারা গিয়েও যে আছেই তার মধ্যে আর কি কথা?**"

আমি অভিমানের স্বরে বলিলাম—"তোমার কাছেত সবই সমান। কিন্তু আমারত কেবলই মনে হচ্ছে বাজাজজী এত করে তোমায়

যাওয়ার জন্য বললেন। কিন্তু তখন তোমার খেয়াল হলোনা। আর এখন তিনি চলে গেলেন এবার হয়ত তোমার খেয়াল হবে।"

২৯শে মাঘ, বৃহস্পতিবার।

ঝাঁসিতে মা

কাল রাত্রে আমাদের সঙ্গে হরিরাম যোশী, শীতল প্রসাদজী প্রভৃতি কয়েকজন কানপুর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কানপুরে নামিয়া গেলেন। আমরা ঝাঁসি রওনা হইয়া আজ ভোর সাড়ে পাঁচটায় এখানে পৌঁছিয়াছি।

মহারতনও আমাদের সঙ্গেই আছে।, স্টেশনে পৌঁছিয়াই এখানকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট দেওয়ান বিহারীলালজীকে সংবাদ দেওয়া হইল। সংবাদ পাইবামাত্রই তাঁহারা স্বামী স্ত্রী আসিয়া মাকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

বিহারীলালজীর শিশুকন্যার মায়ের প্রতি অপূর্ব্ব আকর্ষণ

স্থানটি বেশ একান্ত। মা আসিয়াই পাহাড়ের উপর হাঁটিতে গেলেন। বিহারীলালজীর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা এখন প্রায় পাঁচ বৎসরের। এই মেয়েটি যখন মাতৃগর্ভে ছিল তখনই মার সহিত ইহাদের প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। আট মাস বয়স হইতেই মেয়েটি জপ করিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া মাতা পিতা যখনই কোনও ভজন গান করেন তখন মেয়েটি গিয়া তাঁহাদের মুখে হাত চাপিয়া বলে "মা, মা"! কোনও সময়ে কান্নাকাটি করিলেও "মা মা" নাম করিতে লাগিলেই ক্ষান্ত হইয়া যায়। আজ মা আসিবার

একটু পরেই নাকি তাহার মাকে বলিয়াছে—“আমি মাতাজীকে জানিয়াছি!”

মেয়েটিকে দেখিলাম একটু অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। আরও ভাইবোনেরা আছে। কিন্তু কাহারো সঙ্গে তেমন মেলামেশা নাই। স্বামীস্ত্রী যখন পূজা পাঠ ইত্যাদি করেন তখন সেও কাছে বসিয়া চুপ করিয়া তাহাই করিবার চেষ্টা করে। ভজন কীর্ত্তনের সময় অবশ্য শুধু ‘মা’ নামই করিবে—অন্য কোনও নাম না।

বিকাল বেলা মা বাহিরে বসিয়া আছেন। মেয়েটি অনেকক্ষণ যাবৎ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাকে দেখিয়া চলিয়া গেল। আবার একটু পরেই নিজের একখানা ছোট্ট চেয়ার লইয়া আসিয়া মার সামনে বসিয়া মার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ৫ বৎসরের এই বালিকার এইরূপ অপূর্ব্ব স্বভাব যে কি ভাবে হইল তাহা বুঝিয়া উঠা মুস্কিল। পরমানন্দ স্বামীজী, অভয় ও আমি বসিয়া বসিয়া তাহারই হাবভাব সব লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কাহার ভিতরে কি আছে তাহা মা-ই বলিতে পারেন।

১লা ফাল্গুন, শুক্রবার।

আজ শিবরাত্রি। মা এখনও অন্যত্র যাইবার কথা বলেন নাই।

পরমানন্দ স্বামী ও অভয় বসিয়া চিঠিপত্র পড়িয়া মাকে শুনাইতেছে। একজন ছেলের রোগের কথা লিখিয়াছে। মা তাহার চিঠির উত্তরে হাসিতে হাসিতে নিজেই একটি কবিতা বানাইয়া ফেলিলেন—

“সর্ব্ব চিন্তা পরিহরি
কেবল বল হরি হরি

তাঁহারে ভরসা করি
দেও ভব সাগর পাড়ি।
নিকটে বিপদ ভারী
থাক লীলাময়কে ধরি।"

একটু পরেই বলিলেন—"শেষের দুইটি লাইন না হয় নাই দিলে। বিপদের কথা শুনে আবার কান্নাকটি করতে বসবে হয়ত।"

মায়ের দেহে নানা ক্রিয়াদির প্রকাশ

মার হাতে কি একটা খুব ব্যথা হইতেছে। হাত একেবারে নাড়িতেও পারেন না। অভয় মাকে বলিল—"কাল রাত্রে যেমন হাত নেড়ে নেড়ে কি সব ক্রিয়া হচ্ছিল সেইরূপ করে ব্যথাটা সারিয়ে ফেলুন না।"

মা বলিলেন—"হাঁ, একটু আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু ভালরূপ হলনা। হলে কমে যেত।"

অভয়, পরমানন্দজী ও আমি অনুরোধ করিতে লাগিলাম যাহাতে ক্রিয়াদির দ্বারা মা এই ব্যথাটি কমাইয়া ফেলেন। অনেক সময়েই দেখিয়াছি যে ক্রিয়াদি হইলেই কত কঠিন রোগও মার নিমেষে দূর হইয়া গিয়াছে।

একটু পরে মা নিজেই বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। শরীর স্থির হইয়া আসিল। সামান্য একটু একটু ক্রিয়া হইল। কিন্তু সেরূপ বিশেষ কিছু হইল না। চুপ করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া মা আবার শুইয়া পড়িলেন।

মার এখানে আগমন সংবাদ এতক্ষণ পর্য্যন্ত গোপন রাখিবার চেষ্টাই করা হইয়াছিল। কিন্তু তবু কিভাবে সংবাদ পাইয়া স্থানীয় অনারারী

ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রবীন মুখার্জ্জী সস্ত্রীক মার দর্শনের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি রায়পুরে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাকে প্রথম দেখিয়াছিলেন। আসিয়াই আমাদের বলিলেন—"মাকে কি কেউ গোপন করে রাখতে পারে? আমরাও যে মার দর্শনের জন্য ব্যস্ত ছিলাম। তাই কৃপা করে মা স্বয়ং খবর পৌঁছে দিয়েছেন।" মাও হাসিয়া বলিলেন—"তোমাদের কথা আমার কালই খেয়ালে আসছিল।"

রবীনবাবু মাকে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহাকালী ও মহালক্ষ্মী মন্দির এবং মার্কণ্ডেয় শিবের মন্দির দেখাইতে লইয়া গেলেন। আমরাও মার সঙ্গে গেলাম। ঝাঁসির আরও কিছু কিছু দ্রষ্টব্য স্থান আমরা দেখিয়া আসিলাম।

লখ্নৌর কয়েকটি কথা মনে পড়িতেছে। গোমতীর তীরে অবস্থানকালে শীতলপ্রসাদজী একদিন মাকে একখানা বেনারসী শাড়ী দিয়াছিলেন। তাঁহার তীব্র ইচ্ছা ছিল যে মা একবার অন্ততঃ শাড়ীখানা পরেন। রাত্রি বারটার পরে যখন প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন তখন মা নিজেই উঠিয়া গিয়া তাঁবুর পিছনে শাড়ীখানা পরিয়া ঘোমটা দিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। ছেলেমানুষের মত হাসিতেছেন। সমস্ত মুখমণ্ডলে এক আরক্তিম আভা। যে দুই এক জন তখনও উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা মাকে প্রণাম করিলেন। ডাঃ পান্নালালজীও ছিলেন। মার এই রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার চক্ষে কেন জানি জল আসিয়া পড়িল। প্রণাম করিয়া করজোড়ে তিনি বলিতে লাগিলেন—

ভক্তের অভীষ্ট পূরণ

"সখীরূপে গুরু তুমি,
অতি ভিখারিণী আমি।
বাঞ্ছা কল্পতরু তুমি,
দয়া কর আমারে
দয়া কর সবারে ॥"

পান্নালালজীর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় এই কবিতার অংশটি শুনিতে শুনিতে অনেকেরই প্রাণে এক ভাবের স্রোত বহিয়া গেল।

ডাঃ পান্নালালজী একজন বিশেষ ভক্ত লোক। বৈষ্ণব ভাবে একেবারে যেন ভরপুর। একদিন কি কথা প্রসঙ্গে তিনি মাকে বলিতেছিলেন যে তিনি কাটোয়াতে গিয়াছিলেন। মা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "মহাপ্রভুর সময়েতে ছিলে না?" মার এই কথাটির পিছনে কোনও গূঢ় অর্থ আছে মনে হইল। একদিন অভয়েরও নাকি হঠাৎ মনে হইয়াছিল যে পান্নালালজী মহা প্রভুর সময়কারই কেহ একজন ছিলেন। কে জানে? প্রকৃত বিষয়টি ত মা-ই বলিতে পারেন।*

ডাঃ পান্নালাল কে?

আরও একটি ঘটনার বিষয় লিখিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লখ্‌নৌ মিউনিসিপাল সোসাইটির পক্ষ হইতে একটি সভা হয়। তাহাতে ডাঃ পান্নালালজীও উপস্থিত ছিলেন। সেই সভার মধ্যে কি প্রসঙ্গে আলোচনা হয় যে বর্ত্তমান কালের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধু কে? পান্নালালজী সেখানে মায়ের

লখ্‌নৌর সভাতে মায়ের সম্বন্ধে আলোচনা

*ডাঃ পান্নালালজীর আগ্রহে কয়েক বৎসর হয় শ্রীশ্রীমার বৃন্দাবনস্থ আশ্রমে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

নাম করিয়াছিলেন। তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে মাকে কিভাবে লখ্নৌতে আনা যায়। অনেকেই অনেক প্রস্তাব করিলেন। রবীন বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে মা যদি সত্যিকারের মা হন তবে তিনি নিজেই আসিয়া দর্শন দিবেন। সত্য সত্যই ইহার কিছুদিনের মধ্যেই মার লখ্নৌতে আগমন হয়।

মার নিকট হইতে আরও একটি সুন্দর ঘটনা শুনিলাম। লখনৌতে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া একান্তে মাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার এক বন্ধুর যক্ষ্মার মত হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধুকে দিয়া তিনি মার নিকট একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পরে সেই বন্ধু গিয়া নিজেও মার দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। মা তাঁহাকে গায়ত্রী জপ এবং আরও কি কি সব করিতে বলিয়াছেন। অনেক সময়েই তিনি মাকে স্বপ্নে দেখিতে পান। দুই একবার তিনি পরিষ্কার দেখিতে পাইয়াছেন যে মা বলিতেছেন—"তুই ভাল হবি আর সময়ে মুক্তও হবি।"

অলৌকিক ভাবে জনৈক ভদ্র-লোকের রোগমুক্তি

কোনও এক স্বাস্থ্যকর স্থানে তিনি ছুটিতে ছিলেন। ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে। পুনরায় ডাক্তারের সার্টিফিকেট দরকার। এতদিন তিনি কর্ম্মস্থলে তাঁহার রোগের বিষয়ে প্রকৃত সংবাদ জানান নাই। কিন্তু এখন তাঁহার বিশেষ আশঙ্কা হইল যে ডাক্তার যদি তাঁহার ঐ রোগের বিষয় লিখিয়া দেন তবেত তাঁহার চাকুরী যাইবে। ভীত হইয়া তিনি মনে মনে মার নিকটে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। রাত্রে স্বপ্নে দেখেন মা আসিয়া বলিতেছেন—"ভয়

নাই। তুই ডাক্তার দেখা।" ইহার পরে ডাক্তারকে দেখাইতেই ডাক্তার বলিলেন যে তাঁহার প্রকৃত রোগ ত ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। সার্টিফিকেটেও সেই কথাই লিখিয়া আরও ছুটির জন্য অনুমোদন করিয়া দিলেন। ভদ্রলোক এইভাবে আসন্ন বিপদ হইতে মায়ের কৃপায় রক্ষা পাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে তিনি নাকি আজকাল সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ কাজে যোগ দিয়াছেন।

২রা ফাল্গুন, শনিবার।

আজই মার অন্যত্র যাওয়ার কথা হইয়াছিল। কিন্তু বিহারীলাল বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর একান্ত আগ্রহে যাওয়ার কথা চাপা পড়িয়া গেল। মারও যাওয়ার সেরূপ পাকা খেয়াল এখনও হয় নাই মনে হইল। নতুবা তাহা বদল করিতে পারে কাহার সাধ্য ?

৩রা ফাল্গুন, রবিবার।

আজ এখানে কীর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বৈকাল চারটার গাড়ীতেই মার রওনা হইবার কথা। যাওয়ার সময় হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় সংবাদ আসিল যে গাড়ী প্রায় এক ঘণ্টা লেট্। এইটুকু সময়ও বেশী পাইয়া সকলে আনন্দে যেন আত্মহারা হইয়া পড়িল। একটু পরেই যদিও মাকে লইয়া আমরা রওনা হইলাম। সকলে ষ্টেশনে আসিয়া চোখের জলে মাকে বিদায় দিলেন।

ঝাঁসি হইতে রওনা হইয়া আমরা সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ললিতপুর

ললিতপুরে একরাত্রি

পৌঁছিলাম। ললিতপুর ঝাঁসি হইতে ৫৬ মাইল দূরে। আমরা কোন দিকে যাইতেছি তাহা এখনও ঠিক নাই। হরিরামজীও আমাদের সঙ্গেই আছেন। আমরা ললিতপুরে নামিলাম।

এখানে হরিরামজীর পরিচিত একজন হেডমাষ্টার আছেন। তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার বাসার নিকটে একটি মাঠের মধ্যে মার জন্য তাঁবু লাগান হইয়াছে। মাকে লইয়া আমরা সেখানেই রাত্রিবাস করিলাম।

৪ঠা ফাল্গুন, সোমবার।

সকালে উঠিয়াই মা বলিলেন সমস্ত শরীরে ভয়ানক ব্যথা। এমন দুঃসহ ব্যথা যে সাধারণ লোক নাকি হার্টফেল করিয়া মারাও যাইতে পারে। আমরা সকলেই খুব চিন্তিত হইলাম। মায়ের হার্টে প্যালপিটেশন আরম্ভ হইয়াছে। মা শুইয়াই রহিলেন।

একটু পরেই নিজে উঠিয়া বসিলেন। নানাপ্রকার ক্রিয়াদি আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ আবার চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। মধ্যে

নানারূপ ক্রিয়াদি ও মন্ত্রের প্রকাশ

মধ্যে মুখ দিয়া ২।১টি মন্ত্র বাহির হইতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া শরীরে হাত বুলাইয়া দিতেছি। মার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল—"পং স্বাহা।" আমি কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করায় আবার বলিলেন—"কং স্বাহা।" অনেক জিজ্ঞাসায়ও প্রকৃত অর্থ জানিতে পারা গেলনা।

অভয় ঘরে ঢুকিয়া এইসব দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"বাঃ, পূর্ণব্রহ্মের ঘা ঘসা হচ্ছে!" অভয়ের মুখে এই জাতীয় কথা এই প্রথম না। অনেক সময়ে সে ইচ্ছাপূর্ব্বকই এইরূপ নানা উক্তি করে। কিন্তু স্নেহময়ী মা তবু তাহাকে সর্ব্বদা স্নেহের অঞ্চলে সুরক্ষিতই রাখিয়াছেন।

অভয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া মা আস্তে আস্তে বলিতে

লাগিলেন—"কে ঘসে? আমিই ঘসি। ঘসাটাও আমি। ভালও আমি, মন্দও আমি। আমিইত সব। যা কিছু হচ্ছে আমিই করছি।"

মা তখনও এক অন্য ভাবে আছেন। এই অবস্থাতেই মুখ দিয়া বাহির হইল—"সময় নষ্ট করোনা। আলস্য বড় খারাপ।"

আবার একটু পরে বলিতেছেন—"এই শরীরটার কাছে যারা এসেছে তাদের আর পতন নেই।"

অভয় জিজ্ঞাসা করিল—"আর যারা আসেনি?"

মায়ের মুখ হইতে বাহির হইল—"যারা মনেও করেছে তাদেরও।"

এই জাতীয় কথা এইরূপ স্পষ্ট ভাবে আর কখনও বোধ হয় মার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। আমরা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—আজ কি হইল? একটু পরে মা নিজেই বলিলেন—"এই সব কথা নিয়ে তোরা আলোচনা করিস না কিন্তু।"

মা তখনও চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া আছেন। সমস্ত শরীরে একটা অস্বাভাবিক ভাব। হরিরামজী মায়ের পায়ে হাত বুলাইতেছিল। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই মা ব্যথায় হাতখানি পর্য্যন্ত নাড়াইতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে ক্রিয়ার সময় এমন দ্রুত গতিতে হাত নাড়াইতেছিলেন যে তাহা দেখিয়া আমরা হতভম্ব হইয়া গেলাম। আশা হইল যে এইবার ব্যথা নিশ্চয়ই সারিয়া যাইবে।

বিকাল বেলা মা স্বাভাবিক ভাবেই একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। অভয় মার সঙ্গে ছিল। কথায় কথায় মাকে সে বলিল—"মা, আপনার হাতেত লেখা আছে অনেক ছেলেমেয়ে।" সম্মুখের

জিনিষ দেখাইয়া সঙ্গে সঙ্গে মা বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, ঐযে গরুটা দেখছিস, পাখাটা দেখছিস, গাছপালা দেখছিস, সবই আমার ছেলে মেয়ে। আবার সবই আমি।"

ফিরিয়া আসিয়া মা একটু শুইয়াছেন। পরমানন্দ স্বামী কি কথায় কথায় যেন বলিতেছেন যে তিনি মাকে চিনিয়া নিয়াছেন। মার কানে এই কথাটা যাইতেই মা একটু গম্ভীর ভাবে হাসিয়া বলিলেন—"আরে না বুঝালে কে বুঝবে?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"আজ মার কি হল? মুখ দিয়া যে খুব স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বের হচ্ছে।"

মা অমনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ, স্পষ্ট আবার কি বলা হল? তোরা কিন্তু এই সব কথা নিয়া আলোচনা করিস্‌না।"

সূক্ষ্মে বিন্ধ্যাচলে গমন

দেবীজী* বিন্ধ্যাচলে আছেন। তাঁহার নিকট মা ২।৩ দিন পূর্ব্বে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। মার কথা লেখা ছিল—"এই শরীর তোমার ঘরে এবং তার পাশের নূতন দুইটি কোঠাতে ঘুরে এসেছে। তোমার জানলা সব বন্ধ ছিল।"

সূক্ষ্মে মা এইরূপ সর্ব্বদাই নানা স্থানে যাওয়া আসা করেন—নানা জিনিষ দেখেন তাহা আমাদের নিকট নূতন না। কিন্তু সাধারণতঃ এইরূপ স্পষ্ট ভাবায় তাহা মা প্রকাশ করেন না। দেবীজীর উপর

---

*পাহাড়ী সাধিকা রূমা দেবী। কৈলাসের পথে মায়ের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। কয়েক বৎসর হয় ইনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

মার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আছে। তাই বোধ হয় তাঁহাকে এই কথা মা নিজের মুখে লিখিয়া জানাইতে বলিলেন।

দেরাছুন হইতে হেমবাবু মার নিকট চিঠিতে কি কথায় কথায় লিখিয়াছেন যে তিনি খ্যাপা হইয়াও পরশ পাথর পাইতে চান।

“অনাহত ধূনী জ্বালাইতে চেষ্টা কর”

তাঁহার এই চিঠি শুনিয়া মা জবাব দিলেন—“এই কথাটাই যেন মনে থাকে। চাওয়া রূপেতে পাওয়া এলেও আশা। চাওয়াই চাই। অনাহত ধূনী জ্বালাইতে চেষ্টা করা। অগ্নি নির্বাপিত না হয় তাহার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা।”

৫ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

ওয়ার্দ্ধার পথে

গতকাল সন্ধ্যায় ললিতপুর হইতে রওনা হইয়া ইটারসি হইয়া আজ সন্ধ্যায় নাগপুর আসিয়া পৌঁছিলাম। রাত্রিটা স্টেশনেই থাকা হইল। রাত্রিতে মার মুখ হইতে প্রকাশ পাইল—“ওয়ার্দ্ধা চল।” ওয়ার্দ্ধার কথা শুনিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল আজ যমুনালালজী ইহলোকে নাই। তিনি আজ থাকিলে না জানি তাঁহার কত আনন্দ হইত। শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি মার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন।

৬ই ফাল্গুন, বুধবার।

আজ সকালের গাড়ীতে মা ওয়ার্দ্ধা রওনা হইলেন। এখান হইতে ওয়ার্দ্ধা জংশন মাত্র ৫০ মাইল দূর।

গাড়ীতে আবার যমুনালালজীর কথা উঠিল। বার বারই মনে হইতেছিল তিনি আজ নাই। মা আমাদের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বাঃ, সে গেল আবার কোথায়? সঙ্গে সঙ্গেইত আছে। স্পষ্ট দেখছি সে খুব হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় সেইরকমই টুপী। মুখে খুব আনন্দের ভাব।"

সূক্ষ্মে যমুনালালজীর উপস্থিতি

কমলনয়নকে টেলিগ্রাম করা হয় নাই শুনিয়া মা বলিলেন—"বাঃ, বেশ হয়েছে। আপন ঘরে আপনি সব, তার আবার টেলিগ্রাম করা কি? যমুনালাল বিশেষ করে ওয়ার্দ্ধা যাওয়ার কথা বলায় বলা হয়েছিল যে যদি বিন্ধ্যাচল বা ওদিকে যাওয়া হয় তবে ওয়ার্দ্ধার কথা দেখা যাবে। তাই এদিকে আসা হল। যেয়ে ঘুরেও আসতে পারি। খবর দেবারত কিছু দরকার নেই। তবে তার ছেলেকে বলা হয়েছিল যে গেলে খবর দেওয়া হবে।"

আবার বলিতেছেন—**"আমার কাছেত সে যেমন তেমনই আছে। আমিত দেখছি আমার সঙ্গে সঙ্গেই। তোদের মত মনের কল্পনাত না। একেবারে সত্যি সত্যি যেমন ছিল ঠিক তেমনটিই।"**

মার সঙ্গে যমুনালালজীর যে সব কথা হইয়াছিল সেই অনুযায়ী তিনি কয়েক মাস যাবৎ গোপুরীতে নির্জ্জন স্থানে একটি কুটিয়া করিয়া একান্ত বাস করিতেছিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে গোসেবার কাজও করিতেছিলেন। রায়পুরে বাড়ী করিবার প্রস্তাবে মা নাকি তাঁহাকে একান্তে বলিয়াছিলেন—**"দেখ, এক**

যমুনালালজীকে মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস প্রদান

নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। কে কতদিন আছে কে জানে? ছয় মাসও হতে পারে আবার ছয় বছরও হতে পারে। তুমি এখন নিজের ভাবে একা একটু সাধন ভজন করতে আরম্ভ কর।" এইভাবে আরও কি সব কথা মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন।

মা বলিলেন—"**সকলেত এই শরীরের সব কথা ধরে কাজ করতে পারে না। কিন্তু যমুনালাল অনেকটা করেছিল।**"

হরিরামজীর নিকট যমুনালালজীর শেষ পত্রে লেখা ছিল যে মা যেন গিয়া তাঁহার কুটিয়াতে থাকেন। মার কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে মা গোপুরীর কুটিয়াটিতে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়াই হয়ত চলিয়া আসিতেন। কেহ জানে—জানিল, আবার নাই বা জানিল। কিন্তু এবার লখ্‌নৌ ষ্টেশনে কমলনয়ন আসিয়া মাকে যখন ওয়ার্দ্ধা লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন মা তাহাকে বলিয়াছিলেন যে পরে যাওয়া হইলে সে খবর পাইবে। তাই মার যখনই ওয়ার্দ্ধা যাওয়া স্থির হইল তখনই মা কমলনয়নকে খবর দিতে বলিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহাকে সংবাদ দিতে ভুলই হইয়া গেল। মার পূর্ব্ব খেয়ালও অনেকটা সেই রকমই ছিল।

গোপুরীতে যমুনালালজীর কুটিয়াতে মায়ের অবস্থান

তবুও মার মুখ হইতে যখন একবার বাহির হইয়াছে যে সংবাদ দেওয়া হইবে তাই আমরা ওয়ার্দ্ধা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিতেই হরিরামজী কমলনয়নকে খবর দিল। খবর পাওয়া মাত্রই কমলনয়ন, যমুনালালজীর মেয়ে ও জামাই মোটর লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মার নির্দ্দেশ মত সকলে গোপূরী অভিমুখে চলিলাম।

গোপুরীতে আসিয়া পৌঁছিবামাত্রই যমুনালালজীর পত্নী জানকীবাঈ আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। মাকে পাইয়া পুনরায় মৃত পতির স্মৃতি যেন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। রুদ্ধস্বরে তিনি বলিলেন—"মাতাজী, আপনাকে দেখার জন্য আপনাকে এখানে আনিবার জন্য তিনি কত ব্যস্ত ছিলেন।"

জানকীবাঈ ও কমলনয়নকে সান্ত্বনাদান

মা হাসিয়া জবাব দিলেন—"**তিনিইত আনিয়াছেন। এখনও তিনি আছেন। দুঃখ করিওনা।**"

যমুনালালজীর কুটিয়ার বারান্দায় আসিয়া মা বসিলেন। জানকী বাঈ মার কোলে হাতখানা রাখিয়া পতির মৃত্যু সময়ের নানা কথা বলিতে লাগিলেন। ছেলেমেয়ে সকলেই মার সম্মুখে আসিয়া বসিয়াছে।

জানকীবাঈ বলিতেছেন—"মাতাজী, আজ বুধবার। গত বুধবার এমন সময়েও তিনি আনন্দে এখানে বাস করিতেছিলেন। আপনি সাতদিন পূর্ব্বেও কেন আসিলেন না?"

মার মুখ হইতে বাহির হইল—"**এখনই যে আসার ছিল। যা হয়ে যায় তাই ভাল। এই ভাবটা থাকলে আর কষ্ট হয় না। বাসনাই কষ্টদায়ক আর পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর কারণ।**"

আবার বলিতেছেন—"**এক দৃষ্টিতে তোমরা দেখছ যে সে নাই। কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে সে যেমন তেমনই আছে। সে এই শরীরটাকে বলেছিল—'মা, মৃত্যু-সময়েতে যেন কারো সেবা না পাই।' তাকে বলা হয়েছিল—সব কাজ কর, কিন্তু সেই সময়টির জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা দরকার। তাই সে করছিল।**"

যমুনালালজী সম্বন্ধে মায়ের মুখে নানা কথা প্রকাশ

জানকীবাঈ—"মাতাজী, ঠিক তাই হইয়াছে। পায়খানা হইতে আসিয়াই যে চক্ষু বন্ধ করিলেন আর খুলিলেন না। কাহারো দিকে একবার চাহিলেন না পর্য্যন্ত। সব শেষ হইয়া গেল।"

কমলনয়নও মাকে বলিতে লাগিল যে মার নিকট হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতেই তাঁহার ভিতরে সর্ব্বদাই একটা যেন আনন্দের ভাব দেখা দিয়াছে যাহা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঐরূপ দেখা যায় নাই। চিত্ত যেন নির্ম্মল হইয়া গিয়াছিল। কোন কাজই তিনি বাকী রাখিয়া যান নাই। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করিয়াই সব সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন।

মা আসিয়া পৌঁছিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই জানকীবাঈ কাহাকে বলিতেছিলেন যে যমুনালালজী নিজের হাতে সূতা কাটিয়া মার জন্য একজোড়া কাপড় বানাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মারত এদিকে আসিবার এখনও কোনই সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি ভাবিতেছিলেন যে বস্ত্রখানি আজই পার্শেল করিয়া মার নামে পাঠাইয়া দিবেন। এই কথা শেষ হইতে না হইতেই টেলিফোনে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল যে মা ওয়ার্দ্ধা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই ঘটনায় তাঁহারা সকলেই বিশেষ ভাবে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন।

কমলনয়ন ও তাহার মা শ্রাদ্ধাদি সম্পর্কে মাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলে মা বেশ জোর দিয়া বলিতে লাগিলেন—

মায়ের নানা উপদেশ

"ঋষি মুনিরা যেমন বলে গেছেন তাহাতে নিশ্চয়ই ফল হয়। শ্রাদ্ধ হল শ্রদ্ধা। পিতৃ-মাতৃ পূজা এও ভাল ভাবই।"

জানকীবাঈ মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পিণ্ডদান করিলেত সে মুক্ত হইয়া গেল। আবার শ্রাদ্ধের প্রয়োজন আছে কি?"

মা—"মুক্ত আত্মার স্মৃতিতেও পূজাদি করলে যারা করে তাদের মঙ্গল হয়।"

জানকীবাঈ আবার দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে মা কেন অন্ততঃ সাতদিন পূর্বেও আসিলেন না। মাও হাসিয়া উত্তর দিলেন—"তিনিত আজও দেখছেন। আত্মা কখনও মরে কি? জল কি কেটে কেউ দুভাগ করতে পারে? তোমরা দুঃখ করো না। দুঃখ করতে নেই। তেমন উচ্চ আত্মা যদি না হয় তবে এই দুঃখ করাতে তাঁকে নীচের দিকে টানে—কষ্ট পায়। এমনও অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক জন্ম হয়ত পার হয়ে এসেছে কিন্তু তবুও অনেক সময়ে মনটা খুব খারাপ লাগে। ইহার কারণও কিন্তু কখনও কখনও ঐ-ই।"

জ্ঞানকীবাঈ—"আচ্ছা, মাতাজী, সকলেই কি জন্ম নেয়?"

মা—"কেহ জন্ম নেয়। কেহ বা সূক্ষ্ম ভাবে থেকেই নিজের কর্ম্ম শেষ করে—উর্দ্ধগতিতে চলে যায়। কেহ বা আবার অল্প দিনের জন্য জন্ম নিয়ে কর্ম্ম শেষ করে উর্দ্ধ-গতি প্রাপ্ত হয়। এই রকম অনেক অবস্থা আছে।"

যমুনালালজীর মায়ের নিকট শিশুভাব

কথায় কথায় মা বলিতেছেন,—"পিতাজী যখন এই মেয়েটার কাছে ছিল তখন রোজ প্রাইভেটে কথা বলতে গিয়ে ছোট্ট শিশুর মত কোলে শুয়ে থাকত। একদিন গণেশ পূজার দিন বলে বসল—'মাতাজীর সঙ্গে প্রাইভেট না করে খাব না।' শেষে প্রাইভেট করতে গিয়ে এই শরীরটাকে বলল—'আমার তিন কথা। প্রথম কথা হচ্ছে যে রায়পুরে আমি একটা জমি নিচ্ছি

সেখানে তুমি একবার চরণ ধূলি দিবে।' অবশ্য এই সব কথা সে তার নিজের ভাবেই বলছে। কারণ এই শরীরটাত সকলকেই বলে—'আমি তোমাদের ছোট্ট মেয়ে'।"

মা আবার বলিতে লাগিলেন—"তারপর সে বলল—'আমার দ্বিতীয় কথা, আমার নাম বদল করে দেও। কেহ আমাকে যমুনালালজী বা বজাজজী বা শেঠজী বলতে পারবে না। আমি তোমার ছেলে, তাই আমি সকলের ভাইয়া।' 'ভাইয়া' না 'ভাইয়াজী' হবে সে জন্য উপস্থিত সকলের মধ্যে তখন ভোট নেওয়া হল। এও এক খেলা তামাসা আর কি! ভোটে 'ভাইয়াজীই' জিতল; কিন্তু শরীরের কোলে যে কাগজখানা রাখা ছিল তাতে 'ভাইয়াই' লেখা ছিল। তাই শেষ পর্য্যন্ত 'ভাইয়াই' থাকুক বলা হল। সেও বলল—'আমারও ইচ্ছা ছিল যে 'ভাইয়া' নাম থাকে'। এই রকম খেলা হল।"

যমুনালালজীর 'ভাইয়া' নামকরণ

একটু থামিয়া মা বলিলেন—"আর তৃতীয় কথাটা এখনই এ শরীরের বলা আসছে না। যদি পরে আসে বলে দেব। এই তিন কাজ শেষ করে তবে সে খেতে গেল। সে প্রায়ই বলত—'মা, আমি যা মনে করি করব সেটা করে তবে আমার শান্তি।' কথা ধরবারও বেশ ক্ষমতা ছিল। এই যে কুটিয়ায় থাকার কথা, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার কথা এসবত অনেকের সঙ্গেই হয়, কিন্তু সকলেত এইভাবে কাজ করে উঠতে পারে না।"

জানকীবাঈ বলিলেন—"মা, সত্যই তাঁর স্বভাব এমনই ছিল। ছোটবেলা হইতেই বলিতেন যে তাঁর মৃত্যুর জন্য ভয় হয়না।"

মা বলিলেন—"মৃত্যুত একটা অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র। সবই যেমন আছে তেমনই থাকে। দেখা যায় কখনও

স্বপ্নে এসে কেউ কোনও কথা বলে গেল মারা যাওয়ার পরেও। তাই বলা হয় যদি নাই থাকে তবে দেখা যায় কেন? আর কথাবার্ত্তা সত্য হয় কি করে?"

জানকীবাঈ কাতর ভাবে বলিলেন—"মা, সবই বুঝি। কিন্তু তবু প্রাণ কাঁদে কেন?''

মা সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে মোহ আছে তাই। ইহা সব মোহেরই কাজ। যদি কাঁদিতে হয় তাঁহার জন্যই কাঁদা। উহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়।

কমলনয়ন আবদারের সহিত বলিল—"মা, আমাদের শান্ত না করিয়া কিন্তু আপনি যাইতে পারিবেন না। পিতাজী ভাল লোক ছিলেন। তিনি আপনার সকল কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু আমি খারাপ সন্তান। আমি কিন্তু আপনার কথা শুনিবনা। গুরুজনদের কাছে আমরাত অপরাধ করিবই। তাঁহারাও ক্ষমা করিবেনই। চিন্তা কি?"

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হ্যাঁ, তবে বাচ্চা কান্নাকাটি করলে পিতামাতা শেষে বাচ্চার কথাতেই রাজী হয়ে যায়। আর যদি মা বল তবেত মার কথা শুনবেই।''

জানকীবাঈ সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ মাতাজী, ঠিকই। আমরা যদি আপনার মা, তবে আমরা যাহা বলিব তাহাইত করিবেন।"

মার থাকিবার ব্যবস্থা কুটিয়ার মধ্যেই করা হইল। ছোট্ট একটি কুটিয়া। চাটাই দিয়া ঘের দেওয়া আর উপরে খড়ের চালা। জানকী বাঈও আজকাল এইখানেই আছেন।

বিকালে যমুনালালজীর একজন মিত্র মার সঙ্গে দেখা করিতে

আসিয়াছেন। তাঁহার সহিতও কথায় কথায় মা বলিতেছেন—
“তোমার বন্ধু কোথায় গিয়েছে? আমিত দেখছি তোমার নিকটেই বসে আছে।”

সন্ধ্যাবেলা সকলে মিলিয়া প্রার্থনা সুরু করিলেন। যমুনালালজীর মৃত্যুদিবস হইতেই এই নিয়ম রাখা হইতেছে—সকালে পাঠ ও সন্ধ্যাতে প্রার্থনা। প্রার্থনায় অনেকেই আসিয়া সমবেত হইলেন। প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে যমুনালালজীর ভ্রাতুষ্পুত্র মার সম্বন্ধে সকলকে একটু বলিলেন —“বজাজজী যখন হইতে মাতাজীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তখন হইতেই তাঁহার সমস্ত ধ্যান মাতাজীর উপরেই ছিল। তিনি বলিতেন যে অনেক স্থান তিনি ঘুরিয়াছিলেন অনেক সাধু মহাত্মা তিনি দেখিয়াছিলেন কিন্তু মাতাজীর ন্যায় এমনটি আর কোথাও দেখেন নাই। আজ মাতাজী কৃপা করিয়া এখানে পদার্পণ করিয়াছেন। ইহা আমাদের সকলের পরম সৌভাগ্যের বিষয়।” এইরূপ আরও নানা কথা বলিলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ মাকে এক এক রকম প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মাও তাঁহার স্বভাব মধুর ভাবে উত্তর দিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

যমুনালালজীর পুনর্জন্ম হইবে কি

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন যে যমুনালালজীর মাকে এখানে আনিবার তীব্র বাসনা ছিল, কিন্তু তাহাত অপূর্ণই রহিয়া গেল। ইহাতে তাঁহার পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে কি না?

মা উত্তর দিলেন—**“বাসনা, পিতাজী, অনেক রকমের আছে। এই বাসনাতে জন্ম হয় না।”**

গোসেবার কাজও তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাও সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। এই বিষয়ে আবার কেহ জিজ্ঞাসা

করিলে মা পুনরায় বলিলেন—"আসা না আসার কথা বলা হচ্ছে না। তবে এই শরীরের সঙ্গে তার কথা হয়েছিল। তাতে এইরূপ ভাব ছিল যে শুধু চিত্ত শুদ্ধির জন্যই সেবা করা। আবার চিত্ত শুদ্ধি হয়ে শক্তি সঞ্চারিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত সেবার কাজ হতেই পারে না। তাই বলা হচ্ছে যে এই কাজের উদ্দেশ্য যদি তার থেকে থাকে শুধু চিত্ত শুদ্ধি, তবে কাজ সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণের কোনও কথাই আসে না। আবার, এই কাজের জন্যই যে আসতে হবে তাও বলা যায় না। কারণ কাজ অনেক রকমের হয়। যেমন তুমি এখানে এসেছ, বাসায় হয়ত কোনও কাজ এই সময়েতে বাকী আছে। তুমি হয়ত কাউকে বলে এসেছ সেই কাজটা করতে। কাজটা হয়েও গেল। তাই সেই কাজের জন্য তোমার আর যেতে হয় না। কাজটা হওয়া নিয়া কথা। এই রকমটা আর কি।"

আবার কি কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছেন—"পিতাজী, তুমিত অনন্ত। তোমার ভিতরে অনন্ত ভাব অনন্ত মূর্ত্তি আছে। দেখনা, একটি ছোট বীজের মধ্যে কত বড় গাছ ফল কত বীজ থাকে তার কি অন্ত আছে? সবই যে অনন্ত তিনিই সব রূপেতে কিনা।"

একজন প্রশ্ন করিলেন যে বাজাজজীত চলিয়া গেলেন। এখন তাঁহার অভাবে সকলে কি করিবে? কিসে তাঁহার তৃপ্তি সাধন হইতে পারে?

মা উত্তর দিলেন—"তিনি যাহা চাহিতেন সেই কাজ করিলেই তাঁহার তৃপ্তি সাধন হইবে।"

৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

মহিলামণ্ডলীর মেয়েদের নানা উপদেশ প্রদান

সকালে কুটিয়ার সম্মুখেই রামায়ণ পাঠ হইল। মহিলা মণ্ডলীর মেয়েরা এবং আরও অনেকে আসিয়া পাঠে যোগদান করিয়াছেন। পাঠের পর একটি মেয়ে মাকে প্রশ্ন করিল—"মাতাজী, আপনার নিকট ভগবানের স্বরূপ কেমন ?"

মা হাসিতে হাসিতে জবাব দিলেন—**"যেমন তুমি আমার নিকট, এইরূপই।"**

ইহার পর মেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোমাদের ভাগ্যত খুব ভাল। এই বয়সেই তোমরা সেবার কাজে লেগেছ। **কিন্তু মনে রাখা চাই যে তাঁকে সঙ্গে না রাখলে আসল সেবা হতে পারে না।** যত ছোট ছেলে মেয়ে সব আমার দোস্ত। আর তাদের বাবা মা আমার বাবা-মা। **তোমরা সব মনে রেখ যে তাঁকে ছাড়া শান্তি নেই। তুনিয়া কিনা ?—তুই নিয়া। কাজেই তুঃখ আছেই। তাঁকে সঙ্গে রাখলে আর তুঃখ পেতে হয় না। একমাত্র তাঁর ধ্যানেই শান্তি।"**

একটি মেয়ে—"মা, আপনার এইরূপ ভগবৎ প্রেম কি করে হল ?"

মা—"এই শরীরটার কথা ছেড়ে দেও। এই শরীরটার এই রকমই স্বভাব।"

অপর একটি মেয়ে—"মাতাজী, আপনি কে তাহা আমাদের বলুন।"

মা হাসিয়া—"তোমার কি মনে হয় ?"

মেয়েটি—"আমার মনে হয় আপনি ঈশ্বর।"

মা—**"যে যা বল আমি তাই। আমাকে পোকা বল,**

আমি তাই। খারাপ কিছু বল, আমি তাই। আবার তোমাদের দোস্ত বল, আমি তাই। তোমাদের মেয়ে বল, আমি তাই।" এই জাতীয় আরও অনেক কথা মা বলিলেন।

"যে যা বল আমি তাই"

গতকালের ন্যায় আজ রাত্রেও খুব বৃষ্টি সুরু হইল। মা যেখানটায় শুইয়াছিলেন সেখানে জল পড়ায় মাকে জানকী বাঈর ঘরে লইয়া গেল। সেখানে তিনিও মার সঙ্গেই মার পায়ে হাত দিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহারত মহা আনন্দ।

৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার।

মহাত্মাজী ওয়ার্দ্ধাতে ছিলেন না। গতকাল তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আজ দুপুরে তাঁহার আশ্রমে একটি মিটিংএর আয়োজন হইয়াছে। যমুনালালজী অনেক কাজের ভার নিয়া ছিলেন। এখন তাঁহার অবর্তমানে সেই সব কাজের ভার কাহারা নিবে সেই বিষয়ে আলোচনা হইবে। মাকেও ঐ সভাতে উপস্থিত থাকিবার জন্য মহাত্মাজী বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইয়া লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মা বলিয়া পাঠাইয়াছেন—"নিমন্ত্রণের কি আছে? এই ছোট্ট মেয়েটার যদি খেয়াল হয় তবে কেউ না বললেও বাপুজীর কাছে চলে যাবে।"

মহাত্মাজীর আশ্রমের মিটিংয়ে মাকে নিমন্ত্রণ

সভাতে যাইবার পূর্ব্বে জানকীবাঈ মাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য খুবই আগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু মা গেলেন না। শুধু বলিলেন—"এখন খেয়াল হচ্ছে না। তোমরা যাও। খেয়াল হলে নিজেই চলে যাব।"

আজ সন্ধ্যায় মার অন্যত্র যাইবার কথা হইয়াছে। সকলে সভাতে চলিয়া যাইবার পর মা আবার আমাদের বলিলেন—"যদি কোনও বিশেষ বাধা না হয় তোমরা চেষ্টা কর।"

সকলে সভা হইতে বিকালে ফিরিয়া আসিয়া মার যাওয়ার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। জানকীবাঈ বলিলেন—"মাতাজী, তিনি থাকিলে তোমাকে অন্ততঃ একমাস রাখিতেন। আমিও মনে করিয়াছি ৮।১০ দিন থাকিবেনই। এইমাত্র বাপুজীকেও বলিয়া আসিলাম যে মাতাজীকে সেবাগ্রামে এক সময় লইয়া আসিব। আজ প্রার্থনা সভায় অনেকেই যোগদান করিবেন। তাঁহারা সকলে আপনার দর্শন পাইবেন। কিন্তু আজই সন্ধ্যায় চলিয়া গেলে কিছুই যে হইবে না।"

ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে সন্ধ্যার গাড়ী আজকাল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভোর পাঁচটার গাড়ীতে মা রওনা হইতে পারেন।

কমলনয়ন ও জানকীবাঈ বার বার বলিতে লাগিলেন—"মহাত্মাজীর সহিত দেখা না করিয়া আপনি কিছুতেই যাইতে পারিবেন না। আমরা মহাত্মাজীকে বলিয়া আসিয়াছি যে আপনাকে নিয়া আমরা সেবাগ্রামে আসিব। হয় আপনাকে সেবাগ্রামে লইয়া যাইব নতুবা মহাত্মাজীকেই এখানে আনিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মা আস্তে আস্তে বলিলেন—"এখনই যাওয়ার খেয়াল হচ্ছে না। বাপুর কাছে মেয়েত ছুটে চলে যায়। তবে এই মেয়েটার মাথা খারাপ কি না তাই সব সময়ে সবটা খেয়াল হয় না। আর বাপুজীত আমার পিতাজী। এই মেয়েটাত বাবার কাছেই আছে। যাওয়া আসার মধ্যে কি?"

কমলনয়ন অভিমানের সুরে বলিল—"আপনার কাছেত সবই আছে। কিন্তু আমরা স্থূলে দেখিতে চাই। তাইত আপনার ওয়ার্দ্ধা আসা। নতুবা আপনিত ওয়ার্দ্ধাতে ছিলেনই।"

মা হাসিয়া বলিলেন—"একেবারে ঠিক কথা। এই শরীর কখনও কোথাও যায় না আসেও না। তবে তোমরা যে বলছ তাতে বলি খেয়াল হলেই যাব। বলতেও হবে না।"

কমলনয়ন আবার বলিল—"খেয়াল হইলেত হইয়াই যায়। কিন্তু আপনিই বা এইরূপ খেয়ালের অধীন কেন ?"

মায়ের খেয়াল তাঁহারই স্বাধীন ইচ্ছা

মা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"**এই মেয়েটা খেয়ালের মোটেও অধীন না। এসব তাঁরই স্বাধীন ইচ্ছা। এতে অধীনতা নেই।**"

কমলনয়ন একটু পরে আসিয়া বলিল যে মার যাওয়ার সংবাদ বাপুজীকে ফোন করিয়া জানাইয়াছে। বাপুজী এই কথা শোনা মাত্রই বলিয়াছেন যে মাতাজী তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়া যাইতে পারিবেন না। মাতাজী যদি তাঁহার ওখানে না যান তবে তিনিই এখানে আসিবেন।

কমলনয়ন বলিল—"বাপুজী এইমাত্র মিটিং হইতে গেলেন। আরও অনেক কাজ আছে। শরীরও ভাল না। তবে আপনি যাহা বলিবেন তাহাই তাঁহাকে জানাইয়া দিতেছি।"

মা বলিলেন—"কি বলব ? এখনত কিছুই বলা খেয়ালে আসছে না।"

মার মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে মার ঘরের বাহিরে গিয়া অগত্যা মহাত্মাজীকেই এখানে আনিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

মহাত্মাজীর সঙ্গে মার দেখা হইল না আর মা চলিয়া যাইবেন ইহা তাঁহারা কিছুতেই হইতে দিবেন না। মার যাওয়া যদিও ভোর পাঁচটার গাড়ীতেই স্থির রহিল।

প্রার্থনার পূর্বে অনেকেই আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদও আসিয়া মার ঘরে বসিলেন। দুই চারটি কথাও হইতেছিল। প্রার্থনার সময় হওয়াতে সকলে উঠিয়া গিয়া প্রার্থনায় যোগ দিলেন। মাও বাহিরের দিকে যাইতেছিলেন এমন সময় আচার্য্য বিনোবাজী আসিয়া মাকে বলিলেন—"আপনি নাকি আজই যাওয়া স্থির করিয়াছেন। বাপুজী আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চান। কিন্তু তাঁহার শরীর খারাপ। এখনই তাঁহাকে এখানে আনিতে যাইতেছে। ইহাতে তাঁহারত খুবই কষ্ট হইবে মনে হয়। আপনি নাকি বলিয়াছেন কোন বাধা না আসিলে কাল যাইবেন। কিন্তু ইহাওত এক রকমের বাধাই।"

মায়ের নিকট রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও বিনোবাজী

মা হাসিয়া বলিলেন—"পিতাজী, এই মেয়েটার মাথার ঠিক নেই। যা হয়ে যায়।" এই বলিয়াই মা চুপ করিলেন। বিনোবাজী প্রার্থনায় যাইয়া বসিলেন। মাও একটু বাহিরের দিকে চলিলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলাম। মা আমাকে হঠাৎ বলিলেন—"কমলনয়নকে ডাক।"

কমলনয়ন ছুটিয়া মার নিকট আসিল। তাহাকে দেখিয়াই মা বলিলেন—"চল এখনই সেবাগ্রাম। এখান থেকেই চল। ভিতরে আর যাব না।" মার সবই অদ্ভুত। কমলনয়ন মহানন্দে মোটর আনিতে চলিল। সেই মোটরই গান্ধীজীকে আনিতে যাইতেছিল।

সেবাগ্রাম আশ্রমে গমন

মোটর আসিলে মার সঙ্গে পরমানন্দ স্বামী, অভয়, হরিরামজী, জানকীবাঈ এবং আমি চলিলাম। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদও আমাদের সঙ্গেই গাড়ীতে আসিলেন। সেবাগ্রাম আশ্রমে গিয়া পৌঁছিতেই কমলনয়ন দৌড়িয়া গিয়া মহাত্মাজীকে মার সংবাদ দিল। মাও সঙ্গে সঙ্গেই গিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহাত্মাজী যে ঘরে সকলকে নিয়া বসিয়াছিলেন সেই ঘরের বারান্দাতে মা উঠিবামাত্রই মহাত্মাজী ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন—"আইয়ে, মাতাজী, আইয়ে।" মাও 'পিতাজী' 'পিতাজী' বলিতে বলিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহাত্মাজী মাকে হাত বাড়াইয়া একেবার কোলের কাছে নিয়া নিজের বুকের মধ্যে মার মাথাটি টানিয়া লইলেন। মাও একেবারে ছোট্ট মেয়েটির ন্যায় মহাত্মাজীর বুকের মধ্যে হাতখানি দিয়া বসিয়া রহিলেন। দুই-জনের এই মিলন দৃশ্য দেখিয়া সকলেই মহা আনন্দিত হইল।

মহাত্মাজীই প্রথমে কথা বলিলেন—"যমুনালালকে তোমার কাছে কে পাঠাইয়াছিল জানত? আমিই পাঠাইয়াছিলাম। তোমাকে

মায়ের সহিত মহাত্মাজীর কথাবার্তা

ডাকিবার জন্যও আমিই পাঠাইয়াছি। যমুনালাল আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছে যে আমার নিকট হইতেও যে শান্তি সে পায় নাই, আমি যে শান্তি তাহাকে দিতে পারি নাই, সেই শান্তি সে তোমার নিকট পাইয়াছে। সে তোমাকে পাইয়া কি রকম পাগল হইয়াছিল তাহা তুমি জানত?"

মা হাসিয়া মাথাটি নাড়িলেন মাত্র। মহাত্মাজী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমাকে তোমার কথা প্রথম কে জানায় জান?

কমলা নেহরু। সে-ই আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিল যে আমি যেন তোমার সঙ্গে দেখা করি।"

উপস্থিত সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কমলা ইঁহাকে গুরুর মত মানিতেন।"

মা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"পিতাজী, আমি কাহারো গুরুটুরু না। আমিত ছোট বাচ্চি।" মহাত্মাজীও হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা।"

এইরূপ নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। উপস্থিত সকলের মধ্যেই আনন্দের স্রোত যেন বহিয়া চলিয়াছে। মহাত্মাজী মাকে ঐভাবে ধরিয়াই বসিয়া আছেন। মাও একেবারে ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় তাঁহার বুকের সহিত সংলগ্ন হইয়া নিঃসঙ্কোচে বসিয়া আছেন। কমলনয়ন মার কথা মহাত্মাজীকে সব বলিতেছে।

মার যাইবার কথায় মহাত্মাজী মাকে বলিলেন—"দেখ তুমি এখন যাইবার কথা আর মোটেও বলিও না। অন্ততঃ দুইদিন আরও এখানে থাক। যমুনালালের বিষয় নিয়া আরও দুইদিনের কাজ আছে। তুমি থাকিলে ইহাদেরও (জানকীবাঈ ও কমলনয়ন) খুব শান্তি হয়।"

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"পিতাজী, এই ছোট্ট মেয়েটার ম্যথাটা কিছু খারাপ। সব সময়ে সব কথা রাখতে পারে না। তার কি করব পিতাজী? তোমার স্বভাবইত মেয়েটা পেয়েছে?" সকলে মার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মহাত্মাজী মাকে রাখিবার জন্য অনেক ভাবের কথাবার্ত্তা বলিয়াও যখন আশা পাইলেন না তখন উপস্থিত সকলকে দেখাইয়া বলিলেন

—"ইহারা যে সকলেই হাসিবে। বলিবে কোথা হইতে একজন পাগল মেয়ে আনিয়াছে তাহাকেই বুঝাইয়া রাখিতে পারিল না, আর চীনদেশের সেনাপতিকে কি ভাবে বুঝাইবে? সকলেই আমাকে তখন উপহাসই করিবে।"

মাও হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বেশত, আমার বাবাকে নিয়া লোকে যদি একটু আনন্দ করে হাসে হাসুক না। আর আমার বাবাত এই সব কথা গ্রাহ্যই করেনা। বাবার এইসবে কিছুই আসে যায় না।"

মহাত্মাজী—"আমিত অনেকেরই বাবা। তুমিও আমাকে বাবা বলিতেছ ভালই। আমি ভুলে প্রথমে তোমাকে মাতাজী বলিয়া ফেলিয়াছি।" এই বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর অন্যান্য সকলের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"যমুনালাল জেলে বসিয়া সূতা কাটিয়া সেই সূতা দিয়া এক জোড়া কাপড় বানাইয়া মাতাজীর জন্য রাখিয়া গিয়াছে। মাতাজী তাহার মধ্যে এক টুকরা আমাকে, এক টুকরা জানকীবাঈকে, এক টুকরা বিনোবাজীকে আর এক টুকরা নিজের জন্য রাখিয়াছেন।"

মাও হাসিয়া বলিলেন—"পিতাজী, আমিও একবার নিজের হাতে সূতা কাটিয়া এক জোড়া কাপড় বানাইয়া ছিলাম।"

একটু থামিয়া বলিলেন—"একবার ঢাকাতে যখন তুমি গিয়াছিলে তখন আমি তোমাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তুমি তখন চরখা কাটিতেছিলে।"

ইহার পর কি কথায় কথায় মা বলিলেন—'আমিত পিতাজীর কাপড়ই পরি।" মা কথাটা এমন ভাবে বলিলেন যে কথার ভাবটি হয়ত ঠিক মহাত্মাজী ধরিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ

হ্যাঁ, যেখানে যেখানে খদ্দর বানান হয় সব আমারই কাপড়।" এই বলিয়া মার কাপড়ের দিকে তাকাইলেন। মার গায়ে তখন একখানা খদ্দরের চাদরই ছিল।

অনেক কথাবার্তার পরও মা যখন কিছুতেই থাকার কথায় সম্মতি দিলেন না তখন অগত্যা মহাত্মাজী হাসিতে হাসিতে মাকে বলিলেন —"তুমি বড় ধোকাবাজ মেয়ে। আমাকে ধোকা দিয়া ভুলাইতে পারিবে না।" মাও হাসিয়াই জবাব দিলেন—"ধোকাকেত ধোকা দেওয়াই ভাল। কি পিতাজী ঠিক না?"

কমলনয়ন মহাত্মাজীকে বলিল—"বাপুজী, মাতাজীকে আপনার কাছে রাখিয়া যাই। তবে আর ভোর বেলা যাইতে পারিবেন না। আপনি জোর করিয়া রাখিয়া দিবেন।"

মহাত্মাজীও বলিয়া উঠিলেন—"বেশ তাই ভাল। জানকীবাঈ ও মাতাজী এখানেই থাকুন, তাদের শুইবার বন্দোবস্ত আমার কাছেই করিয়া দিব।" গোপুরীতে মার খাবার জন্য দুধ সাবু তৈয়ার করা হইয়াছিল। একজন গিয়া তাহা নিয়া আসা স্থির হইল।

ইতিমধ্যে হরিরামজী মহাত্মাজীকে বলিল যে ভাইজী ও সকলের ইচ্ছা ছিল যে মাতাজীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় এবং একান্তে কিছু কথাবার্ত্তা হয়। মা এইকথা শুনিতে পাইয়াই মহাত্মাজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তার কিছু দরকার নেই। কি পিতাজী? তোমার কোনও কথা আছে?"

গান্ধীজী বলিলেন—"আমার একান্তে কোন কথাই নাই। আমার সবই খোলা সকলের মধ্যে।"

অভয় আবার বলিল—"আমারও খুব ইচ্ছা ছিল যে মার সঙ্গে

আপনার আধ্যাত্মিক কোনও কথাবার্ত্তা হয়। কিন্তু তাহা কিছুই হলনা। আবার মার সঙ্গে কবে দেখা হবে কে জানে ?”

অভয়ের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই মহাত্মাজী বলিলেন—“তোমরাত সেবক। তোমরা চেষ্টা করিলেই দেখা হইবে।” মার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“এত বলিতেছে আসল কথাবার্তা কিছুই হইল না। তাহার কি হইবে ?”

মা বলিলেন—“ওসব কথা ছেড়ে দেও। পিতাজীর সাথেত কথা হয়েই গেল।”

আবার যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠিল। মা হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—“আমার বাবা আমার কথায় নিশ্চয়ই রাজী হবে। আমাকে কাল নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে।”

মহাত্মাজী—“আমাকে এমন বাবা পাও নাই যে এত সহজেই বুঝাইয়া চলিয়া যাইবে। আমি এত শীঘ্র রাজী হইবার পাত্র না।”

মা হাসিয়া হাসিয়া আবার বলিতেছেন—“বাবা ছোট্ট মেয়েটার কথা শুনবেই।”

অবশেষে মহাত্মাজী যখন বুঝিতে পারিলেন যে মাকে রাখা যাইবেনা তখন তিনি কমলনয়নের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“যাওয়ার ব্যবস্থা কি ?”

কমলনয়ন মহাত্মাজীর কথা শুনিয়া নিরাশ হইল। বাপুজীও মাকে রাখিতে পারিলেন না। অগত্যা সে তাহার মোটরটি মার জন্য রাখিয়া যাইবে বলিল।

পরমানন্দ স্বামী ও অভয় মার খাবার জিনিষ এবং আমাদের সব বিছানাপত্র আনিতে গোপুরী চলিয়া গেল। মার নিকটে আমি ও হরিরামজী রহিলাম। ইতিমধ্যে মহাত্মাজীর রক্তের চাপ পরীক্ষা

করিতে গিয়া তাঁহার সেবকদের মধ্যে একজন দেখিল যে চাপ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে সকলেই খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মহাত্মাজী উঠিয়া মুখ হাত ধুইতে গেলেন। ডাঃ সুশীলা নায়ার আসিয়া মাকে বলিলেন—"মহাত্মাজী খুব পরিশ্রান্ত। শরীরও অসুস্থ। এখন কথাবার্ত্তা কিছু না হইলেই ভাল হয়।"

মা সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—"আমারত কোনও কথাই নেই।" তিনি আবার বলিলেন—"আপনারত কোনও কথা নাই। কিন্তু মহাত্মাজী নিজেই হয়ত আপনার সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিবেন। তাই আপনাকে বলিয়া দিলাম।"

গান্ধীজী ইতিমধ্যে আবার আসিয়া বসিলেন। হরিরামজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যোশী তুমি কি মার সঙ্গেই আছ?"

হরিরামজী উত্তর দিল যে মা তাহাকে কাশী হইতে তার দিয়া আনাইয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া মার দিকে চাহিয়া মহাত্মাজী বলিলেন—"তোমার একা আসিতে ভয় করে নাকি?"

মা হাসিয়া জবাব দিলেন—"ভয়েরত কথাই নেই। ও বলেছিল এদিকে আসলে খবর দিতে, তাই উহাকে খবর দেওয়া হয়েছিল।"

আমি বলিলাম—"মার ভয়ের কোনও লেশই নেই। এক একদিন রাত্রিতে মা একাই বাহির হন। একবার তারাপীঠে রাত্রিতে বাহিরে গেলেন। আমাদের ওদিকে সঙ্গে যেতে এমন ভাবে নিষেধ করলেন যে আমরা আর যেতে পারলাম না। মা একাই ঘুরে ফিরে আসলেন।"

মার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে মহাত্মাজী বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি হুকুমও চালাও!"

আরও ২।৪টি কথাবার্তা বলিয়া মহাত্মাজী গিয়া বারান্দায় বিছানার

উপর শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার এক পার্শ্বে জানকীবাঈ এবং অপর পার্শ্বে মায়ের জন্য শয্যা পাতা হইয়াছে দেখিলাম।

মহাত্মাজীর সহিত রাত্রিবাস

মাও গিয়া মহাত্মাজীর পার্শ্বেই ছোট মেয়েটির ন্যায় শুইয়া পড়িলেন। মহাত্মাজীর পায়ের ধারে এবং আশেপাশে দেখিলাম আরও কয়েকজন শুইলেন। ২।৩ জন সেবা করিতে লাগিল। কেহ পা টিপিতেছে--কেহ মাথায় ঘি দিতেছে। আমি ও হরিরামজী সেইখানেই বসিয়া আছি।

হঠাৎ মহাত্মাজীর হাতখানি মার শরীরে লাগিবামাত্রই মা বলিয়া উঠিলেন—"পিতাজীর হাত নাকি?" তিনি অমনি মার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া শুইয়া রহিলেন।

এইরূপ ভাবে শুইতে আজ পর্য্যন্ত মাকে কখনও আমরা দেখি নাই। অবাক হইয়া আমরা দেখিতেছিলাম যে ঠিক যেন বৃদ্ধ পিতার পার্শ্বে তাঁহার কন্যা শুইয়া আছে। সঙ্কোচ বা লজ্জার লেশমাত্রও নাই।

মা চুপ করিয়াই শুইয়াছিলেন। মহাত্মাজী তাঁহার সেবিকাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ২।১টি কথা মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন। মা হঠাৎ নিজের ভাবেই একজন সেবিকাকে বলিলেন—

মহাত্মাজীর ইহলোক ত্যাগ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম নির্দ্দেশ

"তোমাদের কাছ থেকে যদি আমি পিতাজীকে উঠিয়ে নিয়ে যাই? তোমরা কি করবে? ডাণ্ডা লাগাবে নাকি?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা অনেকেই বলিয়া উঠিলেন যে তাহারাও সঙ্গে যাইবেন।

মা তাঁহাদের কথায় যেন সেরূপ খেয়াল না করিয়াই মহাত্মাজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"সময় মত ঠিক নিয়ে যাব। কি বল পিতাজী?" মহাত্মাজী বোধ হয় কথার অর্থ কিছুটা বুঝিতে পারিলেন। অন্য কেহ

আদৌ ধরিতে পারিল কিনা জানিনা। মহাত্মাজী গম্ভীরভাবে আস্তে আস্তে জবাব দিলেন—"হাঁ।" মা অমনি বলিয়া উঠিলেন—"পিতাজীর সঙ্গে বাচ্চির এই কথা রইল কিন্তু।"

মার মুখের এই কথা শুনিয়া আমি ও হরিরামজী পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলাম। মায়ের মুখ হইতে হঠাৎ এইরূপ কথা কেন বাহির হইল? তবে কি মহাত্মাজীর সময় হইয়া আসিয়াছে? হরিরামজী তখনই কিছু বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু আমি তাহাকে নিরস্ত করিলাম।

বারান্দার বাতি নিবাইয়া দেওয়া হইল। আমরা তখন সকলেই চুপ চাপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। সেবিকারাও আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। মার পায়ের কাছে আমি কম্বল বিছাইয়া লইলাম। গান্ধীজী ভিন্ন আর অপর কোন পুরুষ এখানে রাত্রে থাকিতে দেওয়া হয়না। মহাত্মাজীর নির্দ্দেশে পরমানন্দ স্বামী, অভয় ও হরিরামজীর শুইবার ব্যবস্থা অন্যত্র করা হইয়াছে।

রাত্রি প্রায় দশটার পরে পরমানন্দ স্বামী ও অভয় আমাদের জিনিষপত্র ও মার খাবার লইয়া আসিল। মা আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া দুধ সাবুটুকু খাইয়া আবার নিঃশব্দে গিয়া মহাত্মাজীর পাশে শুইয়া পড়িলেন। আমরা কোনও রকম আওয়াজ না করি সে সম্বন্ধেও সতর্ক করিয়া গেলেন। আমিও গিয়া চুপচাপ শুইয়া রহিলাম।

৯ই ফাল্গুন, শনিবার।

ভোর চারটায় ঘণ্টা পড়িতেই মহাত্মাজী ও অন্যান্য সকলে উঠিয়া বসিলেন। আমি খানিক পূর্ব্বেই উঠিয়া আসিয়া জিনিষ পত্র গুছাইতে

ছিলাম। মহাত্মাজী উঠিয়া বসিবা মাত্রই সেবিকারা তাঁহার মুখ ধুইবার জিনিষ পত্র নিয়া আসিল। তিনি মুখ ধুইতে ধুইতেই মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল নিদ্রা হইয়াছিল ত?"

মা প্রশ্নটি এড়াইয়া আস্তে আস্তে জবাব দিলেন—"যাহা হয় তাহাই হইয়াছে।" মার ত আমাদের মত নিদ্রা না। তাই এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা যাহাতে না উঠে সেইজন্যই মা কথাটি ঐভাবে চাপা দিলেন মনে হইল।

মার রওনা হইবার সময় হইয়া আসিল। জানকীবাঈ তাড়াতাড়ি আসিয়া মাকে বলিলেন—"এখনই সকলে মিলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ হইবে। দেখিয়া যাও।"

মহাত্মাজী সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন—"প্রার্থনায় থাকিতে হইলে গাড়ী ছাড়িতে হয়, আর গাড়ী ধরিতে হইলে প্রার্থনা ছাড়িতে হয়।"

মা আস্তে আস্তে বলিলেন—"পিতাজীর কথা কত লোকে শোনে। আর এই পাগল মেয়েটা এত করে বলা সত্ত্বেও কথা রাখলনা। পিতাজী নারাজ হবে নাত?"

মহাত্মাজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তোমার তাহাতে কিছু পরোয়া আছে কি?"

মাও হাসিয়া বলিলেন—"আবার হয়ত খেয়াল হলে নিজেই এসে পিতাজীর ঘরে ঢুকে পড়ব। কি বল পিতাজী? মাথাটা যখন এইরকম?"

মহাত্মাজী ধীরে ধীরে বলিতেছেন—"হাঁ, চোর ডাকুতে এই রকমই করে। দেরাদুন হইতে একজন এইরূপ আসিয়াছে। কি আর করি?"

আনন্দের সহিত হাসিতে হাসিতে মা বলিলেন—"বাঃ, পিতাজী চোর ডাকাত নাম দিয়ে দিল। ভালই হল। পিতাজী, তোমার কিন্তু সব চুরি করে নেব। 'চোরী করনেওয়ালী' এইত বেশ ভাল নাম।" এই বলিয়া আরও জোরে হাসিতে লাগিলেন।

"এমন 'চোরী করনেওয়ালী' কোথায় মিলে?"—আস্তে আস্তে মহাত্মাজীর মুখ হইতে বাহির হইল।

গতরাত্রে কস্তুরবাঈ একবার আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া গিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"খুব ভাগ্য যে আপনার দর্শন পাইলাম। আমার খুব ইচ্ছা ছিল আপনাকে দর্শন করিবার।" সেবিকারা তাঁহাকে ধরিয়া ধরিয়া আবার লইয়া গেলেন। শুনিয়াছি তাঁহার শরীরও খুব খারাপ।

সেবাগ্রাম হইতে বিদায় গ্রহণ

রওনা হইবার সময় হইয়া আসিলে মা মহাত্মাজী প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় লইয়া রওনা হইলেন। স্টেশনের পথে মাকে একবার কয়েক মিনিটের জন্য মহিলা আশ্রমে লইয়া যাওয়া হইল। শান্তাবেন একবার যাইবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন।

যমুনালালজী ও মহাত্মাজী সম্বন্ধে মায়ের উক্তি

স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি গাড়ী বেশ লেট। মার সঙ্গে জানকীবাঈ, কমলনয়ন, শান্তাবেন, মহাত্মাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং আরও ২।৩ জন আসিয়াছেন। জানকীবাঈ মাকে যমুনালালজীর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মাও বলিতেছেন—"এই শরীরটার সঙ্গে সে এত অল্প সময়ের মধ্যেই একেবারে শিশুর মত মিশেছিল। এরকমটা সাধারণতঃ দেখা যায় না।"

যমুনালালজীর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে মা বলিলেন—**"সে সম্বন্ধে কিছু বলছিনা। তবে যদিও জন্ম হয় পতন আর হবে না। উর্দ্ধগতিই হবে।"**

গাড়ী আসিলে মা গাড়ীতে উঠিয়া জানকীবাঈকে বলিলেন **—"বাপুজীকে বোলো আপন ঘরে যাওয়ার সময়ত হল। তৈয়ার হতে বলে দিও।"**

গতকালের সেই কথার আভাস পুনরায় মার মুখ হইতে বাহির হওয়ায় আমরা খুবই অবাক হইয়া গেলাম। জানকীবাঈও মার কথা ধরিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তাই নাকি?" মা সঙ্গে সঙ্গে কথার ধারা ঘুরাইয়া দিয়া বলিলেন—"না, না, এখনই সে কথা বলছি না। তবে বয়সত হল।" এই বলিয়া মা চুপ করিলেন। মায়ের মুখ দিয়া এইজাতীয় কথা সাধারণতঃ প্রকাশ পায়না। তবে মহাত্মাজীর সম্বন্ধে দুই দুই বার মা কেন এইরূপ বলিলেন তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মহাত্মাজীর শরীরের অবস্থা মধ্যে মধ্যে খুবই আশঙ্কাজনক হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু সমস্ত ভারতবর্ষ যে আজ তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। দেশের এই চরম মুহূর্ত্তে তাঁহার উপস্থিতির বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ওয়ার্দ্ধা হইতে রওনা হইয়া নাগপুর আসিয়া সমস্ত দিন স্টেশনেই থাকিলাম। স্থানীয় একজন পাঞ্জাবী ডাক্তার ওয়ার্দ্ধার সাগর অভিমুখে পথে এখানে স্টেশনে মাকে দর্শন করিয়া খুবই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজ মাকে একবার বিশেষ আগ্রহ সহকারে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন।

সন্ধ্যা ছয়টার গাড়ীতে আমরা সাগর অভিমুখে রওনা হইলাম।

১০ই ফাল্গুন, রবিবার।

আজ বেলা প্রায় বারটা নাগাদ ইটার্সি ও বীনা জংসন হইয়া সাগরে আসিয়া পৌঁছিলাম। সাগর নাগপুর হইতে প্রায় ৩৭৫ মাইল দূরে। সহরের এক ধর্ম্মশালায় গিয়া মাকে লইয়া উঠিলাম। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লইলাম। আজ ভোরে ট্রেনের মধ্যেই মা আমাকে বলিতেছিলেন যে মা দেখিতেছিলেন কমলনয়ন যমুনালালজীর শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিতে আসিয়াছে। ঠিক যেমন বাঙ্গালীরা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া পালন করে সেইরকমই। কমলনয়নের গলায় ধরা বাঁধা, মাথা মুণ্ডিত। কে একজন যেন বলিলেন যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সমস্ত কাজ হইয়া যাওয়া চাই। সাদা কাল মিশ্রিত রংয়ের একটি গরুও আনিল। জানকীবাঈ মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এক বেলা খাইবেন কিনা। মাও যেন তাঁহার কথায় মাথা নাড়িয়া সমর্থন করিলেন।

সূক্ষ্মে যমুনালালজীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া দর্শন

মার মুখে এইকথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। কারণ গতকালই ওয়ার্দ্ধাতে শুনিয়া আসিলাম যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সেরূপ কিছুই হইবেনা। মহাত্মাজীর এইসব করাতে তেমন নাকি মত নাই। মাকে এই কথা আবার জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন—"সংস্কারত থাকে, আবার কখনও কখনও এই শরীরে না হলেও অন্য শরীরেও কাজ হয়ে যায়।"

এখানে শুনিলাম নেপালের মহারাজার মন্ত্রীর স্ত্রী ও ছেলেরা থাকে। হরিরামজীর এক বন্ধু নাকি এক ছেলের নিকট মা যাইতেছেন এই সংবাদ চিঠিতে দিয়াছিলেন। হরিরামজী সেখানে সংবাদ নিতে গিয়া শুনিল যে কোনই চিঠি তাহারা পায় নাই। ছেলেদের মধ্যেও

কেহ বাড়ীতে ছিলনা। তাই হরিরামজী বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

আমরা অপর এক স্থানে যাইবার আয়োজন করিতেছি এমন সময় দেখি সেই রাণী সাহেবা মার জন্য একটি মোটর বাস পাঠাইয়া দিয়াছেন। হরিরামজী গিয়াছিল এবং কোনও সাধু-মা এখানে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়াই মাকে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। অনেক ধর্ম্মশালায় খোঁজ লইতে লইতে তাঁহারা গাড়ী লইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত। হরিরামজীরত খুবই আনন্দ।

সেই গাড়ীতে করিয়া মাকে লইয়া আমরা রাজবাড়ীতে আসিয়া বাগানের মধ্যে বসিলাম। রাণী সাহেবা আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন এবং কয়েকটি দিন থাকিবার জন্য খুব অনুরোধ জানাইলেন। হরিরামের মুখে মার সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়া আরও বেশী করিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। মা থাকিতে রাজী হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ বাগানে তাঁবু লাগাইয়া দিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

১১ই ফাল্গুন, সোমবার।

আজ খাওয়া দাওয়ার পরে রাণী সাহেবা মাকে নিয়া প্রায় ৯ মাইল দূরে ব্যাস নদীর তীরে নিজেদেরই এক ধর্মশালা দেখাইতে চলিলেন। মার পছন্দ হইলে সেখানেও থাকিতে পারেন। পছন্দের কথা শুনিয়া মা বলিলেন—"পছন্দ অপছন্দের কিছুই নেই। লোকত সব অবস্থাতেই থাকে। যা হয়ে যায়। ওখানেই যাওয়া যাক।" মার কথামত তাই আমরা জিনিষপত্র লইয়াই চলিলাম।

সাগরে মায়ের অজ্ঞাতবাস

সেখানে পৌঁছিয়া দেখি যে মাঠের মধ্যে বেশ একান্ত স্থানে সুন্দর ছোট্ট ধর্মশালাটি। নিকটেই একটি প্রকাণ্ড বটগাছ। ধর্মশালার পাশ দিয়াই ব্যাস নদী প্রবাহিতা। কিছু দূরে দুইটি গ্রাম চিতোরা ও বেড়খড়ি। মার উপস্থিত এখানেই কয়েকটি দিন থাকার কথা হইল। রাণীসাহেবা আমাদের সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। বেশ সুন্দর স্বভাব—ধর্ম্মপ্রাণা ভক্তিমতী।

১২ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

আজ পরমানন্দ স্বামীজী ও হরিরাম রায়পুর রওনা হইয়া গেল। সেখানে কিছু কাজ আছে। মার কাছে শুধু আমি ও অভয় রহিলাম।

আজ খুব ভোরে মা বিছানার উপরে উঠিয়া বসিতে আমরাও বসিলাম। প্রায় ঘণ্টা খানেক ঐভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

মায়ের মুখ হইতে মন্ত্রোচ্চারণ

কখনও কখনও মার মুখ দিয়া পরিষ্কার ভাষায় নানা প্রকার মন্ত্রাদি উচ্চারিত হইতে লাগিল। শুনিবার সময় বেশ পরিষ্কার শুনিলাম। কিন্তু একটু পরেই আর ঠিক ঠিক স্মরণ রাখিতে পারিলাম না।

১৩ই ফাল্গুন, বুধবার।

মার সঙ্গে আমরা বেশ আনন্দেই আছি। মাও নিজের খেয়ালমত স্বাধীনভাবে আছেন। আজ পায়জামা পরিয়া তাহার উপর একটা আলখাল্লা পরিলেন। নিজেই হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—"কোনও গোলমাল নেই। যা হয়ে যায় তাই।" মার মুখ হইতে নানা

সময়েই মন্ত্রাদি বাহির হইতেছে শুনিতে পাওয়া যায়। কখনও একটু জড়িত; আবার কখনও খুব স্পষ্ট। "শিবকালী" শব্দটি মধ্যে মধ্যেই শুনিতে পাইতেছি। আজ রাত্রে জোরে জোরে একবার বলিলেন—"আমি আসছি।" আবার একটু পরে শুনিলাম—"পনের দিন।" এইরূপ অনেক কিছুই মার মুখ হইতে বাহির হইতেছে। ঠিক ঠিক অর্থ কিছুতেই ধরিতে পারিনা।

বিকালে পুরীতে স্বামী তুরীয়ানন্দজীর * নিকট একটি চিঠি দিতে বলিলেন। মার কথা লিখিতে বলিলেন—"বাবা, কোনও চিন্তা নেই। তোমার ভাবনা তিনিই ভাবছেন।" বিন্ধ্যাচলে নিশিবাবু ও অখণ্ডানন্দজীকেও লিখিতে বলিলেন—"অখণ্ড আনন্দে থাকতে চেষ্টা কর। তোমাদের শক্তিটুকু সম্পূর্ণ ভাবে কাজে লাগাতে পারলেই ব্যাস। আত্মচিন্তায় সময় দাও।"

ডোঙ্গাতে মা যখন ছিলেন সেই সময়কার কথা আজ উঠিল। কথায় কথায় বলিতেছেন—"সেখানে একদিন দেখছি, ধর একটা বৃহৎ কাঠের গামলার মত, তার মধ্যে যেন মাটির ঢিবি। তার ভিতর থেকে খুব তাজা মোটা একটা লাল পুঁইয়ের ডগার মত একটু বেঁকে উঠছে। একেবারে যেন ঝক্ ঝক্ করছে। সেই মাটিটা কি? যে মহাশক্তি মহাযোগ মহাকারণ হতে সৃষ্টি এখানে সেই

মায়ের বিরাট অখণ্ড স্বরূপে যুগলমুর্ত্তি বিলীন

* স্বামী অখণ্ডানন্দজীর পুর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতা। তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণের পরে পুরীধামে থাকিয়া সাধনভজন করিতেছিলেন।

তত্ত্বটির প্রকাশের দিক ধরতে পার। সেই ডগাটির গায়ে ও মাথার দিকে ছোট ছোট পাতাগুলি ঠিক যেন নাক মুখ চোখ জীবন্ত জাগ্রত। এই শরীরটা সেখানেই। একটি ছোট্ট শিশুও। একজন তপস্বী তাকে এই শরীরের কাছে দিতে চাচ্ছে। গোপালের মত ছোট্ট শিশুটি বসে বসে আঙ্গুল চুষছে। আবার এই শরীরের ডানদিকেই একটি ছোট্ট মেয়ে। পাশে ঘাস ঘাসের মত স্থান। যেন চন্দ্রের আলোতে গড়া জ্যোতি পূর্ণ শুয়ে আছে। দুইটি মূর্ত্তিরই দুইভাবে অপূর্ব্ব কান্তি। কথাটা হল এই যে ঐ ছোট্ট ছেলে বিগ্রহটি এবং শিশু কন্যারূপটি এই যুগল কোনও এক আশ্রমের উপাস্য। আর ঐ তপস্বী সেই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। (আশ্রমের নাম বা স্থানের নাম মা প্রকাশ করিলেন না। মা যাহা বলিলেন তাহাতে আমাদের মনে হইল মা বিরাট ও অখণ্ড) তপস্বীর স্বীয় খণ্ড ভাবের উপাস্য, বিরাট অখণ্ডে প্রকাশের দিক। সে ইহাও জানে যে ছোট্ট শিশুটিকে দিতে দিতেই ঐ মূর্ত্তি এখানে মিলিয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ছোট্ট স্ত্রী মূর্ত্তিটিরও তাই হবে।”

একটু থামিয়া মা বলিতেছেন—“ঐ দুটি যুগল আর কি! প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ। তার পর কি হল? দিতে দিতেই ঐ দুটি মূর্ত্তিই তাহার ভাবে এই শরীরে মিলিয়ে গেল। ঐ তপস্বী আবার বিরাটের মধ্যে ঐ খণ্ড মূর্ত্তিও দেখতে লাগল। খণ্ড ও অখণ্ড দুইই দেখছে।”

এই ঘটনা যে কতদিন পূর্ব্বের বা কোথাকার সেই বিষয়ে মা কিছুই বলিলেন না। মা শুধু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"কত স্থানের কত সময়ের কত রকমের কত কিছু দেখা যায় বলাত হয় না। তোমরা এই জাতীয় কথা তুললে তাই এলোমেলো এই জাতীয় কথাটা বেরিয়ে গেল। এই শরীরত ইচ্ছা করে কিছু বলে না বা করে না। যাক্ এই শরীরেরত যা হয়ে যায়।"

জনৈক ব্রহ্মচারীকে সূক্ষ্মে দর্শন

আবার বলিতে লাগিলেন—"আচ্ছা, আবার দেখছিলাম এই শরীরের এক পাশে এক সম্প্রদায়ের একটি ব্রহ্মচারী দাঁড়ান। অপর পাশে আর একজন। ব্রহ্মচারীর এই শরীরটার দিকে লক্ষ্য। কিন্তু সঙ্গীয় জনের নয়। যে সঙ্গী তাকে এই দিকে (মার দিকে) দেখিয়ে বলছে ঐ তাঁকেই পেতে হবে। সে কিছু একটা তাকে বলতে যাচ্ছিল—ব্রহ্মচারীর নেংটী পরা ছিলনা। একটা লম্বা আলখাল্লার মতন জামা গায়ে। ঐ কথা শুনে হঠাৎ ভয়ানক চটে আলখাল্লাটা রাগের মাথায় কোমর পর্য্যন্ত উঠাতে উঠাতে পা দুটা দাবড়াতে দাবড়াতে খুব জোরের সঙ্গে তোদের দৃষ্টিতে একটা মন্দ বকুনি দিল। ঐ শোনা মাত্রই যেন সঙ্গীর খুব পরিবর্তন আসল। একটা শান্তভাব দেখা গেল। পুরুষ স্থান ঊর্দ্ধদিকে। বাইরে শুধু ছোট্ট কুশির মত একটা চিহ্ন।"

যেইদিন মা ডোঙ্গাতে এইরূপ ঘটনা দেখিতেছিলেন তখন সেই ব্রহ্মচারীটি রায়পুরে মায়ের আশ্রমেই অবস্থান করিতেছিলেন। সেইদিনই মা রায়পুরে গেলে সেই ব্রহ্মচারী নিজ হইতে মাকে ঐ সঙ্গীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত সব শুনিতে চাহিলে মা তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"দেখ এই শরীরটাও আজ ভোরের সময় ডোঙ্গাতে এই জাতীয় অনেক কিছু দেখেছিল। কি সুন্দর যোগাযোগ! এখন তুমি কথা তুললে তাই বলা হচ্ছে। দেখ এক সময়েত তুমিই ঐ সঙ্গীর গুরু ছিলে। এখনওত জাগতিক হিসাবে গুরু স্থানীয়। আধ্যাত্মিক ভাবে।"

১৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

আজ দুপুর বেলা শুইয়া শুইয়া মার মুখ হইতে অস্পষ্ট ভাষায় অনেকক্ষণ যাবৎ 'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ' বাহির হইতে লাগিল। চক্ষু বুজিয়া আছেন। দেখিলাম চক্ষুর কোণ দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে। সমস্ত শরীরে কি রকম যেন একটা অস্বাভাবিক ভাব। তাহার পর চুপ করিয়া বেশ কিছু সময় শুইয়া রহিলেন।

২০শে ফাল্গুন, বুধবার।

আজও দুপুর বেলা মা শুইয়া আছেন। অভয় ও আমি কাছেই বসিয়া আছি। মার মুখ দিয়া মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। অভয় মাকে বলিল—"আপনি বলুন, আমি একটু লিখি।" এই বলিয়া সে খাতা লইয়া বসিল। মা চক্ষু বুঝিয়াই মন্ত্র বলিয়া যাইতেছেন আর অভয় লিখিতেছে।

মায়ের মুখ হইতে মন্ত্রোচ্চারণ

পরে আমি ইহা অভয়ের খাতা হইতে লিখিয়া রাখিয়াছি—

"অপ্ স্বাহা, প্রকৃতি স্বাহা, বিয়োগ স্বাহা, যোগ স্বাহা, সংসার স্বাহা, সন্দেহ স্বাহা, অশ্রদ্ধায় স্বাহা, শিবকাশী

শ্রদ্ধায় স্বাহা, বং স্বাহা, শ্রুতি স্বাহা, সিদ্ধতে স্বাহা, সন্তোষ স্বাহা, সাক্ষী স্বাহা, সৃষ্টি স্বাহা, স্রষ্টা স্বাহা, প্র-ব্রহ্মঢ়ো স্বাহা, জগৎ ব্রহ্মঢ়ো স্বাহা, প্রমুৎপন্নে স্বাহা, রক্ষায় স্বাহা, হরণ্নহায় স্বাহা, তুরদৃষ্ট স্বাহা, তুপ্রাঃপ্রমণায় স্বাহা, তুষ্প্রাপ্যয়ো স্বাহা, তুর্গমনায় স্বাহা, ছন্দবেশ স্বাহা, সিদ্ধত্বো মনসায় স্বাহা, নপর বেশো স্বাহা, জন্তত্বা ননমে স্বাহা, শক্তি যুতঃ স্বয়ং স্বপ্রকাশ নরোপগয়াঃ শ্রিদ্ধতে শ্রিণয়াং সমুৎপন্নে বুক্ বক্ষ বোয়া বিত্ততে শ্রিদ্ধত্বাং ননময়াঃ সরোপ বসতে সন্তোষ স্বয়ং সরৎ প্র-প্রবশ্যেঃ জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাস্যো স্বয়ং যং স্বাহা* * * * সুব স্বাহা পক্ষীফননা মিতঃ বিত্ত প্রন্নমণে সিদ্ধতি স্বয়ং শান্তি নারাহি যিত্যতনাঃ। সংসার সপ্রমাদঃ সংসার শুদ্ধ ও নমেদঃ সংসিসিততনা। যঃ সত্যঃ সোঽহং সোঽহং সোঽহং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং ওঁ শিব ওঁ শিবায় ওঁ শিব ওঁ শিবায় ওঁ ব্রহ্ম ওঁ ছন্দোবেদঃ ওঁ ছন্দোয়াত্মনয়া গং গশ্নায় স্ম মনা মিত্তৎ নমসে সাক্ষী স্বয়ং বং তুত্যবনাঃ ও ব্রহ্মা ওঁ শোভ প্র প্রমাদ শ্রী বৃদ্ধি ওঁ সিসত্তা, ওঁ শান্তিঃ ওঁ বিত্তা ওঁ সং দাহা শিবক্ শিবক্ শিবক্ শিবক্ শিবকাশী শিবকাশী শিবকাশী শিব-কাশী বিন্দু ছন্দত্তে ননমা ওঁস্বাহা ওঁ স্বাহা ওঁ স্বাহা বাং বাং বাং* * * * * *"

এইসব মন্ত্রগুলি মা এত স্পষ্ট অথচ তাড়াতাড়ি বলিতেছিলেন যে আমরা তাহা ঠিক লিখিতে পারি নাই। যতটুকু ধরিতে পারিয়াছি তাহা লেখা হইয়াছে। আগে পিছেও অক্ষর শুদ্ধ ঠিক ঠিক করিয়া লিখিতে পারা যায় নাই মনে হয়।

সন্ধ্যার সময় মাকে কয়েকটি চিঠি পড়িয়া শুনান হইতেছে। একজন প্রশ্ন করিয়াছেন যে নামজপের সময় কেবলমাত্র নাম করিলেই হয়, না রূপ ও গুণের চিন্তাও করিতে হয়।

মা উত্তর দিলেন—"লিখে দেও। নাম নামী অভেদ। গুণও সেইখানেই। নাম জপের সঙ্গেই রূপ ও গুণের চিন্তা করতে হয়। তবে তুমি যদি সেইভাবে না পার তবে ভিন্ন ভাবেও রূপ গুণের চিন্তা করতে পার। আবার শুধু নাম করতে করতেও সব প্রকাশ হতে পারে। সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগ দরকার। সৎসঙ্গে যত বেশী সময় দেওয়া হয় তবেই আশা।"

মার মুখে পূর্ব্বেও শুনিয়াছি যে সত্য, ব্রহ্মচর্য্যপালন ও ত্যাগ দরকার। নামের আশ্রয়ে থাকা, অবিচারে গুরুর আদেশ পালনই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য।

নাম সম্বন্ধেই মা অপর এক সময় বলিতেছিলেন—

"আচ্ছা, নামের ক্রিয়া ইত্যাদি, আসন, প্রাণায়াম, হঠ-যোগ, রাজযোগ আরম্ভ, পূজার ভাব। এই যে নিয়মিত-ভাবে হোম ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত পূজা, মানসিক পূজা, স্থূল পূজা, এই সবই—এই জগতে যে নাম মাহাত্ম্য, নামের ক্রিয়া, বীজের স্বরূপ প্রকাশ, যে কোন নাম বা বীজ হউক, প্রাণায়ামের ক্রিয়া, যোগাদি সব যাহা যাহা হতে পারে। সকলে গুরু গ্রহণ ক'রে যেমন নেয়। ঐশরীরের নিজেই গুরু, নিজেই শিষ্য, সাধক, পূজক যা' বল। এটা যদি ক্রম বোঝ, তা হইলেও জানবে, যাহারা ক্রম চায়—ক্রম; আবার ক্রম অক্রমের প্রশ্নই নাই। এই ভাবেইত নানা

ক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গীন ভাবে প্রকাশে—খেলাটা। আবার ইষ্ট ও যদি ধর, কোন মূর্ত্তেরদিকও অমূর্ত্তের দিকও। আবার রূপ ও মূর্ত্ত অমূর্ত্তের প্রশ্ন নাই। ইষ্টরূপেরও কোনই প্রশ্ন নাই। সবেতেইত সব। কেন না, এই যে হরিনাম, আবার কোন আকারেও প্রয়োজন নাই, নাম রূপে যে আকারটি রয়েছে, সেই নাম করতে করতে নামীইত নামরূপ। আবার সেই নামের যে এক ধারা তান, অখণ্ডশব্দ, সেই শব্দ-ব্রহ্মকে পাওয়া, নাম-ব্রহ্মের আশ্রয় নিয়ে। তোমরা নাদবিন্দু কি সব বল না? সেই প্রকাশে ক্রমে যেখানে তাহার আলো পেয়ে সেই ব্রহ্মজ্যোতির প্রকাশে, যে জ্যোতি নাম ও তোমরা নাদ ইত্যাদি যা বল, তাহার পূর্ণ প্রকাশে ব্রহ্ম-জ্যোতি যার মূর্তি যখন যে ভাবানুযায়ী সেই জ্যোতিতে গড়া মূর্ত্তি, প্রকাশটা মূর্ত্ততেও অমূর্ত্ত, এক জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশটা। শব্দাতীত ও জ্যোতির অতীত। যাওয়া ও পাওয়া মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের প্রকাশ না থাকা। মূর্ত্তি দর্শন, আবার, নিজস্ব মূর্ত্তি যতক্ষণ ততক্ষণও। কিন্তু সর্ব্বমূর্ত্তি সর্ব্বাকার, নিরাকার সবই কিন্তু নিত্য আছে। অনন্তে অনন্ত।

"পাওয়াটা কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া চাই। আবদ্ধ নিবদ্ধ যেখানে প্রশ্ন নাই। শক্তিরূপই যেখানে প্রকাশ, যেমন, তার নামই একমাত্র রূপ। আবার নাম নামী অভিন্ন কারণ যাঁর নাম করছি তাঁর আকার আছে। শিব শক্তি দুই-য়ের কথাও। তেমন শক্তি বল্‌তে শক্তিই একমাত্র তার রূপ, বোধ স্বরূপও। মহাশূন্যই একমাত্র তাঁর রূপ। যেখানে এই শূন্য সেখানে কিন্তু মহাশূন্য বুঝায় না। আবার এই সবের

কোন প্রশ্ন নাই। কি আছে কি নাই আবার সবই আছে— ও নাইও, নাইওনা আছেও না......সব হারিয়ে সব পাওয়া —এইটাও কিন্তু চাই, পূর্ণ। জাগরণ টাগরণ যা বল যা তাই।”

বিকাল বেলা কি প্রসঙ্গে কথা উঠিল যে এক সময়ে দেখা যাইত মার শরীরের সমস্ত দ্বার দিয়াই শ্বাস চলিতেছে। এমন কি লোমকূপ দিয়াও শ্বাস চলিত। এই বিষয়েই মা আজও বলিলেন—“একদিন স্নান করতে পুকুরে নেমেছি, দেখি কি প্রস্রাবের দ্বার দিয়েও শরীরের ভিতরে জল যাচ্ছে আবার বেরও হচ্ছে। অন্যান্য সমস্ত দ্বার দিয়েও এই রকমটা দেখা যেত। নাভি দিয়েও নিয়মিত ভাবে শ্বাস চলত।” মার সমস্ত কিছুই অসাধারণ। আমাদের বিচারের মাপকাঠি দিয়া মাকে বিচার করিতে যাওয়া যে কতদূর মূর্খতা তাহা প্রতি পদে পদেই বুঝিতেছি।

শরীরের প্রতিটি দ্বার দিয়া শ্বাস চলা

আমার ডায়েরী—মায়ের জীবনীর পূর্ব্ব অংশ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি খণ্ড লইয়া মাকে কিছু কিছু শুনাইতে-ছিলাম। এক স্থানে দেখিলাম লেখা আছে যে দাদা মহাশয় একবার বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ঘরে ফিরিয়া আসিবার পরই মার শরীরের প্রকাশ হয়। এই কথাটি মার কানে যাইতেই মা বলিয়া উঠিলেন—“এ কথায় সাধারণতঃ সকলে এইটাই মনে করতে পারে যে সাধারণভাবে জীবের মত পিতামাতা হতেই এই শরীরের জন্ম।” এইটুকু বলিয়াই মা চুপ করিলেন। অনেক জিজ্ঞাসাতেও মার মুখ হইতে আর কিছু বাহির হইল না। শুধু একবার হাসিয়া

মায়ের জন্মের গূঢ় রহস্য

বলিলেন—"আমি শুধু এই কথাটি বলছি যে লোকের পক্ষে এটা মনে করাই স্বাভাবিক।" মায়ের আবির্ভাবের পশ্চাতে যে কি নিগূঢ় রহস্য লুকান আছে তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মা নিজে কৃপা করিয়া যদি কিছু না প্রকাশ করেন তবে তাহা হয়ত চিরদিন অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে।

২২শে ফাল্গুন, শুক্রবার।

কাল রাত্রে মা চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। হঠাৎ একটা কি রকম আওয়াজ মুখ দিয়া বাহির হইল। আমি ও অভয় জাগিয়া উঠিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিতেই মা বলিলেন—"আমিওত শুনছি যে ঐরকম একটা শব্দ বের হচ্ছে। আমি খুকুনীকে ডাকছিলাম আর ঐ জানোয়ারটাকে সরাবার জন্য ঐভাবের আওয়াজ করছি। ঘরের মধ্যে একটা জানোয়ারের মত এসেছিল। (বলা বাহুল্য স্বপ্নে) ঐ জানালাটা দিয়ে আবার বের হয়ে গেল।"

আবার বলিতেছেন—"কাল রাত্রে দেখছি এই বট গাছটার নীচে একজন ব্রাহ্মণের পেতাত্মা রয়েছে। সেই ব্রাহ্মণ চণ্ডালের অন্ন খেয়েছিল। তার আত্মাটা এখানেই ছিল। যখনই বাইরে প্রকাশ পেত সকলে ভাল বলেই জানত। যেমন কোনও দেবতা। সেও নিজের পুঁটলি পাঁটলি নিয়ে এই গাছতলায় বেশ জমিয়ে ছিল। কাল আমি দেখেই বললাম যে ঐটা ঐরকমের। তাড়াতাড়ি সে সব নিয়ে চলল।"

প্রচ্ছন্নরূপী প্রেতাত্মাকে দর্শন

অভয় জিজ্ঞাসা করিল—"একেবারে চলে গিয়েছে কি?"

মা বলিলেন—"তখনত দেখা গেল মাত্র যাচ্ছে। তবে, হ্যাঁ, সে চলেই গেছে।"

মা আবার বলিতেছেন—"গোপীবাবাকে দেখলাম। একটা বিরাট কি অনুষ্ঠান হচ্ছে। গোপীবাবার উপর চাঁদা তুলবার ভার পড়েছে। নেংটী পরা, অল্প অল্প দাড়ি। এই শরীরটার কাছেও এসেছে ভিক্ষা নিতে। তোরা কেউ কাছে ছিলি না। গোপীবাবা বলছে—'যাহা হয় কিছু দিলেই হবে।' দেখা গেল ভিক্ষার থালায় পয়সাই বেশী। দু'টী টাকা দেওয়ার কথা হল। নিকটে কে একজন ছিল তাকেই বলা হল ভিক্ষা দিতে।"

সূক্ষ্মে কবিরাজ মহাশয়কে দর্শন

রাত্রে মা বিছানার উপর বসিয়া আছেন। আপন ভাবে কত কি মন্ত্র মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতেছে। একটু পরেই হাততালি দিতে দিতে অতি মধুর স্বরে কি এক ভাষায় গান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার এক অক্ষরও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আপন মনে গাহিয়াই যাইতেছেন। তাহার পর আবার মুখ দিয়া বাহির হইল—'**কিরণ চন্দ্র দত্ত**'—'**কিরণ চন্দ্র দরবেশ**' এইরূপ আরও কত কি। '**শিবোঽহম্, শিবোঽহম্, হরি ওঁ, হরি ওঁ, শিব কালী, শিব কালী, শিব, শিব, শিব, শিব,**' এইরূপ নানারূপ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে চুপ হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ কোনও কথাবার্ত্তাই বলিলেন না। ইসারায় দুই একটি প্রয়োজনীয় কথা বুঝাইয়া দিলেন মাত্র।

মায়ের মুখে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় গান

২৩শে ফাল্গুন, শনিবার।

গতকাল এবং আজ রাত্রিতেও শুইয়া শুইয়া মা অনেকরকম মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। সেইরূপ দুর্ব্বোধ্য ভাষায় খুব প্রাণ দিয়া অনেকক্ষণ

গাহিলেনও। আমরা শুধু বিস্মিত হইয়া মার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম — "ইনি কি এই জগতেরই না অপর কোনও লোকবাসিনী?" মা যে আমাদের একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে তাহা দিন দিনই পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি।

আজও মার মুখ হইতে 'কিরণ চাঁদ দরবেশ', 'শিবকাশী' 'শিবোহহম্' 'শিব শিব' 'হরি বোল হরি বোল' ইত্যাদি অনেক কিছু নাম বাহির হইতে লাগিল। কখনও একেবারে স্থির হইয়া যান। অভয় ও আমি ডাকাডাকি করিলে শুধু 'উঁ' বলিয়া একটু সাড়া দেন।

মন্ত্রোচ্চারণের সময় আজও অভয় খাতা পেন্সিল লইয়া আসিয়া বলিল—"আপনি বলুন, আমি মন্ত্রগুলি লিখি।" মা আপনভাবেই উত্তর দিলেন—"দেখা যাক। যা হয়ে যায়।" ইহার পরেই মার মুখ হইতে মন্ত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল এবং অভয়ও যথাসম্ভব লিখিতে চেষ্টা করিল। মাঝে মাঝে মাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া নিতেছিল। অভয় যতটুকু লিখিতে পারিয়াছে তাহা তাহার খাতা হইতে এইখানে তুলিয়া দিলাম।

"***ঈং ব্রহ্মবাঃসুধানা বিক্ষয়াৎ পরমরক্ষ অক্ষুত পরমাত্নয়ে রূপান্তরিত মহাত্মনা। রিপ্সুতা মিত্রয়োমনে রক্ষয়াৎ শরৎ মনে। বং স্বাহা নো রাহং সংস্থিতা বিছত্তে বিদ্ধতে সত্তনাম্য মনা বীং সং স্বাহা আং স্বাহা ঋকরক্ রাহা ওম্ রাহা ওম্ ব্র ব্রহ্ম—ওম্ ব্রহ্মা ওম্ স্বাহা ওম্ সদ্ধঃ বীং প্রম্ অক্ষতা শ্রদ্ধা উৎপন্না। রূপে সাক্ষী আক্ষোত বিছনব মন্ত্রণা ঐ ঐং। সংসিত অসৎমনা ওঁ ব্রহ্ম ওঁ শ্রদ্ধা ওঁ বিষয়াৎমনা। রূপ-কারণে ওঁ সিদ্ধত্তা শতয়া ওপ্রাবিৎ সঙত্তিতা। আশতি করুণাময় বকসীতানাথ হৃছয়েৎ শ্রদ্ধা বিদ্ধ শ্রদ্ধেয়

শ্রদ্ধয়াৎমনা আং শান্তিঃ। নমো ব্রহ্মণ্যে অঃ ব্রহ্মণ্য আং স্বয়ং শ্রদ্ধে ব্রহ্মণ্য। নিত্য ব্রহ্ম অনিত্যব্রহ্ম স্বয়ং। বিদ্যা ব্রহ্ম অবিদ্যা ব্রহ্ম স্বয়ং। না হো ব্রহ্ম ইহো ব্রহ্ম স্বয়ং সৎ ব্রহ্ম অসৎ ব্রহ্ম নাসৎ সৎ ব্রহ্ম। আস্তক ব্রহ্ম নাস্তক ব্রহ্ম ব্রহ্মা ঈঁ ব্রহ্ময়াৎ ব্রহ্ময়োং ব্রহ্ময়োং ব্রহ্ময়োং। রক্ষণ বেক্ষতে ব্রহ্ম ও ক্ষাতি ভক্ষয়াৎ ব্রহ্ম রূপকরণে স্বয়ং স্থিতা। স্বয়ং স্থিত স্বয়ং সর্ব্ব স্বয়ং সর্ব্বস্বস্তি। অমূল্য প্রভা প্রকরণ স্বাধ্বা স্বয়ং ওঈঁ লক্ষ্মা লক্ষ্মণা বিক্ষতা বিক্ষমা ক্ষমা। অং ব্রহ্ম ওঁ শিব ওঁ শুদ্ধ ওঁ সত্য ওঁ নিত্য ওঁ স্বাহা ওঁ সত্তা ওঁ নিত্যা ওঁ বোদ্ধা স্বয়ং সত্য ভিক্ষা ভক্ষয়াৎ রূমনা নিত্য শুদ্ধ সত্য ওঈঁ দিত্তৎনা। সূক্ষ্ময়াম্ সূক্ষ্মঃ আত্ম ওঁ হ্রীং ব্রহ্ম অহং ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্ম সাং সাক্ষাৎ স্বয়ং ঈঁ স্বয়াং স্বয়ৎমনা স্বয়তে স্বয়াদ্ধত্তাঃ পরৎমনে পরত্তা পরৎমন্যে স্বয়ং সুদ্ধত। বং ব্রহ্ম আং স্বাহা ওঁ ব্রহা ক্ষণে। ও বৃহাৎ মনে সিস্তত্তা নন্ময়াঃ দি নালীলং দিত্তং বীসমাং সিদ্ধত্তনা আং স্বাহা * * * ”

আজ সন্ধ্যার সময়েও খানিকক্ষণ মন্ত্র উচ্চারণ হইল। প্রতিটি মন্ত্রের পরেই 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারিত হইতেছিল। ঐ সঙ্গে সঙ্গে কিছু যেন আহুতি দিতেছেন এইভাবে হাতেও মুদ্রা ইত্যাদি হইয়া যাইতেছিল।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে আমাদের সঙ্গে কথা বলিলেন। কিন্তু ঐ ভাবটি তখনও আছে মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছিল। মন্ত্রোচ্চারণের সময়ে অভয় মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"স্বাহাকে' 'স্বোহা' বলিতেছেন কেন?" তখন মার কানে যে ঐকথা প্রবেশ করিয়াছিল কিনা তাহাও বুঝা যায় নাই। পরে মা হাসিতে হাসিতে

বলিলেন—"অভয় ভাবছিল 'স্বোহা' মানে 'স্বাহা'। কিন্তু ওটা 'স্বয়ম্' শব্দটাই শেষের দিকে বাঁকা চোরা হয়ে ঐভাবে আসছিল। কি চমৎকার! যার যতটুকু যেভাবে বুঝবার ক্ষমতা, তার বেশীত বুঝতে পারে না। আর নিজের বুদ্ধিতে ঠিক ঠিক ধরতে না পারলেই মুস্কিল।"

সত্যই তাই। আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ বিচার বুদ্ধি দিয়াই আমরা ঐসব অপ্রাকৃত বিষয় ধরিতে চেষ্টা করি। যতটুকু আমাদের ক্ষমতা বা সীমার মধ্যে তাহাইত আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। আর বাকী সব কিছু নাগালের বাহিরেই থাকিয়া যায়।

২৫শে ফাল্গুন, সোমবার।

এই দুইদিন যাবৎ সন্ধ্যার পরে প্রত্যহই মার মুখ দিয়া অনেক প্রকার মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাহা ঠিক ঠিক লিখিয়া রাখা কিছুতেই সম্ভব হইল না। এইসকল মন্ত্র নিতান্ত অমূল্য সম্পদ। কিন্তু আমাদের অক্ষমতা বশতঃ আমরা তাহা বুঝিয়াও উঠিতে পারি না।

কয়েকদিন হয় কাশী হইতে পটল ও নেড়ুর পত্র আসিয়াছে। মাকে শুনাইয়া মার জবাব দেওয়া কিছুতেই হইয়া উঠিতেছে না। আজও একবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মা নিষেধ করিয়া দিলেন।

২৬শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

পটল ও নেড়ুর চিঠি লইয়া আজ আবার মার নিকট বসিলাম। পটলের চিঠিখানি বেশ সুন্দর লেখা। কয়েকটি লাইন তাহা হইতে

ডায়েরীতে তুলিয়া নিলাম। এক জায়গায় পটল লিখিতেছে—"মার খেলা সাধারণের দুর্ব্বোধ্য। সের সিংহের জামাতাকে আনবার জন্য কি মা আর কোনও সহজ উপায় অবলম্বন করতে পারতেন না? শুধু শুধু নিজেকে এত কষ্ট দিলেন কেন? যদিও কষ্ট বলে ওঁর কিছুই নেই। হাত পুড়ে গেলেও জ্বালা করে না। বিষাক্ত সর্প দংশনেও ব্যথা পান না। মাথা ঠুকে ফুটবল হয়ে গেলেও যন্ত্রণা হয় না, লঙ্কা খেলেও ঝাল লাগে না; কিন্তু সে সবত স্বয়ম্ভূ জগন্মাতার হিসাবে। তা বলে স্বর্গীয় বিপিন ভট্টাচার্য্য ও বিধু মুখীর (অধুনা সন্ন্যাসীনী) কন্যা হয়ে রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে কথাত ভুলে গেলে চলবে না। অখণ্ডের ভিতর কি সেটাও নেই?"

মায়ের সব কিছুই ঐ অখণ্ডের ভিতরে

মা এই কথাগুলি শুনতে শুনতে যোগ দিলেন—"তোদের দৃষ্টিতে আবার দেখছিস্ না, কখনও কখনও ব্যথা ট্যথা চলছে, অম্বল হল বলছে—" এই বলিয়া হাসিয়া বলিতেছেন— "কেউ কেউ কি বলবে জানিস না? কেউ কেউ কে জানিস্ না? আমিই আমাকে বলছি। বলবে তখন শরীরে যোগ ক্রিয়া হত বলে ঐরূপ সব হয়ে যেত। এখন আর কিছুই সে সব নেই। তবে তোরা এটা বুঝিস্ না যে অখণ্ডের মধ্যে সবই সম্ভব। এইসব কিছু সাধারণ প্রকাশ। তোরা যা দেখিস্ বুঝিস্ বলিস্ এও ঐ অখণ্ডের ভিতরেই।"

পটলের চিঠিতে 'বিপিন ভট্টাচার্য্য ও বিধুমুখীর কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন' এই কথাটা লইয়া মাকে আমি প্রশ্ন করিলাম —"সেদিন তুমি এমন ভাবের একটা কথা বলেছিলে যাতে আমার সন্দেহ দৃঢ় হয়েছে যে তোমার জন্ম সাধারণ জীবের মত মাতা-পিতা থেকে নয়। বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে বলনা কৃপা করে।"

মায়ের জন্ম-গ্রহণের রহস্য

কয়েকবার বলাতে মা ধীরে ধীরে বলিলেন—"**এ শরীরটার কথা ছাড়িয়া দে কিন্তু ঔরস জাত না হয়েও মাতৃগর্ভে সন্তানের মত প্রকাশ পেতে পারে।**"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিন্তু এই যে মাতৃগর্ভ হতে জাত দেখা যায় তাতেও কি অন্য কোনও বিষয় থাকতে পারে?"

মা হাসিয়া জবাব দিলেন—"**তাঁহার লীলার, তাঁহার মায়ার খেলার কতরকম প্রকাশ দেখাতে পারে। অনন্ত ও অব্যক্ত কত কি যে!**"

মা কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি চাপিয়াই গেলেন। জানিনা কোনও দিন এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে কিনা। ভাবিতে লাগিলাম যতই শুনিতেছি যতই জানিতেছি ততই যেন মনে হয় কিছুই বুঝিতেছি না। আরও কত কি যে শুনিবার বুঝিবার বাকী আছে তাহাই বা কে বলিবে?

২৭শে ফাল্গুন, বুধবার।

প্রায় ১৫ দিন এই ধর্মশালাতে থাকিয়া আজ সকালে বাসে করিয়া বর্ম্মণঘাট রওনা হইলাম। বর্ম্মণঘাট এখান হইতে ৬৫ মাইল

নর্ম্মদা তটে অজ্ঞাত বাসের ইতিহাস

দূর। বেলা প্রায় আড়াইটা নাগাদ আমরা গিয়া পৌঁছিলাম। প্রথমেই নেপালের বৃদ্ধা রাণীর মহলে লইয়া গেল। শুনিলাম তীর্থস্থান বলিয়া তিনি অধিকাংশ সময় এখানেই বাস করেন। বেশ সুন্দর স্থানটি। তিনি তাঁহার বাড়ীর নিকটেই মার জন্য তাঁবু লাগাইয়া দিতে চাহিলেন। মা বলিলেন—"জিনিস পত্র এখানেই থাক। চল আমরা কম্বল নিয়ে কোনও একটা গাছ তলায় গিয়ে বসি।"

কিন্তু এত রৌদ্রের ভিতর বাহিরে যাইতে রাণী সাহেবা নিষেধ করিলেন। ড্রাইভার বলিল যে এইস্থান হইতে প্রায় মাইল খানেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটি শিব মন্দির ও সাধুদের থাকিবার স্থান আছে নর্ম্মদার তীরেই।

ড্রাইভারের কথা শুনিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন—"চল, সেখানেই যাওয়া যাক।" তখনই মোটরে মাকে লইয়া রওনা হইলাম। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া মোটর চলিল। গন্তব্য স্থান হইতে প্রায় দেড় ফার্লং দূরে মোটর থামিয়া গেল। আর যাইবার রাস্তা নাই। ড্রাইভার জঙ্গলের মধ্যে গিয়া কোথা হইতে দুইজন লোককে ডাকিয়া আনিল। তাহারা আমাদের বিছানাপত্র লইয়া চলিল। রাস্তার দেখিলাম কোনও চিহ্নও নাই। মন্দিরে পৌঁছিয়া দেখি ঘোর জঙ্গলের মধ্যে একটি শিব মন্দির ও একটি ধর্মশালা। স্থানটির নাম রামঘাট। ধর্মশালাতে দেখিলাম একজন বাবাজী আছেন।

আমরা গিয়া দেখিলাম তিনি আহারে বসিয়াছেন। আহার সমাপ্ত হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম আমরা কোথায় থাকিব। দেখিলাম ভাল দুইটি ঘর তিনি দখল করিয়া আছেন। বারান্দার পাশে

দরজা জানলা শূন্য দুইটি ছোট কুঠরী তিনি আমাদের অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। ভাল একটি ঘরও তিনি ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না।

মায়ের ইচ্ছামত অগত্যা আমরা ঐরূপ একটি কুঠরিতেই আশ্রয় লইলাম। মা বলিলেন—"পিতাজী, মেয়ের জন্য যে ঘর সাজাইয়া দিয়াছেন তাতেই থাকব।" ড্রাইভারের ইচ্ছা ছিল যে গ্রামে সংবাদ দিয়া গ্রামবাসীদের সহায়তায় সাধুটির নিকট হইতে একটি ভাল ঘর আদায় করিয়া লয়। রাণী সাহেবের নাম শুনিলে গ্রাম-বাসীরাই আসিয়া সাধুকে ঘরছাড়া করিবে। কিন্তু মা বিশেষভাবে নিষেধ করিলেন। মা আবার বলিলেন—"সাধুটি নির্জ্জন স্থানে এতদিন ধরে সাধনভজন করছে। হয়ত ভাবছে এই নির্জ্জন স্থানেও আবার একি গোলমাল। যদি আমরা চলে যাই মন্দ হয়না। তার ভাবটা কতকটা এইরকমই।"

আমাদের আবার বলিলেন—"তোমরা কেউ কিছু কিন্তু বলো না।" ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি ইঁদুরের অসংখ্য গর্ত্ত এবং খুবই নোংরা। ড্রাইভারই কোনও প্রকারে লোক দিয়া লেপাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিল।

কিন্তু স্থানটি দেখিলাম খুবই মনোরম। নীচে নর্ম্মদা প্রবাহিতা। আর সবদিকে গভীর জঙ্গল। অতি নির্জ্জন স্থান, জনমানবের চিহ্ন মাত্রও নাই। শুনিলাম হিংস্র পশুও রাত্রে প্রায়ই এইখানে আসা যাওয়া করে। এদিকে মার ঘরেরত দরজাও ঠিক নাই। ড্রাইভার কোথা হইতে একটি লোক সংগ্রহ করিয়া আনিল। আমাদের কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া রাত্রে চলিয়া যাইবে।

অভয় গিয়া বাবাজীর সহিত আলাপ করিয়া অনেক কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আসিল। শুনিলাম ইনি তন্ত্রোপাসনা করেন। গত পরশু রাত্রে নাকি স্বপ্নে দেখিয়াছেন মাতাজীর মতই একজন স্ত্রীমূর্ত্তি (পীতাম্বর পরিধানে) আসিয়া তাঁহার গলায় সন্তান ভাবে হাত দিয়া জড়াইয়া আছেন। নর্ম্মদা মাতাই হয়ত তাঁহাকে এইভাবে ছলনা করিয়া গিয়াছেন বলিলেন।

ড্রাইভারটি দেখিলাম খুব চতুর ও করিৎকর্ম্মা লোক। সন্ধ্যার পরেই রাণীমহল হইতে মার জন্য দুধ, চাল, ডাল, আটা, ঘি, সব্‌জী ইত্যাদি সব কিছু লইয়া আসিয়া হাজির। মা সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন— "বাবাজীকে গিয়ে কিছু দিয়ে যায়।" তিনি প্রথমে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিলেন। কিন্তু পরে লইলেন। তিনি এবার বলিলেন— "এখন বুঝিতেছি কে আসিয়াছেন; পরশুইত স্বপ্নে দেখিয়াছি। আমিও সন্তানের ভাবে তার গলায় হাত জড়াইয়া দিয়াছিলাম, মাতাজীও আসিয়াই আজ বলিলেন—আমি তোমার বাচ্চি। কে বলিবে কে কি ভাবে আসেন ?"

ড্রাইভার গৌরীশঙ্করও বলিতেছে—"আজ ভোরে আমিও দেখি মাতাজী দেবীমূর্ত্তিতে আমাকে দর্শন দিতেছেন।" মায়ের লীলা এই গভীর জঙ্গলেও যে কিভাবে প্রকাশ পাইতেছে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

মার জন্য দুধ জ্বাল দিতেছি। এমন সময় সাধুটি আসিয়া বলিলেন যে একদিন তাঁহার নিকট হইতেও যেন ভিক্ষা নেই। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমার সব কিছুই নিয়া নিব। বাচ্চি যখন বলেছ তখন সব কিছুতেই আমার অধিকার আছে। কি বল পিতাজী ?"

আবার বলিলেন—"কখনও দরকার হয়ত পিতাজীর ঘরেই ঢুকে যাব।"

সাধুটি মার কথার হয়ত অন্য অর্থ করিতে পারেন তাই অভয় তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে 'ঘরে ঢুকে যাব' অর্থাৎ 'হৃদয়ে ঢুকে যাব'। তখন সাধুটি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

২৮শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

ভোরে উঠিয়া দেখিলাম সাধুটি নর্ম্মদার তীরে বোধহয় সাধনভজন করিতে চলিয়া গিয়াছেন। মা তখনও শুইয়া আছেন। আমি গিয়া শিব মন্দিরের বারান্দায় একটু বসিলাম। চারিদিকে জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। একেবারে নিস্তব্ধ। শুধু মধ্যে মধ্যে দূরে জঙ্গলের মধ্যে ময়ূরের ডাক শোনা যাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে মা উঠিলে মায়ের মুখ ধোয়াইয়া দিলাম। এই বিরাট অরণ্যের মধ্যে শুধু আমরা তিনটি প্রাণী—মা, অভয় ও আমি। এইরকম একান্তবাসের সময়ে মাকে এমন গভীরভাবে পাইবার সুযোগ ঘটে যে তাহা বলিবার না। নিজের গর্ভধারিণীর মতই মায়ের ব্যবহার যে কত মধুর তাহা কি করিয়া বুঝাইব? আমাদের কত জন্ম জন্মান্তরের সুকর্ম্মের ফলেই না আজ আমরা এইরূপ সুযোগলাভ করিতেছি!

আমরা এখানে থাকিলে সাধুটীর নির্জ্জনবাসে ব্যাঘাত হইতে পারে সেইজন্য মা আজই এখান হইতে যাওয়ার কথা বলিতেছেন। ড্রাইভার আসিয়া সংবাদ দিল যে সাধুটীর দুইটী ঘরের মধ্যে একটি ঘর মার জন্য নিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"না, না। কোনও দরকার নেই। লোককে কেন কষ্ট দেওয়া; বিশেষ

করে ভজনের ভাব যখন আছে। যদি এই শরীরটার থাকবার খেয়াল হয় তবে হয়ত বাবার ঘরেই ঢুকে গিয়ে সোজা বলব—বাবা, কাল তোমার কথা শুনেছি। আজ আমার কথা তুমি শোন। মেয়েটাকে যখন এখানে এনেছ জায়গা দিতেই হবে। আর যদি খেয়াল না হয় তবে হয়ত চলেই যাব। বাবাকে অসুবিধায় ফেলা হবে না। খেয়াল হলে যদিও এইসব কোনও সুবিধা অসুবিধার কথাই আসে না। যা হয়ে যায়।”

ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া কি ভাবে যেন মার সংবাদ পাইয়া কয়েকজন লোক মার দর্শন করিতে আসিল। এইরূপ গভীর জঙ্গলের মধ্যেও মার নিকট দর্শনার্থীর অভাব নাই দেখিলাম। একজন আবার মাকে প্রশ্নও করিল—“মন কিসে স্থির হয়?” মা উত্তর দিলেন— **“এই যে ‘কিসে হয়’ জিজ্ঞাসা, এইই হল পথ। এই ব্যাকুলতা তাঁর দিকে নিয়ে যায়।”**

বেলা প্রায় তিনটা নাগাদ রাণীসাহেবা ও আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক মার দর্শনের জন্য আসিলেন। মা রাণীসাহেবাকে বলিলেন—“পিতাজীর সাধনভজনের যাতে বিঘ্ন না হয় সেইজন্য আজই চলে যাব। গাছতলায় কি অন্য কোনও মন্দিরে থাকা যাবে।”

মা আমাকে জিনিষপত্র সব ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া সঙ্গে মাত্র এক একখানি কম্বল রাখিতে বলিলেন। রাণীসাহেবার সঙ্গেই আমরা ফিরিলাম। তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া মা আমাদের লইয়া হাঁটিয়া যে কোনও দিকে যাইতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই রাজী হইলেন না।

নর্ম্মদার তীরে রাজঘাট বলিয়া আর একটি স্থানে গাড়ীতে মাকে লইয়া গেল। সেখানেও দেখিলাম একটি ভাঙ্গা ঘর পড়িয়া আছে। অত্যন্ত অপরিষ্কার। সেইখানেই আমাদের রাত্রিটা থাকা স্থির হইল। রাণীসাহেবার একজন চাকর কিছু কিছু পরিষ্কার করিয়া দিল। সেই খানেই কম্বল বিছাইয়া লইলাম।

মায়ের লীলা আমাদের পক্ষে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। রাজপ্রাসাদের দ্বার যাঁহার জন্য উন্মুক্ত পড়িয়া রহিয়াছে তিনিই আজ অতি সাধারণ একজন ব্যক্তির ন্যায় কোথায় কি ভাবে কি অবস্থার মধ্যে দিন কাটাইতেছেন!

আমাদের সঙ্গেই কিছু খাবার ছিল। তাহাই খাইয়া আমরা শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় এগারটা নাগাদ মা একটু শব্দ করিতেই আমি উঠিয়া বসিলাম। মাকে জিজ্ঞাসা করিতেই মা বলিলেন —"তোরা একজন করে বসে বসে নাম কর।" সেই সঙ্গে মার শরীরও একটু ছুঁইয়া থাকিতে বলিলেন। আমি বসিয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। অভয় শুইয়াই রহিল। একটু পরে মা আবার বলিলেন—"ঘুমে ধরলে আমাকে ডাকিস্।" বসিয়া বসিয়া মার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে অবশ্য ঘুম যে না পাইতেছিল তাহা নয়। এই ভাবে ভোর চারটা পর্য্যন্ত বসিয়া কাটাইলাম। তাহার পর মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া একটু শুইয়া পড়িলাম।

২৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার।

সকালে মা উঠিলে কাল রাত্রির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। মার মুখে শুনিলাম যে একটি বিশেষ খারাপ আত্মা আমাকে ও

দুষ্ট আত্মার কবল হইতে মায়ের কৃপায় রক্ষা

অভয়কে ধরিতে আসিয়াছিল। সেই আত্মার এত শক্তি যে তাহার গায়ের বাতাসেই আমরা ঢলিয়া পড়িতেছিলাম। তখন মা দুইহাতে আমাদের দুইজনের চুল টানিয়া টানিয়া জাগাইয়াছেন। মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কোথা হতে এসেছ?" পিছনের ধর্ম্মশালা হইতে আসিয়াছে তাহাই সে বলিল। মা আমাদের হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"নর্ম্মদার তীরে বসে নাম করাত বেশ ভালই হয়েছে।" আমি কিন্তু মা যে কৃপা করিয়া আমাদের দুইজনকে দুষ্টআত্মার হাত হইতে কিভাবে রক্ষা করিয়াছেন তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম।

শুনিলাম নর্ম্মদার অপর পারে একটি মন্দির আছে। নাম দীপক মন্দির। একটু বেলা হইলেই নৌকা করিয়া আমরা সেই মন্দিরে আসিলাম। দেখিলাম প্রকাণ্ড শিব মন্দির। কিন্তু বহুকাল মেরামত না হওয়ায় এখন এতদূর অপরিষ্কার যে বলা যায় না। চড়াই পাখী ও চামচিকার বাসস্থান হইয়াছে। নিকটে আরও ২।১টি মন্দির আছে। তবে লোকজনের চিহ্নমাত্রও নাই।

রাণী সাহেবার লোক সঙ্গেই ছিল। সে কোনও ভাবে একটু পরিষ্কার করিয়া দিল। জলও আনিয়া দিল। কোনও ভাবে রান্না খাওয়া শেষ করিলাম। মা আজকাল নিত্যই চরু খাইতেছেন।

দুপুর বেলা অনেক লোকজন নর্ম্মদার অপর পার হইতে মার দর্শনের জন্য আসিয়াছে। রাণীসাহেবার লোকজনের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া দলে দলে লোক আসিয়া উপস্থিত। সকলেই আসিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছে—"সাধু মা কোথায়?" একটি

স্ত্রীলোক বলিল—"আমরা তীর্থস্থানের লোক। কোনও মহাপুরুষের সংবাদ পাইলেই আমরা দর্শন করিতে যাই।" সংবাদ পাইলে হাজার লোক একত্রিত হইবে বলিল। আমরাত মনে মনে ভাবিলাম, ভালই একান্তস্থানে আসিয়াছি! এই স্থানটি নাকি অতি প্রসিদ্ধ তীর্থ—নর্ম্মদা পরিক্রমায় বহু সাধু মহাত্মা এখানে আসেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলে চলিয়া গেল।

মন্দিরের তিনদিকেই খোলা। প্রচণ্ড বাতাস বহিতেছে। ছাতিটা খুলিয়া মার মুখের কাছে ধরিয়া রাখিলাম। নতুবা শোয়া দায়। গাড়োয়ালী একজন সাধু মা কোথা হইতে আসিয়া আমাদের সঙ্গে জুটিলেন। তিনিও মার নিকটেই রহিলেন। আমরা দুইজনও কোনও ভাবে শুইয়া পড়িলাম।

আজ সকালেই মা বলিতেছিলেন যে ব্যাস নদীর তীরে চিতোরাতে যে ধর্ম্মশালায় আমরা ছিলাম সেখানেই মা রামঘাটের ধর্ম্মশালার সেই সাধুটিকে দেখিয়াছিলেন। কাল সারারাত্রিও নাকি তাঁহাকে দেখিয়াছেন। সাধুটির তীব্র সাধন ভজন নিষ্ঠার কথা বলিতেছিলেন। আমরা যে সেখানে গেলাম, ফিরিয়া আসিলাম এবং যে সব কথাবার্তা হইয়াছে—সবই আমরা চলিয়া আসার পরে তাঁহারও মনে সারারাত উঠিয়াছে। কিন্তু তবুও সাধনে নিষ্ঠার জন্য তিনি বারবার ঐ সকল বিষয় মন হইতে সরাইয়া দিতেছিলেন। সাধুটি বাল্যকাল হইতেই শুনিলাম এই পথে আছেন। জ্বালামুখীর দিকে জন্মস্থান। তাঁহার নামও জ্বালাদত্ত।

সূক্ষ্মে রামঘাটের সাধুকে দর্শন

৩০শে ফাল্গুন, শনিবার।

আজ আমরা এইস্থান ত্যাগ করিয়া ওপারে গিয়া বাসে করিয়া পুনরায় সাগর রওনা হইলাম। বেলা প্রায় একটা নাগাদ আবার ব্যাস নদীর তীরে সেই ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলাম। এখানে পূর্ব্বেও প্রায় দুই সপ্তাহ থাকিয়া গিয়াছি। সমস্ত স্থানটি তাই আমাদের পরিচিত। বিশেষ কোনও অসুবিধাও নাই। দেখা যাক মা এখানে আবার কতদিন থাকেন।

সাগরে প্রত্যাবর্তন

রাত্রে মার নিকটে আমরা শুইয়া আছি। মা হঠাৎ বলিলেন—"জানালা সব বন্ধ করে দেত। ধূপকাঠি থাকলে জ্বালিয়ে দে। আলোটাও একটু জ্বালিয়ে রাখ্।" আমি মার পায়ের কাছেই শুইয়াছিলাম। মা বলিলেন—"ছুঁয়ে শুয়ে থাক্।" আমিও মার পায়ে হাতখানি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। বুঝিলাম আবার কোনও কিছু আসিয়াছে।

১লা চৈত্র, রবিবার

খুব ভোরে মার হাতে একটু মালিশ করিয়া দিতেছিলাম। হঠাৎ মা বলিয়া উঠিলেন—"দেখছি তুরীয়ানন্দের খুব খারাপ অবস্থা।" আর কিছু বলিলেন না। ভাবিলাম হঠাৎ তাঁহার কিছু হইল কি?

সূক্ষ্মে স্বামী তুরীয়ানন্দের খারাপ অবস্থা দর্শন

অভয় সকালে উঠিয়াই কাল রাত্রে কে আসিয়াছিল তাহা মাকে জিজ্ঞাসা করিল। মা বলিলেন—"তোদের

মঙ্গলের জন্যই ঐরকম করতে বলেছিলাম। কখনও হয়ত এই শরীরের উপরই ঐসব মূর্ত্তিদের লক্ষ্য থাকে। তখন হয়ত এই শরীরের ভিতরেই প্রবেশ করে কিছু দিন খেলা করে গেল। এই শরীরেরত ভাব কাউকে ডাকাও না আবার তাড়ানও না। যোগের অবশ্য একটা অবস্থা থাকে, যখন যেভাবে ইচ্ছা থাক। সামান্য সর্দ্দিটুকুও তখন হতে পারে না। সাধকের সেই একরকম অবস্থা। আবার এখন যেমন; তোরাও সব আছিস্, রোগও তেমনই। এই শরীরত তোদেরও তাড়ায় না; ওদেরই বা তাড়াবে কেন?"

রোগমূর্ত্তির মায়ের নিকট আগমন

২রা চৈত্র, সোমবার।

বিকালের দিকে নেপালের বৃদ্ধা রাণী সাহেবা তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধু সহ মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। অনেক প্রকার কথাবার্ত্তা হইল। গতকাল মায়ের নিকট সূক্ষ্মে যে রোগের মূর্ত্তি আসিয়াছিল সেই ঘটনাও তাঁহাদের নিকট বলিলাম। তাঁহারাত এই সব শুনিয়া হতভম্ব হইলেন। রাত্রি প্রায় নয়টায় সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

কি কথায় কথায় মা যেন বলিতেছিলেন—"তাঁকে নিয়ে বেশী সময় দাও। মনে মনে পূজা কর। চুপ করে বসে প্রথম পায়ের দিক থেকে মাথা পর্য্যন্ত এবং আবার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত চিন্তা করে তাঁর চরণে মনে মনেই প্রণাম কর।

মানসিক পূজার ক্রম বর্ণনা

মনে করবে মাথায় যে সহস্রধারা আছে তাই দিয়েই যেন তাঁর চরণ ধুইয়ে দিচ্ছ, তাঁকে স্নান করাচ্ছ, নিজের ভিতরে যে তেল আছে তাই মাখাচ্ছ, ফুল দিয়ে মনে মনেই পূজা করছ, মালা দিচ্ছ। তারপর খাইয়ে দিয়ে নিজের হৃদয়েই বিছানা পেতে শুইয়ে দিলে। চিন্তা করবে তাঁরদ পদসেবা করছ আর কেঁদে কেঁদে তাঁরই নিকট কৃপা প্রার্থনা করছ। আশা করে থাকবে কখন তিনি কৃপা দৃষ্টি করবেন। অবশেষে তিনি যেন উঠে বসলেন। তুমি তাঁর চরণে নিজেকে সঁপে দিলে। তিনি কৃপা দৃষ্টি করলেন। এই রকম ভাবে যখনই সময় পাবে সংক্ষিপ্ত মানস পূজায় সময় দিবে। তবে দেখতে পাবে প্রত্যক্ষ, যেমন তুমি আমি কথা বলছি সেই রকম প্রত্যক্ষ-ভাবেই তাঁকে পাবে। তিনি যে আছেন এই কথা মনে রাখবে। তোমরা চেষ্টা করে যাও যথাশক্তি। জাগ্রত ভাবে সেবা পূজা করবার চেষ্টা কর তাঁকে জাগাবার জন্য।”

৩রা চৈত্র, মঙ্গলবার।

বিকাল বেলা রাণী সাহেবা আবার আসিয়াছেন। আজ মার কাছে সাধন ভজন সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন যে এতদিন ভয়ে ভয়ে এসব কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পান নাই। আজ মাও তাঁহাকে নিজ হইতেই অনেক কথা বলিলেন।

রাণী সাহেবার কি কথার উত্তরে মা বলিলেন—“এই যেমন তুমি আমি দুইজন। আবার তুমি আমি একই। এই

যে দুইজনের মধ্যে শূন্য রয়েছে এও আমিই। দুই এর কোনও কথাই নাই। রাগ দ্বেষ হয় দুই ভাব হতেই। আমার নিজের হাত পা আঙ্গুল—এদের উপর কি আমার রাগ দ্বেষ হয় কখনও? এইরূপই যে সব।"

রাণী সাহেবা মার কথা মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন। রাত্রি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু উঠিতে ইচ্ছা হয়না বলিলেন। একটু পরে মা-ই নিজে তাঁহাদের রওনা হইতে বলিলেন। কারণ অনেকটা দূরের পথ জঙ্গলের মধ্য দিয়া।

ব্রহ্মচারী কান্তি ভাইর মায়ের নিকট আসা

আজ শান্তিনিকেতন হইতে হঠাৎ গুজরাটী যুবক কান্তিভাই ব্যাস * আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহার ইচ্ছানুসারে মা তাহাকে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। যাইবার সময় বলিয়া দিয়াছিলেন—"সব দেখ। দেখে শুনে যাঁকে ভাল লাগবে তাঁর কাছে থেকে সাধন ভজন করবে। গুরু করতে ইচ্ছা হলে তাই করবে।" মার উপদেশ মাথায় তুলিয়া কান্তিভাই তখন নানাস্থান ঘুরিতে আরম্ভ করে। পণ্ডিচেরীতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করিল, অরুণাচলে গিয়া মহর্ষি রমণকে দর্শন করিল, আনন্দ আশ্রমের স্বামী রামদাসকে দর্শন করিল। সকল স্থানেই কয়েকটি দিন করিয়া বাসও করিয়া আসিয়াছে। নানা তীর্থক্ষেত্রে ঘুরিতে ঘুরিতে মার নিকট ২/৩ খানা পত্রও দিয়াছিল। অবশেষে পুরী, কলিকাতা হইয়া রবীন্দ্রনাথের শান্তি-

---

* বর্ত্তমানে সে স্থায়ীভাবে আশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিতেছে। মা তাহার নাম দিয়াছেন 'রঘুনাথ দাস'।

নিকেতনে যায়। সেখানে গিয়া মার চরণে প্রার্থনা জানাইল—"মা সবই প্রায় দেখিলাম। কিন্তু তোমার চরণে যেমন শান্তি এমন আর কোথাও দেখিলাম না। তুমিই আমার গতি। এখন আমাকে তোমার কাছেই নিয়া যাও।" মা ইহার উত্তরে আবার লেখাইলেন —"আরও কিছু ঘুরিয়া দেখ। সময়ে দেখা যাইবে।"

কিন্তু মার নিকট হইতে এই চিঠি পাইয়াও কান্তিভাই আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। মার চরণে পৌঁছিবার জন্য তাহার প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মা কোথায়? মার ঠিকানাও চিঠিতে দেওয়া ছিলনা। খামের উপর শুধু আগের পোষ্ট অফিসের ছাপ দেখিয়াই মার নাম লইয়া অজানা পথে যাত্রা করিল।

কিভাবে যে সে আজ মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহা সত্যই আশ্চর্য্য। ভাবিলাম 'যে খোঁজে সেই পায়' ইহা কত সত্য! এইরূপ ব্যাকুলতা আসিলে তিনি কি আর দূরে থাকিতে পারেন? তিনি নিজেই আসিয়া তখন দেখা দেন। বাস্তবিকই কান্তিভাই যে ভাবে একমাত্র মার নাম স্মরণ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট অজানা পথে যাত্রা করিয়া আজ অভীষ্টের চরণে আসিয়া পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে ইহা মারই কৃপা ভিন্ন আর কি?

আজই ভোরে মা বেড়াইতে বেড়াইতে দুইবার "কা—ন্তি" শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। অভয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কোন কান্তি? কান্তি ভাই কি?" মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"হাঁ"। আমি তখন বলিলাম—"হয়ত কান্তি-ভাই এখন মাকে খুব চিন্তা করছে।" কিন্তু কান্তি ভাই যে তখন কোথায় এবং কি অবস্থার মধ্যে মার অনুসন্ধানে

ঘুরিতেছে তাহা কি আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছি? ভক্তের আহ্বান ভগবানের নিকট পৌঁছিতে বাধ্য। ভগবান নিজেই ভক্তকে অন্ধকারের ভিতর হইতে হাত ধরিয়া আলোকের পথে লইয়া আসেন। ইহা কত শুনিয়াছি, কত পড়িয়াছি; কিন্তু তবু আমাদের বিশ্বাস স্থির হয় কই? আজ মা আমাদের স্পষ্ট করিয়া তাহা দেখাইয়া দিলেন।

৭ই চৈত্র, শনিবার।

গতকাল রাণী সাহেবার পুত্র আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল —"মাতাজী, এই গাছটির নীচে নাকি এক পিশাচ অপবিত্র আত্মার ছিল?" তাহার উত্তরে মা বলিয়াছেন—"হাঁ একটি অপবিত্র আত্মা ছিল। আত্মা অবশ্য সবই শুদ্ধ। কিন্তু তবুও যেমন জীবাত্মা বা বদ্ধ আত্মা বলা হয় না, সেই ভাবেই বলা হল।

মাতৃদর্শনে উর্দ্ধগতি

জলত সবই জল। তবুও বদ্ধ জলেই গন্ধ হয়। ব্রাহ্মণ হয়ে চণ্ডালের অন্ন খেয়েছিল। চোর যেমন সাধুর বেশ ধারণ করে লোককে ভুলায় সেইরকম ঐ আত্মাটিও কখনও কখনও দেব দেবীর মূর্ত্তিতে প্রকাশ পেত। দেখতে পেয়ে লোকে নানারকম পূজাটুজা দিত। ভাল বলেই জানত। কিন্তু এই শরীরটার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই যখন সে জানল যে চিনে ফেলেছে তখনই সে স্থান ত্যাগ করে পালিয়ে গেল।"

রাণী সাহেবার ছেলে জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি মুক্ত হইয়া গিয়াছে?"

মা হাতখানি জোড় করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—"এই শরীরত সে সব কথা বলে না। যা দেখেছে তাই শুধু বলা হল। তবে এই শরীরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাহার ঊর্দ্ধগতিই হয়েছে। ঐ অবস্থায় আর নেই।"

আজ দুপুর বেলা মা বারান্দায় শুইয়া ছিলেন। হঠাৎ মা বলিয়া উঠিলেন—"রণভঙ্গ, রণভঙ্গ, রণভঙ্গ, রণভঙ্গ, খেলা সাঙ্গ।"

সূক্ষ্মে নানা দর্শন

অভয় ও আমি মার নিকটেই ছিলাম। মার কথা শুনিয়া অভয় প্রশ্ন করিল—"এখানকার খেলা সাঙ্গ হল নাকি?" আমিও যোগ দিলাম—"আমারও তাই মনে হয়।"

মা হাসিয়া বলিলেন—"বাঃ, এই এক জায়গাতেই যেন আমার খেলা ভঙ্গ হয়।" অভয় আবার বলিয়া উঠিল—"তবে হয়ত চির দিনের মত কারো খেলা সাঙ্গ হল।" আর কিছু মা বলিলেন না। চুপ করিয়া আবার শুইলেন।

কিছুক্ষণ পর আবার বলিয়া উঠিলেন—"কান্না"। আমি বলিলাম—"এইমাত্র যে খেলা সাঙ্গ বললে। সেই কান্নাই বোধ হয়।"

মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না। সব রকমেরইত কান্না হতে পারে। কত রকম আছে।"

একটু থামিয়া বলিতে লাগিলেন—"হরিরামের বাড়ীর সবারই মন খুব খারাপ দেখলাম। সেই বাড়ীরই একজন এই শরীরটার কাছে এসে খুব কাঁদছে।"

ইহার পর আবার বসিয়া বসিয়া নিজেই ছড়া রচনা করিতেছেন, নিজেই বলিতেছেন, নিজেই হাসিতেছেন। অভয় মার এই সব ছড়া

শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিল। মা তাহা দেখিয়া বলিলেন—

"শিখাও নাই লেখাপড়া।

কবিতা শুনতে চাও ভরা ভরা।" এই বলিয়া আনন্দের যেন একেবারে ফোয়ারা ছুটাইয়া দিলেন।

৮ই চৈত্র, রবিবার।

আজ এখানকার পালা সত্যই সাঙ্গ হইল। বিকালেই কাশী রওনা হইবার কথা হইয়াছে। খাওয়া দাওয়ার পরেই রাণীসাহেবার মোটরে আমরা তাঁহার বাড়ীতে আসিলাম।

কাশী অভিমুখে যাত্রা

আমরা চলিয়া যাইতেছি বলিয়া রাণীসাহেবা খুবই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বারবার বলিতেছেন—"আমাদের ভুলিবেন না। আবার এইরূপ সৌভাগ্য কবে হইবে?" যথাসময়ে মা রওনা হইলেন। রাণীসাহেবা অশ্রু-সজল নয়নে আমাদের বিদায় দিলেন।

বিকাল চারটার গাড়ীতে রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটায় ঝাঁসি আসিয়া পৌঁছিলাম। বিহারীলাল বাবুকে সংবাদ দেওয়াতে তিনি আসিয়া আমাদের তাঁহার বাসাতে লইয়া গেলেন।

ঝাঁসিতে দুই দিন

মাকে এইরকম অপ্রত্যাশিত ভাবে পাইয়া তিনিত একেবারে আনন্দে ভরপুর হইলেন। রাত্রিতে আমাদের ওখানেই থাকার ব্যবস্থা হইল।

১০ই চৈত্র, মঙ্গলবার।

গতকাল সমস্ত দিনটি ঝাঁসিতে থাকিয়া আজ রাত্রে লখ্নৌ রওনা হইলাম।

১১ই চৈত্র, বুধবার।

ভোরে লখ্‌নৌ পৌঁছিয়া মাকে লইয়া ষ্টেশনেই রহিলাম। সংবাদ পাইয়া স্থানীয় অনেকেই মার দর্শনের জন্য ছুটিয়া আসিলেন। ১২টার গাড়ীতে আমরা আবার কাশী রওনা হইলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাশী পৌঁছিয়া সোজা বাচ্চুদের বাগানে গিয়া মা উঠিলেন।

১৩ই চৈত্র, শুক্রবার।

মার সম্মুখে আজ সাতটি ব্রাহ্মণ বালকের উপবীত গ্রহণ হইল।

হরিরামজী ও নীরজবাবুর পুত্রের মাতৃ সমক্ষে উপবীত গ্রহণ

তাহার মধ্যে হরিরামের কনিষ্ঠ পুত্র মোহন, নীরজবাবুর মধ্যমপুত্র বিন্দু, হেমি মাসীমার দুই পুত্র এবং আশ্রমের আরও তিনটি ছেলে আছে। আশ্রমের তিনটি ছেলের শুধু দণ্ড রাখার ব্যবস্থা হইল। স্থির হইল তাহারা নিত্য যজ্ঞ করিবে।

পৈতার কাজ সমাপ্ত হইলেই মা বাচ্চুদের বাগান হইতে নৌকায় চলিয়া গেলেন। কতদিন মা এখানে থাকিবেন এখনও কিছুই জানি না।

১৬ই চৈত্র, সোমবার।

বিন্ধ্যাচলে দুইদিন

তিন দিন নৌকাতে থাকিয়া আজ বেলা তিনটার গাড়ীতে মা আমাদের লইয়া বিন্ধ্যাচলে রওনা হইলেন।

১৯শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

গতকাল বিন্ধ্যাচল হইতে রওনা হইয়া আজ মাকে লইয়া আমরা

দিল্লীতে ডাঃ সেনের বাসায় আসিয়া উঠিলাম। তিনি আজ কয়েক মাস যাবৎই মাকে একবার তাঁহার বাসায় লইবার জন্য খুবই প্রার্থনা জানাইতেছিলেন।

দিল্লী হইয়া দেরাদুনের পথে

কিন্তু আজ রাত্রির গাড়ীতেই মা আবার রওনা হইলেন। এবার দেরাদুনের পথে।

২০শে চৈত্র, শুক্রবার।

ভোরবেলা হরিদ্বার স্টেশনে ট্রেণ পৌছিতেই মা আমাদের লইয়া সেখানেই নামিয়া পড়িলেন। মার খেয়াল! একবার ব্রহ্ম-কুণ্ডে বেড়াইয়া আসিয়া দিনটি স্টেশনেই কাটাইলেন। আবার বিকাল চারটার গাড়ীতে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময়ে দেরাদুন পোঁছিয়া সোজা কিশনপুর আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

২২শে চৈত্র, রবিবার।

আজ দিল্লীর ভক্তেরা অনেকেই আসিয়া এখানে আশ্রমে মার সম্মুখে অখণ্ড নামকীর্ত্তন করিল। গত দুই বৎসর যাবৎ তাহারা প্রতিবারই এই সময়ে দেরাদুনে আসিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে। দিনভর বেশ সুন্দর নাম চলিল। মাও মধ্যে মধ্যে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন।

দিল্লীর ভক্তগণ কর্ত্তৃক অখণ্ড নাম কীর্ত্তন

সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। দিল্লীর প্রায় সকলেই মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। মাত্র একটি বেলার জন্য কত কষ্ট করিয়া আসিয়াছে শুধু মার সম্মুখে নামকীর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে। ইহাদের সকলের ভাব এত সুন্দর যে দেখিলেও মুগ্ধ হইতে হয়।

২৩শে চৈত্র, সোমবার।

আজ সন্ধ্যায় করণপুরে হেমবাবুর বাসায় কীর্ত্তনে মাকে লইয়া গেল। কীর্ত্তন শেষ হইলে রাত্রিতে মা সেখান হইতেই রায়পুর আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

৩০শে চৈত্র, সোমবার।

আজ সাতদিন প্রায় হইল মা রায়পুর আশ্রমেই আছেন।

একদিনের ঘটনা। মা নিজের ঘরে চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। পরমানন্দ স্বামী সেই ঘরে বসিয়া কি যেন করিতেছেন। মা চক্ষু বুজিয়াই আপন ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"কেউ কেউ আরতি করে গেল। ধূপের আগুন এই শরীরটায় পড়ল।"

সূক্ষ্মের ব্যাপার স্থূলে প্রকাশ

মার কথার দিকে পরমানন্দজী ঠিক যেন খেয়াল করিলেন না। পরদিন দেখা গেল মার পেটে হাতে কয়েকটি ফোস্কা পড়িয়াছে। তখন মা হাসিয়া বলিলেন—"কালইত পরমানন্দকে বলছিলাম।" একটু পরে নিজেই বলিতেছেন—"ঐ রকমই পড়েছিল। সূক্ষ্মের ব্যাপার স্থূলেও ত প্রকাশ হতে পারে।"

মায়ের অনন্ত লীলার মধ্যে ইহাও একটি!

—0—